

# ধনপতির সিংহলযাত্রা



রামকুমার মুখোপাধ্যায়

কবিকঙ্কণ মুকুন্দকে মাইকেল উল্লেখ  
করেছিলেন কবিতা-পঙ্কজ-রবি হিসেবে আর  
রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছিলেন বাঁসালা ভাষার  
সর্বপ্রধান কবি। ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত  
বাঙালি একদিন প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্গে  
বিস্মৃত হল তাঁকেও; বঙ্গ-হৃদ-হৃদের কমলে  
কামিনীও অদৃশ্য হল। ধনপতির সিংহলযাত্রা  
উপনিবেশ-পূর্ব বাংলা তথা ভারতবর্ষের সঙ্গে  
নতুন সেতুবন্ধন। এই উপন্যাসে রয়েছে  
নবদ্বীপ, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, খড়দহ, মগরা,  
নীলাচল, শঙ্কুদ্বীপ, সর্পদহ, কালিয়দহ হয়ে  
ধনপতির সিংহলযাত্রার অনুপুঙ্খ বিবরণ।  
নানা অবলুপ্ত নদীপথ ও বিস্মৃত জনপদের  
বর্ণনা এবং অপ্রচলিত শব্দাবলি পুনরুদ্ধারে  
বাংলা কথাসাহিত্যে এ-টি একটি দিগ্দর্শী  
রচনা। পড়তে পড়তে মনে হয় ইতিহাস বা  
ভ্রমণকথা হয়ে উঠছে উপন্যাস আর সে-  
উপন্যাস আমাদের হারানো সম্পদ ফিরিয়ে  
দিচ্ছে আমাদেরই হাতে।

# ধনপতির সিংহলযাত্রা

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ ১৪২০ সালে আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত ॥



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,  
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে! যশঃ-সুধাদানে  
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী  
বাগ্‌দেবী! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,  
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে?---  
বঙ্গ-হৃদ-হৃদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥

## সূচি

১। রাজসমীপে ধনপতি	১৩
২। খুল্লনার আতঙ্ক, লহনার আনন্দ	১৬
৩। দক্ষিণ পাটনে দৈবজ্ঞের নিষেধ	১৮
৪। সপ্তডিঙা উত্তোলন	১৯
৫। বিনিময়দ্রব্য সংগ্রহ	২২
৬। তরণী পূজা	২৯
৭। খুল্লনার চণ্ডী পূজা	৩৫
৮। সাধুর কোপ, খুল্লনার বিনয়	৪০
৯। সদাগরের প্রতি চণ্ডীর ক্রোধ	৪৫
১০। চণ্ডীর প্রতি পদ্মার উপদেশ	৫০
১১। ধনপতির ডিঙাঘাটায় গমন	৫৫
১২। নদীবন্ধে ধনপতি	৬১
১৩। নৌকারোহণ	৬৫
১৪। ডিঙা দর্শনে প্রতীক্ষা	৬৯
১৫। কাণ্ডারির আতঙ্ক	৭৭
১৬। সাধুর লহনাদর্শন	৮০
১৭। নাটশালা	৮৩
১৮। ডাহিনে ললিতপুর বামেতে ইন্দ্রাণী	৮৯
১৯। অজয়যাত্রা	৯৩
২০। নদী-সংগমে ধনপতি	৯৬
২১। নয় দীয়া, নয় দ্বীপ	১০০
২২। ভাগীরথী স্রোতে নিশিযাত্রা	১০৪

২৩। মুক্তবেণী	১০৮
২৪। অনুপাম সপ্তগ্রাম	১১১
২৫। মগরার পথে	১১৫
২৬। পদ্মাবতী সকাশে ভগবতী	১২০
২৭। নদ-নদীর মগরা গমন	১২৫
২৮। ডুবুডুবু সপ্তডিঙা	১২৮
২৯। ছয় নিষ্পদের অতলযাত্রা	১৩৩
৩০। একা ভাসে দুর্গাবর	১৩৯
৩১। সংকেতমাধব প্রদক্ষিণ	১৪৪
৩২। নীলাচল যাত্রা	১৫১
৩৩। জগন্নাথধামে ধনপতি	১৫৪
৩৪। পূর্ণচন্দ্রে সাগরযাত্রা	১৬০
৩৫। জলৌকাদহ অতিক্রম	১৬৪
৩৬। নিশিপাটন	১৬৭
৩৭। শঙ্খদ্বীপে ধনপতি	১৭৩
৩৮। দিগ্ভ্রাস্ত দুর্গাবর	১৭৬
৩৯। সর্পদহে সদাগর	১৮১
৪০। রামের জাঙ্গাল	১৮৭
৪১। আড়খান	১৯২
৪২। কমলে কামিনী	১৯৯
৪৩। লঙ্কাতীরে দুর্গাবর	২০৫
৪৪। সাধুর রাজসভা গমন	২১০
৪৫। লঙ্কাবাসীর রত্নমালা যাত্রা	২১৫
৪৬। না কমল না কামিনী	২১৯
৪৭। ডিঙা লুণ্ঠন	২২৩
৪৮। বন্দিশালে ধনপতি	২২৮
৪৯। গীতময় লঙ্কা দ্বীপ	২৩২

শব্দার্থ ২৩৪

মানচিত্র : প্রাচীন জনপদ ও জনপথ ২৩৯

ঋণ

সুকুমার সেন  
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়  
মাণিকলাল সিংহ  
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ  
অশোক মুখোপাধ্যায়  
অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়  
হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

সুমেরু উপরে আছে কুমুদ ভূধর  
তাহার উপরে আছে বট তরুবর।  
এগার যোজন সেই তরুবর বট  
জার সুখে হর নাহি ছাড়েন নিকট।  
তাহার কোঠরে আছে পাঁচখানি নদী  
তথি বহে গুড় দুগ্ধ ঘৃত মধু দধি।  
তাহে ঝালি খেলে চণ্ডী সহ সখীগণে  
হেনকালে খুল্লনা পড়িয়া গেল মনে।

উপন্যাসটির রচনাকাল ভাদ্র ১৪১১ থেকে মাঘ ১৪১৬

ধনপতির সিংহলযাত্রা



## ১ রাজসমীপে ধনপতি

পারলে গোধূলির এই রং গণ্ডুষে শুষে নিত ধনপতি। ওই কেশ-কালা ফিঙেটির মতো দোল খেত কর্ণের মাথায়। পশ্চিমের কমলা সূর্যের মতো দিন-শেষে ডুবে যেত ভ্রমরার জলে। গিরিমাটিরঙে রাঙিয়ে দিত আকাশের কোল।

কিন্তু তাকে যেতে হবে সিংহল দেশে, নোনা পথে—রাজার নির্দেশ। যে-জন চন্দনে শিবের আরাধনা করে সে সপ্তদ্বীপা অবনীতে রাজা হয়, যে শ্রীহরির সামনে চমরি দুলিয়ে বন্দনা করে সে রথে চড়ে স্বর্গে যায়; কিন্তু এক তোলাও চন্দনকাষ্ঠ নেই রাজভাণ্ডারে, চমরি নেই একটিও। ভাণ্ডারীর প্রয়োজন গজের জন্য লবঙ্গ, তুরঙ্গের সৈন্ধব লবণ, রাজরানিদের পাম্বা, নীলা, মানিক, প্রবাল, মোতি ও পলা, বামাদের শঙ্খালংকার, কুঙ্কুম, কস্তুরি ও গন্ধচূয়া এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পাহাড়িয়া ভোটকম্বল। রাজভাণ্ডারী বলে, যত ঋণী সদাগর ছিল তারা সব এখন ধনী। গেহ থেকে এক পা ফেলার মতি নেই কারো। শেষ দক্ষিণ পাটনে গিয়েছিল জয়পতি দত্ত, ধনপতির বাবা। ডিঙার পর ডিঙা ভরে এনেছিল নানা সামগ্রী। তারপর আর কোনো সাধু ওমুখো হয়নি, কোনো সদাগর আসেনি ওদেশ হতে। ফলে গুয়ারও টান। রায়, কীসে সাজা হবে তাম্বুল, কী দিয়ে রাখবেন মান!

ডাক পড়ে সাধু ধনপতির। যেতে হবে সিংহল পাটনে। করজোড়ে সাধু বলে, আপনার চরণে আমার নিবেদন, এবার যাক অন্য জন। বিগত বৎসর আপনার আদেশে গৌড় পাটনে গেছি শুক-শারির জন্য হেম পিঞ্জর গড়াতে। এদিকে গেহ-গারিতে চরম অশান্তি। বড়ো বধূটি ছোটোটিকে বনে পাঠাল ছেলি রাখালিতে। ব্যাস্ত্র-ভল্লুক সাথে বনে ফেরে সে। লোচনের লোহে বসন ভেজে। গেহ-গারির অশান্তির কথা কী মুখে বলি রায়! খুল্লনাকে ঘরে ফেরায় কিন্তু জ্ঞাতি-কুটুম্ব অন্নে বসে না। বলে, যার জায়া বনে ফেরে তার গেহ-গারিতে শশীর কলঙ্ক। শেষে জৌ-গ্হে প্রবেশ। নিজ হাতে বহি জ্বালে খুল্লনা। অগ্নি মাথা তোলে, যোজনপ্রমাণ তার শিখা। জ্ঞাতি সাধুরা অনলের তাপে পিছু হটে। নীল ধূম ওঠে আকাশে। ডানা মেলে চাতক-উলুক, পাড়ি দেয় ভিন দেশে। উত্তাপে পথ পদলায় পথিক। অগ্নিশিখা ছোটো বায়ুর স্কন্ধে চড়ে, বৃষের মতো গর্জায়। রথ ছেড়ে সূর্যের সাত অশ্ব ছোটো সপ্তমুখে, শতীপতিকে ফেলে দৌড় দেয় ইরাবৎ, চন্দ্রচূড়কে কাঁধে তুলে বৃষভ পালায়, কমলাপতিকে পথে বসিয়ে উড়ে চলে গরুড়, ব্রহ্মাকে রেখে হংস

চন্দ্রবতী সাগর কূলে ধায়। রায়, লোচনের জলে ভাসি। ভাবিনি ফিরে পাব খুল্লনাকে। বুক চাপড়ে কাঁদি। ছুটে যাই জৌ-গৃহের দিকে। আপনাদের আশীর্বাদে ফিরে এল খুল্লনা। আর হারাতে চাই না, রায়। আপনার চরণে এইটুকু নিবেদন।

সভাজনেরা বলে, দ্বিতীয়-তৃতীয় পত্নী ঘরে আনে অশান্তি। অগ্নি প্রথমে হৃদে পরে জৌ-গৃহে। সেই অগ্নিতে হবি ঢালে জ্ঞাতিরা। কিন্তু অগ্নির ভয়ে বণিকের জল ছাড়লে কি চলে? বসে খেলে কুবেরের ধনও শেষ, নদীর বালুও ফাঁকা। চাঁদ সদাগরের বাহির মহলে যে সাত মরাই মুদ্রা তা ওই নিত্য পাটনের কারণে। তা ছাড়া সাধু জয়পতির যোগ্যপুত্র কেন অন্দরে নারী আর বাহিরে কবুতর নিয়ে মত্ত থাকবে? বিশেষ করে যখন রাজার ভূ-ভূমি ভোগ করে।

ধনপতি বোঝায় ডিঙাগুলির দূরবস্থা। পিতা জয়পতির কালে ফি-বছর জলে ভেসে তলগুলিতে পচন। কর্ণ-কেরয়ালেও ঘুণ। এসব ডিঙা নিয়ে সাগর ভাঙবে কেমন করে? দক্ষিণ পাটনে পদে পদে মকর, তিমি, তিমি-খাদক তিমিস্থি। প্রাণ-পিড়াসিল মীন শতেক যোজন তনু নিয়ে জল-পথিকের পথ আটকায়। ও সাগরে কুমির, টমক, সিঙ্গা, জলৌকা সবরকম জলপ্রাণীর বাস। সাগরপাড়ো কি কম আপদ? যত শাদূল তত দুষ্ট। রায়, এবার অন্য কেউ যাক, আমি আপনার চরণে থাকি।

রাজার লোচন দু-টি লোহিত। কালু দত্ত মৃদু স্বরে ধনপতিকে বলে, গেহ-গারি ছেড়ে সাগরে ভাসার ব্যথা-দুঃখ বুঝি, কিন্তু রাজ-আজ্ঞা না মেনে কাঁই-বা উপায়?

হাত পাতে ধনপতি। তাম্বুল দেন রায়। সঙ্গে শালবন্ধ, লক্ষ মুদ্রা, তুরঙ্গ, বর্ম এবং দু-ফলা কাটারি। রাজসভার বাইরে এসে ধনপতির মনে হয় উপহারগুলি মৃষিকের গর্তে ফেলে পা ছড়িয়ে কাঁদে। ইচ্ছে করে রাজার কাছে ফিরে গিয়ে বলে, আমার ভাণ্ডারের সমস্ত চন্দনকাষ্ঠ শূলপাণিকে উৎসর্গ করে তুমি পৃথিবীর রাজা হও, আমার গৃহের সমস্ত চমরি নিয়ে শ্রীহরির বন্দনা করে তুমি পুষ্পবিমানে স্বর্গে যাও—শুধু আমাকে ফিরিয়ে দাও উজানি নগর। আমি আমার সব পান্না-নীলা-মানিক-প্রবাল-মোতি-পলা তোমার রানিদের দেব রায়, তুমি আমাকে গৃহে থাকতে দাও। আমি তোমার গজদলকে আমার সংগ্রহের শেষ লবঙ্গটি পর্যন্ত দেব, তুমি আমাকে আমার বান্ধব জনার্দন, হলধর, সুবল, সুদাম, মুরারির সঙ্গে পারাবতক্ৰীড়ায় যেতে দাও। আমি তোমার তুরঙ্গদলকে আমার সমস্ত সৈন্যব লবণ দেব, তুমি আমাকে মকরজ, ঘনবোলা, রণজয়া, কয়রা, নয়নসুকাকে আকাশে ওড়াতে দাও। আমি তোমার বামাদের আমার সব শঙ্খালংকার, কুঙ্কুম, কস্তুরি ও গন্ধচূয়া দেব, তুমি আমাকে লহনার পাকে, কনক থালে, শুকুতা, মীন, মাংস, বড়ি ও দুই বুড়ি ভাজা কই খেতে দাও। আমি রায় পরিবারের সব বৃদ্ধ-

বৃদ্ধাকে ভোটকঞ্চল দেব, তুমি শুধু আমাকে দেখতে দাও খুল্লনার কলাপী পুচ্ছের মতো কেশ, শশীর মতো মুখ, কদম্বকোরকের মতো স্তন, মধুকরীর মতো ক্ষীণমধ্যা। শালবস্ত্র ফিরিয়ে নাও রায়, আমি তোমাকে কুসুমমালা দেব। ফিরিয়ে নাও লক্ষ মুদ্রা, আমি ঘড়া-ভরতি গঙ্গাজল দেব। তুরঙ্গ ফিরিয়ে নাও, ধেনু দেব। বর্ম ফিরিয়ে নাও, শত নারিকল দেব। দু-ফলা কাটারি ফিরিয়ে নাও। তোমাকে দেব দধি, চাঁপা কদলী, দোখণ্ডি বাদ্যযন্ত্র, সরস গুয়া আর সহস্র তাম্বুল।

প্রবীণ নফর অপেক্ষায় ছিল প্রবেশদ্বারে। ছুটে আসে সাধুকে দেখে। দৃষ্টি তোলে ধনপতির মুখে। এ যে কালবোশেখির ঈশান গগন! অমন চন্দ্র বদনে এত মসি এল কোথা থেকে? রাজসভায় প্রেতের বাস নাকি? নিপাট ললাটে বেলা না পেরোতে অত বলিরেখা পড়ল কেমন করে? অনেক প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরের মানুষটি বোবা। যার শত পারাবত দিন-রাত বকম-বকম বকে তার মুখে কুলুপ। কথার ভিত স্থাপন করতে সাধুর হাত থেকে গাএবস্ত্র নিয়ে নফর বলে, বস্ত্র বহুপ্রকার কিন্তু মেঘ-বস্ত্রের কোনো বিকল্প নাই। অন্য প্রাণীর কেশেও গরমবস্ত্র তৈরি হয় কিন্তু তা কর্কশ। যে-প্রাণীর মনে উত্তাপ তার কেশ ঠাণ্ডা। কেশরী-কেঁদুয়ার কেশে তাই আসন হয়, বসন হয় না। সবচেয়ে উত্তম শীতবস্ত্র হয় হিম দেশের শীতল মেঘের কেশে। রাজার দেহ-বস্ত্রগুলি নরম কিন্তু ভাণ্ডারের দান-সামগ্রীগুলি খড়ম। নরমটি নিলে পুরোনো, নতুনটি নিলে শক্ত। দানের জিনিসপত্র ধাতে কড়া হয়—যেমন নারিকল, তিল নাড়ু...আর কী যেন সাধুমশাই?

উত্তরের আশায় নয়ন মেলে দেখে সাধু চলেছে পাটের দোলায়। ছুটে ধরতে যায় নফর কিন্তু পথ আগলায় অশ্বপাল। নৃপতির একটি দান রয়ে গেছে। একখানি অশ্ব। তার স্বন্ধে কাশপুষ্প, লাঙ্গুলে চামর। কিন্তু জলযাত্রীকে অশ্ব কেন? মান দিতে। নফরের প্রশ্ন, ঘোড়ামুগের জাত নাই অথচ ঘোড়াদানে মান মেলে কোথা থেকে? অশ্বপাল মান-অপমান বোঝে না। সে জানে ঘোটকের চল্লিশ দশন আর ঘোটকীর ছত্রিশ, শরৎকালে ঘোটকীর গর্ভধারণ আর গর্ভকাল তিন শত বাইশ দিন। নফরের হাতে লাগামটি ধরিয়ে দিয়ে অশ্বপাল বলে, চক্ষু রাখবে কর্ণে। কর্ণ দু-টি উন্নত দেখলে বুঝবে মতি শাস্ত, সামনে বিস্তারিত দেখলে বুঝবে ভীত এবং পেছনে দেখলে বুঝবে কুপিত। আর সবচেয়ে বড়ো অশ্বটি হলো অশ্বিনীকুমারের। রাত্রিকালে আকাশে তাকিয়ে দেখে নিয়ো।

## ২ খুল্লনার আতঙ্ক, লহনার আনন্দ

রাজসভা হতে সপ্তডিঙার জরিপে ভ্রমরায় গিয়েছিল ধনপতি। ডিঙা রইল জলে, সাধু দেখল গোধূলি, ডাউয়া ডুমুর, আর পাটের সূর্য। এমনই হয়, বলেছিল দৈবজ্ঞ গণক। সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের প্রথমটিতে যার জন্ম সে সপ্তভাবে বাঁধা— দেবকার্যপরায়াণ, বিনীত, সত্ত্বাধিত, সম্পত্তিশালী, যোষানুরক্ত, অলংকারপ্রিয়, পুত্রবৎসল। মিথুন রাশির কারণে প্রকৃতি-অনুরক্ত। সেই প্রকৃতি কখনো উদ্ভিদপ্রকৃতি, কখনো নক্ষত্রপ্রকৃতি, কখনো প্রাণীপ্রকৃতি, কখনো আবার একান্ত নারীপ্রকৃতি। এই নারী প্রকৃতি হচ্ছে যোষানুরাগ। তার নানা রূপ যার ভেতর একটি হল যোষামুজ, স্ত্রী সহিত কমল। মিথুন রাশির অশ্বারূঢ় পুরুষটি পঙ্কজ বনে কামিনী দেখে।

অন্ধকার ভিড় করে ভ্রমরার বৃকে। আকাশে মুখ তোলে সন্ধ্যা তারা। দু-চোখে বাতি জ্বালিয়ে নদী পাহারায় বসে উলুক, সাগুনের ডালে। ভ্রমরা বয়ে চলে। নিতাদিন এই চলা, নিরন্তর এই যাত্রা কিন্তু ত্যাগ করে চলে যায় না। চলতে চলতে থাকে, থাকতে থাকতে চলে। কিন্তু ধনপতিকে যেতে হবে, চলতে চাাতে চক্ষু-সীমার বাইরে চলে যেতে হবে। তার গমন নিশ্চিত কিন্তু প্রত্যাগমন নয়। কত সাধু ভুল পথে চলে যায় আরও বড়ো সাগরে, তলিয়ে যায় ঝড়ঝঞ্ঝায়, হারিয়ে যায় ঢেউ দাপটে। তখনও থাকবে ওই ভ্রমরা, ওই সাগুন বৃক্ষ, ওই নলতৃণ, ওই মৎসরাঙা পাখি, ওই চঞ্চরী, ওই গোহালিয়া লতা কিন্তু ধনপতির থাকার উপায় নেই। তাকে জলযাত্রায় যেতে হবে। হতে হবে প্রস্তুত।

গেহে ফেরে ধনপতি।

সাধুর সিংহল-যাত্রার সংবাদে আকাশ ভেঙে পড়ে খুল্লনা শিরে। সংসারে এ কী দৈব-ঝড়? খুল্লনার দু-চোখে দামোদর, দারুকেশ্বর। বলে, নিজাগারে যত চন্দন-শঙ্খ আছে দাও নৃপবরে। সেইবার পিঞ্জর-যাত্রায় তোমার এক বৎসর কেটেছিল গৌড়ে, আমার ছেলি-সাথে গহন কাননে। আর নয়। এইবার গৃহের সমস্ত কাঞ্চনভূষণ দাও। রাজদ্বারে সমস্ত পান্না-মানিক-কণ্ঠি-নীলা নিয়ে যাও। তাতেও না হলে এই নাও আমার কনকচুড়ি, এই নাও কলধৌত কণ্ঠমালা, এই নাও কর্ণের হেম-মুকুলিকা, এই নাও রজতপাশুলি, এই নাও পদাস্কুরিও। এই ধরো মুখর নৃপূরশালি, নৃপবরে বলো, সাধু না থাকলে কার জন্য শিঞ্জন, কার জন্য রব, কার জন্য কথা বলা। তুমি সৈন্ধব পানিতে পাটনে যেয়ো না সাধু, স্বাদু জলে থাকো। তুমি থাকলে আমি কবরীতে বাঁধব কুসুম, কানে কনক-বউলি। মনে হবে আষাঢ়ের মেঘে বিজুলি। তুমি কাছে থাকলে বাহ্যুগে পরব কনক-বাজু আর

বাজননূপুর। কটিতে বাঁধব কিঙ্কিনী, যা পদে পদে ধ্বনি তুলবে মত্ত করালের। তুমি যেয়ো না সাধু। তুমি থাকো, তুমি দেখো আমি যাবক রসে মার্জন করব অধর।

ধনপতি বলে, রাজার আদেশ হয়ে গেছে খুল্লনা—এ রদহীন। রাজাদেশ দুঃখ-বেদনাশূন্য। কাঞ্চন আছে, কামিনী নেই। শশীমুখী, দুই চক্ষের শ্রাবণ ধারায় আর একখানি ভৈরবী, কর্মনাশা, শিলাই কিংবা চন্দ্রভাগা হবে কিন্তু রাজবচনে পরিবর্তন হবে না।

বসনে নয়ান মোছে খুল্লনা। বলে, তুমি দীর্ঘ পরবাসে সিংহল-দেশে চললে, আর এদিকে, লাজ খেয়ে বলি, আমার গর্ভ ছয় মাস। তুমি চলে গেলে তোমার করাল বান্ধবজন আমায় যে কলঙ্ক দেবে সাধু। আর কত পরীক্ষা দেব আমি? সরোবর-জলে কত বার ডুবে থাকব, কত বার নাগিনীর মুখ থেকে কেড়ে আনব অঙ্গুরি, কত বার ফুটন্ত ঘৃতের ভেতর থেকে তুলে আনব কাঞ্চন, কত বার দুই করে ধারণ করব অগ্নি-শলাকা, কত বার জৌঘরে ঢুকব সাধু?

ধনপতি নিজ পিতৃদ্বের সুসংবাদটি শোনে লবণ-যাত্রার দুঃসময়ে। তার মনে হয় সপ্তডিঙা ভাসিয়ে দিয়ে বসে থাকে ভূমা আঁকড়ে। সফরিয়া দ্রব্যের জন্য পত্নী এবং ভাবী সন্তান ছেড়ে জলযানের রইঘরে বসতে চায় না সে। কত জৌ-মোহরে সুখ আসে ধামে, শাস্তি নামে গৃহে? কিন্তু হৃদয়ের দুঃখ বৃথা, নয়নের লোহ অর্থহীন। জয়পত্র লেখে ধনপতি—তোমার গর্ভ যখন ছয় মাস, নৃপাদেশে আমি পরবাসে যাই। যদি কন্যা হয় নাম দিয়ো শশীকলা। উত্তম বরে তার বিবাহের ব্যবস্থা কোরো। পুত্র হলে নাম দিয়ো শ্রীপতি। বিদ্যাচর্চার মধ্য দিয়ে তার মতিটি কোরো শোভন, সু এবং হিত। বারো বৎসর অতিক্রান্তেও যদি না ফিরি, তাকে পাঠিয়ো দক্ষিণে পাটনে। সে যেন সব ক-টি বন্দিশাল ঘুরে দেখে। সব বন্দির নামগোত্র জিজ্ঞাসা করে। সন্ধান করে বাম নাশায় কার আঁচিল আর বক্ষে কার ছয় তিল। যেন দেখে নিত্যদিন শিবপূজার প্রণতিচিহ্ন আঁকা কার ললাটে। আর এই অর্পণ করলাম তিন নিদর্শন—কেশবন্ধ বালা, সুমন্ত অঙ্গুরি এবং গাত্রের আঁচলা। এই নাও সন্দেহভঞ্জন-পত্র, সুমুখী।

‘স্বস্তি’ ‘স্বস্তি’ বলে মাথে পত্রখানি স্পর্শ করে খুল্লনা। তারপর আপনার বাসে চলে। আসে লহনা। বসে সদাগরের পাশে। নয়নে বারি কিন্তু মনে বল আনতে বলে সাধুকে। বোঝায় মীন আর সদাগরের সংসার হল নদী-সাগর, ডাঙাটি হল পরবাস। ডিঙার খোল খালি রাখতে নাই, কাছিম-কাঙড়ায় ডিম পাড়ে। শ্বশুর তাই প্রায় পুরো বৎসর ভেসে থাকতেন জলে। তাঁর বাণিজ্যের ফলেই তো গেহ-গারিতে এত সুখ, এত আনন্দ। পাশাক্রীড়া আর পারাবতে মেতে থাকলে কি চলে? লোকে মান দেয় ধন দেখে। চম্পাই নগরের চান্দ সদাগর গজে চেপে গমন

করে। কর্জনার নীলাম্বর বান্যার যত ভাই তত অশ্ব, যত অশ্ব তত লক্ষর। সাঁকোর শঙ্খ দত্তের অষ্ট বাহন রথ বয় রাত্রিদিন। বর্ধমানের ধূস দত্ত, গণেশপুরের সনাতন চন্দ, সপ্তগ্রামের শ্রীধর হাজরা, কাইতির যাদবেন্দ্র দাস, জাড়াগ্রামের রঘু দত্ত, তেঘরার গোপাল দত্ত, দশঘরার বাসু লা, ত্রিবেণীর রাম রায়, লাউগাঁর রাম দত্ত, পাঁচড়ার চণ্ডীদাস খাঁ, বিষ্ণুপুরের ভাগ্যবন্ত খাঁ, গেরনের মধু দত্ত, খণ্ডকোষের বাসু দত্ত—কার না মুদ্রা বাঁধা আছে মরাইয়ে? কুস্তীরের ভয়ে বুড়ি ছুঁয়ে থাকা জনও অবশ্য ছিল—নীলাম্বর দাসের বাবা। হাটে পসরা সাজাত, অবলারা তার আমলা কিনত যতন করে। বারবধূদের সঙ্গে নিত্যদিন হাতাহাতি। বান্যা হয়ে কড়ি গুনত, কটিবন্ধনীতে গুঁজত। প্রাণনাথ, তুমি নৃপতির আজ্ঞা মেনে বৃহিত ভাসাও জলে। আমি খবর করি ওঝাকে। সে দেখুক শুভ দিন।

### ৩ দক্ষিণ পাটনে দৈবজ্ঞের নিষেধ

দৈবজ্ঞ খড়িবজ্র খাঁর ডাক পড়ে। দ্বিজ আসে সাধু ধনপতি সকাশে। রাশিচক্র পাতে, পঞ্জিকা দেখে।

দক্ষিণের পথ রুদ্ধ। শরাকৃতি অশ্বিনী নক্ষত্র আকাশে। ও দৃষ্টি ভালো না সাধু। জলনিধিতে তরঙ্গ তোলে। ঝড় ডাকে। অষ্টমীও শুভ না। প্রেতনাথের বিহারকাল। পদে পদে মৃত্যু, পথে পথে আপদ, পলে পলে বিপদ। বপুস্থান, রক্তনেত্র, পাশহস্ত, ভয়ংকর ওই যমরাজের রাজত্ব হল দক্ষিণ। অষ্টমীতে বৃহিতে চড়ে না সাধু। কাউ ভাবে তরণী ডোবে। রাবণরাজের ভয়ে প্রেতনাথের ওই কাউরূপ। কাউ-সঙ্গে সিংহল যাত্রা কোরো না। নবমীটিও শুভ না। মাথার ওপর কুন্তিকা। যেন অগ্নিশিখা। কুন্তিকার দেবতা অগ্নি। এই অগ্নিতে আলো আছে কিন্তু তারও বেশি আগুন। ও আগুনে গেহ-গারি জ্বলে, কপাল পোড়ে। ওই অগ্নিখুরের তলাপথে সপ্তডিঙা ভাসিয়ে না সদাগর। রাতের অন্ধকারে আগুনের চাঁই খসবে সাগরে। বাদাম পুড়বে, কেঁরয়াল জ্বলবে। ওদিকে দশমীতে তিথি ত্র্যহস্পর্শ। বড়োই করাল রূপ। ফণা তোলে সাগরের ঢেউ। দংশন করে। গৃহে থাকো সাধু। চন্দ্রের দ্বাদশকলাক্রিয়ারূপা তিথিতে যেতে পার কিন্তু ফললাভের আশা বৃথা। বাণিজ্যযাত্রায় লক্ষ্য অর্থাগম। তার কোনো শুভলক্ষণ নাই। নিমিস্তহীন যাত্রায় দ্বাদশে বাধা নাই, কিন্তু তোমার আগুণভাবহীন। ত্রয়োদশ সংখ্যাটি শুভ না। ত্রয়োদশ দিনে মৃতের বিধেয় কার্য-বিশেষ পালনের রীতি। ত্রয়োদশে প্রেতাশ্মার বাস। ত্রয়োদশে তরণী তীরবন্দী রেখো। চতুর্দশীও ভালো না সদাগর, সাগরযাত্রার পক্ষে

শুভ না। অথচ সব ধন তো সাগরে। নীল বারিতে চতুর্দশ রত্ন—লক্ষ্মী, কৌস্তভ, পারিজাত, সুরা, ধন্বন্তরি, চন্দ্র, সুরভি, ইরাবৎ, রত্নাদি-অঙ্গরা, উচ্চৈঃশ্রবাঃ, কালকূট, শার্ঙ্গধনুঃ, পাঞ্চজন্যশঙ্খ ও অমৃত। আকাশে কিছু নাই—কাউ আর চিল্লক। মাটিতেই-বা কী? কেবল কাম আর অর্থ। কামদূতী কোকিলা ডাকে বসন্তে কিন্তু নরজন্মে কামকেলি নিত্যদিন। ধর্মপত্নীর তুলনায় কামপত্নী অধিক। কাম আর কাঞ্চন মিলে এই মানবসংসার। সদাগর, চতুর্দর্শী রিক্তা। সাগরযাত্রা নাই। তারপর শুক্র। সেটিও খুশি দেখি না। ছয় মাস দূরযাত্রা রহিত। দক্ষিণপথে প্রাণসংশয় আর বৃহিত হারানোর ভয়। অগ্নি কোণে তিথি ত্রয়োদশীর অবস্থান। অনল, জ্বলন, বহির ভয় সদাগর। গৃহদাহের আশঙ্কা। পত্নীবিবাদ থেকে নানাকিছুর ডর। আরও একটি অকুশল দেখি। বন্দিদশা। বড়োই অমঙ্গল, অশুভ, অশিব কাল সাধু। পথ নাই, পাথেয় নাই, পণ্য নাই, প্রমদ নাই। শুধুই প্রমাত, প্রমাদ, প্রলয় আর প্রয়াণ।

ধনপতি শোনে। মুখ বন্ধিম হয় তার। দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিন্তু দৈবে অসীম বিশ্বাস। মানুষের দানে ক্ষুধা নিবারণ অথচ দেবতার আরাধনায় দিনযাপন। ইহলোকে বাসস্থান, পরলোকে অবস্থান। লৌকিকে দেহ, অলৌকিকে মন। অন্ন খায় পৃথিবীর আর গীত গায় গগনের। গণকজাতটি বড়ো দ্বিচারী। রাত্রি পৃথিবী যখন ঘুমোয় ওরা গ্রহ-তারার হাতড়ায়। বৃধ-শুক্র চিত্রা-মঘা দেখে। চন্দ্রের মুখ আর রূপে মজে। এদের চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। নফরকে ডেকে ধনপতি বলে, ধাক্কা মেরে তাড়া তো গণককে।

আসন ছেড়ে ওঠে ওঝা খড়িবজ্র খাঁ। পঞ্জিকাটি বস্ত্রখণ্ডে বেঁধে দরজায় আসে। তারপর পথে নেমে চিৎকার করে—দুষ্কর্মা, দুষ্কৃৎ, দুরাত্মা, দৈতা। সাগরে ডুবুক সাততরী দেমাক, শিরে ভাঙুক সাতমনি বাজ, দু-সতিনে কোন্দল করুক নিত্যদিন, ভিটায় ঘুঘু চরুক জোড়ায় জোড়ায় আর বোদাল মীনের ঝোল-ঝাল-চচ্চড়ি খা দিন-রাত্রি।

## ৪ সপ্তডিঙা উত্তোলন

ভ্রমরার জলে ডিঙা ভাসে। গোধূলির ঝিঙা ফুল আলো নদীর তরঙ্গে, ডিঙার কর্ণে। জলকাক টুবটুব দেয় পদ্ম বনে—দিনের কাজ চুকিয়ে এবার জল-ছুঁই বেনাবনে রাত্রিবাস। ডুবুরি সঙ্গে সাধু আসে নদীতীরে। নফর আসন পাতে

দেবতার। ঘটে স্থাপন করে আশ্রপল্লব ও বেল। শঙ্খ বাজে। সিদ্ধুপতি বরুণের আরাধন। তার বরদানে সাগরযাত্রায় জলযান ভেসে চলে জলধরের মতো। তার করুণা হলে মকরের মুখে কেতকী বৃক্ষের গুজি। বরুণ দেবতার চরণে শতকোটি প্রণাম। তার অভয়ে জল-কেউটিয়ার ফণায় জোড়া তাল। দেবতা সহায় হলে জলকুমারী ঘুমোয় জলটুঙ্গিতে আর জলকন্যা নৃত্য করে। হে জলরাজ, এই নাও তোমার দূর্বা, এই নাও পুষ্প, এই নাও তণ্ডুল, এই নাও বস্ত্র। বায়ু হোক দক্ষিণমুখী, আকাশে ভাসুক জলধনু, সাগর হোক নিখর আর তীর হোক শাদূল-দুষ্টখণ্ড মুক্ত।

ভ্রমরার সেতুবন্ধে উৎসুক নগরবাসী। তাদের জলরহস্য শোনায দুই ডুবুরি। খাল-বিল-নদী-সাগর হল স্বর্গের দর্পণ। মেঘ, পাখি, পরি, দেব-দেবীদের মুখ ভাসে জলে। চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারা সবাই নিজ রূপ দেখে। মানুষও দেখত একসময়। আকাশে উড়তে উড়তে তাকাত নীচে। কিন্তু একদিন পক্ষ গেল খসে। বাদল কীটের মতো চলে গিয়েছিল অগ্নিদেবতার কাছে। পক্ষকাটা মানুষকে জায়গা দিতে সাগরে জাগল দ্বীপ। সেটিতেই মানুষের বাস। আকাশ থেকে নামতে নামতে দু-চারজনা বায়ুর টানে জলে পড়ে। তাদের কেউ হল জালিক কৈবর্ত, কেউ তরলীধর, কেউ ডুবুরি। প্রথম দু-টির বাস জলের ওপর, তৃতীয়টির জলের নীচে। জলের ওপরে থাকলে মীন মেলে, জোটে পারানির কড়ি কিন্তু শঙ্খ, প্রবাল, নীলা সবই নীরধির নীচে। আছে আকাশের বরে-যাওয়া গ্রহ-তারাও। তাদের যেমন রং তেমন রূপ। তবে দম দরকার। শিখতে হয় শ্বাস-শাস্ত্র। তখন প্রতি ডুবে এক যোজন, সাগরের তলে বসে শঙ্খনিদ।

যে-ডিঙাটি প্রথম তোলে তার নাম মধুকর। দৈর্ঘ্য যেমন দিগন্তবিস্তারী, প্রস্থে তেমনই সুদূরবিস্তৃত। নৈকাঠে তার অলৌকিক নির্মাণ। সম্মুখভাগ সূচ্যগ্র আর পশ্চাৎ গোলাকৃতি। সম্মুখের স্থানচ্যুত জল ডিঙার দু-পাশে বাহিত হয়ে পশ্চাতে মেলে। ডিঙার গায়ে দারুণ অপূর্ব কারুকার্য। যেন বিশ্বকর্মা আপন হাতে শিলায় ছেনি ঘসে কুণ্ডগুলি গড়েছেন। কুণ্ডের ওপর আশ্রপল্লব। মধুমাসের বায়ুতে সে-পল্লব দোলে। আর রয়েছে স্বর্ণলতা। তারা কুণ্ডের গায়ে শোভা দেয়। মধুকরের মাঝখানে দু-খানি ঘর। দুটিই সুবর্ণনির্মিত। গৃহের চালে কাঞ্চনযুথিকা। গোধূলির আলোয় জ্বলজ্বল করে হেমপুষ্প। ঘর দু-টির দু-পাশে নাইয়াদের বসার সুবন্দোবস্ত, মধ্যভাগে কাণ্ডারের। মাথার ওপর বাদাম। মধুকরের পশ্চাতে মানিকভাণ্ডার। মধুকর যখন জল ভাঙে তখন লক্ষ অলির গুঞ্জন ধ্বনি ওঠে। সে-স্বরে জলপুষ্প পাপড়ি মেলে, মধুকণ্ঠ ডেকে ওঠে তমালের ডালে, মধুকোষে রেণু জমে।

পরের ডিঙা দুর্গাবর। গাভীর ও ডহু দারু-নির্মিত জলযান। অভিনব, অভিরাম, মোহন তার রূপ। দুর্গার দ-কারে দৈন্যনাশ, উ-কারে বিঘ্ননাশ, র-কারে রোগনাশ,

গ-কারে পাপনাশ ও আ-কারে ভয়-শত্রুনাশ—দুর্গাস্মরণে সাগর পথ নিরাপদ। সেই অখণ্ডিত নৌযানে বসবে জোয়ান নাইয়া। আবার এটি হচ্ছে সদাগরের ডিঙা। তাই তার বেশ ক-টি জলদেয়াল। খোলের ভেতর খোল। ডিঙাগুলির রূপও উত্তম। গজদন্তের কাজ স্থানে স্থানে। ডিঙার বাহির খোলে দুর্গতিনাশিনীর মুখ। দশ হাতে দশ অস্ত্র, দু-পাশে দারুপ্রদীপ। তার শিখা দোলে ভ্রমরার দক্ষিণী বায়ুতে। পালে সুবিশাল বস্ত্রখণ্ড। তার ওপর দেবাদিদেব মহাদেবের ত্রিশূল ও বিষমঢাকের বর্ণময় চিত্রলেখ।

পরের ডিঙা শঙ্খচূড়। কাঁঠাল, পিয়াল ইত্যাদি দারুর পাটি ও গজালে এই জলযান। গাঙ্গেয় দুকূলে আশি গজ জল ভাঙে। হাতের কাজ ফেলে নগরবাসী বিস্ময়ে দেখে। দৈত্যাকৃতি এই ডিঙার গমনের গমকে জলপ্রাণী পালায় চকিতে। শঙ্খচূড় দৈত্য পুরাকালে যুদ্ধে দেবতাদের পরাজিত করে এবং বেদ অপহরণ করে সমুদ্রতলে নিয়ে যায়। পরে মীনাবতারে বিষ্ণু তাকে বধ করে বেদ উদ্ধার করে। সাগরপথে শঙ্খচূড়ের নামে সমস্ত দুষ্ট আত্মা দূরে থাকে। শঙ্খচূড়ের অস্থি থেকে শঙ্খের সৃষ্টি। তা কখনো রণবাদ্য, কখনো শান্তিধ্বনি। সেই শঙ্খের দারুচিত্র ডিঙার গায়ে। তার পাশে এক জোড়া শঙ্খচূড় লতা ফণ তুলে রক্ষা করে ডিঙা।

ডুবুরি তোলে চন্দ্রপাল। দৈবসার ও তমাল বৃক্ষের পাটি দিয়ে তৈরি এক মালবাহী জলযান। সমুদ্রমহুনে জাত চতুর্দশ রত্নের প্রথম চন্দ্র এবং সেই এই ডিঙার পালক ও রক্ষক। বাদামের প্রসারিত পটে তারই চিত্র। দীর্ঘ দক্ষিণযাত্রায় তার আলো জ্বলবে মাথার ওপর। যখন চন্দ্র আকাশে হাসবে না, তখনও বাদামে ভাসবে। তার সঙ্গে থাকবে রোহিণী-সহ সপ্তবিংশতি দক্ষকন্যা। তারা যাপন করবে মধুচন্দ্রিমা। নোনা পথখানি হয়ে উঠবে মধুর। আকাশে ফুটেবে চন্দ্রমালতী, জলে দুলবে চন্দ্রশালা, বাতাসে ভাসবে চন্দ্রকিরণ। ডিঙার গায়ে দারুশিল্পীর নানা কারুকার্য। কলাপী পুচ্ছের মধ্যস্থলে গোলাকার চন্দ্রক। কলাপীর রঙিন গ্রীবা এবং মুখমণ্ডলও খোদাই করেছে কারিগর। নোনা পথে সব সর্প সরে যাবে দূরে। সুরক্ষিত থাকবে ডিঙা। কলাপীর মাথা ওপরে সারি সারি নাইয়ার পিঁড়া। তারা দিনভর কেঁরয়াল টানবে, গলায় ভাঁজবে সুর। চন্দ্রপালে যখন ভরা তুলবে তখন কোল-গর্ভিণী বধুর মতো নাওয়ার রূপ পড়বে ফেটে। নদীর দু-কূলের মানুষজন তাকিয়ে দেখবে। বলবে সদাগর শুধু ভরা বেচে না, নাওটিকেও আদরে রাখে। তা নইলে এমন বিদ্যাধরী রূপ?

পরের ডিঙা ছোটোমুঠি। আকার যেন বজরার হাতল। শাল, পিয়াল, ডহ কাঠের পাটিতে তালের গজাল। এ-নায়ে যাবে বাহান্ন পাউটি চাল। ডিঙার গায়ে তাই ফলস্ত ধান্যের শিষ। সোনা রং শিষ ঝুঁকে পড়ছে ভারে। মা লক্ষ্মী সদয় হলে

এমন হয়। তখন পালুইয়ের মাথা ছোঁয় আকাশ, মরাইয়ের বেড় হয় দ্বিগুণ। ছোটোমুঠির গায়ে রূপার কাজ, অঙ্ককার নেমেছে ভ্রমরায় কিন্তু রজত পাতে চাঁদের আলো খেলে। মনে হয় কোজাগর পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সহাস্য লক্ষ্মীর সাজ। হাসতে হাসতে ভেসে যাবে ভিন দেশে। সেখানের নগরবাসীরা সাধুর তণ্ডুলে অন্ন রৌঁধে বলবে উজানির খেতের মাটিতে দুধ, মধু, ঘৃত ও কর্পূরের পাক। ছোটোমুঠিকে অপরূপ করেছে ডিঙা-শিরের মুড়োলাখানিও। দৈবসার দারুণ ওপর ছেনির টানে কাষ্ঠকার গড়েছে চূড়াকার কেশবন্ধ।

ডুবুরি তোলে গুয়ারেখি ডিঙা। চেহারাখানি যেন গুয়া মাপার কুশি। গুয়ারেখিতে গুয়া যাবে দক্ষিণ পাটনে। পান সাজতে গুয়া, মান রাখতে গুয়া। গুয়া দিয়ে বিবাহ, গুয়া দিয়ে উপনয়ন। মুখশুদ্ধিতে গুয়া-কপূর। গুয়ারেখির সম্মুখভাগ সিংহমুখী। গাভীর-তমালের মাজা খয়েরি কাঠের ওপর সিংহের কেশর। কেশরের নীচে বনরাজের আয়ত ললাট। তার তলে নাদিত সিংহের বিক্রমী মুখমণ্ডল। চক্ষু দু-খানি মানিকের। আকাশের তারা দোল খায় ভ্রমরার জলে। সেই আলো বিলিক দেয় পশুরাজের দুই মানিক-চক্ষে।

শেষ ডিঙা নাটশালা। ওটিতে গাবরদের বাস। কৌতুক, মজা, তামাশায় ভরপুর। এত মানুষ আর কোনো নায়ে নেই তাই এত রঙ্গও মেলে না সেখানে। নাটশালাতে নামা কারুকার্য। কোনোটি নৃত্যের ভঙ্গি, কোনোটি-বা লীলার। কোথাও ঢোল-কঁসি, কোথাও আবার বেণু-বাঁশি।

সাতখানি ডিঙা তোলে ডুবুরিয়া। বিশ্বকর্মার পাঁচ পুত্র—কাষ্ঠকার, শিলাকার, লৌহকার, তাম্রকার এবং সুবর্ণকার গড়েছিল এই সাত নাও। তাদের অঙ্গুলি টানে সপ্তডিঙায় স্বর্গ, মর্ত, পাতাল। মানুষজন বলে মনু, ময়, তুষ্টা, শিল্পী আর দৈবজ্ঞ সতিই পাঁচ গুণের সহোদর। জগৎসংসার যেন সপ্তডিঙায় ভাসে, সপ্তনায়ে হাসে। ডুবুরিরা ডিঙা আনে নদীকূলে। কাষ্ঠস্তম্ভে বাঁধে শন-রজ্জুতে।

ঘরে চলে সাধু ধনপতি।

## ৫ বিনিময়দ্রব্য সংগ্রহ

টোলির বাদ্যিতে কান পাতে উজানি নগর। হাল দাঁড়ায়, মাকু থামে, কণ্ঠ চাপে মালাধর গরাইয়ের ঘানি। কই ঝোলে রন্ধনখোলার ওপর, মাই ঢোকে কাঁদুনে ছেলের মুখে। বাদ্যি শুনতে নেত্রে থামায় বাঁশিনি বাঁশের নাচুনে বন। টোলির

প্রতিধ্বনি জাগে ভ্রমরার জলে। দোলে কহলার ফুলদল। চোংদার ঘোষণা দেয়—  
কে ভরবে গো মধুকর, দুর্গাবর, শঙ্খচূড়, চন্দ্রপালের খোল? কে পুরবে ছোট্টোমুঠি,  
গুয়ারেখি, নাটশালার কোল? কণা দিলে দানা মিলবে, তিল দিলে তাল।

কোথা যায় সদাগর? সহস্র বৎসর হুদে জপধ্যানে মগ্ন ছিল ঋষি। ক্ষুধা-তৃষ্ণা  
বোধ নাই। হঠাৎ আবির্ভাব দেবলোকবাসী নর্তকী উর্বশীর। হুদে রেতঃস্থলন হল  
ঋষির। এক হরিণী হুদবারি পাণে জন্ম দিল ঋষ্যশৃঙ্গের। ঋষ্যশৃঙ্গ একদিন ঋষি  
হল। তারই তুষ্টিতে রাজা দশরথের রামাদি চতুর্দশ পুত্রলাভ। কৈকেয়ীর ইচ্ছেয়  
রামের বনবাস। সঙ্গে পত্নী সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ। রাক্ষসরাজ রাবণ-ভগিনীটি  
খানকি। শূর্ণপথার জন্য সীতাহরণ আর রাম-রাবণ যুদ্ধ। শেষে সিংহলে রামরাজ্য  
প্রতিষ্ঠা। সাধু ধনপতি যাবে বাগিজ্যে, সিংহল দ্বীপে। রামরাজ্যে সুবর্ণ থেকে  
শুকপাখি সব সস্তা। মণিমুক্তার ছড়াছড়ি। বিনিময়দ্রব্য নেবে সাধু। ধূলিমুঠি দিলে  
সোনামুঠি ফিরবে।

মৃগ নেবে সদাগর। আছে নাকি খড়্গামৃগ? পালে পালে নিয়ে চল ভ্রমরার  
কূলে। কী লাভ পুষে? দিবারাত্র ত্রয়োদশবিধ মুণ্ডচালনা। মুণ্ডছেদন নাই, শুধুই  
মহারণের মকশো আর মশকরা। রণ নাই, তৃণজলে শুধু রঙ্গ পোষা। তুলে দাও  
সাধুর সপ্তডিঙায়। খড়্গামৃগ নাই? ভ্রাস্ত, উদ্ভ্রাস্ত, আবিদ্ধ খড়্গগুলি গেল কোন  
বনে? জ্ঞাতি খেল পিতৃশ্রদ্ধে? খড়্গ অভাবে রুরুশ্চিব নেবে সাধু। ওর হাড়মাসে  
আতঙ্ক। ইহলোকে অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য, পরলোকে নিপীড়ন মৃত মৃগের আত্মা-  
হাতে। পা দু-খানি আম্রাতক ডালে আর মস্তকটি শলি-মাপ কড়ার ফুটন্ত তৈলে।  
তাই রুরুমৃগ নিধনে কাজ নাই। সাধুর সপ্তডিঙায় তুলে দাও। ফেরত নাওয়ে অশ্ব  
পাবে। নাতি তখন অশ্ব চেপে বাহে যাবে। রুরু-আকালে পৃষতাস্থ, পবনবাহন  
মৃগ। শ্বেতবিন্দুগুলিতে অজিনখানি বড়োই সুচারু। যেন শত শ্বেতপদ্ম নয়ন  
মেলেছে নীলান্বুতে। আহা, হর-গৌরী দৌহা দেখি অজিন-আসনে। তবে পৃষতাস্থ  
দেবসেবাতেই ভালো। জগৎসংসারের মায়াজাল থেকে মুক্ত হতে মৃগ-অজিনে  
বসে মহামায়ার মহাবীজ উচ্চারণ। নইলে মায়াজালে বদ্ধ হবে সংসার।  
মায়ামৃগের মায়ানটের অন্ত নাই। নগরবাসীগণ, পৃষতাস্থ মৃগ তুলে দাও সাধু  
ধনপতির সপ্তডিঙায়। পৃষতাস্থ না থাকলে মৃগস্তথা। তাতেও অশ্ব মিলবে। ঘোড়া  
আর শালের জোড়া—এর মাপে মান নাই। রাজা দান দিয়েছে, মান দিয়েছে সাধু  
ধনপতিকে। দক্ষিণ পাটনে যায় সদাগর। কুরঙ্গ দাও, সাধু জাত তুরঙ্গ আনবে।  
চলো হে, নগরবাসী, ভ্রমরায় চলো।

যার কোনো মৃগ নাই তার বিধি কি বাম? বামটি বামা হলে গৌরী, লক্ষ্মী,  
সরস্বতী। তখন বামাধরসুধা। শুধু কি মৃগই লক্ষ্যে চলে? আর কিছু নাই? বারিধর

রয়েছে মাথার ওপর। দিনরাত বাষ্প দেয় পূব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। তাল হারালে প্লাবন, প্লাবন। বানভাসি জগৎসংসার। জলধরে কাজ নাই। দরকার নাই জলকাউয়েও। লক্ষ্যে দিন কাটে কিন্তু মুদ্রা নাই পায়ে। গলার স্বরটিও জলখেরা। জল-চাষির কানে ঢুকলে অযাত্রা, জালে না রোহিত, না কাতল। শফরীও হাওয়া। ভোররাত থেকে জল ছেকে একটি মেটে ভাণ্ড আর একখানি শ্যাওড়া ডাল। বাষ্পে দড়ো ভেকও। সোনা ভেক, কুনো ভেক বিল টপকায়, বিল পেরোয়। খাল-নদীও ভাঙে বোশেখ-জঠিতে। কিন্তু সাগরে খরা-ঝরা নাই। সারা বছর জল থই থই। ভেকে কাজ নাই। মাকড় ধরো। কদলীবৃক্ষে কদলী নাই। সব কপিবরের উদরে। কুঁদুরির আকাল। সব পবননন্দনের রসনা-গহ্বরে। দক্ষিণ পাটনে খাদ্য আছে, খাদক নাই। রাম-রাবণের যুদ্ধে হত হল দলে দলে। শুধু রক্ত আর হাহাকার। এখনও মধ্যরাতে সমবেত কান্না জাগে ‘কুব’ ‘কুব’। আত্মা আছে, দেহ নাই। মাকড় ধরো, উজানি নগরবাসী। ফাঁদ পাতে মাদার, জিগা, চেঞ্চা বৃক্ষে। অশোককাননে কদলীর মহোৎসব। বত্রিশ ছড়া কদলীর ভারে বৃক্ষ ভাঙে। কুঁদুরির বনে কচি ফল বুড়ো হয়। ঝরে পড়ে। মাকড় দিলে মাতঙ্গ আনবে সদাগর। মাতঙ্গের শুঁড়ে চড়ে দোল খাবে। মাতঙ্গ দস্তে বানাবে ঝি-বৌয়ের কেশদণ্ড। মাতঙ্গ চড়ে নাইতে যাবে নদীতে। লোকে বলবে নগরে একটি দিগ্গজ, বাকি সব দিগম্বর।

মাকড় না থাকলে পারাবত। দু-টিই উচ্চমার্গী, কখনো ভূচর, কখনো বৃক্ষবাসী। পারাবতের ডাকটি শুনি অষ্টপ্রহর, কুজন থেকে নিনাদ। সাগরযাত্রায় সব জাতের কপোত নেবে সদাগর—থুড়িমারা, পাকশালিকা, সেতা, নেতা, নয়নসুকা, করট, তামাট, সুলক্ষণ, সৌরজ, মকরজ, গোলা। আহা, গোলার কী রূপ! গলায় রামধনু, ডানা দু-টি ভিজে বিশ্বকাঠের ধূম আর পা দু-খানি যজ্ঞের অগ্নি। কৌতরি ডাক দিল ‘গুটুর গু’ আর নাচন শুরু করল কৌতর। ডানা ছড়িয়ে লেজ নাচিয়ে কী হলহলি কী গলাগলি! ওষ্ঠে ওষ্ঠ লাগিয়ে সোহাগ। দেহে দেহ চড়াতেই জোড়া ডিম্ব। তারপর আঁতুড়। আঁতুড় কাটতে ভরাট সংসারের হাজার কথা। যত কথা বলে কৌতর-কৌতরি তত ধান্য ফলে মাঠে, বাছুর বাড়ে গোচালে, অষ্টমঙ্গলায় গর্ভবতী হয় নতুন বধূ। সাধুকে কৌতর-কৌতরি দিলে যোগ্য বিনিময় পাবে। গাঁ-ঘরে তার দেখা সহজে মেলে না। তার মূল বাস দক্ষিণ পাটনে। সেখানেও ভাগ্যবানে পায়। সেটি হচ্ছে শুকপাখি। দেবপক্ষী। কেন মানব নয়, ভব নয়, দেব? শুকীরাপা ঘৃতাচী অঙ্গরাকে দেখে ব্যাসদেবের হলো শুক্রপাত। সে-শুক্র মছনে শুক্রপক্ষী। জোড়া পারাবতের বিনিময়ে মিলবে জোড়া শুক। তাদের চরণ শোভায় মুখ ঢাকে কনক, তাদের পালক আভায় ম্লান হয় বজ্র। নিত্যদিন প্রহেলিকা

শোনাবে তারা—‘বেগে ধায় রথ, নাহি চলে এক পা/নাচয়ে সারথি তাহে, পসারিয়া গা।/হ্যালি-প্রবন্ধে, পণ্ডিত দেহ মতি/অন্তরিক্ষে চলে রথ, ভূতলে সারথি।’ কী সে জিনিস? ওড়ে তবে পক্ষী না। ওটি হল ঘুড়ি। আরও আছে—‘তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল/ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল।/পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ/বনেতে থাকিয়া করে বনের দোষণ।’ কী? উত্তর দেবে শুক-শারি। কার বিনিময়ে মিলবে? শিখরিয়া, ঘনবোলা, শ্যামলা, সুবলা, সুভাসন, পবন্যা, বাতাস্যা, হাঁসা, নট্টা, খট্টা, বুড়া, ডাঁসা, জাগ, সিন্দুরিয়া, রণজয়া, কল্যাণা, কুমুদা, কুখা, ঘিরিনি, দিঘলমুখা, মনসুখা, রাস্তা, দেউল্যা, সিঙ্গা, বাঘা, রণজিতা, কয়রা, কপালচিতা, সিঙ্কুমাট্যা, পাঙর্যা, পাখরা, সালিকা, দোষল, খড়্যা, আভাঙ্গ, পবনমেড়্যা, পাটলা, বিটলা, রতিভুরা। রতিভুরার কোনো ছলচাতুরী নাই। কামে ভুরু দু-টি রতিভঙ্গ। এ-পক্ষীর শৃঙ্গাররসে স্থায়ীভাব, তাই ভাঙায় বিনিময় নাই। সুরত-সহচর যুগল চাই।

নারিকল যাবে লক্ষ্মাবীপে। নারিকল খাবে লক্ষাবাসী। নারিকল ও কুমুড়ার ব্যঞ্জে বড়ো স্বাদ। নারিকলপুলিও সুস্বাদু। শঙ্খমুখ নারিকলের বদলে মিলবে সাগরতনয় শঙ্খ। স্বর্গে শঙ্খপানি, আকাশে শঙ্খচিল, ললাটে শঙ্খচরী আর সাগরে শঙ্খপ্রণাদ। ভালো না শঙ্খচূর্ণী। নাকি সুরে কথা কয় ত্রিপ্রহর রাতে। কাছে ডাকে, নিয়ে চলে সঙ্গে করে ধেনো পথে। তারপর রাতভর হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে ভিন্ন গাঁ, ভিন্ন নদী, ভিন্ন দেশ। গাছতলে বাস। ক-রাত পরে শঙ্খচূর্ণীর পেছন পেছন চলে এল আর এক জনা। তখন ন্যাড়ানেড়িতে কুঞ্জ বেঁধে মোচ্ছব। ভালো না শঙ্খচূড়ও। অস্থির, অবোধ, ধীহীন, ঢ্যামনা। অপহরণ করে আনল কৃষ্ণপ্রাণা তুলসীকে। শেষে কৃষ্ণ ছলনায় মৃত্যু আর তুলসী শাপে কৃষ্ণের শিলারূপ। শিলার ভেতর-বার দু-টাই কাঠ। নারিকলের খোলা ভাঙলে যত জল তত শাঁস। চিড়া-জল-শাঁসে লক্ষ্মীর মহাপ্রসাদ। নারিকল দিলে শঙ্খ পাবে। শঙ্খধ্বনিতে মাস্তলিক কর্ম। শান্তি আসে সংসারে, সুখ জাগে মনে। ডাঙা-নদী-বন পেরিয়ে কু-বায়ু তেপান্তরে চলে যায়। নারিকল দিলে শঙ্খবলয় মিলবে। মালক্ষ্মীদের হাতে উঠবে উদয়ের পথে, লিচুচোট, মটর, গোখরি, ধানশিশ, লতা, পলাকাটা, মকরমুখ, চাকি-ফুল-শঙ্খ। সতীসাক্ষীদের হাতে হাসবে ধবলতনু, খেচুর, পায়রা-চোখ, শঙ্খপদ্ম, সোনামুখী, পাঁচগাছি, সাতগাছি, ন-গাছি, রং-খিলান, সরু চোট, খেজুরছড়ি।

কৃমিকীটের অন্ত নাই। গুঁড়াকৃমি, ফিতাকৃমি, কৈচোকৃমি। কৃমির নাচনে ছেলেপিলের রাতভর কাঁদন। কৃমিনাশনে বিড়ঙ্গ। মাঠে-বাটে-ঘাটে পলাঙ্গ, কোলকন্দ, পারিভদ্র, ভল্লাতক, হরিদ্রা। বিনিময়ে মিলবে লক্ষার লবঙ্গ। আদি দেবকুসুম। ত্রিকূট শিখরে বিশ্বকর্মা গড়ল মনোরম রাক্ষসপুরী। কিন্তু বায়ুর ধাতটি

গোলমেলে—লবণময়। সৈন্ধব, বিট, রুচকের ছড়াছড়ি তাই বায়ুশোধনে বিশ্বকর্মা-নন্দন কুবের রোপণ করল দেবকুসুম লবঙ্গ। লবণের ক্ষয় আটকাবে লবঙ্গ-কাননের মরিচ-ঝাল বায়ু। কিন্তু পিতার নির্দেশে কুবের সিংহল ছেড়ে বাস গড়ল কৈলাসে। লবঙ্গ কুসুমের কণ্ঠমালা পরার কণ্ঠ নাই। বৃক্ষতলে কুসুমের পাহাড়। শাখায় শাখায় লবঙ্গের চাক। উজানি নগরবাসী শ্লেষ্মাজ্বরে শয্যাবন্দি আর লঙ্কায় লবঙ্গবৃক্ষ ভাঙে ফল-ভারে। সাধুকে বিড়ঙ্গ দিলে লবঙ্গ মিলবে। লবঙ্গে দস্ত হবে পোক্ত। ঘৃতে-পাক কই-এর মাথা ভাঙবে এক বুড়ি। লবঙ্গে কফাদারের ব্যামো সারবে। তখন চালতাতে তরাস নাই। ঝাল, টক, যা ইচ্ছা রসুই করো। তোতা তাড়িয়ে আতা খাও। শ্লেষ্মার দানাটি নাই। বুকের ভেতর পাঁচ হাপর হাওয়া। কত নেবে, নাও।

শুষ্ঠ নেবে সদাগর। আশ্রাবর্ত, আশ্রপেশি, আশ্রকাসুন্দি। বাদলা দিনের ভিজে বায়ুর শুষ্ঠ না, জ্যৈষ্ঠ-রোদের কড়া-ধাত আশ্রাবর্ত। সাধু নেবে আশ্রকূট পর্বতের মতো পাথুরে আশ্রপেশি। নোনায় ক্ষয়মুক্ত, বর্ষায় রসহীন পেয়ারাফুলি-হিমসাগরের জমট রস। রসনার সেরা স্বাদ মিলবে দুষ্ক আর কদলীর সঙ্গে। পুরানো কটু তৈলে তৈরি আশ্রকাসুন্দিও যাবে দক্ষিণ পাটনে। ভ্রমরায় চলো। আশ্রশুষ্ঠ না মিললে আদাশুষ্ঠ। আদা-মাণ্ডুরির জোড়া ব্যঞ্জন নাই। গিট আদা আর পাকা মাণ্ডুর দরকার নাই, মীন থই থই সিংহল দেশ। আদা-শুষ্ঠ আনো। নিয়ে চলো সপ্তডিঙায়। আদা-আশ্র না মিললে আমলকী-হরীতকী-বহেড়া। আমলকীর রসে সাত বার ভাবনা, শর্করা, মধু ও ঘৃত দিয়ে খেলে বৃদ্ধরা রণপায়ে ছোটো। তিত অলাবুর বীজ আর উদ্ভিদ-লবণ হরীতকীর সঙ্গে পিষে গুহ্যদেশে প্রলেপ দিলে অশ্রুরোগে আশু ফল। বহেড়ারও গুণের অন্ত নাই। কলির অবস্থান বহেড়া বৃক্ষ। দ্যুতে বহেড়া ফলের অক্ষে নীলা-পলা-রাজ্য-রানি সব গেল। আমলকী-হরীতকী-বহেড়ার ভালো বিনিময় দেবে সাধু। গুয়া পাবে ধামা ধামা। মানীর মান রাখতে গুয়া-তাম্বুল, গুয়া-তণ্ডুল, গুয়া-মধুরি, গুয়া-নারিকল। শকটে আশ্রশুষ্ঠ, আদাশুষ্ঠ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া তুলে ভ্রমরায় চলো নগরবাসী। গাত্রহরিদ্রা-বিবাহের দিন ধার্য করো। গুয়া আনবে সাধু ডিঙা ভরে।

সিন্দূর দিলে রঞ্জিনীর রঞ্জক পাবে। মারকুটে রাখালদের পাচনবাড়ির ভয়ে লঙ্কারাক্ষসী রঞ্জিনী সারাদিন লুকিয়েছিল ধাবকের পাথর-চাঁইয়ের তলে। রাতে স্বপ্নাদেশ হল। রাক্ষসীকে পূজা করলে ধাবক প্রচুর রঞ্জক পাবে আর সেই রঞ্জক কাপড়ে দিয়ে অগাধ ধন হবে। হলও তাই। রঞ্জক থেকে রজক, রজক থেকে রাজা। নগরবাসী, রাঙা-মেটে যার যা সীমস্ত-সিন্দূর আছে নিয়ে চলো ভ্রমরায়। রঞ্জিনীর রঞ্জন পাবে। তখন নয়ন দু-টি ভ্রমর, ঠোঁট দু-খানি লালদোপাটি। কুমকুম,

হরিদ্রা, ধূমলের ছড়াছড়ি ঘরদোরে। গুঞ্জাও নেবে সদাগর। বৃন্দাবনের কানাই পরত কদম্বমালা, আমাদের গাঁ-ঘরের কালা গুঞ্জামালা। উজানি নগরবাসী, গুঞ্জা কুড়োও ধামা ধামা। লঙ্কাবাসীরা বংশীধারী হয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরবে। সাধু নিক্তির বাঁয়ে গুঞ্জাদানা ফেলে কনক মাপবে। গুঞ্জা দিলে পলা মিলবে। বামার গলে দুলবে লাল পলাকণ্ঠী। যেন সংক্রান্তির তুসুখোলা চলে মকর চানে। লঙ্কাদ্বীপের মানুষজনের বড়োই পছন্দ পাট আর শোণবস্ত্র। সাধু রেশমসামগ্রী নেবে। বিনিময়ে পাবে ধবল চামর। চামর দোলনে বশ সব ঠাকুর-ঠাকরুন। তারা তুষ্ট হলে গোলায় ধান্যের বান ডাকে, গোশাল ভরে বাছুরে, আঁতুড়ে ছেলে কাঁদে হিম-নিদাঘ-বাদল। চামর-দোলাও, সুখ ঝরাও নগরবাসী। সদাগর নিয়ে যাবে কাচ, কাচদ্রব্য। দাপনি, রঙিন চুড়ি, পুতলির পরিবর্তে পাবে মহানীলাম্বর নীলা। হিরা, মোতি, পলার সঙ্গে গের্গেথে পরবে উজানির বউ-ঝিরা। মনে হবে কালিয়দহে কানুমুখ-কমল দেখি।

পুণ্ড্রপল্লিতে শীতল, মধুর, পিত্তদাহ, পুঁড়ি ইক্ষুর রস। পুণ্ড্রাসুরের কৃপায় ফলনটি এ-বছর ভালো। মাড়াই অস্ত্রে জ্বাল দিলে পাওয়া-ভরতি ঘনদানা গুড়। তারপর বরের মাথায় গুড়াচাউলি ঢালো, গুড়পিঠে খাও, গুড়াকু দিয়ে দস্ত মাজো আর ভুড়ুক ভুড়ুক গুড়ুক টানো গুড়গুড়িতে। কিন্তু স্বাদের সঙ্গে বাস লাগে যে। গুড় দিলে লঙ্কা থেকে দানা-কর্পূর আনবে সাধু। তখন ধামা ধামা কর্পূর, ফেনি, অমৃতফেনি লাডু। পাকে শুধু দু-চারটি ভাজা কুসুমদানা। উৎকুণ্ণ নিধনেও কর্পূরের জুড়ি নাই। এক পলা নারিকল তৈল আর এক দানা লঙ্কার কর্পূর। পুণ্ড্রপল্লির পর পারমাণিক পাড়া। বনবাসী মানুষ পারমাণিক পাড়ায় কেশ-দাড়ি-নখ কেটে যোরো হল। বউ-ঝিদের পায়ে লক্তক পরিয়ে বুনো ঘেঁটু হল রাঙাজবা। লক্তক নেবে সাধু। নিয়ে যাবে সিংহল দ্বীপে। সীতামায়ের রাঙা চরণ দু-টির শোভায় ঘোর লেগেছিল অশোকবনে। সে ঘোরে এখনও লঙ্কা বিভোর। লক্তক দিলে সিন্দূরে করমচা মিলবে। ঝাল হবে, টক হবে। লক্তক নিয়ে ডিঙায় চলো নগরবাসী। তন্তুবায় পাড়ায় ঝোলে কর্তাদের কাছা, গিন্নিদের লইখা, কুচোকাঁচাদের কানি। পাট করে পাটনে পাঠাও। সঙ্গে বাঁধো পাটের পাছড়া, গিলাপ, দোলাই, বালাপোশ। শীতে বড়ো আহ্লাদ হবে লঙ্কাবাসীর। যার যা পণ আছে, গাঁট বাঁধো। আহা, বড়ো ভালো পাটি ঝোলে দেয়ালে। নল, শীতল আর উলুঘাসের পাটিগুলি गरমে হিম। যেমন পাটি, তেমন পট। জোড়া হস্তী, তেজি অশ্ব, রোহিত মীন। যেন জ্যাস্ত সব। পাটি দিলে পামরী কঞ্চল মিলবে। কী নয়নসুখ পামরী তার লতাপাতায়, ফুলেফলে। কত যে ছবি কঞ্চল জুড়ে! আতা গাছের দু-পাশে দু-খানি তোতা। বর্ণ কচি কদলীপত্রের। এমনিতে বাচাল কিন্তু এখন ভাবটি গম্ভীর। যেন ভবের ভবিষ্যৎ ভাবনায় ভাবিত। আর এক কঞ্চলে যুবতী বধু শঙ্খধ্বনি করে পল্লবে

শোভিত মৃৎকলসের গা ছুঁয়ে। পাটি দিয়ে কম্বল, জড়াও মাঘের শীতে। উত্তরে হাওয়ায় বহেড়া কাঁপে গাছের মগডালে, শ্রীকালি চোঁচায় মাঠপুকুরে, গোখুরা বাস গড়ে সাত হাত মাটির তলে কিন্তু তোতা জোড়ার জাড় নাই। ওম খায় পামরী কম্বলেয়।

লঙ্কায় এক সাগর হাওয়া কিন্তু মতিটি সুবিধের না সব ঋতুতে। শীতে শুকনো কিন্তু বাদলে জোলো। জোলো বায়ুতে না শুকোয় সেন্দ্র ধান্য, না অপক্ক শ্লেষ। অনিদ্রায় কাটে গোটা রাত। বচ, কুড়, পিপুল, জিরা, ক্ষেত্রযমানি খেয়েও শ্বাসকষ্ট। ভাণ্ড ভাণ্ড যন্তিমধু আর ধামা ধামা সৈন্ধব লবণেও বায়ুর টান। হরিদ্রার প্রয়োজন। হরিদ্রা দিলে গোপিস্ত মিলবে। প্লীহা জুরে গোপিষ্ঠের সঙ্গে নিম্বপত্র, কাকতুলসীর পত্র ও গোলমরিচ সেবনে দ্রুত আরোগ্য। হরিদ্রা নেবে সদাগর। নদীঘাটে চলো শকট সাজিয়ে। সুলপো শাক তোলো বউ-ঝিরা। পুকুরের সুলপো যাবে সাগরদেশে। ফেরত ডিঙায় আসবে জিরা। ফোড়নে জিরা পড়লে ব্যঞ্জনের স্বাদ আর বাস দেখে কে! তখন সতারও মুখে মধু। শ্বেতসরিষার তৈল আর জিরাবাটা দিয়ে মীনের ঝাল। সুরনদীতে গণ্ডুষের তর নাই পতির। শাক, সূপ, শুভ্রা, ঘন্ট ফেলে আগে জিরা-মীন। সুলপো শাক তোলো পুকুর-ডোবা, ঝিলে-বিলে। ডিঙা ভরো সাধুর। কৃষ্ণসখা সুদামা গাঁথত মন্দার। হায়, মন্দার নাই। ঝড়ে ভাঙল, নাকি ছেলিতে খেল কে জানে! মন্দারের বদলে এখন অর্কমন্দার। মালাকার পল্লিতে শুধুই আকন্দ। আকন্দও নেবে সাধু। বেদপুষ্পেরই তো জ্ঞাতি। আকন্দ দিলে মাকন্দ মিলবে। জাম, জামির, টাবা, নাটা, রম্ভা কত রকমই গাছ-ফসল কিন্তু ফলের রাজা হল মাকন্দ। কাঁচায় অম্বল, পাকায় দধি-চিড়া দিয়ে ফলার। লঙ্কাধীপে মাকন্দের ভারে ডাল ভাঙে। যেমন দুধে-আলতা বর্ণ তেমন মনোহারী গন্ধ। অশোকবনের মাকন্দ খুব খেয়েছিল কপিবর, কদলী ফেলে। আকন্দ নিয়ে চলো ভ্রমরার কূলে। পথপাশে হরিদারু, মাঠে হরিমুগ, বৃক্ষকোটরে হরিলোচন উলুক আর হরিকুঞ্জে বেউশ্যা হরিদাসী। হরিদাসী থাকলে হরিবীর্যও থাকবে। সেই বীর্য জমে জমে একদিন হরিताल। ওটাই জগৎসংসারের সারাৎসার, বাকি সব বাহ্য। হরিताल নেবে লঙ্কাবাসী। ধারণ করবে দেহে। বীর্যের ধাতুরূপ জীবনকে করবে ফলবান। হরিताल দিলে হিরা মিলবে। উজানি নগরবাসী হিরা-বসানো কণ্ঠি পরবে। বউ-ঝিরা হিরা-গাঁথা সুবর্ণ চিরুনি দেবে কেশে। হিরামন তোতা পাবে হিরা-বাঁধা বেড়ি। কে আগে যাবে ভ্রমরায়? কার হাতে আগে ভরবে সপ্তডিঙা?

কার খেতে মাষকলাই পেকে ঝরে পড়ে? অপচয় হে। ত্বরা কাটো, শুকোও, ঝাড়ো, বাঁধো। শকটে চড়িয়ে চলো নদীকূলে। কার হাতে ফলেছে অমন কমলা মসরি? যত দেবে তত নেবে সাধু। তণ্ডুল দাও—রাজাশাল, হাতিশাল,

কাজলশাল। তোলা শকটে। বিন্নি হলে খই হয় দিঘল। বাহারি, গুনসি, ময়না, লালচিকন, মধুমতী, চিনিগুঁড়া, কালিজিরা দাও। ঘৃতপাক মীন, মাংস, বড়িতে স্বাধ ভালো। সাদামোটা, লালমোটা, কাঁচামোটা, নকশিমোটা, ধলামোটাও নেবে সাধু। ফলারের চিড়া হবে পদ্মপাতার মতন ছড়ানো। বালাম দিয়ো বেশ ক-বস্তা। নাসিকা আর কর্ণ ছিদ্র করার প্রয়োজন। হেম-মুকুলিকা পরবে বউ-ঝিরা। চিনা ধান্য দরকার বেশ ক-ধামা, মুড়িঘন্টে দেবে। মধুরিও লাগে, বিউলির ডালে বাটা দিতে। বরবটি, মটরকলাই, তৈল, ঘৃত, ময়দা, খুড়িয়া শাক, সরিষা, তিল, মাড়ুয়া কড়াই, ছোলা সব নেবে সদাগর। ভ্রমরা-ইছানি-কমলাপুরের বাঁক ধরে সপ্তডিঙা ছুটবে তরতরিয়ে। প্রধান কাণ্ডার বুঢ়ন। তার জানা সব নদী-সাগরের মতিগতি। কোন গিরিমাটি জলে ডিঙা ভাসে কতখানি, কোন নীলে ডিঙা ডোবে কত থাক, সব তার হুঁশে। চেনে সব নদী ঘাট। দেখেছে ত্রিবেণীর গাঙ, সুরলোকের রজকিনী নেতেকেও। কাঁদনে ছেলেকে আছড়ে মেরে, সুবর্ণ পাটে বস্ত্র কেচে, মস্ত্র পড়ে প্রাণ দেয় পুনর্বীর। শিব-স্মরি সপ্তডিঙা তরতর ছেড়ে যাবে সব বাঁক।

উজানি নগরবাসী, ত্বরা ভ্রমরায় চলো। সপ্তডিঙা ভরো আপন পণে।

## ৬ তরণী পূজা

মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, কুবঙ্গ আদি বিনিময়দ্রব্যে কোল ভরে মধুকর, দুর্গাবর, শঙ্খচূড়, চন্দ্রপালের। সিন্দূর, হরীতকী, বয়ড়া, মসরি, তণ্ডুলে পূর্ণ হয় ছোটোমুখী, গুয়ারেখি, নাটশালা খোল। পণবাহী বলদ-শকট গোধুলির আলায় ঘরমুখো। দিন শেষে ডানা গুটিয়েছে ক্ষেমংকরীও। বালুস্তূপে বসে এখন দিন শেষের বকেয়া হিসেব। লাল কুলির পাল ইতিউতি মুখ তোলে বেলাভূমি জুড়ে। চোখ পাতে সপ্তডিঙায়। সেখানে সাগর-বায়ু বাঁধার নতুন বাদাম। তার কোথাও দেবাদিদেবের ত্রিশূল, কোথাও বিষম ঢাক। ভ্রমরার জলে দোল খায় ডিঙা। পাড়ি দেবে সিংহল দেশে। জয়পতির বহু যুগ পরে ধনপতি যাবে দক্ষিণ পাটনে। ফিঙে-জোড়া স্মৃতি হাতড়ায়। বৃহিতের পালে চড়ে পদ্মাবতীর বাঁক পর্যন্ত গিয়েছিল সেবার। তারপর ঘরমুখো। মন টেনেছিল ভ্রমরার ঘাট আর ঘাটের গা-ছুঁয়ে পাতা-ঢাকা শাম্মলি গাছ।

গন্ধবণিক পল্লিতে উলুধ্বনি জাগে। সে-ধ্বনিতে স্বর মেলায় শত শঙ্খ আর ভ্রমরার নাচুনে জললতা। বীণা তারে সুর ছাড়ে কেউ। দুলে ওঠে ঝাবুর চিরনি-পাতা। মুখর হয় শতেক এয়োতির পায়ের বাজন নূপুর। বেজে ওঠে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ,

ভেরি। আকাশের আঁধার ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলে পশ্চিমের কোল। করঞ্জার বন ঢাকে কালো কস্মলে, শাল্মলি বৃক্ষ আবৃত হয় মেঘডুমুর বন্থে। লহনা-খুল্লনা চলে তরণীপূজায়। হাতে কদলী খোলের ডিঙা। সে-ডিঙায় একটি করে পরল, একজোড়া গুয়া, একজোড়া কদলী, একজোড়া কুল, একজোড়া শিম, একমুঠি বেতুয়া শাক, একজোড়া মূলা, একজোড়া অলাবু ফুল, দু-টি ক্ষীরের পুত্তলিকা, কিছু পুষ্প আর দু-টি ঘৃত প্রদীপ। শত এয়োতির হাতে, শত কদলী খোলে, দ্বিশত প্রদীপ। দু-পাশের কাশ বন সে-আলোয় হেসে ওঠে। জেগে ওঠে হেমবর্ণ বালুপথ। চোখ মেলে শম্বুকের ছেড়ে-যাওয়া দেহ। আলো পড়ে পাকুড়ের ডালে। চোখ মেলে গাংচিল্লক। তাহলে সত্যিই জয়পতির পুত ধনপতির বৃহিত এবার পাড়ি দেবে নোনা পথে। পাটের দোলায় চড়ে পারাবত ওড়াতে যাওয়া বন্ধ। আকাশজুড়ে এখন শুধু সারস, চিল্লক, জলকুক্কুটের দিনভর সম্তরণ। দীপের আলোয় চোখ তোলে ঘন সবুজ বালুগুন্ম। খেদ করে কী হবে খুল্লনা-লহনার! সাধু বেউশ্যা পাবে নদীবঁকে ডিঙাঘাটে কিন্তু দু-বালার সব রাত্রি সীতা, সাবিব্রী, দময়ন্তীর। সেখানে সমস্ত কাম ও কামনার মুখে নাগবেড়ি। তখন দু-সতীর সতা কোন্দল! আঁধার বাতিতে হাসে দশমূল বন। শব্দু ঋষি এনেছিল সনা বৃক্ষ, পরাশর পারুল, গর্গ মুনি গাভার, অগস্ত্য অর্জুন। দশ ঋষির দশমূল সংগ্রহ। বিশ্বামিত্রের বেল্লিদল, ব্যাসদেবের বিকটি, গৌতমের গোক্ষুরী আর কাশ্যপের কণ্টকারী বঁইচ উজানির দুই কূলে শেকড় গেড়েছে গভীরে। ডালপালা মেলেছে শ্রাবণ আর শালপাণি বৃক্ষ। তারা শত এয়োতির স্বাসে শত শত্বেধ ধ্বনি শোনে। দেখে গন্ধবণিকের চার আশ্রম দেবদাস, শঙ্খভূতি, আবটদত্ত আর বিষ্ণু গুপ্তের রমণীদের সমবেত ভ্রমরা যাত্রা। বাদ্যির ধ্বনিতে নাচে মিষ্টগন্ধা কেয়া বন। লতানো গুঁড়ি আর কেশঘন দিঘল পাতায় খলখল হাসি। বাঁচা মানে বয়ে চলা জলে ও বাতাসে, দেশ থেকে দেশান্তরে। উজ্জয়িনী থেকে উজানি এক দীর্ঘপথ। কোথাও বালুকা, কোথাও শিলা, কোথাও ঝোরা। শত শত বৎসর ধরে পায়ে পায়ে চলতে চলতে একদিন ভ্রমরার কূলে উজানি নগরে। বাঁচা মানে বাহিত হওয়া ভেলায়, মান্দাসে, ডিঙায়—দূর দেশে। মকর সংক্রান্তির তুসু ভেলা পাড়ি দেয় দীর্ঘ জলপথ—চাঁপাতলা, কোঙরবন্দ, দূবরাজপুর, নবখণ্ড, বাঁকাদামোদর, জুজুটি, গোবিন্দপুর, বর্ধমান, গঙ্গাপুর, দেউল্যা, কেজন, আমাদিপুর, গোদাঘাট, কুক্কুরঘাটা, জগতিঘাটা, শিয়াল্যা, ওসমানপুর, বোদল্যা, হাসনহাটি, নারিকলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, ত্রিবেণী। তারপর সুরনদী গঙ্গা-প্রবাহের উজানপথে দুলতে দুলতে নাচতে নাচতে ভাসতে ভাসতে স্বর্গপুরে। দক্ষিণ পাটন তো মাপা পথ। কেঁদো না খুল্লনা। লোহে ভরিয়ে না ঘৃতের প্রদীপ। শিখা মুখে আঁধার-কণা জমবে। দুলে উঠবে শিস। হেসো না,

লহনা, নিভে যাবে বাতি। তখন কী হবে হেম মুকুলিকায়, রজত পদাঙ্গুরিতে! কুলকুল বয়ে যায় গন্ধেশ্বরী নদী কিন্তু স্থিতধী থাকে গন্ধমাদন পর্বত। প্রতীক্ষা করে আবার কবে ঘরে ফিরবে দেশান্তরী জলস্রোত।

বাদ্য থামে উজানির ঘাটে। মাথার ওপর ঝোলে তারাঘন আকাশ। সে তারামণ্ডলে শোভা আছে কিন্তু দীপ্তি নেই। তাই উজানির জলে এক কুনিকা আলো তো তিন কুনিকা অন্ধকার। শুধু কিছু হেম দানা মাথা তুলে ডুবে যায়। নারিকল, হরীতকী, বয়ড়া, আকন্দ, কেয়া, ঝাবুর ডালে-পাতায় জোনাক বাতি জ্বলে-নেবে। এত আঁধারে কেমন করে কর্ণে বসবে সপ্তডিঙার প্রধান কাণ্ডার বুচন? কেমন করে পাড়ি দেবে খরসান নদ, আগলা-পাগলা হাওয়া আর অতলান্ত দরিয়ার সঙ্গে? কেমন করে পার হবে নীল সাগর, কালিয়নাগের জলদ গর্জন? তার বিষে নীল হয় সপ্তসাগর। এত অন্ধকারে লবণ দরিয়া বিপদসংকুল, বলেছিল খড়িবজ্র খাঁ। জলে কুস্তীরের ভয়, কূলেতে শাদূল। চন্দ্রবিহীন রাতে মকর নাচে নোনা বায়ে। প্রাণ-পিড়াসিল মীন শতেক যোজন তনু দিয়ে ডিঙা ওলটায়। বলেছিল শশী বিনা সাগরযাত্রায় পদে পদে আপদ হে। সাধু ধনপতির মনে ধরেনি গণকের কথা। বিতাড়িত করেছিল ঘর থেকে। এখন তো নদী আর আকাশে আঁধারের লুটোপাটি। শত এয়োবতীর সহস্র হাত ভ্রমরকালো কেশের মতো দিঘল এই তিমির, ঘন এই তমস।

শত এয়োবতী বলল সাধু পারবে। এই দেখ সীমন্ত সিন্দূর। এ সিন্দূরে খরস্রোতা হয়েছিল নদনদী আর বেহুলার মান্দাস চলেছিল ডানা উড়িয়ে। দু-তীরের এয়োতীরা কলস-বুকে ভেসেছিল বহুপথ, বেহুলাকে সঙ্গ দিতে। বউ-কথা কউ বলেছিল, ‘রাঙা থাক সতী সিঁথি’। নদীকূলের মানুষ বুক চাপড়ে মন্ত্র পড়েছিল, ‘ডাকিনি কামিষ্কা মাগো করজোড় দিয়া/নাম্ নামরে বিষ জয় জয় দিয়া/সেই মন্ত্রে মড়া যদি নাই কাড়ে রা/আর মন্ত্রে বিষ ঝাড়ে বিষহরি মা’। এই সীমন্তক দেখে বায়ু হয়েছিল ত্রিবেণীমুখী আর জলধর পাড়ি দিয়েছিল অগস্ত্যমুনির সন্ধানে দাক্ষিণাত্যে। গৃধ্রিনী দল উৎসবে মেতেছিল আকাশজুড়ে, শব দেখে মান্দাসে। সীমন্ত সিন্দূরের শিখায় উড়ে গিয়েছিল ভিন্ন কোনো ভূমে, ভিন্ন কোনো কূণপ সন্ধানে। কীট ও কীটাণু আপন বাসগৃহ খুঁজেছিল লখিন্দর দেহে। চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রের মাসমাংসে জমেছিল মহাভোজ, এবার সপ্তমও শেষ। বাছা লখিন্দর, ডুবে যাও চিরঘুমে। সুখ স্বপনে, শান্তি শ্মশানে, মশানে তাণ্ডবে মাতো, কী লাভ গাণ্ডিবে! শেষ অবধি একা যুধিষ্ঠির আর সঙ্গী সারমেয়, পার্থ-সহ বাকি সব মহারথী পথপার্শ্বে পড়ে থাকে কুক্কুরের মতো। সর্ব বল, সর্ব বিক্রম, সর্ব অর্থ, সর্ব যশ এবার ধুনে ফেলি লখিন্দর দেহে? অস্থি মাস দুই খাই? তার আগে বেহুলা

কপোলের ওই ধুনাধুনির অগ্নিকুণ্ড নেভাও হে। নইলে যে তাপে পুড়ি। বেহুলাকে দেখে সেদিন বাদাম নামিয়েছিল জলযান ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পটলা, অভয়া, দীর্ঘা, পত্রপুটা, গর্ভরা, মছরা। এয়োবতী বেহুলা চলে সুরনদীর পথে লখাইয়ের প্রাণের সন্ধানে স্বর্গধামে—ওহে, বাদাম নামাও, কেয়াল থামাও। দু-দণ্ড কর্ম ফেলে বুক চাপড়ে বলো, ‘মোর পুত্র হইয়াছে সাপিনির ডঙ্ক’। বাসর-বিধবা বেহুলাকে দেখে বৃদ্ধ বট কথা দিয়েছিল, ‘সব লাল ফল তোলা রইল তোর সিঁথির কল্যাণে’। সেতুবন্ধে স্বর্গের ধোপানি নেতা বলেছিল, সতী রুমণীর সিঁথিরং পাকা। মন্ত্র আছে ইন্দ্রধামে।

উজানির ঘাটে শত এয়োবতী সমবেতে বলে, ‘এই দেখো সিঁথিরেখা’। জুলে ওঠে শত দীপ। সিন্দূরের রঙে রাঙা সহস্র সিঁথিপাটি। সে রং ছড়ায়, গড়ায়। রাঙা হয় ভ্রমরার জল, আকাশের জলধর, শত রমণীর চরণ, গোলাপের দল। খররঙে বর্ণময় ওষ্ঠাধর, মসরি, তোতাঠোঁট, ডালিমের দানা, কাশীধামের অমরুৎ, টাবা কোয়া, নাগকেশরের রেণু, পলাশের ফুল, ভীমরুল ছল, গোখুরার জিব, কলস স্বস্তিকা।

বেজে ওঠে দুন্দুভি, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ভেরি। মধুকরে বন্দনা করে লহনা-খুল্লনা, পুষ্প ও প্রদীপে। বলে, ‘হে মহাযান, মধুময় হোক তোমার যাত্রা। অলিগুঞ্জে মুখরিত হোক জলপথ। যতগুলি প্রাণ নিয়ে চলেছ দক্ষিণ পাটনে, সব ক-টি ফিরিয়ে এনো গেহ-গারিতে। এই অগ্নিস্পর্শে বাকবন্ধ হই দেহ রাখব শুচি আর জন্ম দেব না কোনো জারজের।’ পরের ডিঙা গাঙীর ও ডহ দারু-নির্মিত দুর্গাবর। বাহিরখোলে দুর্গতিনাশিনীর মুখ। দু-সতিনে বলে, ‘তগুলি আর অষ্ট দুর্বায় বন্দনা করি হে দুর্গাবর। সাধুরে ফিরিয়ে এনো উজানিনগরে। সাধু বিনে কবুতরগুলি বোবা, শয়নমন্দিরটি শূন্য, সংসারটি কানা। সাধুকে রক্ষা কোরো জলের কুস্তীর আর ডাঙার কোটালের হাত হতে।’ ফুল-চন্দনে পূজে শঙ্খচূড়। দৈত্যাকৃতি এই যান চলে জলধি আলো করে। লহনা-খুল্লনা বরণ করে বাতি দিয়ে। নিবেদন করে, ‘হে তুলসীপতি শঙ্খচূড়, তোমার অস্থিতে মঙ্গলময় শঙ্খবাদ্য, শঙ্খধ্বনি। দক্ষিণ পাটন শুভ হোক। ফিরে এসো সব ক-টি গেহ-গারির শান্তি-সুখ-মঙ্গল নিয়ে’। পরের ডিঙা চন্দ্রপাল। দু-রমণী বলে, ‘সমুদ্রমস্থনে চতুর্দশ রত্নের প্রথম ছিলে হে চন্দ্র। তুমি এ-ডিঙার পালক ও রক্ষক। সারারাত্রি আলো দিয়ে পথে। তুমি জাগলে ঘুমিয়ে থাকবে সব অপদেবতা, দৈতাদানা। মহানন্দে ফিরে এসো ডিঙা। তুমি জাগলে তবেই-না বিভাবরী চোখ মেলে। আমরা মকরন্দ জমাই বুকো।’ পরের ডিঙা ছোটোমুঠি। এ-নায়ে যাবে বাহান্ন পাউটি চাল। লহনা-খুল্লনা বরণ করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারটি। নিবেদন করে, ‘নাওয়ের মানুষগুলি যেন অন্ন পায় প্রতিদিন

পূর্ণপাত্র’। তার পরের ডিঙা গুয়ারেখি। মাষ, মসরি, বরবটি, মটর আদি দ্রব্য যাবে এ-ডিঙায়। পুষ্পগন্ধে পূজা করে লহনা-খুল্লনা। বলে, ‘ত্বরা চলুক গুয়ারেখি। দানব-দুষ্ট ঘরবন্দি থাকুক পিণ্ডজুরে, অজীর্ণ-অগ্নিমান্দ্যে, অতিসারে, অম্লশূলে, প্রমেহে, ফিষ্বেদনায়, কর্ণশূলে। ফিরে এসো পাটন সেরে বিপদতারণ পথে, আরতি করব গুয়া-তাম্বুলে’। শেষ ডিঙা নাটশালা। সেথায় দিবারাত্র গাবরদের নানা রঙ্গ। লহনা-খুল্লনা অর্পণ করে শ্লেদক রসাল। শিশু গণপতি ক্রন্দন ভুলেছিল ছানা, ঘৃত, চিনি, দুধে নির্মিত নাড়ুতে। হে রসরাজ নাটশালা, গ্রহণ করো কাঞ্চন-লতিকা, মৌক্তিকাক্ষ, অমৃতকেলি, কর্পূরকেলি, মোতিচূর, লবঙ্গলতা। রসে মেতো, রঙ্গে থেকো। নাট্য করো, মল্ল করো, নৃত্য করো, প্রমোদে ভাসো। আসুক রঙ্গজ, রাঙা হোক সংসার। ডাক দাও রঙ্গজীবকে, চিত্রে ভরুক সব ডিঙা। ওহে ঢুলি, বাজাও রঙ্গ বোল।’ লহনা-খুল্লনার ডাকে নেচে ওঠে সব ঢোল। বোল তোলে। সমবেতে বেজে ওঠে আনন্দলহরি। জাগে প্রীতি, হর্ষ, সুখ ও প্রমোদ। ভ্রমরার জলতলা নৃত্য করে আনন্দে-সানন্দে, আমোদে-সামোদে, পরমানন্দে। শতদীপ দোল খায় ভ্রমরার জলে। এয়োবতীরা নিবেদন করে হিরা, নীলা, মোতি, পলা। সব নিক লবণ লতা, শুধু যেন রঙ্গে ফেরে সর্বজন। শত এয়োবতী দোলায় বাতি, ভ্রমরার জলে অসংখ্য ঢেউ ভেঙে পড়ে অযুত বাতিতে। রঙ্গে মাতে জলস্রোত। নাচে তাতিনি তাতিনি তিনি। বীণার সুর তোলে ঝাবুন, নূপুরের ঝমঝম বোলে মাতে কেয়াকুঞ্জ, করতালি দেয় নারিকল পাতা, এয়োবতীদের পাটশাড়ি হাসে রঙ্গে। ভ্রমরার কূলে উৎসব। সাধু ধনপতি যাবে দক্ষিণ পাটনে।

কুল পুরোহিত স্থাপন করে হেমঘট। স্বস্তিক বাচন শেষে গজাননের আবাহন। দ্বিজ তৈল-সিন্দুরে অঙ্কন করে কার্য সিদ্ধিকারকের স্মরণসূচক গজশুণ্ডচিহ্ন। পুষ্প অর্পণ করে চতুর্হস্ত, রক্তবর্ণ, লম্বোদর, স্থূলতনু, মূষিকবাহনকে। আরাধনায় গজানন বিঘ্ননাশক সিদ্ধিদাতা, বিস্মরণে বিঘ্নদাতা। তাই তাকে নানা রূপে স্মরণ—গণপতি, মহাগণপতি, বিনায়ক, বিরিগণপতি, শক্তিগণপতি, বিদ্যাগণপতি, হরিদ্রাগণপতি, উচ্ছিষ্টগণপতি, হেরম্ব, বক্রতুণ্ড, একদন্ত, মহোদর, গজানন, বিকট। বিঘ্নরাজ আছে তাই তার বাহন মূষিকটিও আছে। তারও নৈবিদ্য প্রাপ্য। মূষিকবাহন রুষ্ট হলে সংসারে সহস্র ছিদ্র। ধান্যভাণ্ডার থেকে পুঁথিঘর সবই তখন গণেশবাহনের উদরে। কোনো কিছুতে অতৃপ্তি নেই। মোদকে গণপতির ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটে কিন্তু বাহনের ভোজন চলে সর্বক্ষণ। হে মূষিক, এই নাও মধু, দধি, শর্করা, আমান্ন—জলপথিকদের কষ্ট দিও না।

বাদ্য বাজে। চামর দোলনে প্রীত হয় সবাহন গণপতি। পুষ্পগন্ধে সুরভিত হয় ভ্রমরার বায়ু ও জল। রত্নদীপমালে আলোকিত হয় নদীতট। শত এয়োবতীরা

উল্লেখ কলধ্বনি জাগে নদীজলে। নিদ্রা ভাঙে পানিকৌটির। চক্ষু জুড়ে বিস্ময়।  
রাধিকা একাকী আসত নদীকূলে, সঙ্গোপনে, মধ্যযামে। আর এখন সহস্র নারী  
সঙ্ঘারাতে হলুধ্বনি দেয় ভ্রমরার তীরে? কানাই বাজাত বাঁশি কদম্বের ডালে বসে,  
আর উজানিনগরের নাগরেরা বাজায় দন্দুভি, মৃদঙ্গ, ভেরি! কৃষ্ণ-রাধিকার ছিল  
একখানি তরী আর এদের সপ্তডিঙা। কী কালই এল! পানিতে ডুব দিতে দিতে  
ডাঙার কামকাণ্ড অজানা থেকে গেছে। লোকে বলে জল তলে পঙ্ক, ওপরে  
পঙ্কজ। কিন্তু এ যে দেখি বিপরীত! শত ডুবেও এই রঙ্গ দৃশ্যের পাপ যাবে না।

ডিঙাগায়ে ধ্বজ বাঁধে যত কিংকর-কিংকরী। স্বর্গমুখী রাঙা ধ্বজ ওড়ে। সে  
দৃশ্যে হ্লাদিত স্বর্গবাসী সপ্ত পুরুষ। সুমতি আছে কর্মে ও ধর্মে। হেম-উজ্জ্বল হবে  
বংশধারা। রাজদ্বারে দণ্ডরায় মান দেবে হাসা ঘোড়া, খাসা জোড়া ও নানান  
অভরণে। গমনের জন্য পাবে সসাজ বারণ। বান্যার সভায় মাল্য-চন্দনে প্রথম  
পূজা পাবে। গৃহে বনিতারা শ্রবণ ওপরে পরবে কনক বউলি, বাহুযুগে কনক-  
কেয়ূর, পায়ে কিংকিণি। হাতে ধরবে হেমদণ্ড আর রস দাপনি। কণ্ঠে ঝুলবে হিরা-  
নীলা-খোচিত সাতলহরী। নিত্যদিন দশ কিংকর যাবে বাজারে শত কাহন কড়ি  
নিয়ে। শয়ন মন্দিরটি হবে বৃহৎ ও বায়ুবহ। দেবতার নিত্য সেবা হবে চৌষষ্টি  
উপাচারে। অর্থবান যশবান হও হে ধনপতি। শিবস্মরি যাত্রা কোরো।  
সিংহলরাজকে যথাযথ ভেট দিয়ো। আর বেউশ্যাদের সঙ্গে মধ্যযাম অবধি জাগ্রত  
থেকো না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে শয়ন এবং প্রাতঃকালে শয্যা্যাগ দেহমন সুস্থ  
রাখে। কিংকরদের বোলো ডিঙাধ্বজগুলি যেন দৃঢ় বাঁধে। সাগর বায়ু বড়ই  
ঝঙ্কারু।

ডিঙা, দেবতা এবং পূর্বপুরুষের পর কর্ণধার ও নাইয়াবরণ। কর্ণধার পথ  
প্রদর্শক, জলদ্রষ্টা। সে চেনে জলের মতি, জানে জলধির স্থিতি। জয়পতির দক্ষিণ  
পাটনের কাণ্ডার ছিল সে, এবার কুলধারক ধনপতির সঙ্গে। এই শেষযাত্রা। বসন,  
ভূষণ ও চন্দনে পূজন হয় বুঢ়নের। বাদ্য বাজে। ললাটে কর ঠেকায় সে। এত  
মানুষের দায় নিয়ে দক্ষিণ পাটন, এত গেহ-গারির ভার। বলে, 'যাত্রা শেষে যে যার  
গেহে ফিরুক। যদি ভার বেশি হয় ডিঙার, এই ত্রিকালগতকে শয়ান দিও  
সাগরজলে হে বিধাতা' বরণ চলে নাইয়াদের। জোয়ান গাবরদের মহানন্দ। না  
জানি কত কী রঙ্গ আছে লঙ্কাদ্বীপে।

বাদ্য বাজে। গৃহে ফিরবে শত এয়োরানি। তার আগে কদলীখেলের ডিঙা  
ভাসানো। পরল, গুয়া, কদলী, কুল, শিম, বেতুয়াশাক, মূলা, অলাবু পুষ্প, ক্ষীর  
পুত্তলিকা ও পুষ্পে শত কদলী ডিঙার সুরলোক যাত্রা। পথখানি আঁধারে ঢাকা।  
তাই ঘৃত প্রদীপ। ভ্রমরার স্রোতে ভেসে চলে শত ডিঙা।

## ৭ খুল্লনার চণ্ডী পূজা

ঘৃতদীপ নিয়ে যায় সব দ্যুতি সব জ্যোতি। ভ্রমরার নদীঘাটে নিবিড় আঁধার। সপ্তডিঙার কোল পূর্ণ তণ্ডুল, মসরি, বয়ড়া, হরীতকী, সিন্দূরে, কিন্তু খুল্লনার অন্তরটি শূন্য। ডিঙার খোল-জুড়ে মৃগ, কপি, কবুতর তবু মনে সুখ নেই খুল্লনার। দক্ষিণ পাটনে পদে পদে বিপদ। আকাশে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত, নদীকূলে শার্দূল-দুষ্ট-খণ্ড। উত্তাল সাগরজলে মকর, তিমি, তিমিসিল। আছে প্রাণাপহারী মীন। কুস্তীর, টমক, সিঙ্গা, কৎসব, জলফণি, জলৌকার সংসারপাতা ওই নোনা পানিতে। আর লক্ষাদ্বীপটি যে কেমন তাও-বা কে জানে! নৃপমুনির মর্জি আর কোটালের মতি মন্দ হলে তখন কী হবে সাধুর? যদি লুটে নেয় খাসি-ঘোড়া-যুদ্ধভেড়া, কেড়ে নেয় মণি-মুক্তা, সাধুকে নিষ্ক্ষেপ করে বন্দিশালে?

সাধু না ফিরলে কী হবে খুল্লনার? কী দুর্ভোগ মিলবে সাপিনি-বাঘিনি-সতিনি লহনার হাতে? সাধু যখন যাত্রা করেছিল গৌড় পথে শুক-শারির স্বর্ণপিঞ্জর গড়াতে, লহনার কাছে মিলেছিল কিল আর লাথি। সাধুর নামে-লেখা কপট প্রবন্ধে কেড়ে নিয়েছিল দেহের অষ্ট অলঙ্কার, ক্ষুধা নিবৃত্তিতে বরাদ্দ করেছিল অর্ধসের তণ্ডুল, শয়নব্যবস্থা হয়েছিল টেকিশালায়, পরনে উঠেছিল খুঞ্চাপাতার বস্ত্র আর কর্ম-মিলেছিল ছেলিচারণ। বৎসরাশ্তে সাধু গৃহে ফেরে কিন্তু খুল্লনার ললাট ফেরে না। পিতৃশ্রদ্ধে জ্ঞাতিকুল সাধুর অন্নগ্রহণে অসম্মত কারণ কাননে ছেলি চরিয়েছিল তার বধু। তারপর সতীত্ব প্রমাণে একে একে জল, সর্প, অগ্নি-শলাকা আর জৌ-গৃহ পরীক্ষা। সেবার বনে বাদল, হিম, শীতের যাতনা ছিল একার কিন্তু এবার যে গর্ভ ছ-মাস। সেই শিশু কী করে সহ্য করবে গেহ-গারির এত গরল, এই রাহু গরাস! শত কদলীডিঙা ঘৃতদীপে নিয়ে চলে সব দীপ্তি, পড়ে থাকে অমানিশা।

শত এয়োবতীর তরণীপূজা শেষ। এবার ফিরবে নগরে। মৃদঙ্গ-ভেরি-দুন্দুভির মুখে কুলুপ, শঙ্খবীণার গলায় বেড়ি। ডিঙার কপি, কবুতর, কুরঙ্গুলিও বোবা, চিত্তাক্লিষ্ট। ভিটে ছেড়ে দূর দেশে যাত্রা। সেথায় না মিলবে স্বজন, না সুজন। প্রাণে বাঁচলেই খুশি। নীরব নদীর ও-কূলের শ্মশানযাত্রীরাও। হরিধ্বনিতে নশ্বর দেহ দাহ করে এখন যে যার বাসে ফেরে। চোখ বোঁজে চিতাবহি, চোখ খোলে শ্মশান-শুগালী। সাধক আসে শিবাবলি নিয়ে। ‘কালী কালী’ রবে বলে, ‘বলিভোজন করে ঈশানে মুখ তুলে রব দাও। তুমি ডাকলে মঙ্গল হয় জগতের আর ঘন হয় আঁধার।’ ভ্রমরার দু-কূল সরব হয়ে ওঠে শ্রীকালি ঘোষে।

খুল্লনা তাকায় সমুখে। তীরের বট, বিশ্ব, অশ্বখ, অশোক, আমলকী আর শেফালিকার ডালে-পাতায় পর্বতের মতো শতসহস্র বৎসরের জমাট তমস। সাত তরীতেও দোল খায় ঘোর অমানিশা। শশীহীন রাতে সাধু ধনপতি ভেসে থাকবে অচেনা নদীজলে, পার হবে খেয়ালি ইছানি, কমলাপুর, চক্রঘাটা, যুগিনী, খুরখালি, ব্রহ্মপুর, পদ্মাবতী, মকুরপুর, প্রয়াগ, ত্রিপিণি, সাগরসংগম মগরার বাঁক। এই তিমির নিয়ে সপ্তডিঙায় পাড়ি দেবে অজানা সপ্তমোড়ার সপ্তবাঁক, জলৌকার বাঁক, কাঁথরার বাঁক, দামঘাটার বাঁক, কৌড়িধির বাঁক, শঙ্খ জলধির বাঁক আর ওই কালিয়দহ।

ভ্রমরা পিছে ফেলে শত এয়োবতী গৃহমুখী। যে নদীযাত্রা ছিল বাদ্যে সরব, ঘূতে সুগন্ধি, সিঁথির সিন্দূরে উজ্জ্বল তা ফেরতপথে নির্বাক, নিগন্ধি, নিরাকার। কানে শুধু ভেসে আসে নদীর চলন ধ্বনি। অন্য এক চাপা স্বর চারপাশে। আনারস, মান, কদলী বনে যেন কোনো শলা। লহনা ভাবে সদাগরের সাত তরী চলে লঙ্কাদেশে বাণিজ্যে তাই দ্বেষে ফোঁসে চারপাশ। তার সামনে ভাসে অঙ্গুরি, পাশুলি, পদাঙ্গুরি, সুবর্ণের কেশকাঠি, মণি, মুক্তা, পলা, হেমহার। সাধু ফিরলে বাম করে নতুন তাম্বুলকৌটা আর দক্ষিণ করে হেমঝারি নিয়ে হাঁটবে কোন মুদ্রায়, ভাবিত হয় লহনা। চলন আর ভাবনার পাকচক্রে দু-চরণ এগিয়ে ঘটে পদস্থলন। তোলে বাইন্যানিরা। কেঁপে ওঠে খুল্লনার বুক। কী বিপদ উঁকি দেয় বেচাল পদে, গাছগাছালির শলায়, চিতাকাঠের ধূমে, উলুকের ডাকে, শিবির চিংকারে! আকাশের তারায় ও কী গুহ্যকথা, জলদের গায়ে কেন রাঙা বর্ণ, কোন শোকে নদীজলে ঝরে পড়ে গগনবাতি! শরের বন কিংবা নদীর বালুপথে তার উত্তর নেই। হটযোগী হাওয়ায় শরের পাতা মত্ত নাচনে আর নদীবালু ব্যস্ত উড়নে। তবে কি ওপারের চিতাদেহের আত্মখানি এখন ভুবনবিহারী? আতঙ্কে, ত্রাসে, শঙ্কায় হুলুধ্বনি দিয়ে ওঠে শত বাইন্যানি। সে ধ্বনি শূন্য শাশানকলসে প্রতিধ্বনি তোলে।

শ্রেতবায়ু পিছনে ফেলে শত এয়োরানি দ্রুত চলে গৃহপথে। নগরবিহারে বেরিয়েছে নদীকূলের আত্মা, কার ভিটেয় বাস গড়ে কে জানে! সত্ত্ব হলে সুখাসক্তি আর জ্ঞানশক্তিতে মন, রজঃ হলে প্রাপ্ত অপ্রাপ্তের অভিলাষ কিন্তু তমঃ হলে তো নিরাকার আত্মার বিকার অবস্থা! আতঙ্কে নিশ্চড়াল আর আর সম্মাজনীর সন্ধান করে নগরবাসীরা।

খুল্লনা ঢোকে পূজাগৃহে, পূজে চণ্ডী। সারাদিনের উপবাস শেষে মধ্যরাতে লোহিতবাসে দেবী আরাধনা। জলগর্ভা দু-টি লাল মৃত্তিকার আর তার উপর সবুজ আশ্রসার এবং দিঘল দুর্বা। সিন্দূর আর চন্দনে আশ্রসার আর দুর্বাদল রাঙা। সারা দেবালয় জুড়ে ধূনা-চুয়ার সুবাস। খুল্লনা অর্চনা করে দেবীকে কুমকুম, কস্তুরী, পুষ্প

আর গুয়ায়। নিবেদন রাখে, নাথকে আশ্রয় দিও বাড় ও ঝঞ্ঝায়, আড়াল কোরো  
 প্রেত ও প্রেতিনীর দৃষ্টি থেকে, রক্ষা কোরো দুষ্ট-খণ্ডের হাত হতে, কেড়ে নিও  
 পরদেশি পাইকের রায়বাঁশ, কেটে দিও ধানকীর ধনুকের ছিলা, ঝতুকাল অনন্ত  
 কোরো সাধুপথের সব বেউশ্যার। দেবীকে খুল্লনা অর্পণ করে আমান্ন, দধি, নবাত,  
 ফেনি, পানিফল, কুল, করঞ্জা, কদলী ইত্যাদি ষোলো উপাচারের নৈবিদ্য।  
 শঙ্খধ্বনিতে প্রদক্ষিণ করে মা চণ্ডীকে। বন্দনা গায়।

প্রলয় সমাপ্তিতে বিষ্ণু অনন্তশয্যায়। নাভিপদ্মে অবস্থান করে ব্রহ্মা। নারায়ণের  
 কর্ণমল হতে মহামায়া দুটি শিশুর জন্ম দিল। প্রথম শিশুটি জন্মের পর মধু পান  
 করতে চায় তাই দেবী তার নামকরণ করল মধু। অন্য শিশুটি কীটের ন্যায় দেবী-  
 হস্তে শুয়েছিল তাই কৈটভ। শিশু দুটি অনন্ত সপ্তসাগরে ক্রীড়ায় মগ্ন থাকে। ধীরে  
 ধীরে তাদের মনে ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা জাগরিত হয় এবং মহামায়া সর্বশক্তির  
 উৎস জেনে তারা দেবীর ধ্যানে সমগ্র বৎসর মগ্ন থাকে। মহামায়া স্বেচ্ছামৃত্যুর  
 বর প্রদান করে। ক্ষমতার দস্তে তখন তারা বিষ্ণুর সঙ্গে রণে মগ্ন হয়। সাগরতলে  
 বাহুযুদ্ধ চলে পাঁচ হাজার বৎসর। তখন বিষ্ণু মহামায়ার ধ্যান করে এবং মহামায়া  
 কাম শরে মধু ও কৈটভকে বিদ্ধ করে। তখন তাদের কানে ধ্বনিত হয় পিকরব,  
 মনে গুনগুন করে অলি আর শরীর জুড়ে আবর্তিত হয় বসন্ত বায়ু। যৌবন রসে  
 মগ্ন তারা। জলে যেমন কেলি করে নিষ্পদ যান, নিশাকালে নৃত্য করে দীপ, বরিষ  
 মাসে রসে-রূপে ভরে ওঠে হাঁড়িতাল তেমনই কামে জরজর অঙ্গ তাদের। বিষ্ণু  
 তাদের রণকুশলতায় খুশি হয়ে বর দিতে চায়, তারা কামের বশে বিষ্ণুকে বর  
 কামনা করতে বলে। বিষ্ণু কামনা করে মধু-কৈটভের বধ হওয়ার বর। দেবীর  
 বক্রদৃষ্টিতে বিভ্রান্ত মধু ও কৈটভ তাতে সম্মতি দেয় কিন্তু জলবিহীন স্থানে মৃত্যুর  
 ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। তারপর ব্রহ্মা নির্মাণ করল এক বিশাল শিলা এবং মহামায়া,  
 মহাদেব, কূর্ম ও অনন্ত প্রমুখ সাগরজলে ভাসিয়ে রাখল সেটিকে। বিষ্ণু তখন  
 বরাহের পৃষ্ঠে বসে নিজ বাম উরুতে মধু ও কৈটভকে রেখে বধ করল। হে দেবী  
 মহামায়া, ব্রহ্মশিলার মতো তুমি সদাগরের সপ্তডিঙা সাগরে ভাসিয়ে রেখো। দুষ্ট  
 ও খণ্ডদের কামবাণে বিদ্ধ কোরো যাতে সদাগরের নাইয়া-গাবরেরা তাদের মস্তক  
 চূর্ণ করতে পারে যষ্টির আঘাতে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করে মহিষাসুর স্বর্গ জয় করল। হে  
 চণ্ডী, একদিন বিদ্যুৎ পর্বতে তোমাকে দেখে পাণিগ্রহণের বাসনা জাগে তার। সে  
 দূত প্রেরণ করল তোমার নিকট। তাকে জানালে যে তুমি বীর্যশূঙ্ক। মহিষাসুর  
 তখন সৈন্য প্রেরণ করল তোমাকে বন্দি করে আনয়ন করার জন্য। তুমি তাদের  
 বধ করলে। তারপরে মহিষাসুর যাত্রা করল তোমাকে রণে পরাজিত করে ভার্যা

হিসেবে গ্রহণ করতে। তখন তুমি নতুন রূপ ধারণ করলে। দেবাদিদেবের প্রভায় রূপ পেল তোমার মুখমণ্ডল, বিষ্ণুর কাস্তিতে বাহু, ব্রহ্মার দীপ্তিতে পদতল এবং শশীর কিরণে দুই স্তন। তোমাকে অস্ত্রে সজ্জিত করল দেবতারা। মহাদেব দিল ত্রিশূল, বরুণ দিল শঙ্খ, অগ্নি দিল আয়ুধ, পবন দিল ধনুয়া ও তুণ, ইন্দ্র দিল বজ্র, যমরাজ দিল দণ্ড, ব্রহ্মা কমণ্ডলু। বাহন হিসেবে হিমালয় অর্পণ করল কেশরী। তুমি হলে সিংহবাহিনী। রণ শুরু হল। নানা রূপ পরিগ্রহ করল মহিষাসুর। তুমি এক রূপে অনন্তরূপা। তুমি চণ্ডী, তুমি কাত্যায়নী, তুমি দুর্গা, তুমি কৌশিকী, তুমি কালী, তুমি কালিকা, তুমি মাতঙ্গী। তুমি মনা মা। তোমার পদস্পর্শে নির্বাপিত হল মহিষাসুরের সব হেঘ, সব ক্রোধ, অবসন্ন হল সব অঙ্গ। বধ হল দেবতাপীড়ক মহিষাসুর। মা চণ্ডী, সাধু সপ্তডিঙায় নিজবাসে ফিরে এলে আমি কাঞ্চন গোধিকা দেব তোমায়। ও কাউর-কামিখ্যা মা, এই নাও ওড়পুষ্প, রক্ত কুসুম। আমার সিঁথিখানি রাঙা রেখো। তুমি কৃপাদৃষ্টি দিলে দুই ওষ্ঠে সুখে থাকে রামজায়া সীতা আর রুষ্ট হলে বিশ-ওষ্ঠ রাবণের ভার্য্যা মন্দোদরীর নিশিগুলি ধবহীন।

মহিষাসুরের বধ যুগ পরে জন্ম নিল দনুর সন্তান শুভ ও নিশুভ। তপস্যা বলে এরা হল প্রবল শক্তিমান। রাজা হল শুভ। শুভ-নিশুভের রাজ্যে এল চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ আর ধূম্রলোচন। সকলে মিলে জয় করল দেববাস স্বর্গ। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারা স্তব করতে লাগল কাত্যায়নীর। কাত্যায়নীর দেহকোষ হতে জন্ম হল রূপবতী কৌশিকীর। কেশ তার কলাপ পুচ্ছ, ঢলঢল বদন পূর্ণিমা শশী, স্তনদুটি কদম্বকোরক আর কটিখানি মধুকরী। শুভ ও নিশুভের দুই সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ড অপরূপা কৌশিকীর সন্দেশ দেয় প্রভুদের। শুভ সুগ্রীব নামের এক দূতকে দেবীর কাছে প্রেরণ করে শুভ কিংবা নিশুভকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে। দেবী জানায় সে বীরশৃঙ্খা। দূতের কাছে সেই বাক্য শুনে শুভ ধূম্রলোচনকে প্রেরণ করে কেশ ধরে দেবীকে স্বর্গে আনার জন্য। তারপর দেবীর ক্রোধে ধূম্রলোচনের ভস্মীকরণ। এরপর আগমন হল চণ্ড ও মুণ্ডের। তখন দেবীর ললাট থেকে আবির্ভূত হল ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা দেবী শক্তি। দেবীর হস্তে নিধন হল চণ্ড ও মুণ্ড। দেবী তাদের শির দু-টি কৌশিকীকে অর্পণ করলে কৌশিকী দেবীর নাম দিল চামুণ্ডা। এরপর রণে আসে শুভ, নিশুভ ও রক্তবীজ। দেবীর বজ্রে নিহত হল রক্তবীজ আর রক্তবীজের রক্ত মেদিনী স্পর্শ করার আগেই পান করল চামুণ্ডা। শুভ ও নিশুভের সঙ্গে রণের পূর্বে দেবী শিবকে পাঠাল দূত হিসেবে অস্ত্র সংবরণ করার জন্য। কিন্তু দুষ্টের মতি সর্বক্ষণে কু। তারা রণদামামা বাজাল আর তখনই দেবীর দেহ থেকে আবির্ভূত হল ব্রহ্মাণী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, মাহেশ্বরী আর অতিভীষণ চণ্ডিকা। নিহত হল নিশুভ ও শুভ।

হে ভৈরবী-ভীমা-বিশাললোচনা, তুমি সদাগরকে তস্কর, খণ্ড আর নাগের ডঙ্ক থেকে রক্ষা কোরো। অধিক একটি নিবেদন হে হৈমবতী, আমার গেহের সতাটি নাগিনী। আমি শশীকলা আর লহনা হল রাহু, আমি মৃগী আর ওটি বাঘিনী। সাধু পাটনে গেলে সতা যদি দুর্বীর হয় তুমি আমার সহায় থেকো মা। চৌষট্টি যোগিনী নিয়ে হাজির হয়ো নিশি শেষে লহনা শিয়রে। ওর কুন্তলখানি ধরে হান হান পাক দিয়ে বার দশ। হাতের খড়্গখানি ব্যোম আর সোমে নাড়া দিয়ে মা চামুণ্ডা। সাধু ফিরলে তোমার খড়্গের ক্ষুধা নিবারণ করব শতেক ছাগ আর মেষে। প্রতি মঙ্গলে তোমার আরাধনা করব, বিপদসাগরে তুমি সাধুর কর্ণধার হয়ো হে চণ্ডিকা।

কপাটের আড়ে ছিল আধখান নেঞ্জহীন মার্জার বোঁচা আর সাধুভার্যা লহনা। নেত্রখাসা বোঁচার চক্ষু ছিল দধিদুগ্ধে আর সতা লহনার কর্ণ ছিল খুল্লনার ভাবে। ডাকিনী দেবতার মন্ত্র পড়ে খুল্লনা। ডাইনকলা শিখে ধেয়ান করে। এবার গেহটি হবে ভূত-প্রেত দতিদানোর আখড়া। কাষ্ঠ পাল্লাগুলি মধ্য নিশিতে খুলে যাবে আপনা-আপনি। পাটকেল পড়বে দ্বিপ্রহর রাতে। কুমুড়া, ফুল বড়ি, বাগ্যনের ঝোল থেকে মীন খণ্ডগুলি উধাও হবে। কটু তৈলে রাঁধা চিতলের কোলগুলি যাবে দানোদের উদরে। অমাবস্যার রাতে স্কন্ধকাটা তার পদজোড়া দোলাবে পাকুড়ের ডালে। নদীতীর ধরে অগ্নিকুণ্ড মাথে হাঁটবে একাকিনী বালা। একদিকে সতা খুল্লনা, শতেক টেঁড়িচামুণ্ডা, চৌষট্টি যোগিনী আর অন্য দিকে একা লহনা আর দাসী দুবলা। লহনা ছোট সাধুর খোঁজে। ভিটেয় ডাইন কলা বন্ধ করে তবে সাধু যাক সাগর পাটনে। সংসারে অনাচার সহ্য করবে না সে।

সাধুকে সেকথা জানায় লহনা সেতুবন্ধে। সাধু নিজ চক্ষে গিয়ে দেখুক। মিথ্যে হলে কেটে দিক তার নাসা। নিবেদন করে, ‘হে পতি, আমাকে গেহ ছেড়ে অরণ্যে যাওয়ার অনুমতি দাও। আমি শশক হয়ে বাস করব গজের সংসারে, ভেক হয়ে থাকব বিষধরের সঙ্গে, মৃগ হয়ে ঘুরব শার্দূল নিলয়ে, মক্ষিকা হয়ে উড়ব কপিদলে, মুষিক হয়ে থাকব নকুল বনে, মীন হয়ে বাস গড়ব চিল্লসরোবরে কিন্তু আমি ডাকিনী সংসারে থাকব না সাধু। খুল্লনার লোহিত বাস আর আকুল কুন্তলপাশ দেখে বুকের ভেতর টেকির পাত পড়ে। আগে তোমায় বলিনি সাধু, পাছে ভাব এ সতার ছিল। যখন যৌবনবতী ছিলাম তখন পঙ্করের পক্ষীর মতো সব কথা শুনতে। আমি নিদ্রা গেলে গুয়া চিবিয়ে আমার মুখে দিতে। এখন কপূর উবে গেছে, পড়ে আছে আধারখানি। শূন্য আধারের কী দাম বল! তাই খুল্লনার ডাকিনী-কলার কথা বলিনি তোমায়। তুমি সঙ্গে থাকলে কীবা ডাকিনী কীবা যোগিনী। কিন্তু তুমি সিংহল দেশে যাও, নাথ, লবণপানি পার হয়ে। সে যে দীর্ঘ পথ। আমার কী হবে সাধু? আমি না জানি ছিল, না ছিলনা। না চিনি কাঙুর, না

কামিখ্যা। গুলাল, শিরীষ, বকুল, কুন্দ আর পদ্মনাল এনে কোন মস্তবলে বাণ মেরে বশ করতে হয় পতিকে, জানা নাই সাধু। শ্বেত কাউয়ের শোণিতের সঙ্গে কালিয়া ঝঙ্কুরের পীত আর ছিনা জলৌকা কী মস্ত্রে বাটতে হয় আমি জানিনি পতি। কালিয়া বিড়ালকে কোন মস্ত্রে বলি দিতে হয় দ্বারে আমার অজানা। তাই লহনা তোমার দুয়ো, খুল্লনা সুয়োরানি। তবে জ্ঞাতিজনে দোষ দিলে আমার দুয়ো না সাধু। রুষ্ট হলে বোলো না আমায়। আমি পতিমুখী। অষ্টমুখী গৃহে, ধ্যান করে ভৈরবীর। দেখবে তো ছুরা চল সাধু।

## ৮ সাধুর কোপ, খুল্লনার বিনয়

লহনার কথা শুনে সাধুর গৌরবর্ণ রাঙা হয়, স্ফীত হয় নাসা। কেশ ফোঁসে যেন কালিনাগ। সাধুর কোপ দেখে মহা হর্ষ লহনার। স্বামী সোহাগে বড়ো গরব সুয়ার। তসরের শাড়ি দো-ছোটে পরে, উড়ে বেড়ায় দিবারাত্র। দু-বেলা দুবলাকে দিয়ে কেশমাঞ্জন চলে। কবরীতে বাঁধে মালতী-মল্লিকা-চাঁপা-গাভা। কর্ণে পরে কনক-বউলি, বাহ্যুগে কনক-কেয়ূর আর পদে কনক-নূপুর। হাতে হেমদণ্ড আর দাপনি। দাপনিখানিতে দেখে যাবকের রসে মার্জনা করে কেমন লাগে অধরখানি। ওরে কুঞ্জরগামিনী ইন্দের নাচনি, সাধু ছেড়ে ছেলিগুলোকে জল দেখা। ধামের বৃষটিকে ভুলে গোশালের গাভীটিকে তৈল দিয়ে কঠয়াল পাতা খাওয়া, বৎস বিয়োবে তাড়াতাড়ি। কে শোনে কার বাক্য! তিনি মণিগাঁথা কিংকিনী পরে মরালের ধ্বনি তুলছেন ঝমঝম। দেখছে কলধৌত কঠমালা কতখানি কুচযুগলে লোটায়। এবার কত দেখবে দেখুক। সুবর্ণ বান্যার ঠুকুরঠুকুর কর্মকারের এক ঘা। চলো তো সাধু। সোহাগের অনেক চুমু দিয়েছ সত্য ওষ্ঠে, এবার রোষের একখানি কিল দাও তো পিঠে। আমি নয়নসুখে দেখি খুল্লনা কেমন গড়াগড়ি যায় ভুঁয়ে।

পূজাগৃহ দ্বারে হাজির হয় ধনপতি। দেখে নৃত্য করে রামা। এ-দৃশ্যে কোনোদিন খুল্লনাকে দেখিনি সাধু। মনে হয় যেন দেবধামে কোনো অঙ্গরা নাচে। দেহের মুদ্রার সঙ্গে ঘন বেজে চলে কিংকিনী-কঙ্কণ। তাণ্ডব নাচে রামা আর অদৃশ্য কিন্নরেরা বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা বাজায়। কণ্ঠে সুর ভাঁজে অনুচনা, অদ্রিকা, অলম্বুষা, অম্বিকা, অসিতা, কাম্যা, ক্ষেমা, তিলোত্তমা, পুণ্ডরীকা, প্রমথিনী, বিদ্যুৎপর্ণা, মিশ্রা, মরীচি, রম্ভা আদি দেবলোকের সুন্দরীরা। খুল্লনা নৃত্য করে আর তার বাহ্যুগের কনক-কেয়ূর ঝলমল হাসে। রামার মুদ্রায় কুন্তলপাশ আকুল হয়, যেমন মাঘ-নাগের ফণা প্রথম বসন্তবায়ুতে মাতনে মাতে। সাধুর মনে হয় পূজাগৃহটি যেন

ঢেকে আছে প্রভাতের কুয়াশায়। আলো-আঁধারিতে কায়া আর ছায়া, মতি আর মায়া, আসক্তি আর বিরাগ, প্রকৃতি ও পুরুষ, স্থিতি ও প্রলয় নেচে চলে ঘন করতালিতে। সাধু বিস্ময়ে দেখে তার দেবগৃহে অবস্থান করে আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক-আধিদৈবিক ত্রিতাপ, ধর্ম-অর্থ-কাম ত্রিগণ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ত্রিদেব, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ত্রিজগৎ। সাধু ভাবে সাত নগরে ঢোল পিটিয়ে তার সপ্তডিঙায় উঠল তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, বিড়ঙ্গ, প্লবঙ্গ, কবুতর, হরীতকী, বয়ড়া আদি, আর তার গর্ভগৃহে ত্রিকাল নৃত্য করছে আপনা-আপনি। এ কী দৃশ্য দেখি!

সাধুর ঘোর কাটাতে লহনা ঠেলা দিয়ে বলে, তুমি ত্রিকালে ডুবলে নাথ, ওদিকে খুল্লনা পুজে ত্রিকোণ অঙ্গ। ওর নেত্রে থামাও সাধু, নইলে পাটন থেকে ফিরে দেখবে একটিও ছাগশিশু নাই। ওই রক্তবসনা সব ক-টি পাঠিয়েছে কাঙর-কামিখ্যায়। তুমিও যদি বামাচারী হও আমি কোথা যাব সাধু, আমি কি বনচারী হব?

বোধে ফেরে ধনপতি। নৃত্যের ঘোরে তার নেত্র দু-টি অন্ধ হয়েছিল। লহনা-খুল্লনাতে রক্ষে নেই তার উপর চণ্ডা, চণ্ডী, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা। তাদের আবার চৌষটি যোগিনী। সাধু ধনপতির দেবালয়ে তাদের অর্চনা হবে? কী অদৃষ্টে এমন পাপিনী যুবতী গেছে এল?

সাধুর রোষ দেখে ভগবতী ঘট ছেড়ে গগনে ওঠে। খুল্লনার কেশ ধরে কুপিত সদাগর। ভূতলে লুটায় রামা। রোষজুত ধনপতি বলে, আমি ধনপতি সদাগর, তুই কিনা তার ধামে পূজিস স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা? আমার জাত-কুল সব গেল। আমি কেমন করে বার হব নগরে, কেমন করেই-বা যাব জ্ঞাতিগৃহে? লোকে বলবে দৈবপুরুষ দেশদাস, শঙ্খভূতি, আবটদন্ত আর বিষ্ণুগুপ্তের বংশধরদের সংসারে যজ্ঞ ছেড়ে যোগিনী পূজা হয়! ও-ভিটায় ভল্লুক, সিংহ, সর্প, কপিমুখীদের বাস। ও-সংসারে ওড়পুস্পের অঞ্জলি পায় শূকর, কাউ, মীন, মোরগ, ভেক আদি চৌষটি বাহন। যদি দ্বিজসব বলে ধনপতি দত্তের শুভকাজে নেই আমরা? না আসে উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধবাসরে? না গ্রহণ করে কনক, রূপা, বসন, বাস, ভূজ্য? তখন কী হবে খুল্লনা? যদি চান্দ বেনে, শঙ্খ দন্ত, নীলাশ্বর দাস, রাম রায় না আসে আমার গৃহে? অর্ঘ্য না গ্রহণ করে কুটুম্বজ্ঞাতি? সনাতন চন্দ, শ্রীধর হাজরা, বিষ্ণু কুণ্ড, অরবিন্দ দাস, রঘু দত্ত, গোপাল দত্ত, রাম দাঁ, যশমন্ত খাঁ, বাসুলা আর গোতানের ছয় ভাই ধুম দত্ত-যাদব-মাধব-হরি-শ্রীধর-বলাই না নেয় দান, আমি কী করব? যদি না গ্রহণ করে নিমন্ত্রণ, আমি বান্যাকুলে থাকব কেমন করে? পিতৃশ্রাদ্ধের কথা মনে নেই তোর? নীলাশ্বর দাস বলেছিল দশমী-দিবসে আমিষ-অন্ন ভোজন করবে না সে। যখন বলা হল রন্ধনকার্য করবে ব্রাহ্মণে তখন শোনায়ে,

গয়া-গঙ্গা-জগন্নাথ দর্শন হয়েছে তাই ভিন্ন গোত্রে অন্নগ্রহণে অপারগ। যে-ব্যাটার বাহান্ন পুরুষ লোন বেচেছে এ তার বায়না! শেষে মল-মনের বক্র কথাটি প্রকাশ করে—‘শুকনো জলাশয়ে মৎস্য, তেপান্তরে রজত-কাঞ্চন আর কাননে একাকী বুলে-বেড়ানো বামা মিললে মুনিজনাও কি ছাড়ে? নাকি হে সব বান্যার নন্দন। তাহলে ধনপতির ছেলি রাখালি পত্নীর কী বিধান হবে? দেবকুলের বধু সীতা রাবণের অশোককাননে অবস্থানহেতু অগ্নিপরীক্ষা দেয় আর মানবকুলের বাইন্যানি ছাড় পায় কেমন করে? আগে এটির সুব্যবস্থা হোক তারপরে অন্নগ্রহণ’। কী হবে খুল্লনা, জ্ঞাতি যদি রাজঠায়ে গিয়ে উচিত বিচারের কথা তোলে? রাজা যদি বলে বামপথি ও-বামার পরীক্ষা নাও। কতবার তুই সরোবর জলে ডুবে পাল্লা দিবি পথিকের শ্বাসবলের সঙ্গে? কতবার কলসের বিষধরের মুখ থেকে নিয়ে আসবি কনক-অঙ্গুরি? কতবার উত্তপ্ত ঘূতে হাত ডুবিয়ে তুলে আনবি কাঞ্চন? কতবার পাণিপুটে ধরবি অগ্নিশলাকা? কতবার তুলাযন্ত্রে দোষ পরীক্ষা দিবি? কতবার ঢুকবি জৌ-ঘরে?

খুল্লনা বলে, আমাকে এ-জিজ্ঞাসা কেন নাথ? আমি তো আপন ইচ্ছেয় বনে ছেলি-রাখালি করিনি। ও ছিল সতার আধা-কপট প্রবন্ধবচন, আধা আমার কপাললিখন। ওই পাণি-ফণী-ঘূত-শলাকা-তুলা পরীক্ষা কি আমার স্বেচ্ছা নিবেদন, নাথ? জৌ-ঘর কী কারো ব্রহ্মানন্দধাম? সে প্রবেশ তো আধা বণিকবিধান আধা এ-বামার বিধি। বিধি আর বিধান কোনোটাই না তোমার হাতে, না আমার।

সাধু রোষে বলে, তুই কর্মদুষ্টা তাই তোর এত বিড়ম্বনা।

লোহিতবসনা হাসে। বলে, দুষ্টা আমি জানি কিন্তু কর্ম কি আমার, সাধু? কর্মকারী পিতা লক্ষপতি, ঘটক দনাই পণ্ডিত, জ্ঞাতিগুপ্তি আর স্বামী-ভর্তা-অধিকারী-অধিপতি তুমি হে নাথ। আমি কর্মসাক্ষীও নই, সাধু। তারা হল সূর্য, চন্দ্র, যম, কাল ও পঞ্চ মহাভূত। আমার স্বেচ্ছা কোনো কর্ম নেই তবু আমি কর্মচণ্ডালিনী, কর্মদোষী, কর্মনাশা। সাধুসখা দনাই পণ্ডিত বলেছিল যত গন্ধবান্যা আছে তার ভেতর রূপে, গুণে, শীলে, কুলে তোমার কন্যার যোগ্যপাত্র, ওহে লক্ষপতি, উজানি নগরের সপ্তডিঙা সাধু। ঘটকের মুখে বরের কীর্তি শুনে সম্বন্ধে সায় দিয়েছিল পিতা। পাপ প্রবাহিণী কর্মনাশা যে জাহ্নবীতে মেশে সে কী তার দায়? অদৃষ্টের চালক নই আমি, দৃষ্টেরও নিয়ন্তা নই তবু কেন এত কর্মদোষ? যে-কর্মে আমার একমাত্র অধিকার সেই পাককর্ম তো আমি নিষ্পৃহ সম্পন্ন করেছি, নাথ। বিষধর, জৌ-ঘর প্রমুখ পঞ্চপরীক্ষা সেরে যে-ওদন যে-ব্যঞ্জন দিয়েছি জ্ঞাতি-বন্ধুজনে তাতে না ছিল গরল না অনল। ভেজেছি ঘূতে নালিতা শাক, পাক করেছি

ফুলবড়ি দিয়ে পাতলা সূপ, দুধ-অলাবু। কোনো পদে লবণ পড়েনি বাড়তি  
 একরতি। কটু তৈলে ভেজেছি দশ পণ কই আর তাতে দিয়েছি আদারস। একটুও  
 রোষ ছিল না রসে। চিতলের কোল ভেজেছি অত পণ কিন্তু পোড়েনি একটিও।  
 রোহিত মৎস্যের ঝোল রেঁধেছি কুমুড়া আর বড়ি দিয়ে, গাছমরিচের উগ্রচণ্ডা রাগ  
 মেশেনি তাতে। সূপের সঙ্গে ভোজনের জন্য পাক করেছি বদরী, শকুল আর  
 শফরী। সঙ্গে দিয়েছি দধি, ক্ষীর, মধু, ঘৃত, মরিচ ও কর্পূরবাসিত রসাল। এর  
 একটির ভাগ বেশি হলে রসনার বাসনা অপূর্ণ থেকে যায়। তেমন হয়নি সাধু।  
 রন্ধনের পাকে ধন্য ধন্য করেছিল বান্যাকুল। ভেজেছি বেশ ক-ধামা কুমুড়ার  
 ফালি আর চিংড়ার বড়া। এরপর ছিল দধি, পিঠা আর মধুর পায়স। মধুমুখে  
 খেয়েছিল ব্যান্যাসমাজ।

কপাটের আড়ে দাঁড়িয়ে শোনে লহনা। সাধু বলে পাপকর্মে কর্মদোষ আর  
 খুল্লনা শোনায় পাককর্মে জ্ঞাতিতোষ। বড়ো দুষ্টা, বড়ো শঠ, বড়ো টেঁটা এই মাগি।  
 গা জ্বলে লহনার। গাত্রদাহে ঢুকে পড়ে ভিতরে। খুল্লনাকে বলে, কর্মের কি শেষ  
 আছে ভগিনী! শূরসেনের কুমারী কন্যা কুস্তী জন্ম দিল কর্ণে। তারপর বড়োপুত্র  
 যুধিষ্ঠির ধর্মের ঔরসে, মেজোপুত্র ভীম বায়ু বীর্যে, ছোটোপুত্র অর্জুন ইন্দ্র শুক্রে।  
 মাদীর দু-টি সন্তানের জনক হল অশ্বিনীকুমার। বৃহস্পতির পত্নী তারার গর্ভে জন্ম  
 নিল নিশাপতির পুত্র বুধ। দ্রৌপদীর হল পঞ্চপতি। বহিনি আমার, নারীকর্মেরও  
 অন্ত নাই। কর্মযোগিনী দিবারাত্র ঘৃতাছতি দেয় কর্মযজ্ঞে। তুই শাবক তাই শুনিসনি  
 খানকিবৃত্তান্ত।

খুল্লনা বলে, কুমারী কুস্তীর অতিথিসংকারে সন্তুষ্ট মুনি দিল পাঁচ মন্ত্র। প্রতি  
 মন্ত্রে আবির্ভূত হবে এক দেব। কিংকরের মতো পূরণ করবে কুস্তীর বাসনা।  
 কৌতূহলী কুমারী কন্যা ডাক দিল দিবাকরে। এল দেব। কুস্তীর পরীক্ষা সফল।  
 বলে ফিরে যেতে ব্যোমে। কিন্তু কে কার অধীন, কে কার বশবতী! দিবাকরের  
 কামনা কুস্তীর কৌমার্য। শত আবেদন-নিবেদন করে শূরকন্যা কিন্তু দিবাকর তখন  
 কামজ্বরে অগ্নিপিশু। বলে ভস্ম করবে কুমারীকে। নিরুপায় কুস্তীগর্ভে জন্ম হয়  
 সূর্যপুত্র কর্ণের। শুনো গো লহনা দিদি, ভস্মভয়ে রতিসুখ, এমন কথা আগে  
 শুনিনি। আর দু-টি যে সন্তান তাও পাণ্ডুর ইচ্ছাবলে। একদিকে ঋষি-অভিশাপে  
 অবাঞ্চিত কামরসে মৃত্যুভয়, অন্যদিকে নিঃসন্তানের স্বর্গপথে বাধা তাই পাণ্ডুর  
 ক্ষেত্রজ পুত্রকামনা। প্রতি বৎসরে একটি সন্তান চেয়েছিল পতি, কুস্তীর বাধায়  
 থেমেছিল তিনি। আর মাদীর যে সন্তানপ্রাপ্তি অশ্বিনীকুমারের ঔরসে তাও পাণ্ডুর  
 অভিলাষে। কুস্তী-মাদীর কথা ছেড়ে দুই অশ্বিনীকুমারের কথা বলো দিদি। স্বামী  
 নপুংসক তাই বদ্রিমতীকে দিল হিরণ্যহস্ত নামে পুত্র আর প্রসববেদনা থেকে মুক্তি।

বক্ষ্যা গাভীকে করেছিল দুগ্ধবতী। সত্যযুগে বক্ষ্যা গাভী দুগ্ধবতী হয় আর কলিতে বান্যা ঘরের বক্ষ্যা বালা কুচগিরিতে গরল জমায়। এও দন্ধ চক্ষ্ণে দেখতে হল গো প্রাণের বহিনি। এবার শোনো তারার বৃত্তান্ত।

লহনা ধনপতিকে বলে, ওগো সাধু, লোহিত বস্ত্র আর ওড়পুস্পে তোমার মোহিনী বালা যে বজ্রতারা হয়ে ওঠে। ওরে থামাও।

খুল্লনা বলে, বৃহস্পতিপত্নী তারা নিশাপতির সঙ্গে নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে দেবগুরু যে মমতাতে মজেছিল, সে-কথা শোনোনি বহিনি? আর দ্রৌপদীর পঞ্চপতি? সে কি তার স্বেচ্ছা নির্ধারণ, সে কি তার আনন্দন?

লহনা গণ্ডে হাত রেখে বলে, তুই কত পুরাণ কত শাস্ত্র জানিস সতা! শরীরটিতে বাঁধুনি আছে তাই ঘাটে তরী বেঁধে সাধু শোনে তোর বায়ুরোগ বাক। তেমন দড়ো পতি হলে বসিয়ে দিয়ে আসত ইছানি নগরে পিতৃগৃহে। কে পুষবে বায়ুকোপের রুগি সংসারে?

ধনপতি বলে, ঝারি-ঝারি ফেলে সংসারে গৃহমতে থাকো। ওই শ্মশানবাসিনী কালী, শ্রীফলশাখাবাসিনী চামুণ্ডাকে ছাড়ো।

লহনা বলে, মন ছাড়তে না চাইলে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলার সঙ্গে তুইও শ্মশানবাসী হ। গেহে চিতাকাষ্ঠ সাজাবে, তা কী করে হয় বহিনি। শিবভক্ত সাধু সহিবে কেমন করে?

খুল্লনা বলে, নিত্যদিনের এই চণ্ডীপূজা তো গেহ-গারির জন্যই। রোগমুক্তির কামনায় দশমহাবিদ্যার ব্রত। জুরজারি, সর্দি, কাশ, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অম্লরোগ, অতিসার সব সারে দেবীর ইচ্ছায়। বসন্ত, ওলাউঠা, প্রমেহ, প্রদর, অধিক রক্তস্রাব সব গৃহ থেকে দূরে থাকে দেবীর আশ্বাসে। দেবী তুষ্ট হলে শ্বাসরোগ, শিররোগ, নাসারোগ, চর্মরোগ, চক্ষুরোগ কিছু নেই। আদ্যা, সনাতনী, শঙ্খিনী, শূলিনী, কপালমালিনী অভয় দিলে শোক নেই সংসারে। মানুষজন হয় শতায়ু, গাভী-ছাগ দীর্ঘায়ু, কুলখানি চিরায়ু। ভদ্রকালী, শিবা, দুর্গা, ক্ষমা, চণ্ডীভীমা, ভৈরবী গৃহে অবস্থান করলে দুষ্ট-খণ্ডের সাধ্য নেই সন্নিকটে আসে। ওগো সাধু, তুমি জলযাত্রী তাই ভয়ের বাস বুকের ভেতরে। তুমি লবণ-পানিতে চলো তাই নলদলের মতো কাঁপি তিরতির। তুমি পরবাসে যাও তাই ত্রাসে ভুগি আমি। আমি অবলা বালা, না পারি সঙ্গ দিতে, না পারি সঙ্গে যেতে। তাই চণ্ডী-আরাধনা। শ্রীরাম চণ্ডীবোধনে ফিরে পেল সীতা। তুমি চলো লঙ্কারাজ্যে। ফিরে এস বিনা ক্রেশে সপ্ততরী ভরে। আমি বস্ত্র খুঁটে গেরো বেঁধে সাতবার স্মরণ করব তারা মন্ত্র, তুমি দেখো পরবাসে কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। আমি একশত আটটি রক্তপদ্ম ‘তারা’ নামে আছতি দেব অগ্নিতে, কোনো নারী তোমাকে বিপথে নিয়ে যেতে

পারবে না। আমি কাউয়া-পালকের ওপর বত্রিশ বার ওই মস্ত্র পড়ে ফুঁয়ে উড়িয়ে দেব বায়ুতে। তুমি দেখো ঝড় ও ঝাপটায় সমস্ত শত্রুর গৃহ একে একে শুয়ে পড়বে ভুঁয়ে।

রোষে বলে ধনপতি, ওরে কুলের কালি খুল্লনা, আমার পণ ছিল ঘরে মায়া দেবতার আসন হবে না। তুই সেই পণ ভঙ্গ করালি। ওই চণ্ডীদেবী শত্রু-ঘর ভুঁয়ে শোয়াক পরে, তার আগে আমি ঘটের বিড়াটি ছুঁয়ে ফেলি। দেখি এবার তোর দেবী কোথায় পাছা ঠেকিয়ে বসে।

সদাগরের পদাঘাতে ছিটকে যায় খড়ের বিড়া আর গড়াগড়ি খায় মঙ্গলঘট।

## ৯ সদাগরের প্রতি চণ্ডীর ক্রোধ

দেবী চণ্ডী আবির্ভূত হয় গগনে। লোচন দুটি যেমন লোহিত তেমন উতলা। সেখানে ক্রোধ ও কোপের হ্লাহলি। দেবীর যে নয়ন দু-টিতে শতদলের লালিত্য বিরাজ করত সেখানে এখন মৃণালকণ্টকের কাঠিন্য ও ত্রুরতা। দেবীর যে তৃতীয় নেত্রে অবস্থান করত বরাভয় সেখানে এখন প্রলয়পর্ব। করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, সুবর্ণা আর পদ্মরাগা সপ্ত অগ্নিজিহ্বায় শুষে নেয় সব জলকণা। অমন যে নধর জলধর তা শুষ্ক, নির্জলা। দেবীর যে আঁখি-পল্লবগুলিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল প্রতোষ সেখানে এখন প্রদোষ, যেখানে ছিল অনুরাগ সেখানে এখন বিরাগ। দেবীর ললাটে ভ্রু দু-খানি যেন জোড়া কার্মুক কিন্তু আজ তুঙ্গ রোষে ছিলাহীন। মনে হয় কালভৈরব কাপালিকের অপেক্ষায় কপালতটে জোড়া চিতাকাষ্ঠ। বায়ুচর পক্ষীদল সেদিকে তাকিয়ে আতঙ্কে নেমে চলে ভুঁয়ে। শুধু এক ঝাঁক গিধিনি পাক দেয় মধ্যগগনে নতুন মাসের সন্ধানে। দেবীর শির থেকে খসে পড়ে বাস। লোহিত বস্ত্রখানি পতপত ওড়ে বেগড় বাতাসে। মর্তবাসী বলে, বহুবীর সিন্দূররাঙা জলদ দেখেছি আকাশে কিন্তু ও বর্ণটি ভিন্ন। যেন ছাগরক্ত। ছমছম করে দেহ। ভয় জাগে এই বুঝি অগ্নিবৃষ্টি শুরু হয়। যেমন হয়েছিল সাত বংশ আগে। দক্ষিণের বন জ্বলে উঠেছিল দাউ দাউ আর পশ্চিমের জলাশয় বায়ু হয়ে চড়েছিল গগনে। চণ্ডীর কুন্তল হয় আকুল। আজানুলম্বিত কেশ ফণী রোষে গর্জায়, ফুলে ওঠে; ভ্রমর-কালী এলোকেশ মুখ ঢাকে দিবাকরের। আঁধার নামে জগৎ জুড়ে। জীবজগৎ ত্রাসিত, তবে কি শুরু হল আর এক প্রলয় পর্ব? নিশাপতি দেখা দেয় গগন মণ্ডলে। নয়ন মেলে দেখে উদ্বিগ্নে। এ জীব ও বস্তুর নিত্য বিনাশ নয়। আত্যন্তিক প্রলয়ও নয় যেখানে যোগারূঢ় ঋষি লীন হয় পরমাত্মায়। তবে কি

সহস্র চতুর্থাংগের শেষে ত্রিলোকবিনাশী আর এক নৈমিত্তিক খণ্ড প্রলয়? নিশাপতি  
বিস্ময়াকুল আঁধারের কুপিত চলনমুদ্রা দেখে। জোয়ারবারির মতো ফাঁপে, ফোলে,  
ফোঁসে, ভেঙে পড়ে তটে। সে-গর্জনে মনে হয় এ বুঝি প্রাকৃতপ্রলয়। কালানলে  
সৃষ্টি লীন হয়ে যাবে প্রকৃতিতে। ধ্বংস হবে এই মায়াজগৎ। নলবনের একটি  
শ্রীকালি একখানি শ্বেত হংস মৃগয়া করে যাত্রা করে স্ববাস উদ্দেশে। মহাপ্রলয়  
অন্তে আবার কবে নব জগৎ সৃষ্টি হবে তার স্থিরতা নেই, তাই উদর পূর্ণ রাখা  
বিধেয়।

দেবীকণ্ঠে দুলে ওঠে দানব করোট মালা। মনে হয় শত গিরিশৃঙ্গ সহযাত্রায়  
চলে সমতলে। বায়ু বয় করোটের রক্ত পথে। ধ্বনি জাগে। যেন শত যোজনের  
বেউড়বন নানা স্বরে সুর ভাঁজে মত্ত গজদলের বিহার পথে। দেবী করালবদনা  
কুপিত, তাই অসিখানি শোণিতপিপাসু। বারে বারে শ্বাস ফেলে, পাক দেয়  
গগনতটে। খড়্গাঘাতে জলদমালা কন্দের মতো কাটা পড়ে, খণ্ড হয়। অস্ত্রের  
ভয়াল পাকধ্বনি কানে বাজে। যূপকাঠ নড়ে, নিদ্রা ভেঙে জাগে। কী ঘটন হবে  
আজ? ছাগ, মেঘ, মহিষ, নর নাকি অসুর? যাই হোক, কোপ হবে একখানি।  
দ্বিকোপে আত্মার দীর্ঘশ্বাস, সাধক তরফে দোষপ্রাপ্তি। মুণ্ডমালিনী রোষিত, খট্টাঙ্গটি  
তাই বিচলিত। পৃথিবীর আদিবৃক্ষ অর্জুনের খট্টাঙ্গখানি সুডৌল এবং সবল। দেবী  
হস্তে যেটি ভয়াপহ, দুষ্ট শিরে সেটিই ভয়াবহ। মনে হয় গগনস্পর্শী অর্জুন বৃক্ষখানি  
ভেঙে পড়ল দেহচূড়ায়। পায়টি ব্যাঘ্রপাদ। বাঘাঘ্রা যখন খট্টাঙ্গখানি দোলা দেন  
অশ্বরে তখন শাবক হারিয়ে বাঘিন যেন নিবিড় অরণ্যে ফুকরায়। খট্টাঙ্গ মুণ্ড  
খোঁজে কপটের, ত্রুরের, খলের, দুর্জনের, দুরাত্মার, পাপীর, পামরের। তাকায়  
ধরাতলে। এত কেশচর্চা কুন্তলচর্চা কিন্তু কচতলে অত ক্রন্দ কেন? কোন মুণ্ডে  
ভেঙে পড়বে খট্টাপদ, প্রতীক্ষা করে দেবী আদেশের। পিঙ্গল-কেশরিণী ক্রোধিত  
তাই দেবীর পাশখানি কুপিল। পশুর অস্ত্র, আকন্দের বক্ষল আর ত্রিশটি চর্ম-অংশক  
দিয়ে নির্মিত দশ হস্ত রজ্জুটি ফোঁসে। কালমুখী কালনাগিনির মতো পাশখানি  
কুণ্ডলাকৃতি ভেঙে উত্তুঙ্গ হয় বার বার। ভাবে কোন বেগে ধাবিত হবে—  
কালবৈশাখী, কালানল, কালসার নাকি কালনাগ? পাশখানি বিবেচনা করে কোন  
মুদ্রায় ভেসে যাবে বায়ু পথে—কাউয়া, কপি নাকি তুরগী। হিসেব করে কোন  
পন্থায় বন্ধন করবে পাপাচারী পাষণ্ডকে। দেবীবাহন শবদেহ কাঁপে। ভাবে মা চণ্ডী  
আজ কোন রোষে চামুণ্ডা মূর্তি ধরল। রক্ষা নাই আর। দেবীগাত্রের ঘোর কৃষ্ণবর্ণে  
ঢাকে চারপাশ। দিনপ্রদীপে লাগে গ্রহণ, রাত্রিবাতিতে অমাবস্যা। কানে জাগে শুধু  
শিবা ডাক। দেবীর মুখমণ্ডল হতে বুলে পড়ে রক্তজিহ্বা। ত্রিচক্ষু জ্বলে ধুনিকুণ্ডের  
মতো ধকধক। শ্বাসনা মা কোটি দন্ত পেষণ করে। বড়ো কর্ণমধুর নির্মাংসার এই

দস্তকচকচি। যেন হস্তী, ভল্লুক, শাদূল, বরাহ আদি ধরার সমস্ত দস্তাল দস্তাদস্তি রণে মত্ত। অটুহাস্যে মাতে শব। দেবীর দস্তধ্বনিতে ভীত পক্ষীকুল পাড়ি দেয় দূর দেশে। দিবা-অন্ধ উলুক ঢোকে বৃক্ষ কোটরে, গজ খোঁজে গহন কানন, মৃগ হাতড়ায় খাগড়ার বন, মার্জার তল্লাসে গৃহস্থের ছাঁচ, খরিশ চলে মরাইয়ের তল। শব দেখে মকর ডোবে সাগর জলে, মীন লোকায কমলবনে, মদগুর-কই খোঁদলে চলে, গৌড়ি-গুগলি জলতলে।

দেব-দেবীদের বাহনদল কেউ স্থলে হাঁটে, কেউ জলে ভাসে, কেউ বায়ুতে ওড়ে। যে-যার জায়গাটুকুতে গর্জায়, বর্ষায়, নৃত্য করে, গীত গায়। দুর্গাবাহন কেশরী জলে অচল, মহাদেবের বৃষ অধম বায়ুতে, বরুণের জলধি খঞ্জ ডাঙায়। ইন্দ্রের তাই দু-টি পৃথক ব্যবস্থা, বায়ুতে মেঘ আর ডাঙায় শ্বেতহস্তী। কিন্তু পুষ্করিণী-নদী-সাগরে কী হাল? ইন্দ্রদেব জলান্ধ। চামুণ্ডার একটি বাহন—শব—কিন্তু তার গতি সর্বত্র। গগনে ওড়ে, জলে ভাসে, ডাঙ্গায় নিদ্রা যায়। যোগে জেগে ওঠে। ছয় মুদ্রা ও দুই উপমুদ্রায় সাধনা। বামাচারে ধ্যান, যোনিরূপে নির্বাণ। কোন পাপাচারী দেবী বন্দনায় রোষে? আই ভোজন করি তোর মাস, সুরাপান করি তোর করোটে।

চণ্ডী বলে, ওরে পদ্মাবতী, আয় মা আয়। বান্যা বেটা ধনা লাভ মেরেছে আমার ঘটে। ওই দেখ নিন্দামন্দ বাক বলে ডিঙাঘাটে চলে। ওরে তোর মা যায় গড়াগড়ি আর তুই নাগকুণ্ডলীতে পাছা পেতে নিদ্রা যাস? ওঠ ওঠ। ডাক দে অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ আর কুলীরকে। ফুঁসে উঠুক অষ্টনাগ। সে-ফুঁয়ে উড়ে যাক আঁটকুড়া ধনা। ব্যাটা বলে স্ত্রী-লিঙ্গ দেবতা পূজে কুলে কালি দিয়েছে খুল্লনা। ওরে পুংলিঙ্গ পুরুষ তোর দুটো মাগ তবু একটা বৎস নাই কেন রে? দু-সতায় নিত্যদিন কোন্দল, তার আবার কুলমান! কুল নারে, ওটা তোর কুলো। ওরে পদ্মা তুই ডাক দিকি আইবুড়ি, বেউশ্যা আর নর্তনীদেব। ওই মাকুন্দ ধনার জন্যে পর্ণ-বস্ত্র পরার দরকার নেই। অপর্ণা দিগম্বরী হয়ে ছুটে আসুক। ধ্বজা উড়িয়ে ধেয়ে যাক ধ্বজভঙ্গ ধনা নিধনে। উড়কি খই ওড়াক বাতাসে, ওড়পুঙ্গ ছুঁড়ুক আকাশে। লাল ধুলোতে রাঙা করুক চারপাশ। নাচুক আর গাক। ক্রীড়া করুক, কৌতুক করুক, মঙ্গলাচরণ করুক আর ভঙ্গলিঙ্গ বাক বলুক ধনা বান্যাকে। ধনা বলেছে মানী কুলের কথা, কুলো পিটিয়ে ধনাকে ভাগাড়ে পাঠাক। সারা উজানি নগরকে জানাক সতীসাবিত্রী খুল্লনা যখন রোদ-বাড়-বাদলে ছেলি চরাচ্ছিল কাননে তখন ধনা ধনকর্মে মত্ত ছিল গৌড়ের বেউশ্যাপল্লিতে। লহনা-খুল্লনাকে বলুক ধনাকে জোড়া শ্রীফল আর জোড়া টাবা খাইয়েছে অনেক, এবার জুমড়ো-কাঠ ঢোকাক ওর মুখে। অপর্ণাগুলিকে বেছে

বেছে ডাকবি। ভব্য, ভদ্র আর শ্রীলরা যেন সেজেগুজে সং করতে না আসে। মোদক মুখের দরকার নাই আমার। মুখ ছোটাতে না পারলে আমি কিন্তু শাপে মূক করে ছেড়ে দেব। আর বলে দে, ধরায় যত আছে ইক্ষু সব বলি দিক একান্ন সতীপীঠে। সেই রসে তৈরি হোক ভাণ্ড ভাণ্ড সুরা। সুরা পান করে মর্তাসুর ধনপতিকে ধনে-মানে ধ্বংস করুক।

চণ্ডী বড়োই বিচলিত। পদ্মাকে বিলাপ করে বলে, আমার এ লাঞ্ছনার কথা শুনলে ইন্দ্রাণী, উষা, অদिति, বাক, রাত্রি, অরণ্যানীরা হাসাহাসি করবে রে। এমনিতে ইন্দের মাগগুলিতে চুলোচুলি কিন্তু ধনার লাথির কথা জানলে তখন দেখবি তিস্তিড়ী পাতায় বসে ছ-সুজনে চণ্ডীর কেচ্ছা গাইছে। বৃহস্পতি সংসারের জুহু, সরমা, শ্বেদারাও কি মুখটিপে হাসতে ছাড়বে? সূর্যের বউ সরণ্য আর যমের বোন যমী খবর পেলে ত্রিলোকের সব বউ-ঝিদের কানে ঢুকবে। ওরে পদ্মা, এমন কর্ম ধনা স্বাহাকে করলে এতক্ষণে জ্যান্ত দাহ করে ফেলত, ইন্দ্রাণীকে করলে বানে ভাসিয়ে দিত আর পবনানীকে করলে দমকা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যেত। তুই আর পঞ্চনাগের চন্দ্রাতপখানির নীচে বসে থাকিসনি। উঠে দাঁড়া। ডাক যত দানা আছে। বল ছুটে আসতে ভ্রমরার কূলে। তারপর যে-যার অস্ত্র নিয়ে হানা দিক সপ্তডিঙায়। যত নাইয়া গাবর আছে সব হত করুক। একটিও যেন ঘরে ফিরতে না পারে। নদী জলে ভাসিয়ে দিক সব দেহ। ভ্রমরা হোক রক্তবর্ণা। ত্রিলোক দেখুক স্ত্রীলোকেরও বল আছে। ধনপতি বুঝুক সব মেয়েই মাগ না যে পা দিয়ে ঠেলবে। ধনা জানুক ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী, মহেশ্বর শক্তি মাহেশ্বরী, কার্তিকেয় শক্তি কৌমারী, বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী, ইন্দ্রশক্তি ঐন্দ্রী আদি সব শক্তি চণ্ডীর স্তনপথে প্রবেশ করে মহাশক্তিতে বিলীন হয়েছে। ওরে, ধনবান ধনপতিকে বল এবার একটু বিদ্যাধর বিদ্যাপতি হতে। পুরাণ শাস্ত্র পাঠ করলে জানবে সকল বিদ্যা ধারণ করে আছে যে আধারটি সেটি হল দেবযোনি। সদাগর স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা পূজতে দেবে না খুল্লনাকে, এত বড়ো বীর্যধারক ও! ওরে পদ্মা ওকে বল, ওর পূজ্য দেবাদিদেব মহাদেব আমার ভয়ংকরী দশমহাবিদ্যা রূপ দেখে আতঙ্কে যন্ত্রে যাওয়ার সম্মতি দিয়েছিল। বলে দে, কালী রূপে আমার বর্ণ ছিল কজ্জলসদৃশ কৃষ্ণ, শির ছিল মুক্তকেশা আর বাম করে ছিল খরশান কৃপাণ। তারা রূপে বর্ণ ছিল শ্যাম, জিহ্বা ছিল লোল আর করে ছিল খড়্গাকাতরি। বগলা রূপে বর্ণ ছিল স্বর্ণা আর চার করে ছিল পাশ, মুদগর, অসুরের জিহ্বা আর বজ্র। ভুবনেশ্বরী রূপে বর্ণ ছিল ওড়পুষ্প ও দাড়িমের মতো লোহিত, শির ছিল জটাজূটমণ্ডিতা আর করে ছিল পাশ ও অক্ষুশ। ভৈরবী রূপে বর্ণ ছিল পলাশকুসুমের মতো রক্তিম, কণ্ঠে ছিল মুণ্ডমালা আর করে অক্ষমালা। ষোড়শী রূপে বর্ণ ছিল প্রভাতরবির মতো রক্তাভ, পরিধেয় বস্ত্র ছিল রাঙা আর

চার করে ছিল পাশ, অঙ্কুশ, শর ও ধনু। ছিন্নমস্তা রূপে বর্ণ ছিল কোটিসূর্যপ্রভাতুল্য, কেশপাশ ছিল বিকীর্ণ আর করে ছিল কাতরি। ধূমাবতী রূপে বর্ণ ছিল ধূম্রের মতো, চক্ষু ছিল অতি রুম্ম আর করে ছিল কুলা। মাতঙ্গী রূপে বর্ণ ছিল শ্যাম, পরিধেয় বস্ত্র ছিল রক্তপঙ্কজ, করে ছিল অসি, খেটক, পাশ ও অঙ্কুশ। ওরে পদ্মাবতী, ধনাকে জিজ্ঞেস কর আমার কোন রূপটি দেখবে, কোন অস্ত্রে ভবলীলা সাঙ্গের শখ ওর। তার আগে আমার চৌষটি যোগিনীদের ডাক। ধনের বড়ো তাপ হয়েছে ধনার। যোগিনীদের বল ছুটে যাক ভ্রমরার কূলে। উঠে পড়ুক সপ্তডিঙায়। গজাননা, সিংহগ্রীবা, কাকতুণ্ডিকা, হয়গ্রীবা, উষ্ট্রগ্রীবা আর বারাহী ছিঁড়ে দিক সপ্তডিঙার সব বাদাম। শরভাননা, উলুকিকা, শিবাবা, ময়ূরী, বিকটাননা, অষ্টবক্রা আর কোটরাক্ষী খুলে ফেলুক সপ্তডিঙার কর্ণ। কুজা, বিকটলোচনা, শুক্লোদরী, লোলজিহ্বা, শ্বদংষ্ট্রা, বানরাননা আর ঋষাক্ষী ভেঙে দিক সব কেরয়াল। কেকরাক্ষী, বৃহত্তুণ্ডা, সুরাপ্রিয়া, কপালহস্তা, রক্তাক্ষী, শুকী আর শ্যেনী গগনে উড়িয়ে দিক ধনার যত কবুতর। কপোতিকা, পাশহস্তা, দণ্ডহস্তা, প্রচণ্ডা, চণ্ডবিক্রমা, শিশুয়ী আর পাপহস্তী মুক্ত করুক ডিঙার যত কপি। তারা নগরে ফিরে ধনার সব কদলী উদরে পুরুক। কালী, রুধিরপায়িনী, বসোধয়া, গর্ভভক্ষা, শবহস্তাস্ত্রমালিনী, শূলকেশিনী আর বৃহৎকৃষ্ণি গ্রাস করুক সদাগরের সব মৃগ। সর্বাঙ্গা, প্রেতবাহনা, দন্দশূকরা, ক্রৌঞ্চী, মৃগশীর্ষা, ব্যাননা আর ব্যাভ্রাসা ডিঙার সব রাজাশাল-হাতিশাল-কাজলশাল তণ্ডুল নিক্ষেপ করুক পানিতে। ধমনিঃশ্বাসা, ব্যোমৈকচরণোধ্বধ্বক, তাপিনী, শোষণীদৃষ্টি আর কোটরী সব তৈল আর ঘৃত নিক্ষেপ করুক অনলে। স্থলনাসিকা, বিদ্যুৎপ্রভা, বলাকাস্যা, মার্জারী আর কটপূতনা ছড়িয়ে দিক সব খুড়িয়া শাক, মাড়ুয়াকলাই আর অল্প-মধুর ফল। ওরে পদ্মা, ডাক দে অটুহাসা, কামাক্ষী, মৃগাক্ষী, মৃগলোচনাকে। বল, ডিঙাতলে যোগ করুক। সাধুর সাত পণতরী ডুবে যাক নদীজলে। ত্রিভুবন দেখুক অবলা নয় নারী, দুর্বলা নয় স্ত্রী-লিঙ্গ দেবতা চণ্ডী।

চণ্ডী বলে, মা পদ্মাবতী, ত্বরা ডাক দে সর্পবদনা ডাকিনীকে। তার বিষম্বাসে ভরে উঠুক চারপাশ, অগ্নিপ্রভায় মুদিত হোক সব দৃষ্টি। ডাকিনী তার কর্তৃত্বায় ছেদন করুক ধনার দুই পদ যা দিয়ে সে আঘাত করেছিল চণ্ডীবারি। পদহীন ধনা গড়াগড়ি খাক ভ্রমরার ঘাটে। লোহিত হোক নদীপানি। ওরে পদ্মা, ডাক দে উলুকমুখী ডাকিনীকে। তার নীলগরলবর্ণে ঢেকে যাক চারপাশ। খেটক ও খড়্গধারিণী ছেদন করুক ধনার দুই কর যা কর্ষণ করেছিল খুল্লনার কেশ। রোহিত হোক ভ্রমরার মীন। ডাক দে উচ্চললাটিনী, পাশ ও অঙ্কুশধারিণী ডাকিনীকে। তার পারুলপুষ্প বর্ণে রাঙা হোক গগন আর অঙ্কুশে বিদ্ধ হোক বান্যার পুং-লিঙ্গ যার

দেমাকে স্ত্রী-লিঙ্গ দেবতায় তার এত রোষ। কুঙ্কুমবর্ণা হোক বাহিত স্রোত। ডাক দে, মার্জারীবদনা শাকিনীকে। তার কাজল বর্ণে অমাবস্যা নামুক নদীতীরে। বজ্র ও দণ্ডধারিণী শাকিনী ছেদন করুক সদাগরের দেহকাণ্ড। লাল হোক নদীগর্ভের যত কমল। ত্বরা আসুক ভল্লুকমুখী হাকিনী। তার মেঘনীর বর্ণে ঢেকে যাক দিকদিগন্ত। খেটক শোভিতার শূলশীর্ষে অবস্থান করুক ধনপতির শির। ওরে ধনার মুণ্ডধারিণী হাকিনীকে ঘিরে নৃত্য করুক পীন ও উত্তুঙ্গ কুচাঘ্রিতা সুরসুন্দরী, বিশ্বফলাধরা মনোহরা, রক্তাস্বরধারিণী কনকাবতী, চন্দ্রাননা কামেশ্বরী, গৌরাস্ত্রী রতিসুন্দরী, শ্যামবর্ণা পদ্মিনী, রমণীয়া নটিনী আর স্ফটিকবর্ণা মধুমতী। আমি পান করব ধনার রুধির। খানিক প্রতীক্ষা কর। আমি বর্জন করি অঙ্গবাস, ধারণ করি মুণ্ডমালা ও যজ্ঞের নাগোপবীত, মুক্ত করি কেশ, গ্রহণ করি কাতরি আর আরুহ হই শবে।

তিষ্ঠ ক্ষণকাল। দেহবর্ণ পীত হোক, উজ্জ্বলতা পাক শ্বেদ-কণায়।

## ১০ চণ্ডীর প্রতি পদ্মার উপদেশ

দেবী-আহ্বানে পদ্মাবতী আবির্ভূত হল ব্যোমে। প্রথমে প্রকাশ পেল দেবীর সর্পরাজ মুকুটখানি। তার যেমন স্বর্ণমৃগ গাত্রবর্ণ, তেমন অগ্নিশিখা জিহ্বা। কণ্ঠস্বর ঘন, যেন জোয়ার এসেছে জলধিতে। ফণীর মাথার ওপর একখানি মণি। তার শোভার অন্ত নেই। মা মনসার মুকুটখানি দোলে আর মণির আলোকদণ্ড নৃত্য করে সারা গগন জুড়ে। মুকুটের নীচে মায়ে়র শশধর বদনখানি। ত্র্যম্বকা ত্রয়ী যেন কাকচক্ষু সরোবরের তিন নীলপদ্ম। কমল বনে পদ্মপত্রে যখন জন্ম হল দেবীর তখন তিনখানি মৃগাল হল দেবীর ব্রিনয়ন। পদ্ম টাটি খাবে বলে রাখলো তুলে ফেলল একখানি পদ্মাক্ষ। মা নিদ্রা গেল এক চক্ষু। চতুর্ভুজা দেবীর ভুজগুলি অরুণ বর্ণের। উদয় ও অস্তকালে আকাশমণির যে দীপ্তি তা দেবীর দেহে। দেবীর আবির্ভাবের আগে সেই বর্ণ ছড়িয়ে পড়ে ব্যোমে, যেমন সূর্যোদয়ের প্রাক্পর্বে আলোকিত হয় পূর্বাকাশ। দেবীর বাম পাশে তার বাহন কুকুট সর্প। বর্ণ ঘোর হরিদ্রাভ। গরলের মনোহরী বর্ণখানি যেন মেখে নিয়েছে গায়ে। দেবীর এক হস্ত বরদা, অন্য তিন হস্তে অঙ্কুশ, দীর্ঘ পাশ ও দিব্যফল। অঙ্কুশ দণ্ডের অগ্রখানি তীক্ষ্ণ ও ধারালো, অরুণ কিরণে ঝলমল। অজ থেকে গজ সব ওই রাশভারি অঙ্কুশের ভয়ে থরথর। সুদীর্ঘ পাশখানি ছুটন্ত মৃগ থেকে ভাসমান জলধি সব বদ্ধ করতে পারে। দেবী হস্তে আর শোভে সুতপ ও মসৃণ মাতৃরূপ দিব্যফল। খেয়ানারী গৌরীকে দেখে ভোলানাথ কোল দিল শ্রীফল বৃক্ষে আর সেই মহারসে জন্ম হল

মনসার। ভুজঙ্গম জননীর চঞ্চল সন্তানগুলি সারাদিন ঘুরে বেড়ায় আদাড়ে-বাদাড়ে বনে-জঙ্গলে, তাই দুঃখ লাগে নিত্যদিন। মায়ের বক্ষেও তাই নধর দুই দিব্যফল। দুঃখে গরল নাশ। সমুদ্রমহুনে জাত বিষ কণ্ঠে ধারণ করেছিল দেবাদিদেব আর তার কন্যা নিত্যা নিত্যদিন দান করে দুঃখ আর গ্রহণ করে গরল। শুধু নাগ-নাগিনির নয়, বিষনাশিনী ধারণ করে স্বর্গ-মর্ত-পাতালের সব দ্বেষ, সব ক্রোধ, সব হতানল।

পদ্মাবতী বলে, ওগো মহাশক্তি, মহাদেব শক্তিতে তোমার বদন, যম শক্তিতে কুন্তলপাশ, বিষু শক্তিতে ভুজঙ্গ, শশী শক্তিতে কুচযুগল, ইন্দ্র শক্তিতে কটিদেশ, বরুণ শক্তিতে উরু, ক্ষিতি শক্তিতে নিতম্ব, ব্রহ্মা শক্তিতে দুই চরণ, বসু শক্তিতে করাসুলি, কুবের শক্তিতে নাসিকা, প্রজাপতি শক্তিতে দন্ত, সন্ধ্যা শক্তিতে দুই ভ্রূতা এবং পবন শক্তিতে তোমার জোড়া শ্রবণ। তুমি যাচনা করলে নির্জলা হবে ভ্রমরা নদী, জ্বলে উঠবে উজানি কানন, ধ্বংস হবে ধনপতি। তাতে তোমার কার্যসিদ্ধি হবে মা নারায়ণী? ধরাধামে তোমার পূজার চল হবে? চম্পানগরীর চাঁদ সদাগর বলেছিল পাঁচ কুলীনের এক কুলীন সে, তাই চ্যাংমুড়ি কানির পূজা করবে না। শুনিয়েছিল তার ধামে পদ্মার প্রসাদ মিলবে না। সুবুদ্ধি দিয়েছিল ব্যাংচ্যাং ধরে খেতে। আমি কিন্তু তার কেশাগ্রও স্পর্শ করিনি। ত্রিভুবন আমাকে বলে চাঁদবদনি, চাঁদ সদাগর চ্যাং মাছের মুড়ি বলল তো বয়েই গেল। ওর নাম চান্দ বলে নিজেকে চান্দসুন্দর ভাবে। ওর মুড়োটা কেমন দেখেছে কখনো? ওর বাপ কোটিশ্বর বান্যার ধন দেখে সনকার বাবা মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল ওই বোদালমুখো, গুঁতোমুখো, ভেল কড়া মুখোটার সঙ্গে। বহুবাব ইচ্ছে জেগেছে একখান হাত দশেক ছানাকে পাঠিয়ে দিই চম্পানগরীতে। একটু চুমা দিয়ে আসুক চাঁদকে। তারপর কঙ্কধামে গিয়ে চিত্তগুপ্তের সঙ্গে সাধুকর্ম করুক। অগুরু, চন্দন, গালা, নারিকল, গুয়ার বদলে তার খরসান, উদয়তারা, টিয়াঠুটি, আগলা-পাগলা, হংসগলা আদি চৌদ্দ ডিঙায় বয়ে নিয়ে যাক নিত্যদিনের যত মড়া। কিন্তু আমি মারিনি চাঁদকে।

নারায়ণী রোষে বলে, তাকে তো পদাঘাত করেনি। আমার বারিতে যে ধনা লাথি মেরেছে রে পদ্মা। তারপরেও হেঁটে-চলে বেড়ায়। তুই তোর পাশে বেঁধে ফেল বান্যাকে। আমি ওর ঢেঙা পা দু-খানি কেটে ফেলি। তারপর পা-কাটা ধনা ভ্রমরার শ্মশান রুহে মরা জোছনায় স্কন্ধকাটা মামদোর সঙ্গে ঝোলাঝুলি করুক। নগরবাসীরা দেখুক চণ্ডী সনে বিবাদের কী ফল।

হাসে পদ্মাবতী। বলে, কার দায় পড়েছে নিশিকালে প্রেতনৃত্য দেখতে যেতে শ্মশানঘাটে? মানুষজন তখন ঘুমবে। কাকপক্ষীরও দেখা মিলবে না। বড়ো জোর উলুক পাখিটি বটের ডালে বসে দৃশ্যটি ডাবা ডাবা চোখে দেখবে। শিরহীন মামদো আর পদহীন ধনার নিম্ববক্ষে ঝোলাঝুলি দেখে মহানন্দ হবে তার।

: তোয়াল হয়ে ডেকেও উঠবে বার কয়েক। কী লাভ তাতে? গৃহস্থের কানে ঢুকলে চোঁচাবে ‘নে আন তো আঁশ বাঁটিটা, নাকটা কাটি।’ সকালে উঠে রাতের কথা ভুলে যাবে। উলুক যে বলবে পাঁচজনাকে তারও উপায় নেই। সূর্য ওঠার আগেই সে ঘুম্নে যায়। আর মামদোর কথা যদি ধর নারায়ণী, সে তো ধনাকে দেখতেই পাচ্ছে না। পদকাটা ধনা দেখছে স্কন্ধকাটা মামদোকে কিন্তু শিরহীন মামদো কেমন করে দেখবে পদহীন ধনাকে? তা হলে বল মা লাভ হল কার। ধনপতি দোল খাবে মহানন্দে। আর পায়ে কী এসে যায় মা? আমার একটি বাহনেরও পা নেই। তবু তারা বিরাজ করে সর্বত্র। অলাবুমাচায় লাউডগা, সারডোবায় মেটেলি, পদ্মবনে গোখুরা, জলে টোঁড়া, রান্নাচালে উদয়লা, বেনাবনে শাঁখামুঠি, দৈবসারবৃক্ষে ময়াল, গোশালায় দাঁড়াশ, ফাটা কাঁতে চিতি, সিঁজবৃক্ষে বোড়া, কালিয়দহে কালিয়, ফল মধ্যে তক্ষক, পাতালে বাসুকি, নলের কোলে কর্কোটক। পদহীন ধনপতি বলে বেড়াবে সর্বত্র, ডাকিনি দেবতার ঘটে লাথি মেরেছি বলে পা দু-টি কেটে দিয়েছে। পা কেটেছে কিন্তু হাত ওঠেনি কপালে। একেই বলে বীর্যবান পুরুষ। স্বর্গে নিন্দা হবে তোমার আর মর্তে বীরগাথা রচনা হবে ধনপতির নামে। কিছুকাল পরে দেখবে ধনাও এক দেবতা। কত নতুন দেবদেবী এল আর কত গেল ভেবে একবার দেখো। পর পর তিন বছর বান হলে বর্ষাকালের দেবীটি ভেসে গিয়ে শীতকালের দেবীটি মাথা চাড়া দেয়। আসল বোধনটি বসে গিয়ে অকালটি বড়ো হয়। এ বার ভেবে বলো মা নারায়ণী ধনার জন্যে কী বিধান ধার্য করলে।

নারায়ণী বিলাপ করে বলে, বিধি বাম হলে কী আর বিধান দেব মা? ত্রিলোকে যে আদ্যা সনাতনী শাস্ত্রবী ব্রাহ্মণীর পূজা হয় তার বারি ভূতলে যায় গড়াগড়ি। যে শঙ্খিনী শূলিনী কপালমালিনীর ধ্যান করে সর্বলোক, তার কপালে পদাঘাত জোটে বান্যঘরে। যে ধাত্রী শাকম্বরী গৌরী দিগম্বরী জয়ন্তী কালী মঙ্গলা ভদ্রকালীর চরণে আশ্রয় নেয় সর্বজনা, সে এখন নিরাশ্রয়, বিচরণ করে ব্যোমে। যে শিবা দুর্গা ক্ষমা চণ্ডী চণ্ডীমা ভৈরবী ভারতী বাণী বসুমতী তারণ করে সংসারের দুঃখ, সে এখন নিজেই দুঃখী। যে কৌশকী কুমারী হরণ করে শোক তাপ, সে এখন নিজেই তাপিত। যে উগ্রচণ্ডা বাশুলি চামুণ্ডা শ্রীফল বৃক্ষশাখে মহানন্দে বাস করত, সে এখন নিরালস্য ভাসে। যে মহাকালিকা ভীমার সীমা মাপতে পারত না ব্রহ্ম পুরন্দর হরি দিবাকর, সে এখন ধনপতির রোষে সীমানার ওপারে। যে যাদব-সেবিতা নন্দগোপসুতা শুভ্র-নিশুভ্রনাশিনী যশোদানন্দিনী মহিষমর্দিনী শঙ্করী সিংহবাহিনীকে শয্যাগ্রহণ ও শয্যাভ্যাগে স্মরণ করত পুণ্যাশালীরা, সে এখন বিস্মরণে যায়। ওরে পদ্মাবতী, তোর পূজা মিলেছে চাঁদ

বান্যার হাতে। ঘরে ঘরে এখন তোর বারি। নিত্য সেবা নিত্যার। জ্যৈষ্ঠের দেশ-দশহরায় তপ্তুল মিষ্টি কেলেকোঁড়া দুগ্ধে পূজা, মানুষের বাস ঘিরে গোময়ের নাগবেড়ি। তুই তো সংসারের বন্ধন মা। জ্যৈষ্ঠের শুক্লদশমীতে চিড়া দধি মিষ্টান্নের ভোগ, বারি নৃত্য বাদির তালে তালে, এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে ভক্তদের মেল। তুই তো জগতের জোড় মা। নাগবেড়িতে বেঁধে ফেলেছিস মেদিনী। শ্রাবণের নাগপঞ্চমীতে মাচা বেঁধে ঝাপান। নাগ নাচে বিষম ঢাকের তালে। তোর বাহনগুলির বিষ আছে তাই ভয় করে মানুষজন। বাঁ-হাতে হলেও ফুল দেয় চান্দ বান্যা। আমার বাহনগুলিতে ডর নাই তাই পায়ে ঠেলে আমায়। এও ললাটলিখন। মধু-কৈটভ, মহিষাসুর, শুভ-নিশুভ বধ করল যে-হাত তা স্পর্শ করতে পারে না ধনপতির কেশ। চণ্ডীর পূজারিণী খুল্লনাকে লাঞ্ছনা করে ধনা বান্যা অথচ আমি অসহায়। এর চেয়ে হোমে আত্মাহুতি ভালো রে পদ্মাবতী। বৃকের অনল যে যজ্ঞের অনলের চেয়েও বেশি দাহ্য মা।

পদ্মাবতী করজোড়ে বলে, রুষ্ট হলো না মা, তোমার বৃকে অনল জ্বলে ধ্বংস হবে যে ত্রিভুবন। দূর কর কোপ। বিচারে সিদ্ধি মেলে অবিচারে নাশ। নীতিশাস্ত্রের পথ ধরে চল। তাহলে ঠিকই পূজা পাবে তুমি। আর যদি ধনপতি দত্তে এখনই নাশ কর তা হলে অবনীমণ্ডলে কোনোদিনই কি প্রতিষ্ঠা পাবে? হে নারায়ণী একবার স্থিত মনে ভাবো। যদি এই তোমার কার্যের পরিণতি তবে কেন স্বর্গধাম থেকে রত্নমালাকে নিয়ে এলে এ-ধরায়? নয়ন দু-টি বন্ধ করলে আমি এখনও শুনি মৃদঙ্গ মন্দিরার ধ্বনি। রামা নাচে তাতিনি তাতিনি তিনি আর ঝমঝম বাজে কিংকিণী কঙ্কন। নারদের কণ্ঠে সুর আর অঙ্গুলিতে বীণার চঞ্চল তার। সে সুরে সুর ঢালে দোহার, তম্বুরের তারে স্বর তুলে। চন্দ্রবদনী রত্নমালা নাচে। সে-নৃত্যে ধ্বনি জোগায় টমক খমক পিনাক। ভুবনমোহনের কাছে মুনি শোনায শ্রীরাধিকার বিষাদকথা আর রামা তাণ্ডবে মাতে। বিপরীতের এক আশ্চর্য সমাহার—বিরহ ও বীর্যের, বেদনা ও লাস্যের, সুর ও স্বরের। তাণ্ডবীর অষ্ট অঙ্গ নৃত্য করে, মুদ্রায় মুখর হয়। নৃপুরধ্বনিতে চোখ মেলে দেখি রত্নমালার রূপে ভাসে সুরলোক। যেন শতসহস্র পূর্ণিমা-শশী হাসে আকাশতটে। বালার তনুতে সবুজ দিব্য পট্টবস্ত্র, দু-করে কনকচূড়ি আর দুগ্ধধবল কীলক-বন্ধ শাঁখা। ময়ূরী নাচে আর পেথমে জ্বলজ্বল করে হিরা, নীলা, মুক্তা, পলা। হংসকণ্ঠে দোলে অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণের কণ্ঠমালা। কুমারীর কলেবর শোভিত চন্দন পঙ্কে। তা যেমন দৃষ্টিনন্দন তেমনই দ্রাণপ্রিয়। মলয়ে দোলে সুবর্ণলতা, তাণ্ডবে মাতে ত্বরিত পবনে। কর্ণের হেমমুকুলিকার পীতবর্ণ গোধূলি আনে সুরলোকে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে বালার কেশ ছুঁয়ে। শিশুশশী উঁকি দেয়। নৃপুর বাজে বামার পদযুগলে। শশী হাসে,

আলোয় ভাসে নাট্যশালা। কিন্তু সেই আলো, সেই হাসি, সেই সুর, সেই মুদ্রা তো স্থায়ী হয় না মা। বসুমতীতে তোমার পূজার প্রয়োজনে সম্মোহন বাণ হানলে তুমি আর তাতে অবশ হল রত্নমালার অঙ্গ। তালভঙ্গ রামা হেঁটমুখ তাগুবশালায়। শেষ হল বিদ্যার্থীর স্বর্গবাস। মনে পড়ে তোমার শাপ শুনে রত্নমালার সেই বিলাপ? বলে, বিধি আমার বাম না হলে আসার পথে হাঁচি-মুখলীর বাধ পড়ল না? যে পুর থেকে নাটশালায় আসা তার দোর চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। পিতা মাতা ভাই বন্ধু হারিয়ে আমি আজ নিঃসঙ্গ, একা, অনাথ। প্রকৃতির বিধানে নিত্যদিন দিবা ও নিশিতে গড়া কিন্তু আমার এখন শুধুই আঁধার পর্ব। বর্ষচক্রে নিদাঘ, মেঘবারি, মেঘান্ত, শরদন্ত, শীতল ও কামসখ এই ছয় ঋতু কিন্তু আমার জীবনে কেবলই নিদারুণ নিদাঘ। মনে আছে নারায়ণী ধূলয় ধূসর রত্নমালার সেই স্বর্গচ্যুত রূপ? নয়নের লোহে বসনখানি শ্রাবণের জলধর, চোখ দুটি ওড়পুষ্প, কেশপাশ ঝড়ক্লান্ত বটবুরি, মুখর নূপুরগুলি বোবা, করতালির হাত দুটি করজোড়, পা দু-খানি বলহীন ন্যূজ, পূর্ণিমা বদনখানিতে পূর্ণগ্রাস, ধনুক ভ্রুয়ুগলে অজস্র ভাঙন, ললাটে ত্রকতরঙ্গ। ওগো অভয়া, যাকে এত দুঃখ দিয়ে নিয়ে এলে এ অবনীতে, সেই রত্নমালা-খুল্লনাকে আবার এই যৌবনে পতিহীনা করবে? জগৎজনকে দুঃখকষ্ট শোকতাপ জুরাপীড়া থেকে রক্ষা করতে তোমার ধরাধামে আসা কিন্তু ধনপতি বিনা কী করে সাধিত হবে সেই কর্ম? মা তুমি রোষ জয় করো, দমন করো কোপ, নির্বাপন করো ক্রোধানল।

রুপ্ত নারায়ণী তুষ্ট হয় পদ্মাবতীর পরামর্শে। বলে, তোর এত জ্ঞানবুদ্ধি তাই তোকে ত্রিলোকে মহাজ্ঞানযুক্তা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠা বলে। কখনো কখনো পুস্তকও দেখি তোর হস্তে। সরস্বতীর হংসখানি নিয়ে হ্রদেও ঘুরিস তুই। বিদ্যা বিনয় আনে। বিচারবোধ গড়ে। সেই বোধটি আছে বলেই মহাজ্ঞান, গুপ্তবিদ্যা আর মৃতসঞ্জীবনী তোর হাতে। শুধু অসিতে কার্যসিদ্ধি নাই, যেমন আমি। শুধু মসিতেও নাই, যেমন সরস্বতী। তুই পুস্তক পড়ে ভাবিস, পাশ দিয়ে বাঁধিস, অক্লুশ দিয়ে মারিস। তোর বাহনগুলি আরও বিবেকমতি। ঠুকরে দিয়ে চলে যায় নীরবে। তাতে এমন গরল যে অমন বলবান অর্থবান চান্দ সদাগরও বেসামাল। চান্দের কাছে ধনপতি তো অনেক সুবোধ। কবুতর ছাড়া অন্য কোনো নেশা নাই। বল-বীর্যের চেয়ে বালাতে ওর বেশি মন। হুঁয়ারে মা পদ্মাবতী, তুই ভেবে বল কী করে ধাতে আনি ধনাকে।

পদ্মাবতী অভয় মুদ্রায় বলে, সদাগর চলুক সপ্তডিঙা চড়ে দক্ষিণ পাটনে। পেরোক নানা ঘাট। নানান নগর দেখুক। হিসেব করুক কত পণে কত লাভ। সিংহলদেশ থেকে ফিরে ক-খানি গোঁজ পুঁতবে গজশালে তা ঠিক করুক। মা নারায়ণী, আমি সঠিক ক্ষণে ছ-খানি ডিঙা রসাতলে পাঠিয়ে দেব। থাকবে শুধু

দুর্গাবর আর মধুহীন-ধনহীন ধনপতি। ধনপতি দেখবে কদলীর কুলহীন মূল্যহীন মান্দাস ভাসে জলে অথচ তার অমূল্য পণ ভরতি ছয় তরী মাঝদরিয়ায় ডোবে। আমি ধনপতিকে প্রাণে মারব না নারায়ণী। মৃত্যু যন্ত্রণা তো ক্ষণিক। আর সে মৃত্যুতে ধনপতির চেয়ে খুল্লনা-লহনার যন্ত্রণা বেশি। জীবনব্যাপী বৈধব্য পালন আর বৈধূর্য লালন। সাধু যাবে রাজদ্বারে। কালিয়দহে এমন এক অভিসন্ধি ফাঁদব যাতে বন্দি হয় সিংহলে। বাকি কর্ম বিচার-শলা করে করা যাবে। আপাতত গুহ্য থাক। বরং ওই দেখ খুল্লনা ভক্তিভরে নতুন করে বাঁধছে বারির বিড়া, শোন মাতা, ক্ষমা চাইছে সাধুর হয়ে। বলছে সাধু মূর্খ তাই তোমার ভজনা করে না। কাতর প্রার্থনা করছে সংকট থেকে সাধুকে রক্ষা করে তোমার পদসরসিজে স্থান দিতে।

ভগবতী গগন থেকে অবলোকন করে বারির নতুন বিড়াখানি মাপের কিনা। বেড়ের গোলমালে বারি যায় গড়াগড়ি। তুষ্ট হয় দেবী, রাজাশাল খড়ের বেড়িটি পোক্ত ও নরম। নিতম্ব বসবে ভালো। ষোড়শোপচারের প্রথমটি প্রতিষ্ঠা পেল। এবার সাগর পথের পরবর্তী সাধুকর্ম পদ্মাবতীর।

## ১১ ধনপতির ডিঙাঘাটায় গমন

কুপিত ধনপতি চলে ভ্রমরার কূলে।

পেছনে ভুঁইয়ে পড়ে থাকে দুই বারি। জলগর্ভা জলগর্দার এখন তিম-পো জল বাইরে, পোয়া জল উদরে। হাহাকার করে খুল্লনা। পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডীর উপাসনা কলসের প্রতিটি জলকণা অত্যন্তুত। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, উর্ধ্ব ও অধঃ এই দশদিকের বিপদভঙ্গক। সেই শান্তিজলকুণ্ড পায়ে ঠেলে সদাগর যে দু-হাতে আপদ ডাকে, বিপদ টানে! কাতর স্বরে রামা অনুন্নয় করে, ও সাধু বন্ধা বারিতে তুমি সাগরজলে ভেসো না। টাল খাবে ডিঙা, জল গিলবে নাওয়ের খোল। ষাঁড়াষাড়ির বানে তুমি কেমন করে সামলাবে পণ, কেমন করে বাঁচাবে প্রাণ? আমি আশ্রসারে ঢেকেছিলুম জলগর্দার মুখ। ওই পল্লব-সুবাসে আমোদিত হয় আকাশ-বাতাস। তখন ঝড় নেই, ঝঞ্ঝা নেই, শুধুই বসন্তবায়ুর মৃদুমন্দ গতি। সেই সুরভিত মাঙ্গলিক আশ্রসহকার ধূলায় লোটার। ওগো সাধু, দাঁড়াও। বাসহীন বায়ুতে বাদাম তুলো না, ডিঙা চলে দিকচিহ্নহীন নির্বাসে। আমি দিঘল দুর্বায় আবাহন করেছিলুম দেবীকে। ওই তৃণ পৃথিবীর আদি আস্তরণ, প্রাণের প্রথম জাগরণ। ও তোমার দেহ-আবরণ, কাম-আভরণ। নগ্ন দেহে আকাশ তলে, সাগর জলে দাঁড়িয়ে না। নোনা বায়ে ক্ষয়

ধরবে চামে, ললাটের ঘাম পড়বে চোখে। আমি গুয়া দিয়ে বন্দনা করেছিলুম দেবীকে যাতে নগরে, বন্দরে, রাজদ্বারে তোমার মান জোটে গুয়া-তাম্বুলে গুয়া-তণ্ডুলে গুয়া-নারিকলে। সে-গুয়া তোমার রোষে গড়িয়ে দেবালয়ের পয় নালায়। ও নালিপথে কোনো গ্রহণ নেই, সবই বর্জন। তোমার এই বাণিজ্যযাত্রায়, ভেবে দেখো নাথ, কতটুকু সম্পদ আগমন কতখানি ক্ষয়। যেয়ো না, পায়ে ঘট ঠেলে পা রেখো না ডিঙায়। আমি সিন্দূর দিয়েছি বারিতে যাতে লোহিত হয়ে ওঠে দেবীর বিস্তৃত ভাল। আমি কামরূপের কৃষ্ণ কস্তুরি ঘসেছি জোড়া কুন্তে যাতে দেবীর মনোহর কান্তিময় উর্ধ্বমুখ স্তনযুগল সুবাসিত হয়ে ওঠে। আমি স্ত্রী-কেশর কুমকুম মাখিয়েছি জল গর্দায় যাতে রাঙা হয় দেবীর চরণ। আমি রক্ত-চন্দন লেপন করেছি ঘটে যাতে লালিমা পায় দেবী ওষ্ঠ। আমি চুয়া ঠেকিয়েছি কলসে যাতে মহামাইয়ের কামরস হয়ে ওঠে সুরভি কিন্তু সবই তুমি পায়ে ঠেলেলে। দেবীর লোহিত সিন্দূরে রাঙা থাকে এয়োতির কপাল, দেবীর সুবাসিত স্তনে এয়োতির বুক জমে রেণু, দেবীর কুমকুম চরণে এয়োতির পা থাকে লালিম, দেবীর চুয়াগন্ধী কামরসে এয়োতি হয় গর্ভবতী কিন্তু সবই তো গড়াগড়ি যায় ভুঁইয়ে। এখন দেবী যদি তার দেহের সব আঁধার ছড়িয়ে দেয় তোমার নোনা বায়ে, কী হবে তোমার? যদি ওই সিন্দূর-কুমকুম মেদিনী ছেড়ে মেঘে চড়ে দক্ষিণ পাটনে, কী হবে আমার? যদি ওই কস্তুরি মায়ামৃগ হয়ে তোমার নিয়ে যায় গহন কাননে কিংবা অথই সাগরে, আমার জঠরের ভ্রূণটির কী হবে সাধু?

অবজ্ঞায় তাকায় ধনপতি। তারপর এগোয় দোর মুখে। কাঁদে খুল্লনা, বুক চাপড়ায়। দুবলা বোঝায় চোখের জলে পিছল করতে নাই পথ। কিন্তু তার বুকের ভেতর যে দুঃখ আর আতঙ্কের সাগর-ডেউ, উথাল-পাথাল! চোখের সাগরবারি বাঁধবে কেমন করে, কোন রশিতে?

শুকনো পথে দিন-দুপুরে উচোটা লাগে সদাগরের পায়ে। হাত আর উর্ধ্ব শরীরের তড়িৎ হাঁশে পতন থেকে রক্ষা পায় সাধু। পিছনে আঁতকে ওঠে তিন নারী—লহনা, খুল্লনা, দুবলা। এ যে বড়ো অশুভ সংকেত! দিবালোকে ইষ্টক বেছানো কূর্ম মসৃণ পথে কী করে উচোটা লাগে অমন সিংহ-দড়ো পায়ে, অমন তুরঙ্গ লক্ক লম্ফনে? লহনা তাকায় দুবলার দিকে। দাসী চোখের ইঙ্গিতে বলে, সে সকালে নারিকল সম্মাজনীতে পরিষ্কার করেছে রাঙা পথ, পথের ওপর পড়ে-থাকা দু-পাশের বরা ফুল সরিয়েছে, ভগ্নশাখা তুলেছে। জল দিয়ে বাসি পথ মার্জনা করেছে। সে সরণীতে দিন-দুপুরে সদাগর বেতাল হয় কী করে? এ তো ভূ নয় যে হঠাৎ মাথা তুলেছে বংশ অঙ্কুর কিংবা বগ্নীকম্প, কিংবা গো-মহিষের শৃঙ্গ? তাহলে তাল কাটল কেন সাধুর চলন-মুদ্রাটির? লহনা-খুল্লনার দিকে কাতর

দৃষ্টিতে তাকায় দুবলা বুড়ি। যেন তারই অপরাধে সাধুর শুভযাত্রায় এই বাধা, এই বিঘ্ন। সেই অলক্ষণা, অপয়া। প্রবোধ দিয়ে তাই বলে, দেখো সাধুপথে কোনো বউ কাঁখে বয়ে আনবে নদীজল। ভরা কুস্তের জুড়ি নাই। ওটি হল গিয়ে গেহের সিন্দুক, মন্দিরের গর্ভগৃহ। পথের একখানি উচোটায় কীসের চিন্তা! কত উচোটা জলে গলে তবেই-না তোমার কোল-আলো কলসখানি। সেই কলসের কণ্ঠ-ছুই জল হল পূর্ণকুম্ভ। কোথাও ফাঁক নাই। আমি বরং একটু এগিয়ে দেখি কাদের বউ-ঝিরা ভ্রমরায় ভাঙ ভরে গেছে ফেরে।

দুবলা পথে নামে। দেব নাম জপতে জপতে এগোয়। মাকন্দ-শাম্মলীর বন পেরিয়ে চোখ মেলে দূরে। না, কোথাও নেই কোনো নদীফেরত রামা, সরসীফেরত বামা। খাঁ-খাঁ দ্বিপ্রহরে আমলকী গাছের শুষ্ক ডালে বসে তারস্বরে কা-কা ডাকে এক কাউয়া। সেই কর্কশ ধ্বনি করাতির মতো কাটতে থাকে ক্লান্ত-শান্ত-মৌনী পড়ন্ত দুপুর। দুবলা খোঁজে জল-কলস আর তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক শুষ্ক অপর্ণা বৃক্ষশাখা আর ততোধিক রসহীন গুটিকয় শীর্ণ প্রশাখা। যেন কাট-বৈশাখের অপরাহ্নে ঈশানে ছড়িয়ে পড়েছে বজ্রের শ্বেত শিরা-উপশিরা। বুঝি একটু পরেই লাল অগ্নিতাল নেমে আসে গুয়া নারিকল বৃক্ষ চূড়ায় কিংবা ঝড়-নাকাল গেহমুখো মানুষের মাথে। দুবলা ভাবে কী কুম্ভণেই না মানুষটা অযাত্রায় যাত্রা করল নোনা পথে। ওই মৃত বৃক্ষশাখা আর মসিকালা কাউয়ার ভাঙা স্বরে কী গতি হবে সাধুর, কী দুর্গতি ঘটবে সংসারের!

কিন্তু নদীপথ এখনও বেশ খানিক। নৃপবরের গজ যদি চানে যায় ভ্রমরায় তাহলে দেখা হবে পথে। গজের সবকিছুই গুণের। চলনটি ললিতমধুর। গজগামিনী কামিনী বড় পয়মস্তা, কাম ও কর্ম দু-টিতেই সমান সুচারু। ওদিকে বীরের গর্জনটি গজঠাটে। কোথাও এক বিন্দু চপলতা নেই, গভীর। হস্তিনাপুরে যত গজের বাস তত বীরের। তাই অস্ত্রশিক্ষা, বিবাদ, হানাহানি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। তার বিবরণ মহাভারতে। বাণীটি ব্যাসদেবের, লিপিকার গণেশ। তিনি গজমুণ্ড, সিদ্ধিদাতা। ধনপতির পথে একবার একখানি গজের দেখা মিললে যাত্রা হবে শুভ। তখন কীসের উচোটা, কীসের শুষ্ক শাখে কাউয়া ডাক! দাঁড়ায় দুবলা, দূরে একটা শব্দ জাগে। যেন গজঘণ্টা। কান পাতে। দাঁড়ায় সদাগরও। সেও শুনেছে মিঠে ধ্বনি। প্রতীক্ষা করে। কাছে বাজে ঝুমঝুম ধ্বনি। গজ না, গজঘণ্টার ধ্বনিও না। ও কোনো অদৃশ্য নারীর পদভূষণের স্বর। ও-ধ্বনিতে বড়ো আপদ, অজানা বিপদ। কোনো নারী পথসাথি কিন্তু সমব্যথী না। সেই কায়াহীন ছায়া অমাবস্যার প্রথম প্রহরে চলমান অগ্নিকুণ্ড দেখাতে পারে নদীতীরে, দ্বি-প্রহরে শ্বেত বরাহ, তৃতীয় প্রহরে গেহ-মুখী পক্ষীকুল। যে সপ্তর্ষিমণ্ডলে ছিল ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য,

অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি এই সপ্ত ঋষি সেখানে বিরাজ করবে তাদের ছয় পত্নী সন্নতি, ক্ষমা, প্রীতি, অনসূয়া, লজ্জা, সন্তুতি আর অরুন্ধতী। মধ্যরাতে বৈদিক ঋষিরা গাইবে মার্গ সংগীত আর গান্ধর্বেরা সুর ধরবে বৈদিক সামগানের। সঙ্গে একটি নুমবুম ধ্বনি। ও বাদ্যযন্ত্রের বোল নয়, ওটি হল পদভূষণ উছটার অমঙ্গুলে ডাক।

গজ না মিললে মিলবে একটি ধেনু, সবৎসা। কৃষ্ণের শত রূপ সহস্র দেহভঙ্গিমা কিন্তু নয়নাভিরাম ছবিখানি হল গোষ্ঠের। শ্বেতশুভ্র সবৎসা ধেনুর সম্মুখে, কদমতলে, যশোদানন্দনের বংশীবাদন। কংসনিধন তার কাছে মলিন, কুরুক্ষেত্রে অশ্বরথে গীতাকথন গোঁগ। কৃষ্ণে প্রয়োজন নেই, তার ধেনুখানি যদি পথে দেখে সাধু তবে সপ্তডিঙা বাদাম-বায়ুতে উড়ে যাবে। তখন দক্ষিণ পাটনে ধূলামুঠি হবে হেমদানা। সাধু গৃহে ফিরে আয়োজন করবে হরিবংশ পাঠের। দান করবে ক্ষীরধেনু, গুড়ধেনু, তিলধেনু। দুবলা মান পাবে না, তাই দান মাগবে গজমোতির একটি হার। নাগরির বলবে, বান্যঘরের ঝি, পাশ্চা পাতে ঘি। কিন্তু হা কপাল, কোথায় বেণু কোথায় ধেনু! পৃথিবী হল গোরুপা কিন্তু একটি গোবৎসেরও দেখা নেই পথের দু-পাশে।

দূরে তেলিয়া ‘তৈল লও তৈল লও’ বলে হাঁক দেয়। তৈল-গাছটি থামিয়েই বেরিয়ে পড়েছে, যেন সদাগরের পথটি পিচ্ছল করবে বলে। স্ত্রী-আচারে তৈল-হরিদ্রায় কল্যাণের স্থিতি আর সোচ্চার তৈল বিপণনে অকল্যাণগতি। দুবলা ভাবে বড়োই দুর্গতি সাধু ললাটে। তৈলময় পথ, পায়ে তাল পাবে কেমন করে? বেসামাল পা পড়বে গিয়ে তেলাকুচার বনে। তখন কোথায় স্বভূমের বিক্রমকেশরী, কোথায়-বা পরভূমের সিংহলেশ্বর? যে-পথে ধেনু নেই সে-পথ দিয়ে ধন আসবে কেমন করে? তৈল পিচ্ছল পথে সে ধন বয়ে গেছে তুলবেই-বা কেমন করে?

পূর্ণ কুণ্ড, গজ, ধেনু না মিলুক যদি একটি ক্ষেমংকরীর দেখা মেলে আকাশে? যদি লাল পক্ষে পাক খায় মাথার ওপরে? গগনজোড়া একখানি ডাক দেয়? ও ধ্বনিতে সব শুচি সব শুভ, সব মঙ্গল সব মধুর, সব পুণ্য সব পবিত্র, সব নির্দোষ সব নির্বিঘ্ন। শুধু একবার শঙ্খশুভ্র কণ্ঠে সর্বমঙ্গলা একখানি প্রণাদ। তখন কীবা ডাঙা কীবা জল কীবা দিবা কীবা রাত্রি সব বিঘ্নহীনা।

সদাগর থাকলেও সদাগতি-সুতের দেখা নেই সারা আকাশে, তার জায়গায় ভূতলে রক্তবসনা যোগিনী ভিক্ষা চায় আধখানি অলাবু। এমনিতে ফলটিতে দোষ নেই, আপন খেয়ালে গাছখানি শুণ্ড দিয়ে উঠে পড়ে গৃহস্থের গেহ আচ্ছাদনে। পত্র-ডণ্ড-ফল সব কিছুতেই উপাদেয় ব্যঞ্জন। গুপ্ত অম্বল, পিষ্ট, শ্লেষ্মা, মেচেতায়

অলাবুর পত্র-ফুলে অব্যর্থ ফল লাভ। কিন্তু অলাবুটি অর্ধ হলে নদী-সাগরের নাওগুলির কিবা গতি! সাত ডিঙায় যাবে মাতঙ্গ, কুরঙ্গ, তুরঙ্গ, প্লবঙ্গ, কবুতর, তণ্ডুল, মসরি, নারিকল, সুবাস দ্রব্য। সঙ্গে সদাগর, কাণ্ডার, নাইয়া-গাবর। সাতখানি নাউ ভেঙে চৌদ্দ হলে কবুতরগুলি ডানা মেলবে আকাশে কিন্তু বাকিদের কী হবে? তাদের তো অধোগতি! আর ওই জটাঙ্গুটা যোগিনীটি কে? স্বয়ং দেবী নয় তো? রুরু দৈত্যের সঙ্গে রণের কালে দেবী একখানি জটা ছিঁড়ে সৃষ্টি করেছিল ভয়ংকরী চণ্ডমারীকে। সেই চণ্ডমারী গর্দভে চড়ে তাড়া করল রুরু দৈত্যকে। তারপর পথ আগলে কব্কট সর্প দিয়ে বেঁধে রুরুর মুণ্ডুখানি কেটে ধরিয়ে দিল তারই হস্তে। চণ্ডমারীর কাছে যা অলাবু ছেদন তাই নাও খণ্ডন, সেটিই আবার মস্তক কর্তন। এখন কী হবে সাধু আর সপ্তডিঙার?

সদাগরের ছিয়া সঙ্গে তাল রাখতে শ্বাসে টান দুবলার। গেহ-গারি ছেড়ে চললে মানুষ বারে বারে পিছন ফেরে। আপনজনের মুখগুলি যতদূর দেখা যায় দেখে। আর এমন বাষ্প সাধুর যেন কোন স্বজন-সুজন নেই পিছনে। নিশিডাকের মানুষজন এমনই হনহনিয়ে হাঁটে। কিন্তু দিনে তো নিশি ডাকে না। তবে কি নিয়তির আহ্বান? দুবলার অন্তরে উথালপাথাল। সামনে মোদকপল্লি। সেখানে দুগ্ধ ফোটে সারি সারি পিষ্টল কটাহে। নীচে অগ্নিকুণ্ড। যদি মোদকের মন থাকে মথুরায় কিংবা চোখ জোড়ে নিঁদে তখন দুগ্ধ ফেঁপে পর্বত। সে দৃশ্য একবার দেখলে নববধূর সংসারজীবন সুখে টাইটুম্বর, নিশি কারবারির বোঁচকাটি উপড়চুপড়, বান্যার বেসাত-তরী ভরপুর। চলতে গেলে উতলে ওঠে। কিন্তু কোথায় দুগ্ধ কোথায় মোদক! তিনটি কৃশকায় সারমেয় লাঙ্গুলী নৃত্যে কটাহ চাটে। বলে, মোদকের পাকাটি বেশ পক। খণ্ডের মণ্ডনা, চন্দ্রকান্তি, অমৃতকেলি, কাঞ্চনলতিকা সবই বড় সুস্বাদু, উপাদেয়।

তখনই ধীবর হাতে দুলতে দুলতে এগিয়ে এল লাজুক কুর্মাবতার। কচ্ছের ভেতর থেকে মুখটি বাড়িয়ে দেখে সদাগরকে। ভাবে সাধুর ডিঙাগুলি ডুবে গেলে তাকে সাগরের তলে গিয়ে তুলতে হবে কি না। যে মন্দর পর্বত ধারণ করেছে তার কাছে সপ্তডিঙা কোনো ভার নয় কিন্তু ভাবে যার ডিঙা যাবে অতলে তার গোছে এত গমক কেন?

পথের সব আপদ-বিপদ সম্পদ হবে যদি একবার একটি বেউশ্যার মুখদর্শন ঘটে। আহা কী রূপ রম্ভা, উর্বশী, রতির! যেন গোধূলির কনক আলোয় ঝিঙাফুল, নীল সরোবরে সদ্যফোটা শ্বেতপদ্ম, রাঙা ডালিমের ডালে হিরামন পাখি, পাকা ধান্য ক্ষেতে ফণাধর দুগ্ধ গোখুরা, অমাবস্যার রাতে উলূকের চোখ। যেমন রূপ, তেমন গুণ। হাঁটলে সুর ধরে বসন্তী, নাচলে পেখম মেলে কলাপী, বেণী নাড়ালে

বাতাসে দোলে কেউটিয়া। আর দশমহাবিদ্যার বেউশ্যাগুলিতো শতগুণ আর রূপের আকর। কেউ অভয়া, কেউ সংকটেশ্বরী, কেউ নিস্তারিণী, কেউ বাক্সিক্দিদাতা, কেউ অন্নদায়িনী। রূপে কেউ পীনোন্নত পয়োধরা, কেউ শ্বেতাননা, কেউ অঞ্জনবর্ণা, কেউ মুক্তকেশী, কেউ নীলপদ্ম গন্ধবিশিষ্ট, কেউ মহাবেণী-ধারিণী, কেউ প্রশস্ত নিতম্বিনী। পূর্ব জন্মের কত-না সুকৃতিতে বেউশ্যা আর তাই বেউশ্যাধারের মৃত্তিকায় দশভুজার পবিত্র মহাস্মান। তারা ভৈরবী কালী উর্বশী মেনকা কৃতস্থলার দরকার নেই, উজবনি নগরের সুকেশী-দিগম্বরী-ক্ষেমার দর্শন মিললেও কার্যে সিদ্ধি।

কিন্তু কোথায় নয়নাভিরাম রমণী আর কোথায় কাষ্ঠভারে ন্যূজ কাঠুরিয়া! নদীচরে যে মাকন্দ, দৈবসার, পিয়ালের বন তাতে কুঠার চালিয়ে সংগ্রহ করেছে কাষ্ঠ। এখন সূর্য যখন মধ্যগগন ছেড়ে বেশ খানিক পশ্চিমে সে বন্ধক বন্ধনীতে কাষ্ঠখণ্ড বেঁধে ঘরে ফেরে। কাঠুরিয়া বৃদ্ধ। দেহের পেশিগুলি বলিষ্ঠ কিন্তু ক্লাস্ত, অবসন্ন। বন থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে নগরের পথে চলে, সে-দৃশ্য দেখে ধনপতি। তার জন্যও কি অপেক্ষা করছে এমন কোনো ভার যা তাকে বহন করতে হবে শিরে, স্কন্ধে, সর্ব শরীরে?

ওহে দুবলা, আর কত ছুটেবে সাধু-পদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, আর কতদূর যাবে? সদাগর বাগিজ্যে যাবে বলে কপালে কেটেছিলে চন্দন তিলক, দেহে তুলেছিলে তসরের শাড়ি, হাতে নিয়েছিলে তাম্বুল, মুখে ভরেছিলে গুয়া। এখন শরীরজলে তিলকের তিল নেই, দেহবস্ত্র ঘামে ন্যাতা, হাতের তাম্বুল পানসি আর মুখের গুয়া মণ্ড। পল্লি ছাড়তে ছাড়তে নগর শেষ। এবার বনপথে নদীঘাট। আর কী শুভ আশা করো? হাটে মহাজ্যোতিষী হরির কাছে শুনেছিলে তুমি মীনরাশিজাত। জ্যোতিষী বলেছিল, এই রাশির নরনারী রত্নকাঞ্চনপূরিত মহাপ্রাজ্ঞ দীর্ঘ কালপরীক্ষক হয়। সেকথা শুনে হ্লাদিত হয়ে এক কাহন এক কড়িদান দিয়েছিলে। হে মহাপ্রাজ্ঞা, এতগুলি পথ-বাধা দেখে কতখানি সুখশাস্তি দেখ সাধুর সাগর যাত্রায়? আরও যাবে? ঘন বনে বটের আধা-অন্ধকার সাথে আছে শুভ্র উলূক? সাধুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হবে? হলে ভালো কারণ হরি তো হরিনেত্রটিকে বিশ্ব চরাচরের শুভ-অশুভ দেখার দায়ভার দিয়েছে। এতখানি সাগরপথে সাধুকে সুনজরে রাখলে মঙ্গল। কিন্তু বনে দিবান্ব পক্ষীটির পরিবর্তে যদি নিশান্ন গৃধিনী দেখে সাধু? নদীকূলে গো-মহিষের দেহ পড়েছে নিশ্চয়। ওই শোন আমিষ ভোজনের আনন্দে পাকের ফুকার।

সাধু দাঁড়িয়ে পড়ল যে? পথ আটকেছে সেয়াকুল। নেতবস্ত্রের আঁচল টেনেছে

গুচ্ছকাঁটা। যেয়ো না সদাগর সাগরপানিতে, চড়ো না ডিঙায়। কথা শোনে না সাধু। বস্ত্র ছেঁড়ে বাহু জোরে। দুবলা ভাবে ছুটে গিয়ে চরণ দু-টি ধরে ফেরায় সাধুকে। কিন্তু সে তো দাসী আর এই পথানুসরণটি গোপন। তাই সে চক্ষু দুটি বস্ত্রপ্রান্তে মুছে পেছন ফেরে। এখন একটাই পথ। হাটের দিন কুসাই ওঝাকে বলে বেদ পড়ানো। গত হাটে বেশ কিছু কড়ি সরিয়ে রেখেছিল সে। সেই কড়ি আর এক গুচ্ছ কুশ দিয়ে ওঝাকে বলবে, সাধু হিতের বিহিত কর দেখি।

পারুল, গান্ধার, অর্জুন বৃক্ষ ছেড়ে এগোয় সদাগর। ভেসে আসে কেয়াফুলের সুবাস। নদী-হাওয়ায় দিঘল পাতার নাচন আর হিসহিস ধ্বনি। হঠাৎই তাল কাটে সুরে। বাঁ-দিক ফিরে সাধু দেখে একখানি ময়াল সর্প দৈবসারবৃক্ষ থেকে নেমে কেয়াবনে ঢোকে। সাধু চোখ ফেরায় দক্ষিণে। সেখানে একটি শৃগালী কুলবনের কণ্টক বাঁচিয়ে সম্ভরণে হাঁটে। যেন বিপদের বার্তা পেয়েছে সেও। তাই আগাম সতর্কতা। সাধু এগোয়। হালকা হয়ে আসে বন। পায়ের তলে বালু জাগে। কাশবন মাথা নাচায়। সামনে প্রবাহিত জলস্রোত আর মাথার ওপর মুক্ত আকাশ। সাধু ভ্রমরার দিকে তাকিয়ে দেখে পর্ণপূর্ণ সপ্তডিঙা আর আকাশে কৃষ্ণচিল্লকের বায়ু-সম্ভরণ।

## ১২ নদীবন্ধে ধনপতি

হেমন্তের দিনান্তে ভ্রমরার স্রোতে সুবর্ণ শোভা। ধনপতি দেখে দু-চোখ ভরে। ভ্রমরার এই হেম বর্ণ হারিয়ে যাবে, মুছে যাবে আঁখি হতে, যখন সপ্তডিঙা ভেসে যাবে দক্ষিণ পাটনে। তখন ভিন্ন জলতল, ভিন্ন স্রোত, ভিন্ন স্বর, ভিন্ন তীর্থও। যে-তীর্থে দাঁড়িয়ে ধনপতি ভ্রমরাকে দেখে তার প্রতিটি আরোহণীতে জল ও জলজের বহু প্রাচীন স্মৃতি, নানান অতীত কথা। উজানি নগরের সব লৌকিক ও পারলৌকিক কর্মের শুভারম্ভ এই নদীবন্ধে। ধনপতির শৈশব-কৈশোর-যৌবনের বহু গল্প-গীত সুখ-স্মৃতি এই সোপানে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে ভ্রমরার দেহ বাড়ে-কমে, যার জলচিহ্ন আঁকা হয় ভ্রমরার ঘাটে। তার সারা শৈশব কেটেছে সে চিহ্নের হিসেবনিকেশে। জলস্রোতের অবতরণে জলতৃণের আশ্রয় পড়ে পাথরে, সিঁড়ি বেয়ে শম্বুক চলে নীচে, জলকাউড়ি ছোটো করে শ্বাস, দশভুজা কুলির বাস গড়ে নদীগর্ভে। আর জল যখন বাড়ে তখন সমস্ত সোপান খরস্রোত ভ্রমরার অন্তরে। সব কথা তখন অন্তঃপুরে। কৈশোর-যৌবনে বহুবার জলতলে গেছে ধনপতি।

ওখানে গুনগুন গান গায় মধুকরী। সে-সুরে মধুর মিষ্টতা, পুষ্পের সুরভি। সেই স্বর সেই সুবাস হারিয়ে যাবে বাদামে লাগলে বায়ু, কর্ণে বসলে কাণ্ডার। তখনও ভ্রমরায় দল মেলবে পদ্ম, জললতায় বাজবে জলতরঙ্গ, জলধর বুলে বেড়াবে কাউচক্ষু বারিতে, সূর্য প্রতিবিম্বিত হবে স্ফটিক পানিতে, ডাঙ্ক ডাক দেবে কুবকুব, জল কেউটিয়া কেলি করবে কহ্লার বনে, পানিশিউলি কলি দুলবে মৃদুমন্দ বায়ুতে, মধ্যরাত্রে জলকুমারী ডাক দেবে শয্যা ছেড়ে কূলে যেতে— শুধু ধনপতির আঁখি থেকে মুছে যাবে এই পট, এই পটভূমি।

ধনপতি বিস্ময়বিমূঢ় কেন পরিচিত সব দৃশ্য, চেনা মুদ্রা, শোনা ধ্বনি আজ এতখানি টানে। যা কিছু সে এতদিন দেখেছে ভাবহীন অভ্যেসে আজ সেসবই যেন তার দিকে তাকিয়ে পরম মমতায়। স্বভূমি থেকে পরবাসে গেলে এমনই কি ঘন হয় বিদায় বেলার বর্ণ? কিন্তু জাত সাধু ধনপতি তো গেছে অন্য ভূমে, অন্য ভূমায়! কখনো এরকম সচল সরব সবাক হয়ে ওঠেনি চারপাশ। তবে কি সুদূরযাত্রার এই বেদনা বিষাদ স্বাভাবিক? যেমন ছোটো নদী সহাস্যে কুলুকুলু বয় কিন্তু দীর্ঘ স্রোত বহন করে এক অন্তঃসলিলা বিষাদ। একজনের কাছে যা প্রমোদবিহার অন্যজনের কাছে অসীমে বিলীন, একজনের কাছে যা জ্ঞাতচর্চা অন্যজনের কাছে অজ্ঞাতচর্চা। কোনোটি শখ-সুখের পদচারণ কোনোটি অনির্দিষ্ট অনিকেতের আকর্ষণ। কিন্তু ধনপতির আকর্ষণ না পথে, না গন্তব্যে—তার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে প্রকর্ষণ করে উজানি নগর আর ভ্রমরা নদী। কিন্তু যত সংযুক্তি ততই তো বিযুক্তি আর এ-দুয়ের মাঝে বিধাতা কি কোথাও ভরে দেয় দৈব পথ বিপর্যয় বণিকের কোনো কর্মদোষে? তাই কি নির্বাসিতের প্রতি ভ্রমরার অপার অনুরাগ, অন্তরঙ্গ আলাপন?

ধনপতি দেখে নদীকূলের হেমবর্ণ বালুতে হেমস্তের হাস্যমুখ রৌদ্র গা এলিয়ে বসে। কারোরই ত্বরা নেই—না বালুর না দিনপ্রভার। একজন পর্বত চূড়া থেকে অবতরণ করতে করতে প্রায় থিতু, অন্যজন তিনপ্রহর পার করে দিনান্তে জিরনে। জীবনকে এমন আয়াস মুদ্রায় কোনোদিন নজর করেনি সদাগর। আর দেখে বালু ওপরে গৃহলক্ষ্মীর চরণ, নদীতটে ধ্যানযোগী সারস, তীরেবাঁধা ধীবর ডিঙা, শমীবৃক্ষে উদাসী বনকপোত, জাবরে মশগুল বলদ, দৈবসারে ঘুমকাতর ময়াল, শ্মশানবন্ধে ধূমহীন নির্বাক হুঁকা, ওপাড়ের নদীতটে ত্রিভঙ্গ পাকুড়, শায়িত আঁকাবাঁকা ঘাটমুখো বনপথ, মৌন বঁইচির বন। সে অবলোকন করে ভ্রমরা-তীর বনানীর মতো উদাসীন, হেমস্তক্ষেতের মতো নিষ্পৃহ, বসন্তবায়ুর মতো ভারহীন, কূর্মের মতো নিশ্চল, চতুর্দশী চন্দ্রের মতো নিষ্প্রভ, নিশীথের মতো নীরব, নিষ্পত্র আমলকী বৃক্ষের মতো নিষ্পন্দ। সে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে সঙ্গোপনে পাতা

মেলে কহলার, চার পায়ে নীরবে নিদ্রা যায় নীল অশ্ব, নদীজলে অজ্ঞাতে মেশে চিতাবহি।

ধনপতি তাকায় নদীচরের দেবদারু বৃক্ষটির দিকে। সবুজ দিঘল পর্ণে ঢাকা সুউচ্চ দারুখানি সাধু দেখে নিত্যদিন কিন্তু কোনোদিন বিস্ময়ে তাকায়নি। দেবদারু তো দেবতরু নয় তাই তার মূল্য কতটুকু! সাধু ভেবেছে পারিজাত বৃক্ষের কথা। শুভ্র, কৃষ্ণ, হরিৎ, হরিদ্রা, নীলি যে বর্ণ কামনা করবে—তাতেই রঙিন হবে পুষ্প। সুবাসিত হবে বায়ু। সারারাত্রি দীপ হয়ে আলোকিত করবে চারপাশ। পারিজাত ধারণ করবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুঃখ-গ্লানি জ্বরা-বার্ধক্য। বৃক্ষতলে দাঁড়ালে শুনবে সংগীতের সুর, বাদ্যের স্বর। ধনপতি কামনা করেছে কল্পতরু। বন্দনা করেছে শিবকে কল্পতরু হিসেবে। তার কাছে কামনায় মেলে শুদ্ধ মন, প্রসন্ন চিত্ত, পাবন বিবেক এবং হিতকর হৃদয়। সাধু স্মরণ করেছে মন্দার বৃক্ষ। তার কুসুম ফোটে বারো মাস এবং সেই সুবাসে চিরবসন্ত বিরাজ করে নন্দনকাননে। মন্দার বৃক্ষের মস্থানদণ্ডে অগ্নি মস্থন করলে শোক, মোহ, কর্তৃত্ব, ভোগতৃষ্ণা আদি ভ্রান্ত-বুদ্ধি দাহিত হয়। ধনপতি ধ্যান করেছে সন্তান বৃক্ষের যা ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যে গড়ে তোলে দারুপ্রাচীর। তখন দেহ-মন শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখের দ্বন্দ্বানুভূতি বিহীন। শুধুই নিত্যত্ব-জ্ঞান। ধনপতি কামনা করেছে হরি হৃদয়িতা চন্দনবৃক্ষের। পীতসার হল গোমেদমণি, পীতমণি হল পুষ্পরাগ, পীতাস্বর হল শ্রীকৃষ্ণ, পীততণ্ডুল হল কঙ্গুলী ধান্য, পীতশ্রোতা হল গঙ্গানদী আর পীতকাষ্ঠ হল হরিচন্দন। নিত্যদিন দ্বাদশ অঙ্গে হরিচন্দনের তিলক ধারণ করলে ভবলীলার অস্ত্রে জীবাশ্মার সঙ্গে মিলন ঘটে পরমাত্মার। দেবতরুগুলি এতকাল দেখেছে ধনপতি। সিংহল যাত্রাকালে অবলোকন করে দেবদারু বৃক্ষখানি। চক্ষু দু-টি মেলে দেখে, আহা কী গগনচুম্বী দেহ, কী নয়নমধুর পর্ণ! পর্ণের ভেতর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের দণ্ডখানি। ওটি হল মদন তপোবন, কামাশ্রম।

ধনপতি বন্দীকমালার দিকে তাকায়। স্তূপ সারি গিরিরাজের মতো নীরব, নিশ্চুপ, ধ্যানমগ্ন। বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় আছে কিন্তু কোনো অভিঘাতহীন। যেমন করে বেউড়ের পাতা ঝরে, পলাশের ফুল খসে, কাশের দণ্ড বাড়ে, নলবনে কুয়াশা নামে, ধুতুরার ফুলে মধু জমে, বেনাবনে সন্ধ্যা আসে তেমনই তাদের ভাঙা-গড়া। ধনপতি রাজগৃহ দেখে বিস্মিত হয়েছে। সিংহদ্বার থেকে রাজসভার সিংহাসন পর্যন্ত বিস্তৃত পথটিতে রয়েছে কত গজ কত অশ্ব, কত ধন কত দৌলত, কত শকট কত দোলা, কত শাস্ত্রী কত মন্ত্রী! রাজপ্রাসাদে রয়েছে রাজপাট, রাজদণ্ড, রাজশকট, রাজভেট, রাজমুদ্রা, রাজবিহার, রাজকবি, রাজভোগ, রাজন এবং রাজভাট। আজ ধনপতি দেখে পাটহীন, দণ্ডহীন, শকটহীন, মুদ্রাহীন, ভেটহীন,

বিহারহীন, ভোগহীন, রাজহীন, ভাটহীন বন্মীক মন্দিরগুলি। সত্যিই মনোরম। বন্মীক স্তূপের বিস্তৃতি নেই কিন্তু বিস্ময় আছে প্রতিটি মৃৎকণায়। কোন বাস্তুকলায় তলমাটি ওপরে আসে, রথ গজায় ভূ ফুঁড়ে? কোন আটনিতে গৃহখানি বাঁধা, কোন বৃক্ষরসে স্তূপগুলি গড়া যে স্তম্ভহীন দাঁড়িয়ে থাকে অমন উল্লস? ঝড় জলে বৃক্ষশাখা ভাঙে, আচ্ছাদন ওড়ে, দেবদেউল পড়ে, কিন্তু স্তূপগুলি যেমন ছিল তেমনই থাকে। বিবাহের একখানি মঙ্গলঘণ্টার জন্য দেবাদিদেব রুদ্রাক্ষ থেকে সৃষ্টি করল কুমারসন্তান রুদ্র পাল এবং উপযুক্ত নির্মাণ স্থানের অভাবে নিজের শির পাতল ভূমিতে অথচ বন্মীকস্তূপগুলি কেমন নিজ হতেই গজিয়ে উঠে গোশালায়, মুখাডাঙায়, নদীচরে। যেমন নির্বাক মাথা তোলে ফণীমনসার বন, বাঁসরের কোঁড়, তালবৃক্ষের চারা তেমনই নিঃশব্দে বন্মীকস্তূপ দেহ তোলে অনাবাদিভূমিতে। ভূমি বন্ধা তাই স্তূপ হয়ে জীবনটি ছড়িয়ে রাখা। তখন রোদ দেবে রবি, জ্যোৎস্না দেবে শশী, জল দেবে জলদ আর হিম দেবে হেমন্ত। ধনপতি দেখে বন্মীকগুলি ঘিরে টগর-সন্ধ্যামণি-যেঁটু ফুল, কলকে-টগর-ধুঁতরো গাছ, অপরাজিতা-তেউড়ি-কেশুরিয়ালতা। ধনপতি ভাবে ওই স্তূপের কোনটির ভেতর আর এক বান্ধীকিমুনি বসে আছে, কে জানে!

সাধু দেখে নদীচরের চারচালা শ্মশান দেউল। চতুরাশ্রম পর্ব মিটিয়ে আত্মা ফিরে গেছে স্বভূমে। এখন দেউলের গায়ে অপরাহ্নের সুবর্ণ গোখিকা বর্ণ। ধনপতি কোনোদিন চোখ পাতেনি এমন দৃশ্যে। সে দেখেছে গড়ের সুবর্ণ চূড়া। চারভিতার গড়খানি যেমন উচ্চতায় গগনচুম্বী তেমনই সুডৌল বেড়। শিলায়-শিলায় গাঁথা দুর্গটির চূড়ায় সুবর্ণ শিরোপা। প্রভাত কিরণে সে-চূড়া সূর্যমুখীর মতো হাসে, দ্বিপ্রহরে অগ্নিকুণ্ডের মতো জ্বলে, অপরাহ্নে সিন্দূর মেঘমালার মতো ভাসে। গড় ঘিরে পরিখা। সেখানে চূড়ার প্রতিবিম্ব পড়ে। তখন মনে হয় টুঙির হেম বুঝি জলকেলি করে। সে-দৃশ্য বড়োই দৃষ্টিনন্দন। কিন্তু শোভার পরেও আছে আর এক বিস্ময়। সেটি হল দুর্গ অভ্যন্তর। সেখানে একটি কুঠরিতে সঞ্চিত আছে রাজনের সব ধনরত্ন। পাহারায় কেঁদুয়া আর দুধ গোখুরাদল। আর অস্ত্রাগারটিতে অন্ধুশ, অশনি, কুঠার, কুশমুদগর, কোঁচ, খড়্গা, গদা, তরবারি, কার্মুক, নাগপাশ, পরশু, যষ্টি, শূল আদি শতাধিক অস্ত্র। একটি অন্ধকূপ রয়েছে যাতে নিক্ষেপ করা হয়েছে শতাধিক দুষ্টখণ্ড এবং এক বিদেশি চরকে। গড়ের গড়নটি এমন যে একটি শিবধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় সপ্তবার। দুর্গ হতে কেঁদুয়ার গর্জন ভেসে আসে কিন্তু ঠিক ক-খানির বাস জানে না কেউ। তবে সবচেয়ে হিংস্র পশুটির নেঞ্জখানি যে খানিক ছাঁটা সেকথা জানা সব উজানিবাসীর। এমন যে বৈভবী গড় তা হতে চোখ সরে যায় সাধুর সার্ক ত্রিহস্ত শ্মশানদেউলে। মানব দেহটি ভস্মীভূত কিন্তু মানবদৈর্ঘের

সমোচ্চ একখানি গেহ মাথা তুলেছে। তার নাভিমূলে একটি তুলসীতরু। দেউলগাত্রে কৃষ্ণকথা— অস্ত্র আর দেহ দুইয়েরই ক্ষয় আছে, দুটিই নশ্বর। কিন্তু আত্মা অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয়। একমাত্র আত্মাই ত্রিকাল এবং ত্রিলোক বিহারী।

সমুদ্রযাত্রার কালে ধনপতি তার পরিচিত জনপদটিকে নতুন করে দেখে, নতুন করে চেনে।

## ১৩ নৌকারোহণ

ভ্রমরার সেতুবন্ধে বাদ্য বাজে—দুন্দুভি, বীণা, মৃদঙ্গ, ভেরি। সে ধ্বনিতে ভ্রমরার তটে উৎসব। সাতরং বাদ্যম ওড়ে হাওয়ায়। নৃত্যে মাতে কেয়া পাতা, শিস দেয় বাবুবন। সুবাস ছড়ায় ভূমিচাম্পা, বিরতি, বান্ধলি ফুল। দিনান্তের শুভংকরী শাল্মলি গাছে বসে দেখে ধনপতি শুদ্ধিমান্নে নামে ভ্রমরায়। সাধুর উন্নত কপালতটীতে অপরাহ্নের মরা রোদ, দুই কপোলে ঘৃত প্রদীপের আলো। দুই বান্যানী, লহনা ও খুল্লনা, বরণপাত্র নিয়ে সেতুবন্ধে সোপান ভাঙে। ধনপতি ভ্রমরায় পাণি পাতে, করতলে জল নেয়, মাথে ছোঁয়ায়। বাদ্য থামে। ধনপতি স্রোতে নামে। নাভি পরিমাপ জলে স্রোত অভিমুখে দাঁড়ায়। তারপর অবগাহন করে নীল ভ্রমরা নীরে। তুলে আনে পঙ্ক, নিক্ষেপ করে তীরে। পর পর পাঁচ বার। নদী সংস্কারের পর নদীর কাছে কামনা করে শান্তিবারির। ধ্বনিত হয় মঙ্গলশঙ্খ। ধনপতি পান করে নদীবারি। তারপর স্মরণ করে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ ঋষিগণকে। তর্পণ করে অগ্নিস্থান্ডা পিতৃদেব, ধর্মরাজ যম ও সত্যবাদী ভীষ্মের। জল-অঞ্জলি প্রদান করে মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠতাত, মাতুল, পিতৃষসা, মাতৃষসা, শ্বশ্রু, শ্বশুর, গুরু, উপাধ্যায়, মাতুলানী, জ্যেষ্ঠতাতপত্নী, পিতৃব্যপত্নীকে। যে-স্রোত বহন করে নিয়ে যাবে ধনপতির সপ্তডিঙা তাকে অর্পণ করে ধান্য-তিল-মুগ-যব ও মাষকলাই এই পঞ্চশস্য। যে নদীবায়ু ডিঙার বাদ্যমগুলিতে বায়ু ভরে দেবে তাকে অর্পণ করে আশ্র-পাকুড়-বট-অশ্বথ ও যজ্ঞ ডুমুরের পল্লব। যেসব জলদল ও জলকুসুম ডিঙাপথে স্থানান্তরিত হবে তাদের অর্পণ করে হরিদ্রার পীত, তণ্ডুলের শ্বেত, কুসুমের লোহিত, দক্ষ তুষের কৃষ্ণ ও বিশ্বপত্রের সবুজ চূর্ণ। যে-নদীগর্ভ ডিঙার প্রাণীকুলের বর্জ্য গ্রহণ করবে তাকে অর্পণ করে গোমূত্র-গোময়-গোদুগ্ধ-গব্যাদি ও গব্যঘৃতের দেহশৌধি পঞ্চগব্য। ডিঙাপথে যেসব কুস্তীর-মকর-

‘ত্রিমিস্রিল ও ফণী স্থানচ্যুত হবে তাদের অর্পণ করে দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-শর্করা ও মধুর পঞ্চামৃত। পশ্চিম আকাশে সূর্যদেবকে জবাদি রজপুষ্প ও দুর্বা দিয়ে জলযাত্রার অনুমতি গ্রহণ করে। বাদ্য বাজে আপন উচ্ছ্বাসে। এক-যুগ পরে আবার সপ্তডিঙা যাবে দক্ষিণ পাটনে। কূল ছেড়ে অকূল দরিয়ায় ভাসা, ভূতল ছেড়ে অতলে কেরয়াল বাওয়া।

ধনপতি তীরে ওঠে। বস্ত্র বদল করে। তারপর বিদায় মাগে দুই ললনা লহনা-খুল্লনার কাছে। লহনা এগিয়ে দেয় প্রজ্জ্বলিত সর্পি দেবদীপ। দু-হাতে উত্তাপ নিয়ে শিরে ঠেকায় সদাগর। খুল্লনা দ্রুত দীপশিখা আঁচলায় ঢাকে। সামলাতে হবে চিতাকাষ্ঠের শ্বাস, কেয়া পত্রের চঞ্চল বাতাস হতে। নিশিপথে বিভা পাবে সদাগর, অমা রাতে প্রভা পাবে। দাসী দুবলা বায়ু-মুখে তুলে ধরে ব্যজনী।

ধনপতি করজোড়ে জ্ঞাতিদের সমুখে দাঁড়ায়। বলে, আমি দক্ষিণ পাটনে যাই রাজনির্দেশে। নিজ গেহ-গারি আপনাদের হাতে অর্পণ করছি। দুই প্রোষিতভর্তৃকার এখন আপনাই আপদভঞ্জন, বিপদতারণ।

এক জ্ঞাতি সন্তোষ দেয়, ওহে ধনপতি, যে দেখার সেই দেবাদিদেব মহাদেব সব দেখবে। তার ধ্যানজপ করবে নিত্যদিন, দেখবে গৃহ ও দরিয়া দুটিতেই স্বস্তি বিরাজ করছে।

অন্য জ্ঞাতি বলে, এটিই হল শেষ সত্য। নীলকণ্ঠ সহায় হলে সংসারের সব গরল সেই ধারণ করে। তখন সত্য দু-টিকে দেখে মনে হবে এক জঠরের তনয়া। কোনো বিবাদ নাই, বনে ছেলি চরানো নাই, জো-গৃহ নাই।

অন্য জন আশ্বাস দেয়, তুমি ভাবিত হোয়ো না হে ধনপতি। ললাটে লেখা থাকলে কেঁদুয়ার থাবা আর কালনাগিনির ছোবল গেহে থেকেও আটকাতে পারবে না। তুমি ‘শিব’ ‘শিব’ বলে যাত্রা কর, তারপর ললাটে যা আছে ঘটবে।

আর এক জ্ঞাতির পরামর্শ, ডাঙার সংসার নিয়ে ভেব না, তুমি বরং নোনা বায়ে দিকগুলি হুঁশে রেখো। সাগরে পথ হারিয়ে কত ডিঙা বিদেশ-বিভুঁয়ে বাহিত হয়। তারপর সন্তান বয়সোচিত হয়ে পিতৃসন্ধানে গিয়ে দেখে এক বিজন দ্বীপের নির্বাস্তব বাসিন্দা সে। কুলধারকটি থাকলে তবে সন্ধানে যাওয়া, না হলে সারাজীবনের দ্বীপান্তর।

বাস্তব দনাই পণ্ডিত বলে, গোধূলিপর্ব শেষ হয় হয়, গগনে গ্রহ-তারার জাগে। এবার তাহলে নৌকারোহণ হোক।

জ্যেষ্ঠতাত বলে, সেই ভালো। গোধূলিতে যাত্রা শুভ। শুধু বলে রাখি, বাবা ধনপতি, তোমার রন্ধনশালাটি আমার দিকে তিন বিঘত এগিয়ে এসেছে। আমার গো-চালাটি নতুন করে করার সময় খানিক তোমার দিকে এগোতে হবে। তাহলে

খড়নগুলি ঠিকঠাক বসবে। আর নতুন বাটির জন্য এজমালি পুষ্করিণী থেকে গণ্ডা কয়েক সাগুন কাটব। তুমি যখন নতুন কোঠা তুলবে তখন তুমিও কেটো। তাহলে ‘শিব’ ‘শিব’ বলে ডিঙাতে চড়া বাবা।

কাণ্ডার বুঢ়ন এগিয়ে আসে বিদায়ে। ধনপতির বাবা জয়পতির সঙ্গে সাগর পাটনের কালে তার ছিল যৌবনকাল। কপাটবিশাল বক্ষ, আকর্ষণ দিঘল চক্ষু, শ্যাম-চামর কুস্তল। দুই বাহু যেন তমাল তরু। অতল জলের বর্ণ চিনত, গহীন গাঙের বচন বুঝত। বর্ষায় যখন কূল হারাত ভ্রমরা তখন বুঢ়ন পারাপার হত নদী। এখন চোখে জমেছে ধূম, দেহে রস। কিন্তু জয়পতির ছেলে ধনপতিকে সে অন্যের কর্ণমুষ্ঠিতে ছাড়তে নারাজ। দক্ষিণ পাটনে জলের মতি চঞ্চলা, কুহকের নানা ছলা, কুহেলির নানা কলা। সাত তরীতে কত জীবন! আকাশের মতি, বায়ুর গতি আর জলধির স্থিতি বুঝতে না পারলে অকূলে ভেসে যাবে সব। কিন্তু সব বিদ্যাই ব্যর্থ যদি না জলদেবের আশীর্বাদ মেলে। বুঢ়ন ভ্রমরার দিকে তাকিয়ে করজোড়ে নমস্কার করে জলাধিপতি বরুণকে।

নাইয়া-গাবরেরা একে একে শঙ্খচূড়, চন্দ্রপাল, ছোটোমুঠি, গুয়ারেখি ও নাটশালায় ওঠে। বুঢ়ন ওঠে প্রথম ডিঙা মধুকরে, সে পথ দেখাবে বাকি ছ-টি ডিঙাকে। মধুকরের পিছে সদাগরের ডিঙা দুর্গাবর। তার ভেতর ছইঘরে সাধু আবাস। সকলের নৌকারোহণের পর বাদ্য বাজে সমবেতে। ভ্রমরার জলে তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।

দূলে ওঠে সপ্তডিঙা। গোধূলির কমলা রং মেশে ভ্রমরার জলে। পশ্চিম দিগন্তে আঁধার নামে তমাল বনে। শেষ সারসদল কুলায় ফেরে। দিবানিদ্রা শেষে উল্লুক এসে বসে পর্কটির ডালে। ফড়িঙার পাল সন্ধ্যার নৃত্যগীত সারে। চামচিকা ডানা ঝাড়ে নিশিবিহারের প্রস্তুতিতে। কুয়াশা নামে আকাশের ক্রোড় বেয়ে। শিশিরের স্বেত দানা আর নিশির শ্যাম কণা ঝরে ভ্রমরার জলে। সপ্তডিঙায় বাদ্যি থামে। জলে কেরয়ালের ছপছপ স্বর। সহস্র ডিঙাধ্বজ ওড়ে আঘন বায়ুতে। বাদাম ওঠে সপ্ত ডিঙায়, দীপমালা হাসে। নদীর ওপারে চিতাবহি জ্বলে। হেমন্ত প্রদোষে কেউ ভুলোকের কর্ম সেরে সুরলোকে চলে।

মৃৎদীপ হাতে একরাশ বিষাদ নিয়ে ঘরে ফেরে খুল্লনা। বেদনার কণা নয়ন কোণে, নাসিকা বাঁকে, বুক মাঝে, ওষ্ঠ ভাঁজে, জিহ্বা তলে। খুল্লনা দেখে তার জীবনের সব দীপ্তি সপ্তডিঙার দীপমালা হরণ করে নিয়ে চলে নদীবাঁকে, নোনা বায়ে দূর দ্বীপে। ভ্রমরার দু-কূলে বকুল-বহেড়া বৃক্ষ-শিরে নেমে আসে আঁধার। খুল্লনার অন্তরেও তৈরি হয় এক মসী প্রান্তর। সেখানে একটি জোনাকও নেই বাতি দিতে। নেই কোনো হলকর্ষণ, বীজবপন, নৌকাযাত্রা, জলাশয়, দেবগৃহ, নাট্যগীত।

একটি জনপদ যেন হঠাৎই হারিয়েছে তার কীটপতঙ্গ, চন্দ্র-তারা, ভূত-প্রেতিনি, নিশিডাক, পাক-পক্ষী, জলধি, নীলাকাশ। খুল্লনা জানে না সে কী করবে সাধুর শত কবুতর নিয়ে। সদাগর না থাকলে তাদের ক্রীড়া নেই, ওড়া নেই, রণ নেই, রঙ্গ নেই। তখন বাকহীন খোপবন্দি জীবন। ওই সাত তরী নিয়ে যায় কুরঙ্গ, তুরঙ্গ, পামরি কন্সল ইত্যাদি শত পণ এবং খুল্লনার সব প্রীতি, হর্ষ ও প্রমোদ। সাধু না থাকলে চোখে নেই মায়াকাজল, রূপে বিচ্ছুরণ, শয্যায় কোমলতা, ওষ্ঠে উত্তাপ, স্তনে আলোড়ন, যোনিতে ক্ষরণ। সব কিছু ডিঙা ভাঙারে ভরে নিষ্পদ সপ্তযান ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলে ভ্রমরার বাঁকে। নয়ন থেকে ক্রমশ মুছে যেতে থাকে বাদাম, নিষগদগু, সহস্র ধ্বজ, ছইঘর, ডিঙাকর্ণ। খুল্লনা জানে না দূরে মিলিয়ে- যাওয়া ওই আলো আবার কতকাল পরে ফিরে আসবে ভ্রমরার সেতুবন্ধে। আবার কবে শত এয়োতির ওষ্ঠে ফুটবে হাসি। বাদ্যি বাজিয়ে আপনজন ঘরে ফিরছে শুনে নগরিয়া কোন ভবিষ্যে ছুটবে নদীতীরে। বান্ধবজন বলবে, এ-পাটনে কী গীত বাঁধলে একবার শোনাও দেখি এই সাঁঝবেলা।

খুল্লনা ভাবে মা মনসার সঙ্গে চাঁদ বান্যার বিবাদে অহি দংশন হল লখাইয়ের। বেহুলার পরিধান বস্ত্রখানি মলিন না হতে স্নান হল বদন, চরণ আলঙ্কারে খুলি না লাগতে ধূসর হল দেহচর্ম, সীমস্ত সিন্দূরে কালি না পড়তে কালা হল লখা দেহ। বেহুলা পতি-তনু কোলে তুলে কলার মান্দাসে যাত্রা করল সুরপুর। শ্বশ্রুমাতা সনকা দীর্ঘ ছয় মাস জ্বালিয়ে রাখল তৈল-প্রদীপ আর দাড়িস্ত তলে পুঁতে রাখল বাসর-অন্ন। খুল্লনার শ্বশ্রু নেই, কে প্রজ্বলিত রাখবে প্রাণদীপ, কে শঙ্খধ্বনি করবে সাঁঝে, কেউবা ধানদূর্বায় বরণ করবে আত্মজন? যিনি রয়েছেন সংসারে, সেই সতা লহনা তো কালিসাপিনী। কপটবন্ধ পত্ররচনা, বাড়ি বাড়ি ফিরে ঔষধ করা, কিল-লাথি মারা, সকল অপকর্মই সু-সম্পাদন করেছিল সাধু যখন গৌড়ে গিয়েছিল শুক-শারির পিঞ্জর গড়াতে। সাধু-বিপদে লহনা যে লক্ষা যাবে মান্দাসে চড়ে তেমন আশাও দিবাস্পন্ন। আর বাসরবাসিনী বেহুলা ছিল একা, তাই লখাইয়ের কুণপ নিয়ে উঠেছিল মান্দাসে। একে একে কুণ্ডরবন্দ, বাঁকা দামোদর, গঙ্গাপুর, আমদপুর, কঙ্করঘাটা, জগাতিঘাট, বোয়ালিয়া-দহ হয়ে ত্রিবেণীর গাঙ্গে নেত ধোপানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। কিন্তু খুল্লনার জঠরে যে সন্তান! অকূল দরিয়ায় সদাগর দিক হারালে কী করে তার সন্ধানে যাবে সে ঘাটের পর ঘাট পেরিয়ে? চণ্ডীকোপে সদাগর পরদেশে বন্দি হলে কী করে মুক্ত করে আনবে? বেহুলার মতো সে কি পারবে নৃত্যকলায় জয় করতে দেবলোক?

হঠাৎ তিরতির কেঁপে ওঠে তার অষ্ট অঙ্গ। সে শোনে যেন কোনো দূর দেশে বাজে মৃদঙ্গ-মন্দিরা। কঙ্কণের স্বর জাগে। বীণা সুরে দুলে ওঠে ঝাবু বাঁথি। খঞ্জুনি

ধ্বনিতে নাচে কেয়ার দিঘল পাতা। নূপুরের বোল জাগে বোড়ার বট নিকুঞ্জে। পিনাকের ধ্বনিতে নৃত্য করে খুল্লনার বেণি আর কাশবনের ফণী। সুদূরের ডাক ভেসে আসে কানে—‘রত্নমালা’ ‘রত্নমালা’।

লহনা নাড়া দিয়ে বলে, সপ্তডিঙা বাঁকে মিলিয়ে গেছে বহুক্ষণ, এখনও তাকিয়ে কী দেখছিস লো? স্বপন? স্বপনে মানুষ মিললে শিশিরে ধান ফলত রে। চ, সাঁঝের কাজ সারি।

রাত নামে উজানিনগরে। ঘরে চলে লহনা-খুল্লনা। সঙ্গে পরিজন, বিষাদী জনপদবাসী। আপনজনেরা গেল সুদূর সিঙ্কু-পাটনে। জলপথখানি কেমন উতোল, কত ঝঙ্কাময়, কত শীতল এই আঘনে কে জানে! শত ভাবনা-ভীতির ভেতর হঠাৎ এক লিলুয়া বায়ু ভ্রমরা বুক হতে জেগে বিহার করে নদীতট। খানিক বালুকণা মুখে তুলে প্রবাহিত হয় বিস্তৃত ওকড়া বনের ওপর দিয়ে চাপা স্বরে। তারপর অপাঙ্গ, আতয়ি, নিসঙ্ক্যার শুষ্ক পাতা ঝরিয়ে প্রবেশ করে বেউড়বাঁশের বনে। আঘন বায়ুর এমন আকস্মিক আবির্ভাবে শারিকা সংসার হয় সরব। নদীর ও-কূলে চিতাগ্নির নির্বাণ হতে না হতে প্রাণবায়ুর নগরভ্রমণ, ভাল না মতিটি। ইন্দ্রধাম যখন ওপরে তখন গগন আরোহণই ছিল বিধেয়। শারিকা পরিবার সতর্ক করে ভ্রমরা-ফেরৎ উজানি ললনাদের, ওহে সমবেতে দীপখানি সামলাও। ওই দেখো বান্ধব খোঁজে দেহত্যাগী আত্মা।

খুল্লনাকে বেট্টনী দেয় এয়োবতী নারীর দল। প্রজ্বলিত সপিদীপ চলে গৃহ মুখে। হিমকণা ঘন জমে গগনে।

## ১৪ ডিঙা দর্শনে প্রতীক্ষা

শঙ্খধ্বনিতে আঁধার নামে ভ্রমরার দু-কূলে। ঘরে ফেরে চারণের ধেনু, গাছের পক্খি, খেতের লাঙ্গলা, বাঁক-ফেরি দধিকর। এবার হাত-পা ছুড়িয়ে দিনের হিসেব-নিকেশ, গল্পগাছা। গাভি তার বৎসটিকে বলে, ‘বড় হিম পড়ছে ক-দিন। নদীর জল সকালে যেমন ঘন তেমন শীতল। খেয়ো না বাছ। এই অগ্রহায়ণ মাসে দিবানিদ্রাও অবিহিত। পালনীয় হল উপযুক্ত পরিমাণে রৌদ্রসেবন।’ গাছের পক্খি তার কামকাতর পতিকে বলে, ‘এখন ঘুমিয়ে নিশায় জাগলে তো পারতে!’ পতি বোঝে না সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে কেন নিশায় জাগবে। পত্নী আকাশের দিকে চোখ তুলে বলে, ‘আজ নিশায় রাহুগ্রহ কুণ্ড রাশিতে গমন করবে। ফলে মুখে কষ্ট-কলহ-অভিমান, কর্ণদ্বয়ে বন্ধন-বধভয়-ধনহানি। অন্যদিকে কেতুগ্রহ সিংহ রাশিতে

গমনের কারণে মুখে ফল মৃত্যু, পাদদ্বয়ে হানি এবং গুহ্যে সর্বস্ব নাশ। নিদ্রাকালে চক্ষু-কর্ণ খোলা রেখো।’ বিস্মারিত চক্ষু পতি ভাবে কোন প্রক্রিয়ায় ও-দুটি অঙ্গ খোলা রেখে ঘুমোনো যায়। লাঙ্গলা তার সহধর্মীকে বলে, ‘আকাশের মতি দেখে মনে হচ্ছে এ-মাসে বৃষ্টিযোগ আছে। তার আগে ভুঁইশশা, বরবটি আর কুমুড়ার বীজ বুনতে হবে। লাগাতে হবে পলাকড়ি চারা। তার পরে, মাসের শেষে, হলধরের বউয়ের সাধভক্ষণ।’ স্বশ্রমাতার মাথায় হাত। নড়বড় করছে পুত্রবধূটি, পলাকড়ি-বরবটি বড়ো হল? চাঁদপানা মুখখানি হাঁড়িতাল করে বলে, ‘তাহলে বৎসের অন্নপ্রাশন আর হলধরের বউয়ের সাধভক্ষণ একদিনেই কোরো।’ দধিকর গোশালায় তার গাভি দুটিকে বলে, ব্রাহ্মণেরা গোমেদ, বৈদূর্য মণি, ঘোটক, বস্ত্র, অস্ত্র, মৃগমদ, কৃষকতিল, তৈল আদি দ্রব্যাদি রাহু-কেতুর প্রতিকারার্থে গ্রহণ করছে কিন্তু এক ভাগও দধি ক্রয় করছে না। তারা তাকিয়ে রয়েছে দধিখ বৃক্ষের দিকে। কপিবররা বৃক্ষশাখে বসে লঙ্কাকাণ্ডের গল্পো করে, ধনপতির সিংহলযাত্রার কথা বলে আর মাঝে-মধ্যে একটি কংবিশ্ব ঘ্রাণ নিয়ে নীচে ফেলে। ব্রাহ্মণেরা বলে দধিখ ফল নাকি দধির চেয়েও উপাদেয়, ভ্রমরার জল নাই তাতে।’ দধিকর গাভি দুটিকে বলে, ওরা অনুধাবন করে না জলহীন দুক্ষে উদরাময়ের আশঙ্কা।

কথায় কথায় রাত্রি বাড়ে। গল্পো-কথা ততক্ষণে নিদ্রায় বেসামাল। মস্তক দোলে বাঁশরি-মাতন ফলীর মতো। গাভি নদীজলের হৈমন্তিক গাঢ়তার কথা ভুলে ভ্রমরার তীরে পৌষসংক্রান্তির মহোৎসবের কথা বলে। গাছের পক্খি গ্রহ-রাশির ফল ছেড়ে আকাশের তারকা গোনে। খেতের লাঙ্গলা হলধরের পত্নীর পরিবর্তে নিজ সহধর্মীর সাধভক্ষণের দিন ধরে। দধিকর দধিভাগুগুলি বৃক্ষতলে রেখে দধিখ বৃক্ষে চড়ে কপিদের সঙ্গে রামচন্দ্রের সিংহলযাত্রায় গল্পো জোড়ে। তখনই দূরে জাগে আলোকমালা। সে আলো ভ্রমরার স্রোতে ভাসে, দোল খায়। বয়ে নিয়ে যায় ধনপতির সিংহলযাত্রার বার্তা এক জনপদ থেকে আর এক জনপদে। নেভানো পিদিম আবার জ্বালায় বউ-ঝিরা, গাভি গোশালা ছেড়ে বাইরে আসে, গাছের পক্খি নতুন জোনাক গাঁথে গোময়ে, শিকার-সন্ধানী শার্দূল থমকে দাঁড়ায়, শিবা ভ্রমরার স্রোতে কেরয়াল ধ্বনি শোনে, মীন সুবাস নেয় ডিঙা-দারু গাভীর, ডহু, পনস, পিয়ালের। নদীতটের এক বাউলি কুটির থেকে বেরিয়ে হাসতে দেখে নদীচরের বালুকে। সপ্তডিঙার বাতিতে তাদের মুখ জুড়ে আলো। বাউলির মুখটিতেও হেম বর্ণ আভা। সে তার বাদ্যটি পেড়ে নতুন একটি কলি গাঁথে কঠে, ‘ব্রহ্ম আমার বসত গড়ে নদীতীরে এই নিশীথে।’ পর্কটীর ডালে উপবিষ্ট উল্লুক মন দিয়ে কলিটি শুনে দর্শনচর্চায় মাতে। বাউলিকে বলে, ব্রহ্ম হল তোমার উদ্বৃত্ত অন্ন। ওই উদ্বৃত্ত দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন, মার্জার ভোজন, ভূশণ্ডি সেবা। আর

তোমার গীতটি হল উদ্ভূত স্বর, ঝড় হল উদ্ভূত বায়ু, নদী হল উদ্ভূত নীর। ওহে বাউলি, চার উদ্ভূতে তোমার বাস, সপ্তডিঙায় তোমারই-বা কী আমারই-বা কী! তুমি বরং পরের কলিটি বাদ্যে বাঁধো।

পক্খি-পতি প্রথম দেখে সপ্তডিঙার আলো। চক্ষু খুলে নিদ্রার কঠিন পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিল সে। ভাবছিল কোথায় পাতবে চক্ষু—উর্ধ্বে না অধে, অগ্রে না পশ্চাতে, নিকটে না দূরে, আশয়ে না নিরাশয়ে, অভাবে না স্বভাবে? সে দেখে মাথার ওপর শশীহীন অনন্ত আকাশ, সামনে বিস্তীর্ণ উলুখাগড়ার জঙ্গল, তাল-তমাল-চালতার ঘন কানন, গভীর বেণু বন আর ভ্রমরার বাঁকে ধনপতির সপ্তডিঙার বাতি। ডেকে তোলে পত্নীকে। বলে, ‘চলো দেখে আসি সদাগরের সাগরযাত্রা। রাঙ্ক-কেতুর কারণে যখন চক্ষু-কর্ণ বন্ধ রেখে নিদ্রার উপায় নাই, এই ভালো। বরং নিষঙ্গ দণ্ডে চড়ে খানিক সঙ্গও দেওয়া যাবে সাধুকে।’ তাদের দেখাদেখি বৎসগুলিও ওঠে। জাগে সব ক-টি পক্খিশালা। কূজনে ভরে বৃক্ষ, বন, জনপদ, নদীতট। পাখের হাওয়ায় ঢেউ জাগে হেমন্তের পাকা ধান্যে, দোল খায় দিঘল পুকুরির নীলপদ্ম, নেচে ওঠে অলাবু লতার ডগা, ফণ তোলে ফণী। কুয়াশার ভেতর দিয়ে উড়ে আসে পক্খিকুল। মাকন্দের শাখে বসে পিক, চালতার ডালে চিলানি। নিম্ব বৃক্ষে কাউ, হরীতকী বৃক্ষে শালিকা, মদন বৃক্ষে খঞ্জন, বট বৃক্ষে শুক পা রাখে। ভ্রমরার দু-কূল জুড়ে নানা রঙের এক আশ্চর্য সমাবাস, নানা সুরের এক বিরল সমাপত্তি।

গাভি ও গোবৎস তলিয়ে গিয়েছিল গভীর নিদ্রায়। গোবৎস মায়ের চক্ষু এড়িয়ে ভ্রমরার শীতল বারি পান করছিল উদর ভরে। দেহ-চামরটি দিয়ে হেমন্তের হিম ছড়িয়ে নিচ্ছিল গাত্র-মস্তকে। কিছুই চক্ষে পড়েনি মাতৃ-দেবীর। তিনি ততক্ষণে ভ্রমরা থেকে যমুনায়। গোয়ালিনি রাধা চলেছে সখীদের নিয়ে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় দধি-দুগ্ধ বিক্রয়ে। ঘাটের মাঝি কালা। তার তরীখানি এতই ছোটো যে তা কেবল এক জনকেই পার করতে পারে। তাই সঙ্গী গোপিনীরা রইল এ-পাড়ে, রাধা চললে ও-কূলে। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণে মিলন হলে তার কি আর কুল মেলে! ছোট জলযানটি অকূল দরিয়ায় হয়ে উঠল একখানি বিশাল প্রমোদতরণী। তখন রাধা-তরীতে কৃষ্ণ-হাল। যমুনার কাণ্ডারি কালার লীলা দেখছিল ভবনদীর কাণ্ডারি শ্বেতশুভ্র গাভিটি ভ্রমর কালো চক্ষে। হঠাৎ কর্ণে ঢোকে পক্খির কূজন। যমুনা নয়, এ ডাক আসে ভ্রমরার তীর থেকে। গোবৎসও জেগে ওঠে। ভ্রমরা থেকে ফের গোশালে। তবে কি সকাল হল? কিন্তু দু-চক্ষে যে ধামা-ভরা নিদ্রা। বাইরে এসে দেখে গ্রহ-তারাগুলি সবে বিপণশাল সাজিয়ে বসেছে। রাতের স্বরও খনা। ঘন হতে দেরি আছে। কিন্তু পক্খিকুল তাহলে অমন ডাকে কেন? এক প্রহর রাতে এ কীসের মহোৎসব? ভ্রমরাগামী একটি শুক-পক্খি তখনই বলতে

বলতে চলে—সপ্তডিঙা ভেসে আসে/ভ্রমরার জলে/কামিনী কঙ্কর গেলে/ কমলের দলে। শুকের সবেতেই হেঁয়ালি। পদ্মবনে কামিনীর দেখা মেলে, সে কামিনী দেবী হলে পদ্মাসনে বসেও কিন্তু হস্তীর ভার কেমন করে সহিবে পঙ্কজ-দল! জাগরণে এই জটিলতার চেয়ে স্বপনে কৃষ্ণ-রাধিকার ওই নৌকাবিহার শ্রেয় ছিল। কিন্তু প্রহেলিকার প্রথম বাণীটি স্পষ্ট—ভ্রমরার জলে ভেসে আসে সপ্তডিঙা। গাভি ও গোবৎস ডাক দেয় উচ্চস্বরে। গোশালা থেকে বেরিয়ে চলে যত বলদ, ষণ্ড, গাভি এবং গোবৎসা ও গোবৎস। টুংটাং ঘণ্টি বাজে গোবৎসের গলায়, ঝমঝম বোল ওঠে বলদের পৃষ্ঠাসনে, রিনিঝিনি ধ্বনি জাগে গাভির শৃঙ্গে। পুচ্ছ দুলিয়ে গো-কুল চলে ভ্রমরায় সপ্তডিঙা দর্শনে।

লাঙ্গলা দেখছিল জনকরাজের দুঃখ। দু-চক্ষের বারিতে বসন ভেজে, সিক্ত হয় মেদিনী। দশরথের সুপুত্র বীর ও ধীর রামচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ দিল কন্যার। দৈবের বিপাকে রামের হল বনবাস। সঙ্গে চলে রাজনন্দিনী সীতা। তারপর সীতাহরণ, অশোকবনে বাস, রাম-রাবণ রণ, সীতা উদ্ধার, সেই সীতার দ্বিতীয় বনবাস ও পাতালপ্রবেশ। মিথিলার গৃহে গৃহে অরক্ষন। বিলাপ বেদনা ব্যথায় মিথিলা আজ উন্মাদী। আবশ্যক ছিল না অযোধ্যার, রাজ্যম্ভের, রাজপ্রসাদের, রাজশয্যার, রাজঐশ্বর্যের, রাজবৈভবের যদি দু-দুটি বনবাস আর অগ্নিপরীক্ষা মিথিলাকন্যার প্রাপ্তি হয়। আমাদেরও, এই মিথিলাবাসীদের, স্বর্গসুখে প্রয়োজন নেই। মরণের পর আমাদের নরকে পাঠিয়ে। কন্যার চিবুকটি তুলে একবার শুধু বলব আর নয়ন-বারি ঝরাস নে মা-জননী। এ-যদি হয় রামরাজ্য তবে তা অগ্নিকুণ্ডে যাক। তুই বঁইচির যে নীল ফল খেতিস, এই দেখ এনেছি তোর জন্যে। এই তোর দুষ্ক বিনুক, হেম মুকুলিকা, পদাঙ্গুরীয়, অঙ্গবদ্র, প্রিয় পুষ্প সন্ধ্যামালতী। লাঙ্গলার নয়নবারি বাঁধ মানে না। বক্ষণ্ড কাঁপে। জনকরাজ্যের মতো সেও হলকর্ষক, যদি আর এক সীতা উঠে আসে তার হলের তল থেকে! তারও ললাটে লেখা থাকে এত ব্যথা এত শোক! লাঙ্গলার মন লাঙ্গলে, ওদিকে ‘হাম্বা’ ‘হাম্বা’ ‘ব্যা ব্যা’ ডাক গোশালে, কদমতলে, নদীচরে। শ্রীকৃষ্ণের যমুনাতীরের ধেনুগুলি কেমন করে সুদূর মিথিলার কোশী নদীর চরে এল ভাবতে গিয়ে নিদ্রা ভাঙে এবং লাঙ্গলা বোঝে গো-কুলের সমবেতযাত্রা ভ্রমরামুখী। কিন্তু এতগুলি গো-ধন সন্ধ্যারাতে সমসময়ে কামাতুর হল কেন! এ কি কৌম বিকার, যৌন অনাচার? নাকি ভবনদী পারের জন্য ভ্রমরার দু-কুলের সকল অধিবাসীদের কাছে সমবেত আহ্বান। মহামারী, প্লাবন, রণে এমন যাত্রা ঘটে। এ বুঝি তার পূর্বাভাস। লাঙ্গলা পত্নীটিকে ডেকে তোলে। উঠানে নেমে আসে দু-জনা। দেখে আকাশের কোলে ডিঙাবতির আলো, বায়ুতে কেরয়ালের ছপছপ ধ্বনি। তাদের ডাকে ওঠে হলধর ও তার সহধর্মিণী। জাগে

পড়শি, পল্লি, পুরো পুরী। ভ্রমরার বালুচরে চলে যষ্টিহস্তে বৃদ্ধ, কার্তিককেশী যুবক, জটাধারী সাধু, উচ্ছল কিশোরী, সদাসতর্ক ধ্রৌড়। লালসালা বলে, একটু ধীরে চলো গো সর্বজন, হলধরের পত্নীটির পূর্ণ ন-মাস। ভুঁইশশা ও বরবাটি রোপণের পূর্বেই সাধভক্ষণের ব্যবস্থা এবং নগরের রমণীকুলের যথাযথ আপ্যায়ন ও ভোজন। তোমরা যাক্ষা কোরো জাতকটি যেন তীর্থযাত্রা-পরায়ণ, সুশীল, কলাবিদ্যাকুশলী, বিলাসী, পরোপকারী, ধর্মপথী আর বিভবযুক্ত হয়।

কপিবর বলছিল দধিকর শুনছিল সাগরে শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের কথা। তখন যেমন দৈবসার-সতবর্গের ঘন জঙ্গল, তেমন মেঘছোঁয়া তালসারি আর গভীর বেণু বন। কপিদল একটি করে ধরে আর মৃত্তিকাচূত করে। তারপর সেগুলি বহন করে আনে সাগরতীরে। এখন প্রয়োজন সেগুলি জলতলে প্রোথিত করা। দধিকর বলে, ‘জানি, কাষ্ঠমার্জারি...।’ কপিবর দস্ত প্রদর্শন করে, ‘কাষ্ঠমার্জারি বহন করবে তাল-তমাল-সতবর্গ? ও বহন করেছিল নুড়ি, আমরা পর্বত। পর্বত বিনা ভেসে যেত সাগরতলের তরু-দারু-বেণু। সাগর বন্ধন করে তারপর সমবেত সিংহলযাত্রা।’ কপিবরের কথার মাঝে পক্ষির কূজন, গো-কুলের ‘হাম্বা ‘হাম্বা’ ডাক, হলধরের পোয়াতি পত্নীকে মনুষ্যজনের সতর্কবার্তা ইত্যাদি ধ্বনি জাগে। কপিদল এবং দধিকর দধিখবৃক্ষের ডালে বসে নিশার প্রথম প্রহরে উষার কর্মচাপল্য দেখে। তখনই দূরে ধনপতির সপ্তডিঙার আলো হাসে। দধিকর বলে, ‘আজ্ঞে আপনাদের নির্মিত শ্রীরামচন্দ্রের সেতুখানি যদি ধনপতি সদাগর...।’ কথার বিস্তার অর্থহীন। দধিখবৃক্ষ-সহ কপিবর অদৃশ্য, কপিদল নিরুদ্দেশ। দধিকর অগ্রহায়ণের আকাশতলে দাঁড়িয়ে ডাক দেয় রাধিকাপল্লির মানুষজনদের—‘চল হে, ভ্রমরায় যাই।’ সে আহ্বানে বেরিয়ে আসে অজস্র বাতি। কোনোটি মৃৎপাত্রের কোলে, কোনোটি কদলীবৃক্ষের খোলে। দধিকর বলে, শ্রীরামচন্দ্রের সাগরবন্ধনের কালে কাষ্ঠমার্জারিও নুড়ি বইল, আমরা পারিনি। লক্ষ্মণ ও কপিকুল-সহ শ্রীরামচন্দ্রের সিংহলযাত্রার দৃশ্য দেখিনি। আজ অন্তত সদাগরের সাগরযাত্রার সাক্ষী থাকি। বাপধনেরা, সপ্তডিঙার সহযাত্রায় সঙ্গী হতে না পার, দূর থেকে গড় হয়ো। তীর্থযাত্রা, রথযাত্রা, শবযাত্রা—সব সমবেত যাত্রার পদরেণু মাথায় নিয়ে।

ভ্রমরার দুই তীর উৎসবে মাতে। হেমন্তের হিমেল বায়ুতে নৃত্য করে কাশ ফুল, সুবাস ছড়ায় শিউলি, শিস দেয় কেয়া বন, চামর দোলায় গো-কুল। তারাঘন গগনের তলে পেখম মেলে কেকা, গীত গায় কোকিলা, লক্ষ দেয় গোবৎস, বাম্প মারে কপিবর, মাতৃজঠরে পাক খায় হলধরের ভাবী জাতক। পখিছানা, গোবৎস, ছেলিশাবক এবং কপি ও মানবকুলের শিশুদের রঙ্গে রাখতে দেহ-

কসরতে মাতে গঙ্গাফড়িঙা, বায়ুক্রীড়া করে ক্ষেমংকরী, টু দেয় কমট, বাস্তু গড়ে কুলির, চলনের মুদ্রা শেখায় শম্ভুক। সপ্তডিঙার আগমন সংবাদে আশ্রুত রসরাজ মোদক, এক ধামা মৌক্তিকাক্ষ নাডু পরিবেশন করে। হলধর গৃহে ফিরে নিয়ে চলে চাঁপা ও মর্তমান কদলী। কপিদল আশীর্বাদ করে হলধর-পত্নীর জোড়া কন্যা হোক, পরমায়ু বাড়ুক পিতার। ক্ষীর ও দধি আনে গোবর্ধন আলু। বিতরণ করে ভ্রমরাতীরের সমবেত মানুষ, কপি, পক্খি এবং অনান্য প্রাণীদের। কমলবনের জোড়া পদ্মগোখুরা নাডু, ক্ষীর, দধি খায় না। হারাধন বাথুলে তাদের জন্য দুগ্ধ আনতে ধামে ফেরে। কিন্তু নাডু, ক্ষীর, দধি এবং ঘন দুগ্ধে জিহ্বায় বড় মিষ্টতা। চক্রপাণি বারুই গুয়া, চুন ও কর্পূর দিয়ে তাম্বুল সাজতে বসে। কিন্তু ক্ষীর, দধি, দুগ্ধ সবই গুরুপাক, তাম্বুলে পরিপাকে সুব্যবস্থা নাই। তাই নরানন্দ নাগের পত্নী সিদ্ধবিদ্যা শঙ্খভস্ম, পিপুল, কস্তুরী, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, শ্বেত দুর্বীর শিকড়, সাজিমাটি, গোলমরিচ, কর্পূর, কাউতুলসী ও কুকাশিমাপত্র সমভাবে একত্রে বেটে করুণা লেবুর রস মিশিয়ে বটিকা প্রস্তুত করে।

ভ্রমরার তীরে আজ অজস্র প্রাণের মিলন, আনন্দের মেলা, জীবনের মহোৎসব। কিন্তু তবু যেন অস্পর্শ, অস্পন্দ, অপূর্ণ। হাজার সুর, স্বর, ধ্বনি কিন্তু কোনো ধর্মকথা নেই। ধর্মদাস পণ্ডিত আসে, বর্ণন করে যোগ-সাধনার আচরণ। সোমরস দেহস্থিত সহস্রার পদ্মে রক্ষিত এবং ওই রস শঙ্কিনী নামক সংকীর্ণ নালিক পথে নিম্নগামী হয়। ইড়া পিঙ্গলাকে মধ্যশিরা অবধৃতিকায় প্রবেশ করিয়ে এবং দেহামৃত সোমরসকে সহস্রার পদ্মে রক্ষা করে, সহজানন্দ লাভ এবং দৃঢ়ক্লম হয়ে অজরামর হওয়া যায়। বোধিচিন্ত সহজামৃতের সন্ধান পেয়ে চৌষট্টি দলযুক্ত পদ্ম নির্মাণচক্র থেকে সংকীর্ণ নালিক পথে ঘটিকা-রূপ মহাসুখচক্রে প্রবেশ করে। ভ্রমরার তীরে দাঁড়িয়ে যদুনন্দন ওঝা অপেক্ষায় ছিল সপ্তডিঙার। হঠাৎ তার কানে ঢোকে ধর্মকথার ‘সোমরস’ শব্দটি। মন দুলে ওঠে। কিন্তু তীর ছেড়ে যাবে না সে, যদি সেই-অবর্তমানে ভ্রমরা ছেড়ে সপ্তডিঙা অজয় নদে প্রবেশ করে? যদুনন্দন শোনে সাধু পুণ্যকথা। শুঁড়িনি আসে, বাকল দিয়ে বারুণীকে বাঁধে। দশমী দুয়ার চিহ্ন দেখে গ্রাহক উপস্থিত। ভেতরে চৌষট্টি ঘড়ায় পশার সাজানো। গ্রাহকেরা প্রবেশ করে একে একে। যদুনন্দন দেখে বাইরে দাঁড়িয়ে সে একা। বিচার করে সিদ্ধান্তে আসে সপ্তডিঙা আসতে বিলম্ব আছে। যাত্রা করে মদিরাপল্লির দিকে। হঠাৎই ডাক শোনে ‘যদুনন্দন’ ‘যদুনন্দন’। চমকিত হয়। ভাবে এ আহ্বান বুঝি ধর্মদাস পণ্ডিতের। ফিরে দেখে পণ্ডিত আপন তন্ত্বে মগ্ন। ডাক আসে বটবৃক্ষের নিকষ-কাল তল থেকে। সেখানে ধলা মই পশার সাজিয়ে বসে। যত মদিরা তত বরাহ মাস। সে এক রোমোৎসব।

এক বৃদ্ধা নিদ্রা গিয়েছিল ভিতর-ঘরে সন্ধ্যারাতে। সারাটা দিন পতির গোদের ওষধি নাকারপাতা তুলে নেতিয়ে গিয়েছিল দেহ। কেউ ডাকেনি তাকে। হঠাৎই ঘুম ভেঙে যায় গৃহপল্লি-গ্রাম-গ্রামান্তরের নিষ্পন্দ নিস্তব্ধতায়। উঠে দেখে খাঁ-খাঁ সংসার। সে তিনগুণা চাঁচর কেশে ঝেড়েঝুড়ে লোটন বাঁধে। তারপর সপ্তডিঙার আলোক পথে ভ্রমরায় চলে। পথের পাশে সুকেশী, দিগম্বরী, ক্ষেমার বসত। বেউশ্যা তিনটি পীনোন্নত পয়োধরা, অঞ্জনবর্ণা, প্রশস্ত নিতম্বিনী কিন্তু তাদের গৃহগুলি আজ নির্বাক। মৃদঙ্গ-মন্দিরার ধ্বনি নেই, কিস্কিনী-কঙ্কণের বোল নেই, বীণা-বেণুর সুর নেই, নূপুর-খমকের তাল নেই। কন্যাগুলির বিরহকাতর বদন দেখে বৃদ্ধা ডাকে তাদের। বলে, ‘ওই শোন পক্ষির কূজন, পণ্ডিতের ধর্মচর্চা, কপিদলের ফুৎকার, গোবৎসের ডাক। গেলে কত কি দেখবি! হলধরের ন-মাস উদরিনী পত্নীটি চলে গেল, তোরা থেকে গেলি? পাটশাড়ি পরে সেজে-গুজে চল তো জননীরা, সাধু ধনপতির সপ্তডিঙা দেখে আসি। মেলা দর্শনও হোক। নেচে নেচে চল ছটির বোলে। বাজুক হাতের কনকচুড়ি, পায়ের নূপুর। ওরা আমাদেরও না ডেকে চলে গেছে। কী এমন বয়স আমার? পো-র হয়েছে পো,/তার হয়েছে ঝি/পোড়ক তৈলে চুল পেকেছে/বয়স বটে কি?’ বুড়ি নাচে, পদ মেলায় সুকেশী, দিগম্বরী, ক্ষেমা। সুর ধরে গাছের পক্ষি। তাল ঠোকে বোড়া নাগ। আঘন আকাশে গ্রহ-তারার জ্যোতি বাড়ে। ভ্রমরামুখী নদীপথে বালুদানা হেমের মতো হাসে।

বিভীতক বৃক্ষতলে দাঁড়িয়েছিল লাঙ্গলা। টুক করে একখানি ফল পড়ে ত্রোড়ের কাছে। লাঙ্গলা হাঁক দেয় ‘হলধর’ ‘হলধর’। হলধর ছিল মদিরা সঙেঘ। ছুটে আসে। লাঙ্গলা বলে, ‘তুই জনক হবি দু-দিন পরে, কোনো ভাবনাচিন্তা নাই তোর? জাতকের পীড়ার ভয় নাই?’ লাঙ্গলা বিভীতক ফলখানি হলধরের হাতে দিয়ে বলে, ‘সমস্ত ব্যাধি থেকে বিগত-ভীত এই বিভীতক বীজ।’ সুবোধ হলধর ফলটি খুঁটে বাঁধে। তারপর কাছাখানি বৃক্ষ-তাম্বুলের মতো পাছায় জড়িয়ে বৃক্ষে চড়ে। লাঙ্গলা বেজায় খুশি, পুত্র এবার সত্যিকারের বুঝদার হল। বিভীতকের সঙ্গে মুখা, ইন্দ্রযব, হরীতকী, আমলকী, কটুকী ও ঘলঘুষার মিশ্রণ সেবনে শ্লেষ্মাজ্বর বিনষ্ট হয় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। এ-ভিন্ন বিভীতকের সঙ্গে কুল আঁটির শাঁস, কুলখ কলাই, দেবদারু, মাসকলাই, কটু তৈল, হরীতকী, কুড়, বচ, সুলভা ও যবচূর্ণ কাঁজিতে বেটে গরম করে পায়ে প্রলেপ দিলে বাতরোগে শান্তি হয়। নলের দেহনিঃসৃত কলি সরিয়ে, ভূতাস্রয় হাতড়ে, বৃক্ষশাখা নেড়ে হলধর যখন নামে ততক্ষণে বৃক্ষতলে আনন্দযুক্ত। বিভীতকের বীজসকল পাশাক্রীড়ার অপূর্ব অক্ষ। বালিয়াড়ির ক্রীড়ামোদীগণ বস্ত্রে বাঁধে গুণা গুণা ফল। পাশা পাতে।

ধনপতির সপ্তডিঙা ঘাটে আসতে বিলম্ব আছে। বাতির আলো দূর বাঁকে। হলধরের পত্নীটির ত্বরা প্রসববেদনা উঠুক, নিরাতঙ্ক প্রসব হোক, গৃহদ্বারে গোমুণ্ড স্থাপন করে যষ্ঠীর পূজা করুক যথাসময়ে, উপস্থিত বিভীতকের ফলগুলি দিয়ে অক্ষত্রীড়া শুরু হোক। তার আগে এসো একবার মঙ্গলধ্বনি দিই সমস্বরে, হিত মাগি হলধরের পত্নী ও ভাবী জাতকের।

জ্ঞানবৃদ্ধ উলূক বাউলিকে ডেকে বলে, তোমার গীতখানি সম্পূর্ণ গাঁথা হল? শোনাবে নাকি?

বাউলি বাদ্যযন্ত্রটি হাতে ধরে উত্তর দেয়, প্রথম কলিটি গাঁথার পর কত নব নব চিত্র দেখলুম। ভাবছিলুম সব মিলে একটি গীত হলে কেমন হয়।

উলূক বলে, সেটিই ভালো—ভাবটি ভেতরের, চিত্রটি বাইরের। এ-দুয়ের মিশেলে জীবনের একটি কর্ণমধুর স্ততিবাণী রচনা কর। প্রথম কলিটি ধর দিকি।

বাউলি সুর ছাড়ে যন্ত্রে, সুর ধরে কণ্ঠে—ব্রহ্ম আমার বসত গাড়ে নদীকূলে এই নিশীথে...

উলূক বলে, ভালো তবে কিনা নদীতটে বড়ো ঝড়-প্লাবন, ‘বসত গাড়ে’র বদলে ‘বসত গাড়ে’ করলে কেমন হয় বল দিকি? আর ‘এই নিশীথে’র জায়গায় ‘সন্ধ্যারাতে’ বা কেমন শুনায়?

বাউলি গায়—

ব্রহ্ম আমার সন্ধ্যারাতে বসত গাড়ে নদীকূলে,  
কেকাগুলি নৃত্য করে গগনপানে পুচ্ছ তুলে।

আবার থামায় উলূক। বলে, কেকা চিরকালই নাচে। সে কথা কত গীতেই শুনলুম। ওদের একটু জিরেন দাও। ওই দেখো গোবৎসগুলি কি নয়ননন্দন বাম্প দিচ্ছে। বল-না ওদের কথা।

বাউলি নতুন করে সুর ধরে—

ব্রহ্ম আমার সন্ধ্যারাতে বসত গাড়ে নদীকূলে,  
বালধেনু বাম্প মারে গগনপানে পুচ্ছ তুলে।  
বৃক্ষশাখে পক্খি ডাকে বহেড়া পাড়ে হলধর,  
তিন বেউশ্যা নেত্যা করে কদলী খায় কপিবর।  
ধর্মদাসের পুণ্যকথা শোনে সবে তরুতলে,  
ব্রহ্ম আমার সন্ধ্যারাতে বসত গাড়ে নদীকূলে।

হঠাৎ সবাই উচ্ছ্বাসে হস্ত তোলে আকাশ পানে—ওই আসে সপ্তডিঙা।

## ১৫ কাণ্ডারির আতঙ্ক

কেরয়াল ধ্বনিতে এগিয়ে চলে সদাগরের সপ্তডিঙা। কাণ্ডার তাকায় ভ্রমরার দু-তীরে। ঘন অন্ধকার দু-পাশের কেয়াকুঞ্জ, নলখাগড়ার বনে, সেতুবন্ধে, জালিকের কুটিরে, জনপদে। বিগত কার্তিকেই দীপ্তিময় ছিল গৃহ, গাঙ, গগন ও দেবস্থল। আশ্বিন সংক্রান্তিতে শুরু হয়েছিল যম-পুষ্করিণী ব্রত। শ্বশুর-শ্বশ্রুমাতা যেন জল পায় সুরলোকে তাই সারা কার্তিক নিত্য প্রত্যুষে ধূপ-দীপে যম পূজা। দিনমণি ওঠার আগেই গৃহস্থের উঠানটি উজ্জ্বল, গৃহবধূর মুখখানি প্রভাময়। কার্তিক সন্ধ্যাগুলিও দীপিত কুল-কুলতীর সর্পি-প্রদীপে। ত্রয়োদশ তিল ও তুলসীপত্রে হরিপ্রিয়ার কাছে কান্তর কামনা ভবনদীটি নিরুদ্ধেগ পারের। গৃহলক্ষ্মীরা কদলীডিঙায় ভাসিয়েছে মৃৎপ্রদীপ সুরলোকের উদ্দেশ্যে। অযুত বাতিতে উজ্জ্বল জলপথ। সুরলোকের পথখানি যেমন দীর্ঘ ডিঙাও অসংখ্য, বাতিও তেমন অগণন। সপ্তডিঙায় সংকীর্ণ দীপগাছায় এই আঘনে কেমন হবে সদাগরের সিংহলযাত্রা, ভাবিত কাণ্ডার। উজানিরাজের ভাণ্ডারী যদি দু-তিন পক্ষ আগে দেখত অকুলান চন্দন, সৈন্দব লবণ, শঙ্খ, সকল্লাথ আদি দ্রব্য তাহলে কার্তিকের উত্তোলিত স্বর্গবাতির বিভা সুরলোকবাসী পরিজনদের মতো জলভাসী সাধুর সপ্তডিঙাগুলিও পেতো। কার্তিক-সংক্রান্তি গতে বসুধাবাসীরা বাতিদানগুলি দণ্ড থেকে নামিয়ে তুলে রেখেছে চন্দ্রশালায়। সে-সবের ভিতর এখন পাঁচ কুনিকা অন্ধকার, আকাশতটেও তাই। কাণ্ডার দেখে নদীতীরে ঘাট-পাটনির নাওখানি বাঁধা। দিবাশেষে নাইয়া ফিরেছে কুটিরে। নাওখানি দোলে আঁধারে, নাইয়া পল্লিটিও প্রায়ান্ধকার। অথচ কার্তিক প্রারম্ভে যমচতুর্দশীতে প্রাণচঞ্চল ছিল পল্লিজন, কর্মমুখর ছিল নাইয়াবধূ। সারা দিবস ধরে বেথুয়া, সরিষা, কালকাসুন্দ, জয়ন্তী, শাঞ্চ, হেলঞ্চ, যুলতা, গুলফা, গুলঞ্চ, শুষ্কী আদি চতুর্দশ শাক সংগ্রহ ও রন্ধন শেষে ভোজন এবং চতুর্দশ দীপদান। এই আঘন সন্ধ্যায় কোথা শাকান্ন কোথায় বা চতুর্দশ বাতি। বেশ কটি গৃধিনীশাবক সোচ্চারে ক্রন্দন জোড়ে নৈশ ভোজনে। কাণ্ডার ভাবে মাসে শাবকদের অনীহা নাকি সমবেত অগ্নিমান্দ্য অম্লশূল? কিন্তু এরব শুভ নয় এই আঘন সন্ধ্যায়। কণ্ঠবিদারী, কর্মবিমুখ, কান্তিনাশ।

সপ্তডিঙা বয়ে চলে ভ্রমরা তরঙ্গে। উৎসুক গ্রাম-গঞ্জবাসী সমবেত বালুচরে। এ-সব মানুষজন পরিচিত কাণ্ডারির, বুঢ়েনেও জানে সর্বজন কিন্তু বদনগুলি আলো-আঁধারিতে অস্পষ্ট, হিমকণায় অস্বচ্ছ। তাই কোন জন যে কে তা থাকে অধরা। এক পিককণ্ঠী বালা শোনায ছইঘরের হেমশোভা কিন্তু বিধুমুখীর বদনটি অদৃষ্ট। এক বেউশ্যাকে সপ্তডিঙা দর্শন করাতে অতিব্যগ্র কপিদল। যে দ্বারের মৃত্তিকায়

দেবীদুর্গার মন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ, ডিঙা দর্শনে তার গণন আগে। কপিদল ডাকে, 'কলাবতী, কলাবতী'। যাদের কণ্ঠে কেবল শ্রীরামচন্দ্র ভার্যা 'সীতা' নাম তারা ভ্রমরাকুল আকুল করে 'কলাবতী' নামে। ব্যাকুল সুরভিদলও। তাদের জিহ্বায় 'শ্রীরাধা' ভিন্ন অন্য নাম আসে না কিন্তু তারাও এ-নিশায় 'কলাবতী' ডাকে বিদীর্ণ করে গগন। এক শ্রৌট মদিরারসিক একটি সুরাভাণ্ড তুলে ধরে কলাবতীর সমুখে। এককণা অগ্নিতে ভাণ্ডখানি পুটকুণ্ড। মহানন্দে জয়কার দেয় তটজন। হর্ষে কণ্ঠ মেলায় সপ্তডিঙার সহস্র নাইয়া-গাবর। সুরাবহিতে উদ্ভাসিত কলাবতীর শশীবদন। তার দুই রামধনু ভুলতা ও ভ্রমর-কালী নয়নমণিতে অপার বিস্ময় সপ্তডিঙার বৈভবে। সে করজোড়ে কামনা করে ফেরৎযাত্রায় যেন ফের দর্শন মেলে। প্রবোধ দেয় পার্থি, সুসম্পন্ন হবে গর্ভমোচন।

ডিঙা চলে প্রহর পেরিয়ে। ভ্রমরার দুপাশের তৃণভূমে, লতাগুল্মে, নলখাগড়ার বনে ঘন আঁধার। কৃষ্ণ-লবলী, চলদল, নাদনের শাখা-পত্রে জমাট তিমির। মহামায়ার শ্মশানমণ্ডপটি নিরাভরণ, নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রভ। অথচ দু-পক্ষ পূর্বেই ওই দাহভূমি রসময় ছিল মাস-মদিরায়, সুরময় ছিল কালিকা সংগীতে, বর্ণময় ছিল ওড় পুষ্পে, সরব ছিল রায়বাঁশিয়া নৃত্যে। অশুভ শক্তিনাশী মহাকালী দণ্ডায়মান ছিল শিব বক্ষে। মুক্তকেশী, জলদবরণা, দন্তুরা, করকাক্ষি, লোলজিহ্বা, ত্রিনয়নী দেবীর সে কি ভয়াবহ রূপ! বিপদভঞ্জে দেবী খরশান কৃপাণধারিণী, অভয়দানে বরদমুদ্রা। এই আঘনে কোথায় করালবদন রুদ্রাণী কোথায় বা দক্ষিণাকালী! মহাশ্মশানে শিবহীন শিবাদল মত্ত অস্থি নৃত্যে, তটিনীবায়ু মগ্ন শত করোটে ষড়বিধ রাগ চর্চায়। তারাহীন এই তালবাদ্য শুভ নয় সদাগর, শিবহীন ওই করট-সুর হিত নয় হে ধনপতি। কি জানি কী তোমার ললাটলিখন এই সাগরপাটনে!

এগিয়ে চলে ডিঙা। ভ্রমরার দু-কিনারে নানা সচল চিত্র, নানান স্থির দৃশ্য।

কৃত্তিকাসংক্রান্তিতে কার্তিকেয় শয়নে গিয়েছিল ভ্রমরায়। রং-মাটি খসে ময়ূরবাহন এখন বালুচরে নিঃসঙ্গ। দীর্ঘ শীত-নিদ্রার বাসসন্ধানী একখানি জলফণী শরীর জড়ায় ময়ূরধ্বজে। নব বসতে হায়ন-অগ্র শুভ। নাগশুদ্ধি বিধানে পশ্চিমভাগে পূর্বদ্বারী কর্তব্য। কিন্তু যে-জন জলবাসী কী তার ললাট লিখন? কাণ্ডার বুটন দ্বিপ্রহর নিশারাতে শ্রোত হাতড়ায়। ভ্রমরার জললতাগুলি কাণ্ডারযানের মধুস্বরে গুঞ্জরিত, মধুবাসে সুবাসিত, মধুকরসে আমোদিত। সুদূর বিস্তারী মনোহর মধুকর ডিঙার যাত্রাপথ এমনই মধুময়-মধুপর্ক-মধুক্ষর হওয়ার কথা। কিন্তু মধুপের বর্ণটি ঘোর কৃষ্ণ, ভ্রমরার শ্রোতটিও তাই। সদ্য অমাবস্যা ও প্রতিপদ গতে মাথার চান্দোয়াখানিও জোছনহীন, মলিন। তাই মধুকরের ডিঙা-তলে ঘন ঘোর আঁধার। এই নিশি-জন্মে বৃশ্চিক রাশি বিপ্রবর্ষ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী

শনি দশা আর ধনু রাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতু দশা। মৃত্যু পাদ দোষ। উত্তরে যোগিনী সন্ধ্যা কালে, নিশাভাগে দক্ষিণে। কাণ্ডারির বাম হস্তখানি কর্ণদণ্ডে, দক্ষিণটি নিকষ ঘন আকাশে। নিকষারও বাস ছিল ওই দক্ষিণ দেশে। কেতুমতী-সুমালির পূর্ণচন্দ্র নিভাননা কন্যাটি জন্ম দিয়েছিল রাবণাদি চার রাক্ষস-রাক্ষসীর। রাক্ষসযোগ নেই তো এই জলযাত্রায়? ধনপতির বাবা জয়পতির দক্ষিণ পাটনে গ্রহ-তারার হাট ছিল আকাশতটে। বশিষ্ঠ আর অরুক্ষতী থাকত যুগলে—বাকি মরীচি-অঙ্গিরা-অত্রি আদি সহবাসী। কেউ নেই এ-যাত্রায়। কবে শেষ হল ধ্যান, কোন দেশে যাত্রা করল সপ্তঋষি? বৃদ্ধ বুঢ়নের দু-চোখে আদিগন্ত বিভ্রম, অকূল বিস্ময়। আকাশের দিশা হারিয়ে জলজীবী কাণ্ডার ভ্রমরা হাতড়ায়। এ-স্রোতের জাত-ধাত জন্মাবধি চেনা। জল-দর্পণে ঠিকই বেঁধে ফেলবে অনন্ত আকাশ, অজস্র নিশাবাতি আর একসময় দ্বিতীয়ার চন্দ্রভাগাটিও।

মাগশীর্ষ অগ্রহায়ণে মৃগশিরা নক্ষত্রটিকে প্রথম ভ্রমরায় খোঁজে বুঢ়ন। কাজলকাল জলে মার্জার পদখানিও। সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের এই পঞ্চম নক্ষত্রখানি ত্রিতারকার সমাহর। সমাহরে সমাস, সমুচ্চয়, সংগ্রহ। তিন পথের সম্মেলনে ত্রিপথ, তিন কাছার ত্রিকচ্ছ, তিন কড়ির ত্রিকড়ি, তিন পর্বতের ত্রিকূট, তিন কোণের ত্রিকূণ, তিন ভুবনের ত্রিভুবন। জলজীবনের কাণ্ডার বুঢ়ন ত্রিকাল, ত্রিতাপ, ত্রিদশ পরিক্রমা করে ত্রিফলে থমকায়। জলফলের তলাগুলি নিখর। যোগিরূপী পানি-ফসল নিশিলীলায় কামুকী। রুপ্ত হয় মধুকরের নৈশনাদে, নদীজলে কাণ্ডারির তারকা সন্ধান। নেচে ওঠে জলতল। উদ্বেল তরঙ্গ, উচ্ছল ভ্রমরা। কোথায় মৃগশীর্ষ, কোথা-বা মার্জার পদ! নদীজলে অম্বরের সমূহ সংহার দেখে কাণ্ডার, প্রবল বিনাশ। অগ্রহায়ণের গাঢ় হিমে মুখ ঢাকে মহাকাশ। ধূম জমে ডিঙা দীপে। নদীকূলের বৃক্ষলতায় তুষার প্রলেপ। চোখ ঘষে কাণ্ডার, হিম মোছে। নাওয়ার পথ হাতড়ায় আকাশে, পথ ভাঙে নদীতলে। বুঢ়ন ভাবে চক্ষু জোড়া এ-ধূমের কতখানি ঋতু নিয়মে কতটি তার বয়সধর্মে। নদীজলের কাজল কতটি নেমেছে আকাশ বেয়ে, কতটুকু ঝরেছে তার দুই চক্ষু হতে! জলপতির দক্ষিণ পাটনের সঙ্গী বুঢ়ন আজ সদাগর পুত্রের যাত্রাসঙ্গী। মাঝে ভ্রমরায় ডুবে গেছে কত শশী, মাথা তুলেছে কত-না রবি! বিষুদেউলের বটবৃক্ষে ঝুরি নেমেছে বছর বছর, নদী গ্রাস করেছে বরোজ বরোজ তাম্বূল খেত, জেগেছে নতুন শিবলিঙ্গ, অরণ্যবহিতে বিলুপ্ত হয়েছে চন্দনের বন, কেতকী বৃক্ষের প্রেতিনি ফল্লুতটে পিণ্ড পেয়ে ফিরে গেছে আদি বৈকুণ্ঠধামে। কাণ্ডার ভ্রমরার জলে ধুতে চায় দু-চক্ষের ধূম। করতলে বারি ভরে বারে বারে। যে-ভ্রমরা দু-তীরের আদিগন্ত কৃষিক্ষেত্র শ্যামলী করেছে, লালন করেছে তরু-তৃণ, পালন করেছে পশু-পক্ষী, আশ্রয় দিয়েছে মীন, ধারণ করেছে

যুগ যুগ ধরে মানবজীবনের দুখ-সুখ সেই জলদেবী আজ কাণ্ডারির কড়ি-মাপ নয়ন-ধূম সংস্কারে অপারগ! তবে কি বৃদ্ধা হল ভ্রমরা? জরা বাস গড়ল জলতলে, বধিরতা সিঁদ কাটল দেহে, শ্রোতের বুক জমল শ্লেষা কোনো অগোচরে! একদিন ভ্রমরাও কি হয়ে উঠবে কৃশতনু ক্ষীণতোয়া? সপ্তডিঙার কাণ্ডার বুটন জলজ্বরী। হলধর যেমন মৃত্তিকার মতি চেনে, কর্ণধারও নিজ করতলের নদনদীর মতো জলের জাত চেনে ধাত বোঝে। কাণ্ডার সন্ধ্যাতারাটিকে সাক্ষী রেখে বারি ধরে করপুটে। সে জলাশয়ে তখন বিস্থিত জলদ, নক্ষত্র, গগন। করতলের বারিতে হঠাৎই জলাবর্ত, জলোচ্ছ্বাস, যেন-বা জলধি। সে প্লাবনে ভেসে ওঠে জলচিত্র— জলপুষ্পে ভাসে জলধিতনয়া। কম্পিত হয় কাণ্ডার-বুক। এ যে যাত্রা নাস্তি, বিলয় গাথা, প্রলয় প্রকাশ। তাই বুঝি নদীকূলে, জলতলে, গগনতটে এত হিম, এত ধূম, এত নিশীথ কাজল!

বিচলিত হয় কাণ্ডার। সদাগর, কী তোমার ললাটলিখন?

## ১৬ সাধুর লহনাদর্শন

সদাগর-তরী দুর্গাবর ভেসে চলে ভ্রমরার শ্রোতে। নাইয়াদল কেয়ালে জল কাটে, বাদাম বাঁধে বায়ু। সাধু ভাবে যদি কোনো দৈবিক ক্রিয়ায় নদী ফিরত উজানির সেতুবন্ধে, বায়ু চলত বসতভূমে? আবার তাহলে দর্শন পেত ভ্রমরা-কূলে তপস্বী বটের, নদীচরে মত্ত মরালীর, পথে বিদ্যাধরী নগরিয়ার, গগনে বায়ুচর ক্ষেমংকরীর, গৃহে খুল্লনার। আবার শুনতে পেত পুষ্প বনে অলির গুঞ্জন, পারাবতের উড়াল ধ্বনি, মাতৃকোড়ে শিশুর করতালি, দ্বিজকণ্ঠে বেদগান, খুল্লনার বাজন-নূপুর। সুবাস পেত সন্ধ্যামালতীর, চন্দনবৃক্ষের, খাজুরছড়ি ধান্যের, কর্পূরবাসিত গুয়ার, খুল্লনা ওষ্ঠের। যদি মদমত্ত ইরাবতের মতো বেপথি হত সপ্তডিঙা তাহলে সাধু দেহাঙ্কন করত পত্রাবলিতে, মন রাঙাত কামসিন্দূরে, অধর ছোঁয়াত খুল্লনার অনুপাম কুচে।

মন হাঁটে উত্তরে, ডিঙা চলে দক্ষিণে। গৃহমুখী পথখানি জুড়ে চারিভিতা গড়, কুলপুরোহিত জনার্দন, বান্ধব অনন্ত-অচ্যুত, পারাবত কল্যাণ-কুমুদা, অমলখি বৃক্ষ, আটশর তৃণবন, আদ্য-বরাহের পাল, অল্লায়ু জলশ্রোত, অম্বারূঢ় আগন্তুক, আঁশি-হাটার মীন। উজানি স্মৃতি-শ্রোতে ভেসে ওঠে উজাগর খুল্লনার মুখ। ভ্রমরার আন্ধারিয়া তরঙ্গে গ্রহ ভাসে, তারা খসে, জলকীট হাঁটে, শফরী নাচে, শ্মশানবারি মেশে, একটুকি মনকথা তলায়, একজানি মুখ জাগে। সে মুখ লহনার।

স্পন্দিত হয় সাধুর ডান বাহু, দক্ষিণ চক্ষু, সর্ব দেহ। দেহ-মন থেকে বিসর্জিত নারী কেমন করে ভেঙে এল একখানি পথ? কেনই-বা তার এই জলপাড়ি! ডিঙার শতেক-রত্নদীপমালে লহনার মুখ জোড়ে সদাগর। নাইয়াদলের-কেরয়াল জল কাটে, ঢেউ ওঠে, বামার মুখ ভাঙে—মিশে যায় নদীস্রোতে। সাধু ভাবে এ হল নয়নবিকার। এমন কত শত বিভ্রম জলযাত্রায়। জ্বলন্ত চিতাকাষ্ঠের নাচন, মৃত মার্জারীর কাঁদন, জলতলে বসুমাতার কম্পন, বৃক্ষডালে ঝুলন্ত রজ্জু, নরমুণ্ডের গড়াগড়ি— এমন কত-না দৃশ্য! দু-প্রহর জলপথ অতিক্রান্তে নদীলতায় লহনার মুখছবি বায়ুকোপ, বাতুলতা। গুয়া-তাম্বুলে পিষ্টনাশ। সাধুর নির্দেশে নফর তাম্বুল-তৈজস আনে।

ধনপতি দেখে হেমন্ত-শিশির ঝরে চারপাশ। নিদ্রিত নদীতীর, বৃক্ষশ্রেণী, লতাগুচ্ছ, পক্ষীকুল, জনমানব। জাগরণে উলুক, ওড় পুষ্প, খড়িশ লতা, মৎস্যভোজী ঘড়িয়াল, শ্মশান শ্রীকালি। আর কার্যব্যস্ত সপ্তডিঙার সহস্র কেরয়াল। ভ্রমরা পেরিয়ে নিশান্তে প্রবেশ করবে অজয় নদে। তখন ভিন্ন জল, ভিন্ন তল। সেখানে স্রোত ধাবিত হয়, জলদেয়াল ভাঙে, আঁশি কম্প মারে, ঘুরুনিয়া প্রবাহ ফেন তোলে মুখে। ভ্রমরার গুঞ্জন নেই নাদবান অজয়ে। নদীস্রোতে কান পাতে সাধু। কামিনী-কোমল ভ্রমরার কুলকুল ধ্বনিতে প্রাণ জোড়ায়। সে এক অনাহত অলৌকিক সুর। যেন নিদ্রিত সংসারে একাকী জাগর বসুধার গীত। তাল দেয় ক্ষেপণীর বোল। হিম-চন্দোয়া দোলে সুরের কম্পনে। আন্দোলিত হয় সাধুও। যত গত হয় প্রহর তত ঘন হয় সুর। সে-সুরে ব্যথার বেদন, বিষাদের বেহাগ। এই আঘন-হিম যেন অশ্রু। এক অবলা নারীর নীরব নীরা-পাত। আচম্বিতে সাধু দেখে নদীজলে এক অনিদ্র মুখ—লহনার।

আলোড়িত হয় সাধু। লহনার এই শিথিল কেশ, কম্পিত ওষ্ঠ, শুষ্ক ত্বক, ধুলিয়া বসন একবারই দেখেছিল সাধু। খুল্লনা সঙ্গে সাধুর পরিণয়ের পাটিপত্রের সংবাদ যখন শুনেছিল লহনা। চক্ষু জোড়ায় না ছিল ক্রোধ না অভিমান। যেন সাতনল ফান্দে বন্দি কুরুব কাদম্ব পাখি। নীরবে ভাবে কেন লুপ্ত হয়েছিল যমাস্তক ব্যাধের তণ্ডুলে। এখন প্রতীক্ষা কেবল পরপারের। এ-লহনার না আছে প্রবোধ না পিরিতি। ক্রোধ-কামও নেই। পিতার মন্দির ছেড়ে একদিন পতি-সঙ্গে এসেছিল সাধুধামে। শঙ্খধ্বনি করেছিল জ্ঞাতিজন। চন্দন-কুসুম-চুয়ায় বরণ হয়েছিল নববধূর। কুমকুম কস্তুরি গুয়ায় সিদ্ধ হয়েছিল কুসুমশয্যায় সহবাস। ওষ্ঠ, স্তন, যোনি—সব অঙ্গ নিবেদিত হয়েছিল সাধু যাগে সাধু যজ্ঞে। আজ সাধুর ভিন্ন গতি, ভিন্ন মতি। ভিন্ন পালঙ্ক ও ভিন্ন পাটরানি।

ভ্রমরার কাজল স্রোতে দেহ পাতে লহনা। আপন পাটশাড়ির আঁচলায় মাথা রাখে। বিসর্জনের দেবী, তার না আছে শয্যা না আসনাধার। সাধু-মন্দিরের পালঙ্ক

আর নয় লহনার। সে শয্যার দারু-বালা দো-ছোট তসরে আজও মরাল মুদ্রায় হাঁটে। করবী বাঁধা তার কেশভার যেন গুয়াগুটি। বাম করের হেমদণ্ডে মণিখচিত দাপনি। শ্রবণ ওপরে কনক-বউলি, নবঘন আষাঢ়িয়া মেঘকোলে যেন ক্ষণিক বিজুলি চমক। রামার বাহুগে কনক-কেয়ুর আর পদযুগলে বাজন-নূপুর। মণিময় কণ্ঠমালিকা লোটায়ে কুচযুগলে। যাবকের রসে মার্জিত বদনখানি বালা আপন দাপনিতে দেখে আজও।

বিসর্জিত লহনার আসন নয় লোহিত কম্বল। রোহিত রশ্মি উদিত রবির, লহনা অস্তাগত। লোহিত পুষ্প, লোহিত চন্দন, লোহিত কুঙ্কুম, লোহিত মাণিক্য আর নয় এ দুয়ার। পয়োধর দু-টিও নিম্নগামী, অবসন্ন। লোহিত-তৃষ্ণাতুরতা জাগরণে অপারগ। ও-দেহ শোণিতে নেই লোহিত নদ, ও-দেহ ধাবনে নেই রোহিত মৃগ, ও-দেহ মছনে নেই লোহিত নাগ। লোহিত দাবানলে বন পোড়ে, রোহিত শোকানলে মন পুড়ছে লহনার। দঙ্ক-ন্যূজ দেহ-মনে কি প্রয়োজন তুলোট পাতনির? যে শয়নে না আছে প্রেম না প্রীতি, কাম-কামনাও নিরুদ্দেশ তার কি প্রয়োজন কোমলতার! ও থাক সাধুর জন্য যার দেহকোষে অনন্ত পিয়াসা। সাধু মন্দিরের পালঙ্কে পাতা আছে নরম সন্ধ্যাখণ্ডিও। বৃদ্ধ ব্যাপারী কথা দিয়েছিল কদম্ব-শুভ্র একখানি গাত্রাবরণ এনে দেবে তার হিমধবল দেশ হতে। তাতে থাকবে না একটিও কালো কি বাদামি মেঘ-কেশ! শ্বেত উষ্মতা পাবে নব দম্পতি, সুবাস পাবে শ্বেতচন্দনের, দ্যুতি পাবে শ্বেতভানুর। বছর অতিক্রান্তে মৃত জনকের কথা পালন করে গিয়েছিল সন্তান। সেই সন্ধ্যাখণ্ডি এখনও পালঙ্কে কিন্তু সেই দাম্পত্য নেই। শ্বেত উষ্মতা, শ্বেত সুবাস, শ্বেত দ্যুতি এখনও এক জীবনে—অন্যটি শীতল, নিগম্বি, মলিন। শয্যা-আচ্ছাদনটিতে ছিল এক জোড়া ময়ূর-ময়ূরী। মাথার ওপর জলদ-ঘন আকাশ। বৃষ্টি ফোঁটায় নৃত্যে মেতেছিল জোড়া পক্ষী। তার তলে ছিল চার কলি কাব্য—ভ্রমরী ভ্রমর, তোরে জুড়ি কর/না গাইয় মধুর গীত/তোর মৃদু রা, কামশর ঘা/চিহ্ন কৈল চমকিত। সূচিকমটি এখনও উজ্জ্বল, সূচি-লিখনটিও স্পষ্ট শুধু মধুগীত গত হয়েছে লহনা-জীবনে। চিহ্নে কোনো চমক নেই, ঘা নেই কামের। অনাবাদি কৃষিক্ষেত্রের মতো সেখানে শুধুই অসার ওকড়া, আটশর তৃণ, কুরগটক বৃক্ষ। নাল-ভূমির মতো সেখানে ধান্য ফলে না, বুলবুল আসে না, ফোটে না ঝিঙা ফুল, হাসে না দানা-কুসুমের গুটি, নাচে না ইক্ষু বন। লহনার বুকে তণ্ডুলের বাস নেই, বাকসনার শোভা নেই, তাম্বুলের রস নেই, কুমুড়ার কর্ণিকা নেই। লহনা সংসারী হয়েও নির্বাসী, এয়োতি হয়েও রাড়ি, বিশ্বগুপ্তা হয়েও আচুষা, কুস্তীন্তনা হয়েও কুচকম্পা, পতিবন্ধ হয়েও কৌমারী।

ভ্রমরার শ্রোতে ভেসে চলে পঞ্চ পুষ্প—অরবিন্দ, অশোক, আশ্রমঞ্জরি, নবমল্লিকা ও রক্ষোৎপল। মদনের পঞ্চ বাণ নদী শ্রোতে ভেসে যায়। সাধু ভাবে

এ কি আঁধারের ছল নাকি ডাকিনী দেবতার ছলনা! চক্ষু মোছে দেহ বস্ত্রে। খণ্ড শশী হাসে, গ্রহ জ্বলে, নক্ষত্র জাগে আঘন হিমের ফাঁকে। সাধু জলতলে লহনার মুখ খোঁজে। তরঙ্গ ভাঙে, তরঙ্গ জোড়ে—ছবিখানি জলমগ্ন, নিমজ্জিত। কিন্তু আর এক অভাবিত দৃশ্য। ভ্রমরায় বাহিত হয় যোনিশ্রোত—শতভিষা-অশ্বিনীর ঘোটক, স্বাতী-হস্তার মহিষ, পূর্বভাদ্রপদ-ধনিষ্ঠার সিংহ, ভরণী-রেবতীর হস্তী, কৃত্তিকা-পুষ্যার মেঘ, পূর্বাষাঢ়া-শ্রবণার কপি, রোহিণী-মৃগশিরার সর্প, জ্যেষ্ঠা-অনুরাধার কুরঙ্গ, আর্দ্রা-মূলার কুক্কট, উত্তর ফল্গুনী-উত্তর ভাদ্রপদের গো, চিত্রা-বিশাখার ব্যাঘ্র, অশ্লেষা-পুনর্বসুর মার্জার, মঘা-পূর্ব ফল্গুনীর মূষিক, অভিজিৎ-উত্তরষাঢ়া নক্ষত্রের নকুল।

সপ্তডিঙা ভেসে চলে আঘন রাতে।

## ১৭ নাটশালা

মাগশীর্ষ অগ্রহায়ণ গগনে অফুরান কৌতুক। শনি বক্রী ও বৃহস্পতি মঙ্গল শুক্রের উদয় এবং মঙ্গল রাহু কেতু বুধ ও শুক্রের রাশ্যস্তর। সঙ্গে শুক্রের বাল্যত্যাগ। কিন্তু সব নিশি রঙ্গের কুলপতি শশী। আঁধার নিয়ে নিত্যরাতে ক্রীড়ায় মাতে। ধনপতির সপ্তডিঙার গাবরেরা দেখে ভ্রমরার স্রোতে আলো-কালোর এক আজব নকশি। দ্বিতীয়ার বালশশী ভাসে হিম চাঁদোয়ার ওপর। হাসে, কখনো কবাটের আড়ে, কখনো গগন-গবাক্ষের ধারে। জললতায় তারই সচল ছবি। সপ্তডিঙার বাতিতে দৃশ্যের স্থান বদলায়, অদৃশ্য হয় না। সারা ভ্রমরায় নানা আকৃতি প্রকৃতির আলপনা। তার ওপর গ্রহ-তারার বিকিমিকি। নদীতটের ছাতিম বৃক্ষের উলুক ভাবে জলনকশাগুলি আলোয় গড়া নাকি আঁধারে গাঁথা। জ্ঞানতপস্বী সে কিন্তু রূপকলাকার নয়। অরূপ, নিরাকার, অমূর্তে স্ববাক উলুক তাই পক্ষদ্বয়ের হিমকণা ঝেড়ে নীচে তাকায়। সেখানে বাউলি নব গীতের সুর ভাঁজে। তাকে ঘিরে সপ্তপর্ণীর আলো-আঁধারির অন্য এক নকশি। উলুক বাউলিকে ডাক দিয়ে বলে, রাতের রঙ্গ দেখো হে, নয়ন মেলো।

বাউলি হেসে উত্তর দেয়, মেলেই তো আছি। আমি দেখছি ভিতর পথে, তুমি বাইরে।

উলুক বলে, তা বেশ। কিন্তু গাবরেরা ডিঙায় এত রঙ্গ করে অথচ তীরের লোকজন যে ঘুমে অসাড়।

বাউলি হাসে, রঙে-রসে আছে তাই এমন ঘোর। কূল আর দরিয়ার বাক  
বিনিময়ও হচ্ছে। তুমি ছাতিম টঙে, তাই শোন না।

উলুক বলে, বাক বিনিময়, মানে কথাবার্তা। কী কথা, কার সঙ্গে! এত কথা  
কীসের?.

বাউলি বলে, কথার শেষ আছে নাকি! ধান, খই, দই, চূড়া...।

‘কুকুট, শ্বেতগুঞ্জা, নাগরমুস্তা, চন্দ্রশালা, কাকমাচিকা সবই চূড়াধর কিন্তু  
চূড়ামণি হলেন ঋষি বাস্মীকি’, উলুক আকাশপানে তাকিয়ে বলে।

বাউলি বলে, এই চূড়া বানভাসি কথা। জলের টানে ভিন দেশ থেকে বয়ে  
আসা। এ হল চিড়া। ওই দেখ কদমতলার জাফরিকাটা আলোর তলে দাঁড়িয়ে  
গাবরদের ডাক দেয় দু-সতা, ও মাঝি নাও লাগাও কূলে।

বৃক্ষচূড়া থেকে নীচে নেমে উলুক শোনে এয়োতিদলের সমবেত আহ্বান—ও  
মাঝি, নাওয়ার ধাওনি ডঙ থামাও, কেরয়াল অমন ঘন ফেলো না। গেহের মানুষ  
ভিনদেশে গেছে বিকিকিনির কাজে কতযুগ আগে। তারপর নিত্যদিন ঘাটে আসা,  
সাধুর পথ চেয়ে বসে থাকা। কত শশী ডোবে, দু-নয়নে বয় শ্রাবণের ধারা, কত  
রবি নদী থেকে মাথা তোলে, ফেরে না গেহের মানুষ। শোকে-দুখে, শাশুড়ি-  
ননদের গঞ্জনায়, ভাসুর-দেওরের কামরোগে কত-না অভাগি কলস বাঁধে গলে।  
আমরাও মরব, তুমি না থামলে। ওই দূরে নদীবঁকে যখন তোমার নাওয়ার বাদাম  
দেখেছি তখনই বুঝি তুমি মনের কারবারি। চলো আমার বসতগেহে। পানি-গামছা  
দেব পা ধোয়ার, বাসি কাপড় দেব পরনের। ও মাঝি—

আমার বাড়িত গেলের মাঝি

বসতে দেব পেড়া

জলপান যে করতে দিব

চিকন ধানের চূড়া

চিকন ধানের চূড়া নয় রে

বিনি ধানের খই

মদন পুবই গা গারাইং কেলা

গোয়াল পাইড়া দই।

হেমস্তের হিম ক্রমশ গাঢ় হয় নদীবুকে। ঢেকে দেয় নদীতীরের দৈবসার-সাগুন  
বন, ভিন পাড়ের ত্রিকালদর্শী বট, কাশের বন, বস্মীক স্থূপ, নিশিজাগর শ্রীকালির  
পাল, তালবৃক্ষের পক্ষীনীড়। সপ্তডিঙার বাতিগুলিও মনে হয় দূরাকাশের গ্রহতারা।  
তেলিয়ার বলদের মতো চক্ষু ঢাকা, কুমুদকলির মতো দেহগুলি মোড়া।

ডিঙাগুলির জলছবিও তাই ধোঁয়াটে, ধূসর। যেন পূর্বজন্মের কোনো স্মৃতি যার গায়ে সন্ধ্যারাতের তরল আঁধার, আশ্বিনের বারিষকণা, বাঁশিনিবনের ছায়া, প্রাগজ্যোতিষ আলো। ভ্রমরার বুক জুড়ে কেরয়ালের ধ্বনি আর গাবর-গীত। গীতবালার বরণ যেন চিকন হেম, কেশ অমানিশি। মিশিতে রঙিন কিশোরীর মুখিকদাঁত। নদীর পাড় ভেঙে চরে নামে। নূপুরের বোল ওঠে। কুশোদরী বালার কুচদুটি অমৃত-কুণ্ড। নেতের বস্ত্রখানিতে বাল্য যেন নবপত্রিকা। বাম কাঁধে মৃৎ-পয়োধর। কিশোরী চলে বালুচর পেরিয়ে দরিয়ায়। সপ্তডিঙা ধীর পায়ে হাঁটে। নাটশালায় অনুরাগের কথা, পিরিতির সুর—

একা কেনে আইসেরে ঘাটে নবীন কিশোরী  
যদি কোনো সদাগরে তোমায় করে চুরি।  
কেমন তোমার মাতা-পিতা কেমন তোমার হিয়া  
তোমারে পাঠাইছে ঘাটে কলসি কাঁখে দিয়া।  
দুপুর বেলা একলা ঘাটে রূপের পসারি  
প্রেমসাগরে ঢেউ তুলিলে, কেমনে হাইল ধরি।  
যাও ফিরিয়া রূপের কইন্যা যাও ফিরিয়া ঘরে  
এই দেশে নাই প্রেমের মানুষ তোমায় যতন করে।

উলুক বলে, ওহে বাউলি, সপ্তডিঙা দেখবে বলে ভ্রমরার তীরে এসেছিল দধিকর কপিবরও ছিল। কারো কোনো বাক্য শুনি না। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? হলধরের পোয়াতি পত্নীটিও এসেছিল। গৃহে ফিরল নাকি নিদ্রা গেল? ধর্মদাস পণ্ডিত যোগ-সাধানার আচরণ শোনাচ্ছিল, তারও তো বাণী শুনি না।

বাউলি বাদ্যখানি দেখিয়ে বলে, কথার পাট চুকেছে, এখন গীত-কলি। তার ভিন পট, ভিন্ন শাস্ত্র। ধর্মদাসের চৌষটি দল পদ্মখানি তাই অদৃশ্য। কপিদলও সিংহল কাণ্ডের স্মৃতিমুহুরে বিরত। হলধরের পত্নীটি শোনে কুশোদরী কিশোরীর বিরহগাথা।

উলুক কান পাতে আঘন হিমেল বায়ুতে। শিস দেয় উলু খেত, সুর ধরে বাঁশিনি বন, কণ্ঠ মেলায় তটিনীশ্রোত, মরালের ধ্বনি তোলে তিন পীনোন্নত পয়োধরা, অঞ্জনাবর্ণা, প্রশস্ত নিতম্বিনী বেউশ্যা সুকেশী-দিগাম্বরী-ক্ষেমা। কিশোরীর দুঃখকথার অংশীদার তারাও। মনের হর্ষে খোঁপা বাঁধে কিন্তু দেখাইয়া না আসে ঘরে। খোঁপা আইলাইলা বাতাসে। যাবকের রসে অধর মাজন সেরে রসের দাপনিতে দেখে কিন্তু দেখাইয়া না আসে ঘরে। অধর মলিন হয়। আষাঢ়িয়া মেঘবরণ কেশে বাঁধে করবীর মালা কিন্তু দেখাইয়া না আসে ঘরে। করবী দল

খসে। বাহুযুগে বাঁধে কলধৌত-কেয়ূর কিন্তু দেখাইয়া না আসে ঘরে। পায়ে পরে বাজন-নূপুর কিন্তু শোনাইয়া না আসে ঘরে। নূপুরের স্বর ভাঙে, তাল কাটে। শয্যায় পাতে নেতের বিছানি কিন্তু শোওয়াইয়া না আসে ঘরে। শরশয্যায় দু-চোখের পানি ঝরে, বয়ে যায় যেন ভরা ভাদ্রের নদ-নদী। বহি অরণ্য গ্রাস করলে ধূম হোঁয় আকাশ, বৃক্ষের পক্ষী ডানা মেলে, কেঁদুয়া গর্জায়, বনবাসী সাধু সরোবরে নামে, তৃণচর গোকুল হাসা ডাক পাড়ে কিন্তু মন দাহ হলে? ও নাইয়া, সে অঙ্গারে এক জনই দক্ষ হয়। তিলে তিলে কণায় কণায় সে দহন। তাই বারে বারে সেতুবন্ধে আসা, নদীজলে দেহ পাতা। তটিনীর যেমন কূল ভাঙে তেমন নারীরও বুক ভাঙে, নাইয়া রে। সে ভাঙনের ধ্বনি জাগে না, সে ভাঙনের ভূমি-ভেদ চক্ষে পড়ে না, সে ভাঙনের আঘাত লাগে না অন্য কারো দেহে তাই সংসারে এত সুখ। মনে বড়ো দুখ, চিতে বড়ো জ্বালা, নাইয়া রে। একবার নাও বেঁধে শশী বদনখানি দেখাও হে যৌবনের ব্যাপারী।

সোনার তরী রঙের বাদাম দিয়াছ উড়াইয়া  
পুবাণি বাতাসে বাদাম উড়ে রইয়া রইয়া।  
রং দেখিয়া এই অভাগি কান্দে ঘাটে বইয়া।  
সোঁতের টানে কলসি আমার গেলেরে ভাসিয়া।  
আইস, আইস সৃজন নাইয়া, কলসি দেও ধরিয়া  
কী ধন লইয়া যাইব ঘরে শূন্য আমার হিয়া।

বামার দুখে মধ্যরাতে নড়ে ওঠে ভারদ্বাজি বন। বনকপোতের নীড় হতে ডাক জাগে ঘুঘু...ঘুঘু। সে বিষাদ ঘন হয় সমবেত স্বরে। আঘন বায়ুতে সে স্বর বাহিত হয় সারা বন। শিবাশিশু কাঁদন জোড়ে। যেন সমস্ত ক্ষুৎ-পিপাসা হঠাৎই মাথা তুলেছে বনবহির মতো। সে কান্নার প্রতিধ্বনি কেতকীর নিষ্পত্র শাখে। অশরীরী কোনো আত্মা কেঁদে চলে নিরন্তর। বড়ো নিদারুণ সে সুর, বিষ্ণুশিলার চেয়েও প্রাচীন, কপ্তিপাথরের চেয়েও নিকষ, তক্ষকের চেয়েও বিষদ, তক্ষের চেয়েও তীক্ষ্ণ, শ্বেতচন্দনের চেয়েও শীতল। কিশোরীর ক্রেশে চক্ষু বোঁজে বেল-মালতী ফুল, শ্বাস ছাড়ে ময়াল নাগ, খসে পড়ে গগনের তারা, আঁচলে নয়ন মোছে হলধরের পত্নী, হাহাকার করে শ্মশানের মৃৎকলস, কপিবর বুক চাপড়ায়, 'হা সীতা হা সীতা'। কিশোরীর বেদনায় একে একে খসে পড়ে মাতুলুঙ্গি লেবু, ভূমিচাম্পা ফুল, ভালুকাবাঁশের খোল, যোগিনীর বেশ, বেঙাচির লেজ, বটের বক্ষল, কেকার পেখম, অহির খোলস, নাইয়ার কেরয়াল। কিশোরীর মরম ব্যথায় পদ্মপাতায় টলটল করে জল। অশ্রুপাত করে নদীকূলের লতাপাতা, পতঙ্গ বাঁপ দেয় শ্মশান বহিতে, বিবাগি ডিঙি ভেসে চলে নিরুদ্দেশ, উথালপাথাল ভ্রমরা স্রোত।

বাউলি বাদ্যযন্ত্র হাতে গীতের প্রথম কলি গাঁথে— ও বেদনি সই, মন মোর কান্দিয়া ঝরে।

উলুক বলে, বা, সুরটিতে বেদনার ঘন একটা আবেশ আছে। ‘বেদনি’ কথাটিও বেশ। বেদাস্তীর জ্ঞান কিংবা বেদবতীর দ্যুতি নেই কিন্তু সমব্যথা আছে। বিষাদের একটি সঙ্গী পেলে মনের যাতনা লাঘব হয়।

নাটশালে আবার সুর ওঠে। সে বোলে নদীর বেড় ভাঙে, জল বাড়ে, বিস্তার ঘটে দরিয়ার, ঢেউ জাগে। আকাশতটে কাজল দেয়ার সমাবেশ, উদ্ভাস্ত সারসের অকস্মাৎ ডানা মেলা, অবিশ্রাম বিজলি ঝলক, জলজীবের অনন্ত উচ্ছ্বাস, নদীজলের উদ্দামতা আর মাঝ দরিয়ায় একটুকি এক ডিঙা। উত্তাল বায়ুতে নাকাল বাদাম, উদ্ভাস্ত জলতলে বেতাল কেরয়াল আর লহর দরিয়ায় একাকী নাইয়া। কুলবালাকে বায়ুযানে বিপদবার্তা পাঠায়—

বন্ধু রে কুল নাই, কিনার নাই

উঠছে কত ঢেউ

এমন নিদান কালে সঙ্গী নাই মোর কেউ

বন্ধু কই রইলায় রে।

হাহাকার মধ্যরাতের বালুতটে। হলধরের পত্নী চক্ষু মোছে। সুকেশী-দিগম্বরী-ক্ষেমা বক্ষ চাপড়ায়। যে ধলা মই মগ্ন ছিল মদিরা ও মাস বিপণে সেও উঠে দাঁড়ায়। সঙ্গী হয় রসিকজন। কিন্তু নব বাক্সলের মুদ্রা নৃত্যের। মাঝ দরিয়ার নাওটির মতো তারাও দোলে। বাদামখানি করমুষ্টিতে ধরলে কেরয়াল বেপথু, কেরয়ালটি করতলবদ্ধ করলে বাদামটি বেতাল। এবার বুঝি নাও ডোবে!

ঝড়-বাদলের মতি বদলায় একসময়। জল নিংড়ে নির্ভার হয় জলদ, শিথিল হয় বায়ু, শীতল হয় অগ্নি, কোমল হয় জলশিলা, নরম হয় জল-ফণী। বাদাম ফিরে পায় নিজ মুদ্রা, কেরয়াল নিজ তাল, ডিঙা চলে আপন মুদ্রায়।

উলুক বলে, মধ্যরাত গড়ালো, বাউলি। প্রেম-বিরহের নানা মনোহর কলি শুনলুম। নাটশালার গীত কি এবার শেষ হবে?

বাউলি হাসে। বলে, শেষ গীতটির সুর জেগেছে, তারই টানে শির দোলায় দুর্বা, গীত গায় ঝিঝি, দোলে কলমি লতা, মাতৃজঠরে পাক খায় হলধরের সন্তান। ওই দেখ কৌতুকে হাসে সপ্তঋষি, নৃত্য করে সুকেশী-দিগম্বরী-ক্ষেমা, নতুন ভাণ্ড খোলে ধলা মই। মধ্যরাতের আঁধারে নাইয়া গিয়েছিল কন্যা গেহে। টোকা দিয়েছিল দ্বারে। আচম্বিতে সরব গৃহবাসী সারমেয়। মহাতঙ্কে নাগর নাইয়া।

কন্যা সন্তোষ দেয়—

কুকুর জাতি নেলজ জাতি  
ডাঙ্গেরা ভাঙ্গিম ঠাং  
দুখে আসুক সুখে আসুক  
কীসের ঝাং ঝাং।

সব বাদ্য সরবে সারমেয়ের নিন্দা করে। ধর্মরাজ নীরব। একসময় শিরটি ঈষৎ  
তুলে বিনয়ে বলে—

‘চোর’ ‘চোর’ বলিয়া করিলাম ঝাং ঝাং  
কায় জানে তায় গিথ্যানির বেটির নাং।

নীরব হয় নাটশালা। খানিক পর উলুক বিষাদী স্বরে বলে, গীতের কলিগুলি  
বড়োই কামুক। ধনিও কেমন কাঁসর বাদ্যির মতো, তুমি কী বল, বাউলি?

বাউলি উত্তর দেয়, যে বয়সের যা ধর্ম। এটি ওদের রঙ্গ-রসের কাল। কর্ম,  
কাম ও কামনার ত্রি-ভাব বড়োই প্রবল। গীতেও তাই যত রতি তত রঙ্গ।

ত্রিকালদর্শী উলুক বাউলির স্বকাল তত্ত্বে সম্মতি জানিয়ে বলে, তুমি রসবেত্তা  
রসস্রষ্টা, জাগতিক বিষয়ে তুমিই সত্য। কিন্তু তোমার ওই কাল তো বড় সংকীর্ণ।  
স্থিতধী হয়ে তটিনীর দিকে তাকিয়ে দেখো নাওখানি মৃত্তিকার, ছইগৃহের ছাওনিও  
তাই। নাওয়ার অধিকারী শ্রীকালি, ভাগুরী গৃধিনী আর কাণ্ডারি হল কাউয়া।  
ক্ষণকালের জগৎকর্ম শেষে অচিরে ওই নাওখানি যাবে অতলে আর নাইয়াদল  
হেমতরী বাইবে সুরধামের মন্দাকিনী শ্রোতে।

বাউলি সহাস্যে বলে, হচ্ছে ইহ জগতের গীতসুধার কথা আর তুমি অবস্থান  
করছো সুরলোকে। ত্রিকালদর্শী তুমি কিন্তু দিবাজাগর নও। তাও দেখতে পাও না  
কত প্লাবন-অনাবৃষ্টি শোক-তাপ এ-জীবনে।

বিষণ্ণ উলুক বলে, তুমি অশ্রান্ত, বড়ো বেদনা বড়ো বিষাদ পার্থিব জীবনে।  
কিন্তু এ-সবই তো অনিত্য, নৈমিত্তিক। অনন্ত সত্য হল এই ভ্রমরা আর ওই  
গগনগঙ্গা। শয়ানে যাবার আগে দু-লোক জুড়ে দু-কলি গীত গাও দেখি।

বাদ্যখানি হাতে তুলে গগন-পথে চেয়ে বাউলি গায়—

তুই যাস না রে মন পাখি তুই ফিরিয়া আই,  
ওরে শুক-শারি নামে পাখি আয় হাদি পিঞ্জরায়।

সপ্তডিঙা জলতরঙ্গে বয়ে চলে কেরয়াল স্বরে।

## ১৮ ডাহিনে ললিতপুর বামেতে ইন্দ্রাণী

ধনপতির সপ্তডিঙা জল কাটে। প্রহর গড়ায়। আঘন হিমে দু-তট ধূসর, নদীস্রোত ধোঁয়াটে। ঘুমে নিথর চারপাশ, নীরব জীবকুলও। সবাক শুধু সপ্তডিঙার কেরয়াল। নদীজলে সমবেত সমাহত সে ধ্বনি। সচলও।

ভ্রমরা শরীর গোটায়। ভোরের আলো ফোটার আগে গুঞ্জন থেমে যাবে তার। একটুকি একজানি একছিয়া জীবনের সঙ্গী সে, সুদূর যাত্রী নয়। দু-তীরের মানুষজন, পশুপক্ষী, গাছপালার হাসি-কান্না জীবন-মৃত্যু ভ্রমরাকে ঘিরে। তারা চেনে তাদের আপন স্রোতের গতি মতি, রাগ-অভিমান। ভ্রমরাও জানে দু-তটের প্রতিটি পশু-পক্ষীর ডাক, বোঝে প্রতিটি বৃক্ষের শ্বাস, চেনে প্রতিটি মানুষের সাধ। কিন্তু রাতের শেষ প্রহরের পর রং বদলাবে পলির, মাটি-বালির ধাত পালটাবে, নদী-কাছাড়ে উঁকি দেবে ভিন্ন গাছ, অন্য সুরে হাল টানবে নাইয়া-গাবর। ভিন্ দেশের ভিন্ কথা, ভিন্ গাথা, ভিন্ কাঁথা, তার নদীটিও ভিন্ন। তখন পর দেশের স্রোত ছুঁয়ে গৃহে ফেরা। শালি, অরিকেশী, আমোদর, তারাজুলি, খাড়ি, বাঁকা, পাগলা, নুনবিল, পলাশি, গস্তীরা, চিল্লা, ডাওকি—এমন কত-না ঘরমুখো স্রোত! ফেরত যাত্রায় আবার পরিচিত ছবি : খঞ্জ ভিখারির গঞ্জ যাওয়া, দোলায় চড়ে বর-কন্যার যাত্রা, গজবাহিনীর জলকেলি, নদীকূলে হটযোগীর হুলাহুলি, শ্রীকালির শিকার সন্ধান, নদীবাঁকে বেউশ্যা ও ব্যাপারীর বাকরঙ্গ। সেই শোনা সুর : শ্রীফল বৃক্ষের ডালে ভাস পাখির, নায়ে ভাট্যারি গীতের, নদীঘাটে বান্যানীর, চেষ্টা শাখের মধুচক্রে মক্ষিকার। সেই আদি গন্ধ : প্লবঙ্গ-পাথরতলে হিলিঞ্চার, আঁশিঘাটায় গাঁখাল পত্রের, সেতুবন্ধে ভূমিচাম্পা ফুলের, শ্মশানসৌধে ধূনা-কর্পূরের, তৃণবনে গো-কর্শ মুগের। চেনা দৃশ্যে, চেনা-সুরে, চেনা বাসে ফিরে চলে ভ্রমরা। মোরগের ডাকে, পাখির কুজনে, কুলিরের ব্যস্ততায়, বাউলির সুরে, কামুকের ঘরমুখো পথে, উলুকের ঘুমাবেশে ভোর হয় অজয়ের দু-তীরে।

ডাহিনে বাবলা বৈচি তাল খাজুর যজ্ঞডুমুর ঘেরা ছোট একটি গ্রাম। নাম ললিতপুর। সেই লালিত্য শিশিরধোয়া ভূতভৈরবীর ঘনসবুজ পাতায়, সদ্য-ফোটা পানিশিউলি ফুলে, নতুন বছরের তালচারায়, নীলকণ্ঠ পাখির ডাকে, ডিঙার রঙিন বাদামে, কদলীর ছড়ায়, অজয়ের সুদূর বিস্তারে। আঁধারের ভেতর থেকে ফুটে-ওঠা গ্রামটির বায়ুতে শুচিতা, লবঙ্গলতায় শুভ্রতা, স্বরে মধুরতা। বিলাসী সেই গায়ে ধীর পায়ে মাঠে চলে হালের বৃষ, আয়েশে গোঠে যায় কিশোর রাখাল, মছর পাক দেয় তেলিয়া বলদ, শুয়ে থাকে একান্তে কুমারের চাক। অচঞ্চল ললিতপুর জনপদে কাঁচা রোদ নীরবে ওঠে গো-শালার মাথায়, শারিকা নিঃশব্দে দানা-খোঁটে,

সদাগরের নাটশালার বাদামে নিশচূপ বসে থাকে মৎস্যরাঙা, আপন মুদ্রায় হেঁটে চলে শম্বুক। ললিতপুরের স্নিগ্ধ প্রত্যাষে হিমেল হাওয়ায় তিরতির দোলে ইক্ষুপাতা, রোদে দেহের হিম শুকোয় হরিদ্রা ধান্য, সবুজে রঙিন হয় খামালুখেত, তাম্বুলপত্র আঁকশিতে দেহ জড়ায়, সূর্য থেকে সাত রং জমায় কুসুম ফুল, শরীরে রস টানে টুমুর কলাই। কাষ্ঠবেড়ালি দু-হাতে নম করে শিবলিঙ্গ, নিশিজাগর সারমেয় দিবাস্বপ্ন দেখে, ললিত আঘাতে মক্ষিকা তাড়ায় গো-বৎস, স্মৃতিমেদুর বৃদ্ধ মেঘ জাবর কাটে যৌবন দিনের, বনমার্জার পেছনের দু-পায়ে পাতার স্তূপ গড়ে বুড়ি গয়লানির রন্ধনের কাজে। ধনপতির সপ্তডিঙা গড়িয়ে চলে নিস্তরঙ্গ স্রোতে। বেলা বাড়ে। নদীতটে বালু হাসে। সরব হয় ছেলিপাল। জালিকের জালে লাফায় মীন। দূর গাঁয়ে চলে শুকদল সবুজ ডানায়। লাঙলি তাড়া দেয় বলদ জোড়াকে। সপ্তডিঙা থামে। প্রাতঃকৃত্য ও স্নান শেষে দক্ষিণের জনপদ ইন্দ্রাণী যাত্রা।

অবগাহন অস্ত্রে সাধু ধনপতি নববস্ত্রে নিজ হাতে ফুল চয়ন করে। ইন্দ্রশক্তি ইন্দ্রাণীর মন্দির গ্রাম-ভেতর। বহুকাল আগে পর পর তিন সন বাদল দেখেনি এই জনপদ। পুষ্করিণী শুকোয়, দিঘি মরে, খাল ফাটে, নদীও প্রবেশ করে পাতালে। ঘাটে মানুষ নেই, হাটে নেই ব্যাপারী। দেশান্তরী হয় ক্ষেমংকরী, আকাশ ছায় গিধিনিতে। সুখানা চালায় বসে কা-কা ডাক দেয় কাউ। হা-অন্ন হা-অন্ন বিলাপ। জল থইখই অজয়তটের মানুষ দুই করতল তুলে জলভিক্ষা করে ইন্দ্রশক্তির কাছে। জলদেবী ইন্দ্রাণী চোখ তুলে চায় এক দিন। জল-আকাল আকাশের কোল কালা হয়, আড়াল হয় আগুন-চাকি, আঁধার নামে দিনদুপুরে, হাঁক পাড়ে মেঘমল্ল, আকাশ ভেঙে জল নামে, চলে একটানা চব্বিশ প্রহর। তখনই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বজ্রহস্তা গজরাজরথাস্থিতা ইন্দ্রাণীর মন্দির। সাধু ধনপতি দীপ-ধূপ-চন্দন-মধু-খণ্ড-দধি-পুষ্পে আরাধনা করে— দেবসত্তা যেমন এক ও অদ্বয় তেমন শক্তিও রূপে ভিন্ন হলেও আকৃতি ও প্রকৃতিতে পুরুষ দেবতার সমধর্মী। তাই হে ইন্দ্র, তোমার নারী রূপটির মাধ্যমে তোমার আদি দেবসত্তাকেই আমি শতকমল অর্ঘ্য দিই।

ভেরি-শঙ্খ বাজে। পূজিত হয় অদ্বৈত ইন্দ্রদেব। খঞ্জ মাধুকরী খণ্ড বোঝে, লিঙ্গ তত্ত্ব জানে না। প্রসাদি রসাল খণ্ডে তৃপ্ত ও তুষ্ট ভিখারি গ্রাম-পত্তনীর গল্পো শোনায়। রাজরোষে ভিটা ছাড়া কয়েকটি পরিবার চলেছিল দূর দেশে আশ্রয়ের সন্ধানে। অজয়তটে চোখে পড়ে একটি আকাশভেদী ইন্দ্রাণী বৃক্ষ। ফুলে-ফলে নিসিন্দা গাছখানি যেন বনরাজ। তাকে জড়িয়ে অজস্র বনলতা, বনপুষ্পের ঘরসংসার। সেই ইন্দ্রাণী বৃক্ষের নীচে জলকলস, অন্নপাত্র, শয্যাঘ্রব্য নামিয়েছিল বাস-সম্বানী মানুষজন। বৃক্ষতলে বসিয়েছিল কুলদেবতা। বজ্রধারিণী ইন্দ্রী মেঘবাদল পাঠানোর পূর্বেই বাস্তু, গোশালা, খেতখামার তৈরি হয়েছিল এই

জনপদে। নদীকূলের কূর্মডাঙায় অলাবু ফলত অগুনতি। মাপে বনবরাহ।

পাল তোলে কেরয়াল, সপ্তডিঙা চলে। লাঙলি আধা মাঠ চষে জিরেন দেয় গো-জোড়ায়। জোড়া বলদ জলপানে চলে নদীতে। দু-টি ফিঙা উঠে বসে বলদ পৃষ্ঠে। বায়ু বিহারে কর্ম মেটে, আহ্লাদ হয় না। বলদ চলনে একটা ভিন্ন গমক, গজগমনের মতো। যেন গজারাঢ় নৃপতি চলেছেন তটিনী তরণে। পরের ঘাটে কদম্বতলে বাঁধা এক পারানি ডিঙা। ভিন পাড়ে যাবে দধিকর, লবণিয়া, মাসব্যাপারী, পারথি কিন্তু আরও জন লাগে। নাইয়া-সঙ্গী শীর্ণ সারমেয় প্রতীক্ষা করে জলযাত্রীর। অধৈর্য কখনও ঘুরে আসে এদিক-ওদিক। ঘ্রাণে বুঝতে চায় নদীঘাটের কোন জনা এপারের লোক, কেই-বা পাড়ির। দধিকর বিলাপ করে তার দু-টি গাভীই প্রসব করেছে দু-টি অঁড়ুয়া। তেলিয়ার চাক ঘোরাবে নয়তো টানবে হালির হাল, তার জন্যে যতনে লালনপালন। পারথি নালি কাটে প্রসূতির। সে বামী সান্ত্বনা দেয় দধিকরে। বোঝায়, জঠর একাধিক, একটির অঁড়ুয়া ফলে বিলাপ করতে নেই। দধিকর নড়ে বসে। বুঝতে পারে না, আর একটি গাভী কিনবে, না কি কদম্বতলে মধ্যনিশীথে বংশী বাজাবে রামীর প্রতীক্ষায়। শ্রৌঢ় লবণিয়ার বুক ফাটে যুবতী পারথি দধিকরের সঙ্গে রঙ্গ করেছে দেখে। লবণ ছাড়া ব্যঞ্জনে কোনো স্বাদ নেই, অথচ তার দিকে ফিরেও দেখে না বামী। লবণিয়ার সাধ যায় আপন হাতের দণ্ড বসায় আপনার শিরে। বোধে ফেরে একসময়। জমি চষে হালিক, জাল টানে জালিক, ক্ষীরপুলি গড়ে মোদক, সুতা কাটে তন্তুবায়, সবাই কর্মে বাঁধা। রঙ্গরসে কেবল গোপেরাই। অজয় নদকে সাক্ষী রেখে মধ্যাহ্ন সূর্যের কাছে লবণিয়া বর মাগে : পরজন্মে গোপজীবন দান করো, হে সূর্যদেব। দুষ্কের মতো আহার নাই, গো-এর মতো ধন নাই, বেণুর মতো বাদ্য নাই, গোচারণের মতো ভূমি নাই, যমুনার মতো নদী নাই, কৃষ্ণের মতো নাম নাই, কদম্বের মতো বৃক্ষ নাই, রাধিকার মতো প্রেমিকা নাই।

নদীঘাটে সপ্তডিঙা থামে। নামে রান্ধনি-পণ্ডিত। দ্বি-প্রহর পাক নদীতীরে। কাষ্ঠ সন্ধানে চলে নাইয়া। গাবরে গড়ে অগ্নিকুণ্ড। কুঠারের ঘা পড়ে কুলিতা গাছে। বনচড়াই সরব ডানা মেলে আকাশে। সে স্বরে গলা মেলায় কুরর-কুলিঙ্গ পাক। সারা গ্রামে বার্তা রটে সপ্তডিঙার। নালিকদল চলে চুপড়ি ভরে বাগ্যান, কুমুড়া, কচা, কাঁচকলা, সজিনা কাঠি নিয়ে। মাথায় চড়ে বেথুয়া শাক, পলাকড়ি, মুসরি ও মাষকলাই, মানকচা। জালিক আনে ছিয়ে-মাপ পাঁচ বুড়ি কাতল মাছ। সঙ্গে বিশ-গুণ্ডা শকুল। দধিকরদল চলে বাঁক কাঁধে শত ভাণ্ড নিয়ে। তার পিছনে যায় মোদক খণ্ড নাড়ু ক্ষীরপুলি ভরে মৃৎপাত্র।

আঘন মৃদমন্দ বাতাসে আশুন ফণা তোলে। কটু তৈলে ভাজা হয় বেথুয়া

শাক। সুস্তা রন্ধন হয় বাগ্যান, কুমুড়া, কচা, কাঁচকলা, সজিনা, মোচার সঙ্গে মশলা মিশিয়ে। সন্তলন হিঙ্গু-জিরা-মেথির। রসবাস-হিঙ্গু-জিরা দিয়ে মুসরি-মটর সুপ চাপে। ঘূতে ভাজা হয় পাঁচ সহস্র পলাকড়ি। বোল হয় মানকচা, বড়ি, মরিচ ভূষিত কাতল মীনের। খর লবণে আশ্র ও শকুল মীনের অম্বল বড়ো পছন্দ সদাগরের। শকুল মিললেও অকালে আশ্র মেলে না। অতিথিপরায়ণ খেয়ানাইয়ার পত্নী আনে পাঁচ কাঠা প্রাচীন তেঁতুলি। অবশেষে ওদন চাপে।

অগ্নে বসে সদাগর, কনক থালে। কাণ্ডার ও নাইয়া-গাবরদের কদলী-পত্র পড়ে। নালিক, জালিক, দধিকর, মোদকের ভোজাহারে আমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ সপত্নী খেয়ানাইয়ারও। সদাগর শিবস্মরণে আচমন করে দু-বার, গণ্ডুষ করে সুবনদীর জলে। শাক-সুস্তা-সুপ-মীন ভোজনে তৃপ্ত হয় সর্বজন। দধি-খণ্ডে সাধ মেটে রসনার। সদাগর ভোজন করে মৌনে। রান্ধনি-পণ্ডিত প্রতীক্ষা করে কুতূহলে। কর্পূর-তাম্বুল খেয়ে সাধু হাসে। বেঞ্জে সাধু তৃপ্ত, ভোজনে প্রীত। ও-দিকে ডিঙা ভেতর মাতঙ্গ-প্রবঙ্গ-কুরঙ্গ-তুরঙ্গের খাওয়া শেষ। সদাগরের অনুমতি নিয়ে কাণ্ডার বলে, শিব নামে বাদাম তোলা হে, কেরয়াল ধরো।

সপ্তডিঙা দোলে। বাদামের ফিঙা ডানা মেলে। ভোজে তুষ্ট কাউয়ার দল সমবেত চিৎকারে সাধুর মঙ্গল কামনা করে। ঝিঙাফুল রোদ হাসে মধুকরের রইঘরে, দুর্গাবরের কর্ণে। বেলা শেষে গ্রামের বউ-ঝিরা নদীবন্ধে আসে কলসে জল ভরতে। পেছনে দিগম্বর শিশু, নেওটা নেউল, কোলকাঙাল মার্জার। বাঁক নেয় ডিঙা। রাখাল বেলা মাপে বাবলার ছায়ে। পড়ন্ত বিকেলে ফড়িঙার পাল বিহার করে ধেনো মাঠে, জাঙ্গল শ্মশানে। প্রজাপতি গোধূলি ফুলের মধু খেতে পাক দেয় সরিষা খেতে, মাধবীলতার বনে, আকন্দের ঝোপে। গোশালের জন্য ব্যগ্র হয় বাস্ত-কাতর গাভী। মন নেই চরায়, ঘাড় তুলে দেশান্তরী ডিঙা দেখে। গো-বৎস ছিনে। বার বার ফিরে আসে মাতৃস্তনে। জাল তোলে বৈকালিক জালিক। শফরী মিলেছে আধা ঝাঁঝরি। কটু তৈলে ভাজা হবে রাতে। সাঁঝের শ্রীকালি চলে সতর্ক পদে। নিত্যদিনের শিবাভোগে ক্ষুধা ঘোচে, বাসনা মেটে না। যদি একখানি বালিহাঁস কিংবা বনমোরগ মেলে গোধূলি লগ্নে সুবর্ণ বালুচরে! ক্ষেমংকরী ডানা গুটিয়ে বসে বটবৃক্ষের ডালে। দিনশেষে মনকে মুক্ত করতে হয় অস্থির-ক্ষণিক-চঞ্চল-ভঙ্গুর-নৈমিত্তিক এই জগৎ থেকে। ধ্যান করতে হয় শাস্ত-সনাতনের। তা না হলে জগৎ-সংসার হয়ে উঠবে সদাগরের সপ্তডিঙা, পণবাহী যান। ডিঙাবাহী সাধুর মন মূল্যবান পণে, বনবাসী সাধুর মন অমূল্য ধনে। বটকোটরবাসী খড়িশ ক্ষেমংকরীকে ‘তিলে ঢেমনা’ বলে নদীতীরে চলে। দিনশেষের মিহি আঁধারে প্লবঙ্গের রঙ্গ হল নদীজলে বাষ্প দেওয়া। তখন দু-একটি

উদরস্থ করতে পারলে নিশিবিহারটি সুখময়। সদাগরের ডিঙাতে যদিও অজস্র পাখপাখালি, কিন্তু খাঁচাগুলি বড়ো পোক্ত আর বুনন বড়ো ঠাস। লখিন্দরের সর্পাঘাতের পর সাধুদের বড়ো রোষ মাঘ-শীতল এই অবলা লতাটির ওপর। বছর বছর কার্তিক পূজা আর ঘরে ঘরে কার্তিকবাহন অহি-খেকো কলাপী। বাতিগুলিরও বেশ জ্যোতি সপ্তডিঙার। আকাশপানে মুখ তুলে হাসে। আলো ঝরে চারপাশ। অজয়ের জলনলতা রাঙা হয়। কনককমল দোলে। জলগুম্ম চোখ মেলে।

বৃক্ষবাসী উলুক দু-চোখের বাতি তুলে বলে, শুভ হোক সাধুর সাগরপাড়ি, লঙ্কাযাত্রা।

## ১৯ অজয়যাত্রা

সপ্তডিঙার কাণ্ডার বৃঢ়ন চোখ পাতে আকাশে। গত নিশায় দ্বিতীয় মৃগশিরা মেলেনি সেখানে। আঘন হিমে ঢাকা ছিল মহাকাশ। ভ্রমরা ছিল কাজল কালা, এলোকেশী। আজ ভিন্ন স্রোতে চলা। অজয়ের বিপুল বিস্তার, ঘন নাদ। এই বৈভবী যাত্রায় যদি আশাবাতি জ্বলে আকাশে, হাসে তৃতীয়ার খণ্ড শশী, তরল হয় বারিবাপ্প!

অজয়ের দু-কূলে স্থিতধী বটবৃক্ষ, বহেড়া, কদম্ব, পক্টি বৃক্ষসারি। সন্ধ্যাহিকে মগ্ন কাশ বন, চুঁচুড়া ভৃগভূমি, উলুখাগড়ার বনবাদাড়। ঝিল্লিদল সরব নিশি-বন্দনায়। গাঁ-গঞ্জে ধ্বনি ওঠে শঙ্খের। গজদল চলে বন পরিক্রমায়। করজোড়ে নম হয় সাধু। গজদর্শনে সদাগরের সিংহদুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে অষ্টঘোড়া রথ, বাহির মহলে বাঁধা থাকে শত মরাই মোহর, সহস্র মানিক ভাণ্ডার থাকে গৃহে। কূলবাসী যোগী দেখে ধনপতির সপ্তডিঙা। বিলাপ করে, দুর্মূল্য পণ বয় সহস্র অমূল্য জীবন। করপুটের জলার্ঘ্যে মেলে সুরলোক আর সপ্তডিঙায় সহস্র কেরয়ালে ধনপতি সদাগর চলে সিংহল দ্বীপ। অকিঞ্চিৎ কাঞ্চনের কিবা রঙ্গ, ভাবে পর্ণকুটিরবাসী।

অজয়ের দক্ষিণতটে মহা ধুম। নিশির দ্বিতীয় প্রহরে কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। তীর ধরে চলে বর ও সঙ্গী যাত্রীদল। চিত্তের হর্ষে বরের বদনখানি বিধু, মূর্তিটি মদনের। শিরে কলধৌত মুকুট, অঙ্গে কুমকুম, দু-করে হেম তাড়বালা, কর্ণে আজানু বনমালা। ভাট পড়ে কায়বার। তার স্ততিবচনে এমন যোগ্য পাত্র নেই ধরাধামে। যেমন রূপ, তেমন গুণ, তেমনই উত্তম ব্যবহার। সত্যে যুধিষ্ঠির, মল্লে ভীম, কার্মুকে ধনঞ্জয়, গীতে নারদ, ভাবে মহাদেব। নাট হয় নদীতটে। গীত গায়

গায়নদল, ‘কাঞ্চা সোনার অঙ্গ গো বরের/বর্ণ গোরোচনা/না দেখি এমন রূপ গো/কী দিব তুলনা?’ অন্য কলি আর এক গায়নদলের কণ্ঠে, ‘সাধক পুরুষবর গৌরবরণ/পরিণত সুচতুর ভাবলক্ষণ।’ আগে পিছে চলে সিঙ্গা-কাড়া, করিবর পিঠে দামামা বাজে। সামনে রণভীমা মল্ল করে, পিছনে উড়া পাক দেয় পাইক। দু-পাশে ধনুক হাতে ধায় ধানকী। রাজা ধুলা মেখে মহানন্দে নৃত্য করে শতেক তবকী। রাইবাঁশের সোচ্চার রবে বনবাসী কেঁদুয়াদল চলে গহন কাননে। আতশবাজি শতেক বিজুলিতে ছড়িয়ে পড়ে আকাশে। সহস্র অগ্নি কুসুম ফোটে, আন্দোলিত হয় আঘন বাতাসে, একসময় ঝরে পড়ে অজয়ের স্রোতে। কখনো আকাশ জুড়ে শতপুষ্পে জাগে কদম্ববৃক্ষ। ভেসে বেড়ায় বর্তিকা-সারি। অজস্র আতস-প্রজাপতি সপ্তবর্ণ ডানায় উর্ধ্বগামী। অজয়ের দু-কূল বিস্তারী স্রোতে আলোক-বর্ণালী।

তট থেকে পুরীমুখে ফেরে বরযাত্র ঠাট। শত অগ্নিশলাকা বালুতট থেকে মৃত্তিকা পথে ঘোরে। ভাট ও গায়ন কণ্ঠ দূরে সরে। ধীরে ধীরে স্থিমিত হয় বাদ্যধ্বনি। একসময় গগনখানি আবার আপন রূপে ফেরে। সপ্তডিঙা পার হয় নতুন সেতুবন্ধ। কাণ্ডার কর্ণে অজয়ের বন্ধিম স্রোতে বাঁক নেয় ডিঙা। ঘন হয় রাত। কূলবর্তী বৃদ্ধের অবকাশ মেলে সুরলোক যাত্রার। লহমনভোগ ও কালাকার্তিক ধান্য কর্তন শেষ। সংস্কার শেষে এখন লক্ষ্মীভাণ্ডারগুলি পূর্ণ। উত্তরের খেতে যব, কড়াই, খেসারি, মুসুরি, তিসি বপন শেষ। দক্ষিণে করলা, চৈত্রশশা ও তরমুজে অঙ্কুর। চতুর্দশীর উপবাস, দীপদান, শাকভক্ষণ, শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা, রাসযাত্রা, ইতু পূজা, কার্তিকেয় ব্রত ইত্যমধ্যে পালিত। তাই এই আঘন তৃতীয় ইহলোক ত্যাগে সুসময়, শুভক্ষণ। মৃতযাত্রায় দোষনাস্তি। পাপক্ষয়ে ঘৃতাশ্রিতির ব্যয় নাই। সঙ্ঘাতিক উত্তর দুগ্ধ ও গঞ্জিকাসেবন শেষে বৃদ্ধ সান্ধ করে ভবলীলা। আত্মাটি উড়ে চলে স্বভূমে, নশ্বর দেহখানি পড়ে থাকে তলে। সংসারের স্কন্ধে চড়ে এখন চিতাশয়নে। মোহ কাঁদে, মায়া চক্ষু মোছে, ভ্রম ধিকিধিকি জুলে হিমেল বায়ুতে। উল্লুক জ্ঞানদৃষ্টিতে ভবলীলার রঙ্গ দেখে। কাণ্ডার কর্ণ নামায়, কেরয়াল থামায় নাইয়াদল। ধনপতি করজোড়ে গড় করে বহিচিঁতা। তুমিই আদি সত্য হে, শেষ মিত্র।

সাধু দেখে চিতাবহি, কাণ্ডার দেখে অগ্নি কোণে যোগিনী। শিরে মায়াবিনী আট নারী, কুহকিনী অষ্ট কামিনী, কী করে সপ্তডিঙা বাই হে সদাগর? মঙ্গলা, পিঙ্গলা, ধন্যা, ভামরী, ভদ্রিকা, উষ্কা, সিদ্ধি, সঙ্কটার একটি কোমল হলে অন্যটি প্রখর। মঙ্গলাটি মনোহরা কিন্তু রবিবাসী পিঙ্গলা বড়োই তপ্ত। বাদাম পুড়লে কীসে হাওয়া ধরব সাধু? ধন্যা হিতকারী ও সুভগা কিন্তু ভামরী? ওর রতিমধুতে মজে

নিত্যদিন মূর্ছা যায় কতশত জনা। জলযাত্রায় কত-না ভ্রমরী চলে নিশিতীরে  
নদীকূলে, হাসে সাগরকমলে। ভদ্রিকা যদিও সুশীলা-কান্তা-শুভকরী কিন্তু উষ্ণায়  
বড়ো তেজ বড়ো তাপ। ওই দেখো উষ্ণামুখী শৃগালী আগুন উগরায় দাড়িস্ব  
গাছের তলে। সিদ্ধিতে ফললাভ কিন্তু সঙ্কট সদাগর? পরাণ সঙ্কট লোনা বায়।

হিম-আবরণের ওপর-নীচ আলো-কালোর এক জাদুরঙ্গ। চাঁদোয়ার বায়ুদোলায়  
রহস্যময় চতুর্দিক। গন্ধবেনার উগ্র সুবাস, নদীস্রোতে অজস্র নাগকেশরের যাত্রা,  
বেণুবনের সমবেত কাঁদন, গিধিনি শাবকের ফুকার, একাকী গোবৎসের উদ্ভ্রান্ত  
বিচরণ, নির্জলা নিশায় কইয়ের খাজুর বৃক্ষ আরোহণ, গুয়াকাঁদির শব্দ পতন।  
কাণ্ডার বুঢ়ন দেখে পিপ্সলা-ভ্রামরী-উষ্ণা-সঙ্কটের নিশিকৌতুক। রঙ্গ ঘন হয়।  
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শিমুলি, সায়ড়া বৃক্ষ জাগে অজয়ের দু-তটে। প্রহর  
কাটে, রাত বাড়ে। গাড হয় বন। বৃক্ষের মাথা ছোঁয় গ্রহ-তারা। ভূতলে বনমাঝে  
অজয়ের আঘন স্রোত আর সদাগরের সাত নাও। আকাশে মূলা নক্ষত্র। সেখানে  
স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে সার্থত্রিবলায়াকারে বেষ্টন-পূর্বক তার অমৃতনির্গমস্থানে মুখ লগ্ন করে  
ভুজগারূপা কুণ্ডলিনী নিদ্রিত। নীচে দু-কূলের কাজল-আঁধার বনে মৃগপালের ত্রস্ত  
পদচালনা, তরঙ্গুর তাজ, দস্তীর দাপ, কপি দম্পতির সরব দ্বন্দ্ব, ফণ-ফণার শৃঙ্গার  
ধ্বনি, গজের উল্লস নিদম্বাস। আর উলূকের বিলাপ—বড়োই অজ্ঞানতা এই  
জীবকূলে।

বাক ফেরে নদী, দিক বদলায় সপ্তডিঙা। মাথা নামায় বৃক্ষ। গর্জন থামায়  
বনরাজ। তরল হয় আঁধার। আলো ঝরে হিম চাঁদোয়ার ভেতর দিয়ে। কণ্টিকারী,  
তেউড়ি, কেশুরিয়া, খেতপাপড়ার শরীর ভাসে। কাশের ফুল চামর দোলায়।  
মধ্যযামের বায়ু জাগে। নাচে কদলীর হরিৎ পত্র, পিপ্সল কটুতৈল খেত, স্বেত  
কঙ্কার পুষ্প। সবাক হয় হটযোগীর করোটি, ত্রিশিরা সিঁজ বন, নগর দুয়ারি।  
সপ্তডিঙার বাদাম ডানা মেলে, যেন সাত ব্যস্ত বায়ুচর বাসে ফেরে দিন শেষে।

বায়ুর গতিতে ব্যাকুল হয় নদীও। ধাওনি ধায়। পড়শি স্রোত বয়ে আসে।  
মেশে অজয় প্রবাহে। ঘন হয় নদীস্বর। কেরয়াল ছোটো। দ্রুত হয় গাবর গীত।  
বয়ে আসে ধারা। উচ্ছ্বাসে মেশে। ব্রাহ্মমুহূর্তে অজয় মিলিত হবে ভাগীরথীতে।  
তার আগে প্রবাহিত স্রোত হয়ে উঠুক অনাদি, অনন্ত, অজেয়। দু-কূলের সমূহ  
ধারার সমবেত জলতর্পণে অজয় হোক বার্ষিকাজরাস্থ্য মৃত্যুহীন অশক্যজয়। তার  
জলে জন্ম নিক গণ্ডকীজাত চক্রচিহ্নিত শালগ্রাম শিলা, মঙ্গলভাবিণী শঙ্খ, নানা  
গোত্রীয় মীন। অজয়ের সুমিষ্ট নদীজল পান করুক পরলোকবাসী আত্মীয়-পরিজন,  
দু-কূলের নগরিয়া, দূরদেশি পাছ। অজয়ের স্রোতে অবগাহন করুক কুবঙ্গ, তুরঙ্গ,  
মাতঙ্গ। অজয়ের চরণধ্বনিতে সুর মেলাক পিকু, শুয়া, ক্ষেমংকরী। অজয়ের

বারিসেচনে ফলুক আউশ-কাউন-ভাসামানিক ধান্য, মাষকলাই, কৃষ্ণতিল, গোধূম, সর্বপ, রাইতিল আদি শস্য। অজয়ের শ্রোতে ও তটে ফুটুক শতদল কমল, ভূমিচাম্পা, বিসসোলা, বাকসনা, বাঙ্কুলি ফুল। অজয়ের চরে বেড়ে উঠুক বটবৃক্ষ যার ক্রোটে বস করবে বৃদ্ধ অহি, ডালে নীড় গড়বে উলুক, টেসকানা, কুরর, কঙ্ক।

বৃদ্ধ বুঢ়নের চোখে অপার বিস্ময়। নদীশ্রোতে এত বল এল কী করে, জল এলই-বা কেমন করে? তবে কি সহায় হিল মঙ্গলা, ধন্যা, ভদ্রিকা, সিদ্ধি? তারা উঠে বসল বাদামের টঙে? শুভ যোগিনীগুলি তাহলে বিশ সন আগের জলযাত্রা স্মরণে রেখেছে। কামিনীগুলিকে করজোড় নম করে কাণ্ডার। মুদিত চক্ষু খুলে দেখে অজয়ের অদেখা রূপখানি। বালুময় নদীতীর জলতলে। দু-তট ছাপিয়ে জলশ্রোত। শ্রোতে অজস্র ঘূর্ণন। বন্ধ পারাপারের খেয়া। জালিকেরও দেখা নেই। মীনভোজী প্রাতঃ-কাউ নিরুদ্দেশ। নেই ক্ষেমংকরীও। শুধু উদাম উত্তাল শ্রোতের তুরঙ্গযাত্রা ভাগীরথী মুখে।

কালো ও আলোর সন্ধিক্ষণে দুই ভিন্ন জলশ্রোত আলিঙ্গনে মাতে প্রবল উচ্ছ্বাসে। জলফেণা কুল হোঁয়, জলদানা জলধি। নদীসংগমে অবগাহন করে হটযোগী।

সাধু ধনপতি স্মরণ করে রাম নাম, প্রণতি জানায় ভূতনাথ পদে। তীর হোঁয় সপ্ততরী।

## ২০ নদী-সংগমে ধনপতি

ভাগীরথী-অজয় সংগমে জন্ম নেয় এক নব প্রত্যুষ। আঁধারের অবশিষ্ট কণাগুলি ঝরে পড়ে নদীজলে হিমকণা সঙ্গে। ধূসর দিগন্তটি ধীরে ধীরে কলধৌত। ধনপতি সদাগর দেখে সুদূর বিস্তৃত এক জলপুরী। দুই শ্রোতের মিলনে তরঙ্গ বাঙ্কয়, নদী-সংগম উচ্ছল। যেন দীর্ঘ আনন্দঘন, প্রতিক্ষিত এই মিলন, সুদূর প্রত্যাশী। লেখা ছিল জায়পত্রে, সাধিত হল দীর্ঘ যাত্রা শেষে। দিন ও রাত্রি, দিক ও অস্বরের মতোই সে মিলন আত্মীয় বোধে, বাঙ্কব উষ্যতায়। সংগম-বারি তাই বাঙ্কময়। সমাহিত, শুভ, মঙ্গলাম্পদ, অবিনাশী স্বস্তিবচনে।

দুই সচল জলধারার এই মিলনক্ষেত্রে বায়ুও চঞ্চল। সে দোলা দেয় কাউ নীড়ে। বলে, প্রাগজ্যোতিষ আভায় উজ্জ্বল পূর্ব দেশ, বিকশিত শতদল, সুরলোক পথে গগনবিহারী তিলোত্তমা পরীদল, এবার ত্যাগ কর নিশিষ্যা। নিশিজাগর

উলুক গেছে শয়ানে, জগৎসংসারের ভার এখন তোমার। সবাক হও উদান্ত স্বরে,  
জাগাও পক্ষীকুল।

যে কাউ কালিন্দীর জলে কলাবতী-পতি দাশাইকে মুক্ত করেছিল জন্ম-  
জন্মান্তরের পাপ হতে, অজয়-ভাগীরথী সংগমে পক্ষী জাগরণ তার কাছে অতি  
বাহ্য। কাউয়ারঙ্গী নীলীবৃক্ষে বসে ডাক দেয় কা-কা-কা। সে স্বরে প্রথম সাড়া দেয়  
পরভূত কোয়েল। তার স্মৃতি জুড়ে শৈশবের স্মৃতি মেদুরতা। কাউয়া চঞ্চুতে তার  
নিত্য উদরপূরণ, কাউয়া পক্ষপুটে নিশিনিদ্রা। প্রভাত জাগরণও ওই কা-কা-কা  
স্বরে। সে অন্নদাতার দায়টুকু গ্রহণ করে সুললিত স্বরে ডেকে ওঠে—কুহু, কুহু,  
কুহু। হ্লাদিত হয় পক্ষীদল কোয়েলের সুকণ্ঠে। নীড় ছেড়ে করন্দা বৃক্ষশাখে বসে  
কপিঞ্জল, কুরুবক বৃক্ষশাখে কুররি, কোকিলাক্ষ বৃক্ষশাখে কঙ্ক, তিলক বৃক্ষশাখে  
তিতির। সুর ধরে টোঠারি, টেসকানা। শুক চঞ্চু জোড়া ঈষৎ দক্ষিণে ঘুরিয়ে  
শারিকে বলে, ‘বড়ো রঙ্গ এ ভবসংসারে। কাউয়ার কা-কা-কা ডাকে ছিল তিনটি  
প্রশ্ন— কে তুমি, কী তোমার কর্ম, তুমি কোন বিষয়-সম্বানী? কোয়েলের কুহু-কুহু  
স্বরে প্রভাতকালেই তার ভেতর কাম ঢুকে গেল।’ শারি সাঙ্ঘনা দিয়ে বলে, আহা,  
কাম কোথা! এ-হল কুহুময় প্রেম। অজয়-ভাগীরথী মিলনের মতো নিষ্কাম।  
তাকাও সমুখে।

নিষ্কলঙ্ক, শুদ্ধ, পবিত্র স্রোত-সংগম। জলদাপনিতে মুখ দেখে দিনমণি, তটিনী-  
সারস, গগনবিহারী দেয়া। দর্পণ হল হৃষ্ট আর তাই অজয়-ভাগীরথী জল-  
দাপনিতে প্রতিবিম্বিত দিনমণি প্রীতচিন্ত, সারস প্রীতমানস, দেয়া প্রীতমতি। তাই  
প্রভাতের হৃষ্টরূপ হৃষিতহৃদয় গগন নদী-সংগমে। ব্রাহ্মমূহূর্তের এই দাপনি-চিত্র  
অম্বরবাসীদের মতি করুক সানন্দ, চিন্তগুলি ইষ্ট। সেই প্রার্থনার পদগুলি অম্বরের  
কোণে কোণে উচ্চারিত হওয়া বিধেয়। ক্ষেমংকরী বসেছিল সংসার বৃক্ষের শাখে।  
সে তার বর্ণালী ডানা দুটি খুলে চক্রাকারে ঘোরে বিস্তৃত জলপুরী আর ডাক দেয়  
শুভম, শুভম। তারই প্রতিধ্বনি নদীজলে, দুর্গাবরের ছইগৃহে, তীরভূমির  
শ্মশানদেউলে।

সে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে নয়ন মেলে তটিনী-সংগমের মাকন্দ, জম্বু, বীজপুর,  
কপিথবৃক্ষ। বিশ্ববৃক্ষে নিশিনিদ্রা শেষে জাগ্রত হয় ধনদা। তাকে ঘিরে বৃক্ষশাখে  
অজা, চঞ্চলা, হরিপ্রিয়া, কমলা, লক্ষ্মী, লোলা, পদ্মা, পদ্মালয়া, শ্রী ও তারা।  
প্রবাহিত হয় আঘন বায়ু। ঘন স্বরে সরব হয় শত-সহস্র হরিৎ শ্রীফল পত্র। দোলে  
অশ্বখ, বট, উদুম্বর, পকটীর বনানী। সুধাকণ্ঠী বংশীবন সবাক নব প্রভাতে।  
শুভংকরীর শুভম ধ্বনিতে বৈদিক বৃক্ষ বৈতালিক গীত গায়। বকুল ও পনস  
নিশিজাগর, তন্ত্রমতি। দিবাপক্ষীর চেয়ে রাতবিহারী চর্মচিকা-বাদুল তাদের নিকট

বান্ধব। বাচিক ক্ষেমংকরীর বাগবৈভবে বিরক্ত বকুল ও পনস চক্ষু মোদে। রুদ্রাক্ষ বৃক্ষের জন্ম রুদ্রের অশ্রুবিन्दু হতে। সে জানে আঘন হিমে কত বেদনা ঝরে পড়ে ইহলোকের— ব্যাধির, বিয়ের, বিচ্ছেদের, বিয়োগের। অজয়-ভাগীরথী মিলনের ব্রাহ্মমূর্ত্তে রুদ্রাক্ষ ঝরে— একমুখী, দ্বিমুখী, ত্রিমুখী, চতুমুখী, পঞ্চমুখী...। উচ্চারিত হয় অশ্রুত কামনা— উদয় হোক ব্রহ্মজ্ঞানের, নির্বিঘ্ন হোক শিবলোকের পথ, সাধুর সাগরযাত্রা শুভ হোক।

ধনপতির সপ্তডিঙা নৈশ জলযাত্রার শেষে নিথর। মধুকরের অলি-গুঞ্জন নেই, সদাগর ডিঙা দুর্গাবরের জলদেয়ালে জলদগন্তীর নাদ নেই, শঙ্খচূড়ের পাঞ্চজন্য ধ্বনি নেই। নীরব চন্দ্রপাল, ছোটোমুঠি, গুয়ারেখি। গীত নেই নাটশালায়। গভীর ঘুমে গাবরেরা। দিবা স্বপনে নাইয়াদল। নিশিঘুমে দানব-দৈত্যের তাণ্ডব, জল-জলধির উচ্ছ্বাস, ঝড়-ঝঞ্ঝার বায়ুকোপ, শাদূল-মাতঙ্গের দাপাদাপি, মকর-কুন্তীরের দুরাচার। দিবানিদে অহি নেই, শ্রীকালি নেই, জো-ঘর নেই। দিবাস্বপনে রাকাপতি কমলবনে জ্যোৎস্না বর্ষায় আর স্বর্গের বালগুণি মৃদঙ্গ মন্দিরার তাতিনি তাতিনি ধ্বনিতে নৃত্য করে। কখনো আবার কাঁখে কলস নিয়ে সেতুবন্ধে বসে। নৌযানের দিশারিকে ডাক দেয় তাকে যাত্রাসঙ্গী করতে। বালার সে স্বরে কী যে মৌ, সে রূপে কত-না মায়া! সুখ দিবাস্বপনে, শান্তি সহগমনে।

ব্রাহ্মমূর্ত্ত গতে সাধু ডিঙা থেকে নামে। প্রাতঃকৃত্য অস্তে-দু-দৈগের রৌদ্রমূর্ত্তে ভাগীরথী সঙ্গমে পুণ্যস্নান। প্রবাহিত জলস্রোতের অভিমুখে দাঁড়ায় সাধু। নদীগর্ভ হতে পঞ্চ নিমজ্জনে তুলে আনে পাঁচটি মৃত্তিকা পিণ্ড। নিক্ষেপ করে নদীতীরে। নিবেদন করে, হে জীবনদাত্রী প্রাণধাত্রী, তোমার স্রোতে অবগাহন করে মুক্তি ঘটুক সমস্ত অপবিত্রতা থেকে। তোমার ধারা প্রবাহিত থাকুক কাল নিরবধি, জলকঙ্কে ফটুক পঙ্কজ, লালিত হোক জলকুন্তল, জলকেলি করুক কুকুট। আমার সুপ্রভাতম জানুক ব্রহ্মা মুরারি ত্রিপুরারি ভানু শশী ভূমিসূত বুধ গুরু শুক্র শনি রাহু কেতু।

স্নানান্তে সাধু দেখে নদীকূলে গোলোকবাসী গাভী। করজোড়ে সংকল্প বাক্য পাঠ করে— হে ধেনু, তোমার দন্তে মরুৎ, জিহ্বায় বাগদেবী, নয়নে সূর্য-চন্দ্র, মূত্রে জাহ্নবী। মরুৎরূপে কূপ উত্তোলন করো ব্যোমে, বিদীর্ণ করো পর্বত, উত্তাল করো সমুদ্র। শান্তরূপে তুমি শস্য, তুমি ধান্য, তুমি অন্ন, তুমি অন্নদা। বাগদেবী রূপে তুমি নির্মল, পবিত্র, সুন্দর, সত্য, সুমতি, যজ্ঞ ধারণকর্ত্রী। এক নয়নে তুমি হিরণ্যপাণি, সর্বদর্শী, সকল সৎ-অসৎ কর্মের সাক্ষী। দিব্য সুপর্ণ গরুড়ান্ন, তুমি স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত কিছুর প্রাণ। অন্য চক্ষু তুমি তারা ও ওষধির অধিপতি চন্দ্র। গো-রূপা ভূমি দেবীকে পৃথু যখন দোহন করে তখন ব্রহ্মা হয়েছিল বৎস আর

অন্য ঋষিরা যখন ভূমি দেবীকে দোহন করে তখন চন্দ্র হয় বৎসরূপী। তোমার মূত্র জাহ্নবী যার প্রবাহিত স্রোতে প্লাবিত হল জহ্নুর সর্বমেধ যজ্ঞের সর্পি, দূর্বা, যব, পুষ্প ও তণ্ডুল।

প্রভাতি নদী-সংগমে অবগাহন করে প্রাচীন ঋষি। উচ্চারণ করে বেদমন্ত্র—‘ও ইন্দ্র, সোমরস পান কর ঋতু সঙ্গে/উত্তেজক বিন্দুগুলি/প্রবেশ করুক ভিতরে, স্থিত হোক।’ কোনো যজ্ঞকুণ্ড নেই, পানপাত্র নেই, সোমরস নেই। যজ্ঞকুণ্ডের বিকল্পে রয়েছে উদীয়মান সূর্য লোহিত রূপে। তারই স্পর্শ শমীবৃক্ষের বন্ধলে, অগুরু চন্দনের শাখে, সতবর্গের কাণ্ডে। যেন যজ্ঞকুণ্ডের ইন্ধন। পানপাত্র নেই কিন্তু রয়েছে ঋষির দুই করতল। এ আধারে প্রবাহিত শত-সহস্র শোণিত ধারা, রক্ষিত প্রাণ-উত্তাপ, ধারিত গ্রহ-উপগ্রহ। নেই সোমক্ষীর রস। কিন্তু সোমসূত্র ভাগীরথী ও অজয় আছে। দুই করতলে ঋষি সংগম-বারি অর্পণ করে প্রভাত রবিকে—‘অগ্নি, মিত্র, বরুণ—যারা আজ উপস্থিত যজ্ঞস্থানে—তোমরা গ্রহণ করো এই তর্পণ।’ বেদজ্ঞ মুনি জানে মর্তবাসী অগ্নির মতি, অন্তরিক্ষবাসী বায়ুর গতি, দ্যুলোকবাসী রবির রহস্য। তাই এই রৌদ্রমুহূর্তের দর্শনে, ধনপতি প্রার্থনা করে, দিবসখানি সুখময় কোরো হে ত্রিদেশদর্শী। তোমার কণ্ঠে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ—তুমি আনন্দময় কোরো জলযাত্রা। হে জ্ঞানী, তুমি যজ্ঞ জান, তুমি জ্ঞান জান, তুমি কর্ম জান, তুমি ইষ্ট জান, তুমি জান অনিষ্ট পরিহারের উপায়—আমার জলপথের লতায় ধ্বনিত হোক তোমার দেবস্তুতি, মঙ্গলগীত।

নদীকূলে পুষ্পচয়ন করে এক যুবতী নারী। তার ভ্রমরা কেশে নদী-সংগমের বারি, তার শ্রবণ উপরের কনক-বউলিতে আঘন হিমের কণা, তার বাহ্যুগের কনক-কেয়ূরে যুথীফুলের রেণু। যুবতীর পুষ্পঝারি ক্রমশ ভরে ওঠে ভূমিচাম্পা, শ্যামলতা, সূর্যমণি ফুলে। সদাগরের মনে হয় এ যেন দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী-সাবিত্রী-রাধা এই পঞ্চদেবীর জাগরিক রূপ। ধনপতি সদাগর করজোড়ে অষ্টোত্তর শত নীলকমল অর্পণ করে মেরু-মন্দার-কৈলাস-হিমালয় শিখরজাত শ্রীফলবৃক্ষ আকৃতা দেবী দুর্গাকে। সদাগর বন্দনা করে গঙ্গুলক্ষণা দুরাধর্ষা শস্যাদিতে নিত্যপুষ্টা গবাদি পশু সমৃদ্ধা সর্বভূতের ঈশ্বরী শ্রীলক্ষ্মীকে। সদাগর বরণ করে সকল জীবে অবস্থিত পুষ্টি, ধৃতি, কীর্তি, সিদ্ধি, কান্তি, ক্ষমা, স্বধা, স্বাহা, বাণীরূপ দেবী সরস্বতীকে। সদাগর স্মরণ করে মদ্ররাজ অশ্বপতি কন্যা, রাজর্ষি দুর্মতেন-পুত্র সত্যবান-পত্নী, বঙ্কলবসনা, তপোবনবাসিনী, সেবাপরায়ণা, হেতুগর্ভ মনোহর বাক্যপ্রাবন্ধিক, পতিব্রতা সতী শিরোমণি সাবিত্রীকে। সদাগর ধ্যান করে কৃষ্ণ-হৃদিনী শক্তি, পরোঢ়া, সর্বসাধ্যকার, মহাভাব স্বরূপিণী, জীবাশ্মার স্বরূপভূতা শ্রীরাধিকার। পঞ্চদেবীর স্মরণ শেষে প্রত্যুষের পুণ্যবতী নারীর কাছে অজয়-

ভাগীরথী সংগমে একটি কাস্ত-কোমল দিবসের কামনা করে সদাগর।

কামিনীটি ছিল দূরে। তার কর্ণগোচর হয়নি সাধুর দেবী বন্দনা, সরল শুদ্ধ নির্মল বাসনা। সে দেখে এক সদাগর ডিঙামুখে দাঁড়িয়ে তার দিকে নিবিড় নেত্রে চেয়ে। সে বন্দনাকে ভাবে প্রেম-বাসনা, কামনাকে ভাবে কাম। সাধুর দিকে ফিরে তাই ললিত রাগে বালা বলে, নিশিগতে যদি হয় নাই কাটে কাম/তাহারে স্কন্ধেতে তোলে প্রেতরাজ যাম।

## ২১ নয় দীয়া, নয় দ্বীপ

এক প্রহর বেলা গতে নিদ্রিত সপ্তডিঙা জাগে। কবুতর পঞ্জরে ঘনবোলা মাতে বকম-বকমে। সুভাসনা দেবদেউলে স্মরণে নত করে মাথা। রণজয়া শুধায় কল্যাণারে শস্ত্রবিদ্যা বড়ো, না কি শাস্ত্রজ্ঞান? উত্তর হারায় কপিদলের লক্ষ্মবাম্প। খাদ্যের জন্য বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে উল্লম্বনের প্রয়োজন নেই এ সাগরযাত্রায় কিন্তু উৎপ্লবন ছাড়া উল্লাস নেই। তাই কপিদলের রস মল্ল, রঙ্গ বাম্প। কুরঙ্গগুলিও পদচঞ্চল। অরণ্য যাদের চারণভূমি, তাদের বাস এখন সাধু-ডিঙায়। কুরঙ্গ পেলে তুরঙ্গ দেবে লঙ্কাবাসী। তাই জলযাত্রা। কমহীন কুরঙ্গদল ভাবে লঙ্কাদ্বীপের তৃণ মিঠা নাকি লবণ বায়ে নোনা— কে জানে! জাগে সপ্তডিঙার নাইয়া-গাবর। বড়ো আহ্লাদ হয় দিবালোকে ভাগীরথী-অজয়ের সন্ধিস্থলটি দেখে। যেমন তার বিস্তার, তেমন রূপ! যেন শত-সহস্র গর্ভবতী ধবল ধেনু চরে চারণে।

নিত্যকর্ম শেষে নাইয়া-গাবরেরা অবগাহন করে সান্ন সলিলে। গাঢ়, নিবিড় এক অনুভব। আধারখানি যত বৃহৎ জলদানাগুলি তত বড়ো। যত গভীর জলতল তত ঘন বারিস্তর। অর্থই জলে নাইয়া-গাবরদের অকূল আনন্দ। অনন্ত গগনে যেমন সরসে সাঁতরায় ক্ষেমংকরী তেমন জলরঙ্গে মাতে তারা। দেখে শিখাধারী সারসের পাল গভীর ধর্মভাবে নদীসংগমের মীনে পূর্ণ করে উদর। ক্ষুধা জাগে ডিঙার জীব ও পক্ষীকুলেরও। সবাক হয় তারা। কিংকরেরা স্নান সেরে ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ করে তাদের। তারপর নদীতটে সমবেত আহার। পাট পাট চিড়া নামে, ঘড়া ঘড়া দধি, কান্দি কান্দি মর্তমান, আর ধামা ধামা ফেনি। ফেনি ভাঙার মটমট শব্দ ওঠে। চিড়া-দই চাঁপা-ফেনির ফলারটি রসনামধুর। বিম্বিধানের খই আর নারিকল-দুধে সুবাসটিও বেশ। সাধু ধনপতির জন্য চাঁপা কলা, টাবা লেবু ও ডাড়িম। সঙ্গে খাজুর নবাত, আর কনক থালে পাঁচ গুণা ক্ষীরপুলি।

ভোজন শেষে কাণ্ডার হাঁক দেয়, যে-যার ডিঙায় চড়ে হে, বাদাম তোলো। নবদ্বীপ অনেকখানি পথ। ঘন ফেলো করয়াল।

ভাগীরথীর স্রোতে কাণ্ডার-ডিঙা মধুকর গুনগুন সুর তোলে। বন্দনা গায় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বাহিত ত্রিপথগার। গোকর্ণে উর্ধ্ববাহু, নিরালম্ব, পবনভঙ্কা, নিরাশ্রয় ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হল দেবাদিদেব। গঙ্গাকে মুক্ত করল জটা হতে। গঙ্গার সপ্তম ধারা প্রবাহিত হল সাগরে। তার পুণ্য বারিতে সগরপুত্রেরা হল সপ্রাণ। যতদিন সাগরসলিল না শুকায় ততদিন সগরসন্তানদের স্বর্গবাস নিশ্চিত করল ব্রহ্মা। হে ভগীরথদুহিতা ভাগীরথী তুমি কাল-নিরবধি প্রবাহিত হও। পুষ্ট করো জলধি, অকূল করো দরিয়া, অতল করো পাথার। সগরপুত্রদের স্বর্গবাস অনন্ত হোক, নিরন্তর ডিঙা-ভাসুক ভাগীরথী-স্রোতে। বারিধি স্রোতে বাহিত হোক দুর্গাবর, গুয়ারেখি, শঙ্খচূড়, চন্দ্রপাল, ছোটোমুঠি, নাটশালা, মধুকর।

ভাগীরথীর দু-কূলে ঘন সবুজ অরণ্য। বটবৃক্ষে সরব শুকঝাঁক, নদীবাঁকে শায়িত শাবক-হ্লাদিনী তরঙ্গুজননী, দক্ষিণ তীরে সারি সারি তাল-খাজুরি বৃক্ষ, সুদূরে বিস্তৃত মুর্গাঘাসের বন, ঘন সবুজ মানকচের বাদাড়, মুণ্ডিত সিঙ্গাছ, নদীজলে ক্রীড়ামগ্ন পানিকৌড়ি, তৃণভোজনে মগ্ন ছেলির পাল। রামানুচর কপিদল রম্ভাবনে বসে সাধুর সিংহলযাত্রা দেখে। ভাবে, ত্রেতাতে শ্রীরামচন্দ্র গেল লঙ্কায় আর কঙ্কি যুগে চলে ধনপতি সদাগর। কালের এ-রঙ্গও দেখতে হল এই চর্মচক্ষে! অবশ্য রামকথা যতদিন মহীতলে থাকবে ততদিন ধর্মকাম, প্রীতিকাম আর কপিজীবন অবিনাশী। সাধু যাক লঙ্কায়, বাণিজ্য যখন তার কর্ম ও জাতধর্ম। কপিদল পদযুগল তুলে সাধুর শুভযাত্রা কামনা করে।

নাইয়া-গাবরদল বিল-জলার গঙ্গে মাতে। আদিত্যপুর, আভঙ্গি, বাচামারি, বড়চক, ধুবলি, কালীদহ—জলের কত-না আকার! কোনোটি তাম্বুল-ডাবর, কোনোটি সাঁঝদীপ, কোনোটি ডিঙার রইঘর। খয়রা, সজনেপুর, পাগলাচণ্ডী, টেংরা, টুঙ্গি—কত-না জলের বর্ণ! খয়রার পানি শিউলি ফুল, সজনেপুরের কাকচক্ষু, টেংরার হরিৎ, টুঙ্গির চম্পাফুল। কত-না মাহাত্ম্যকথা আমদা, বালি, ভোমরা, চামটা, হবিপুর, সাত সলকের জলে! কখনো স্বপনে দেখা দেয় দেবী, কখনো জাগরণে দেখা দেয় দেব। শুরু হয় খনন। মোহিনী মূর্তি মেলে, মোহরও। বিল-জলার প্রতিটি ঘাটের আপন কথা। কেউ নবজন্মে হাসে, কেউ কাঁদে নিজ জন হারিয়ে, কেউ দেবতার ঘট ভরে, কেউ জলদান করে পূর্বপুরুষদের, কেউ ভাসায় পৌষ-সংক্রান্তির ভেলা, কেউ নববধূর স্নানের ব্যবস্থা করে। আবার সব আকার, সব বর্ণ, সব পুরাণকথা ভেসে যায় বর্ষার ঘন বর্ষণে। খাল-বিল, নালা-জলা একাকার। গুড়গুড়িয়ার ঘোরোস্রোত চলে নগরভ্রমণে, পাগলাচণ্ডী যায়

পথপরিক্রমায়। সে রূপবতী অঞ্জনা-শ্রোত প্রহরে প্রহরে রূপ বদলায়— কখনো ময়ূরাজ্ঞন, কখনো তুথ, কখনো শ্রীকর, কখনো ফণী, কখনো নীল নীরদ— সে শ্রাবণ বর্ষে দেশান্তরী। সবাই ফেরে, কেউ ভাদ্রসংক্রান্তির শীতল অন্ন-ব্যঞ্জন, কেউ উমার সঙ্গে মহাবোধনে। হারিয়ে যায় একজনা, একটি কুমারী— অলকানন্দা। দু-কূলের পাখি সুর হারায়, দু-পাড়ের বন স্বর হারায়, দু-তীরের দেবালয় মন্ত্রধ্বনি হারায়, দু-পাশের জনপদ গীত হারায়। কেউ বলে অলকানন্দ এখন হিমালয়বাসী, কেউ বলে দেবলোকের বাসিন্দা। অলকানন্দা হারিয়েছে, কিন্তু গাঙ্গনি-খড়িয়া-জলঙ্গি হারাতে চায় না জনপদবাসী। পৌষসংক্রান্তিতে ধান্যগাছার বেড়িতে বাঁধে মাথাভাঙা, চুর্ণি, ইছামতী, ভৈরবে। যদি কে চোখ যায় যেন জেগে থাকে নদীকূল, নদীগর্ভ, নদীকান্ত, নদীতট, নদীপথ। কাণ্ডার বলে, সেই সংখ্যাহীন শ্রোত হতে ভাগীরথীর দু-পাশের এই দু-কূল নাম পেল নদীয়া।

হেমন্ত-অপরাত্তের হরিদ্রা রৌদ্র হাসে। দীপ্যমান হয়ে ওঠে মধুকরের দুই সুবর্ণ গৃহ, দুর্গাবরের দারুণদীপ, শঙ্খচূড়ের পীত বাদাম, চন্দ্রপালের ময়ূরপুচ্ছ, ছোটোমুঠির মুড়েল, গুয়ারেখির কেরয়াল, নাটশালার কর্ণ। দু-তীরের অন্নক্ষেত্রও পীত আপন বর্ণে। তারই রঙে রাঙা বায়ুবিহারী পতঙ্গের পাখা। বেলা গতের বাসন্তী বর্ণ দু-তটের শত-সহস্র ঝিন্সা ফুলে। ভাগীরথীও বস্ত্র বদলায়। হলদিয়া হয় দেহবাস। দিন অবসানে বাসাংসি বদল বিধেয়। শুভ্রতা মনে শূচি আনে। তারপর মৃৎদীপে ও শঙ্খধ্বনিতে লক্ষ্মীর আবাহন। গোধূলির আলো জাগে পশ্চিম দিগন্তে। রং ছড়ায় তাল-খাজুরি পাতায়, গুয়াগুচ্ছে। গোক্ষুরা রেণুতে রাঙা হয় শিউলি পাতা, মাতুলুঙ্গি লেবু, গোক্রম।

গোক্রম দ্বীপের কাহিনী শোনায় কাণ্ডার। পথিকের জন্য যেমন পাঙ্খশালা, জলযাত্রীদের জন্য তেমনই দ্বীপ। দূরদেশে যাওয়া-আসার পথে ডিঙা বেঁধে রসুই, জিরান দু-এক প্রহরের, রাত কাটানো হট-হড়কা বানে। ভাগীরথী গড়ল শ্রোতের পূর্ব কোলে চার দ্বীপ— গোক্রম, অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ— আর পশ্চিমে পাঁচ— কোল, ঋতু, জহু, মোদক্রম, রুদ্র। কাণ্ডার বলে, এই নয় দ্বীপ হতে এই ভূখণ্ড পরিচিত হল নবদ্বীপ নামে। গোক্রম আর মোদক্রম দ্বীপে ছিল নানা জাতের বৃক্ষ— আতয়ি, আদড়ে, কালচিত, কাশীমলা, চলদল, ডম্বুর, তিলক, ধূলিকদম্ব, নাদন, বাঙ্গুলি। ষোলো শত বাথানিয়া গাভী ছিল গোক্রমে। মধ্যরাতে বংশী বাজাত রাখালরাজ। আন্দোলিত হত ক্রমশ্রেণি। এক আশ্চর্য সৌরভে আমোদিত হত সারা কানন। ‘কোল’ হল বরাহ আর এই দ্বীপের অধীশ্বর হল বরাহবতার বিষ্ণু। ঋতুদ্বীপটিও তারই। ঋতু হল দীপ্তি, আর তদভিমানী দেব হল বিষ্ণু। জহুর যজ্ঞবাঁট প্রাবিত হয়েছিল গঙ্গাশ্রোতে এবং রুষ্ট মুনি পান করেছিল সমগ্র

গঙ্গাবারি। দেবগণ ও ভগীরথের প্রার্থনায় কর্ণপথে নিঃসারিত করে নদীজল। জহ্নু-সূতা জাহ্নবী তাই একটি দ্বীপ সৃষ্টি করে জনক স্মরণে। আর ‘রুদ্র’ দেবাদিদেবের অষ্টমূর্তির প্রথমতম। তাই তার নামেও একখানি জলবেষ্টিত ভূমি।

ভাগীরথী তীরে চোখে পড়ে এক ক্ষুদ্র জনপদ। সাধুর সপ্তডিঙা বামের পারঘাটায় থামে। তিন জালিক ডিঙা দিনান্তে বাদাম গুটিয়ে বিশ্রামে। সদা সংশয়ী তিন সারমেয় পায়ে পায়ে উপস্থিত। সঙ্গী চার সরল শিশু। একে একে দু-চারিজন পারানি-ডাঙ্গিয়া। সাধু নিবাস ও গন্তব্য সংবাদ এবং কুশল বিনিময় অস্ত্রে নিশিভোজনের বন্দোবস্ত। প্রথম কর্ম আঁধার নামার আগে কদলীপত্র সংগ্রহ। বিশ গাবর কাতি হাতে চলে। ইন্ধনের ব্যবস্থা করে ডাঙ্গিয়ারা। অগ্নি জ্বলে একসময়। দীপদণ্ড হাসে। সূপ চাপে। কটুতেলে ভাজা হয় ফুলবড়ি, কুমড়া আর ঘূতে পলাকড়ি। ওদনের পর সূপ চাপে। বাগ্যান, সারি কচু ও খাম-আলুর ব্যঞ্জন সম্বলন হিঙ্গ-জিরায়ে। কামরঙ্গার অঞ্চল বসে। ভোজনের আগে বক্কাল-পানি পান করে নাইয়া-গাবরদল। শেষে সমবেত ভোজন। ততক্ষণে উল্ক মান্দারি বৃক্ষের শাখে। সহভোজনের পটখানিতে বড়ো আহ্লাদ হয় তার। ‘সহ’ হল তৃপ্তি আর তাই সহ-ওদনে এত স্বাদ।

ভোজন শেষে পুনর্যাত্রা। অগ্নি-শলাকা নিভে ততক্ষণে সপ্তডিঙায় সর্পি-দীপের আলো। রাতের প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ। ভাগীরথীর দু-কূল শয়ানে। নদীপ্রোত ধীর, বায়ু মন্দ্র। হিমরেণু ঝরে নিশ্চল পাতা-লতায়, নিঝুম নিশিপুষ্পে। সপ্তডিঙা চলে ধীর লয়ে। নিশি গড়ায়। ঘন হয় প্রহর-স্বর, স্বরব হয় ঝিল্লি। সবাক শিবা চলে সাধনপীঠে। গূঢ় হয় নিম্ববৃক্ষ। নিভৃত শ্রীফলপত্র। এমনই দিব্যযামিনী প্রহরে একদিন ন-টি দীপ প্রজ্জ্বলিত হত, একে একে, নিভৃত দ্বীপে। জাগর হত আমলকী, হরীতকী, স্থূলজীরক বটবৃক্ষ। প্রদীপ্ত হত শতাবরী, ব্রাহ্মী, শ্বেতদূর্বা। কে ওই মহর্ষি— মরীচী, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু নাকি নারদ— সে এক দৈবরহস্য। কিন্তু মহাত্মার নয় দীপালোকে ভুলোক হয়ে উঠল মহালোক, পরব্রহ্মধাম। তাই মহানিশার ও দুই বৈতালিক প্রহরে দৈবহিম ঝরে, দৈবসার মগ্ন হয় ধ্যানে, দৈবনর্তকী নৃত্য করে। নিশিজাগর সাধু ধনপতি দূর থেকে দেখে নবদ্বীপের আকাশে দীপমালার দীপ্তি। দীপস্তম্ভ নেই, দীপশিখা নেই কিন্তু বত্রিশরতি স্বর্ণের বিভা আঘন গগনে। সপ্তডিঙার শত-সহস্র প্রদীপও তার কাছে ন্মান। ডিঙাবাতিতে জ্যোতি আছে, দ্যুতি নেই। কোন মৃত্তিকায় সাধু নির্মাণ করেছিল নয় দীপ, কোন ন্নেহে পূর্ণ করেছিল বর্তি আধার, কোন তুল আবর্তনে তৈরি করেছিল দীপবর্তি? সাধু ধনপতি ভাবে অজ্ঞাত সাধুর কথা যার নয় দীপ হতে এই ভূখণ্ড নাম পেল নবদীপ। দিনে দিনে জনমুখে দীপ হল দ্বীপ।

## ২২ ভাগীরথী স্রোতে নিশিয়াত্রা

আঘন হিমে ঢাকা ভাগীরথী। নবদ্বীপের বাতি পড়ে থাকে পিছে। নদীর দুই-তীরে গাঢ় হুম্ব নৈশ দ্বিপ্রাহরিক আঁধার। ঘন বাজে রাতের স্বর। সপ্তডিঙার কেরয়াল-ধ্বনি নিদ্রাতুর। নীরব তটের আঙলা, নিম্ব, মাকন্দ, হরিচন্দন বৃক্ষশ্রেণি। চকিত সরব কালসার মৃগ, ক্ষুধাতুর কঙ্ক-শাবক, নাওবাসী মুষলী। ভেসে চলে সপ্তডিঙা দক্ষিণ স্রোতে। জলপথের সঙ্গী চতুর্থীর পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র। পূর্বাষাঢ়ার দেবতা তোয় আর তাই এ-নিশায় করতোয়া থেকে ভাগীরথী সর্বত্র সে বিস্থিত। কুলারূপ পূর্বাষাঢ়ার অবস্থানে স্রোত অনুরক্ত, জললতা সুহৃৎ। কাণ্ডার বুটনের ওষ্ঠে হর্ষ। গত নিশীথে গগনে ছিল যোগিনী, আজ হাসে পূর্বাষাঢ়া। সপ্তডিঙা ভেসে চলবে চান্দ্র আশ্বিনের মেঘমালার মতো নির্ভার। নির্ভয়ে অতিক্রম করবে একের-পর-এক জনপদ।

ডাহিনে নিদ্রাতুর গ্রাম পাড়পুর। মধ্যরাতের ঘন ঘুমঘোরে নিশ্চল ধূলিকদম্ব ফুল, শ্বেতদূর্বার বন, ডম্বুর বৃক্ষের সারি। বটকোটরে নিশিজাগর এক উদাসী উলুক। কূলে-বাঁধা তিন নাও। গোশাল-বিমুখ এক গাভি জাবর কাটে নদীঘাটে। সপ্তডিঙার আলোয় সে খানিক ফুল্লিত। নিশিবিলাসী কিছু প্রাণ এখনও আছে তাহলে! কৃষ্ণসাথি ধেনু জানে রজনীতে কত রঙ্গ। তাই গোশালের রঞ্জু ছিঁড়ে নদীপাড়ে। পাড়পুরের নিঝুম নিশায় কর্মব্যস্ত অলিকুল। তারা বিচরণ করে সরিষার খেত, অলাবুর মাচা, যুথী ফুলের বনে। মধুভাণ্ডে মৌ ভরে। তাদের সমবেত গুঞ্জে আহ্লাদে নৃত্য করে শালিখেত। সঙ্গ দেয় জলশিউলি ফুল, কহলার পাতা, জলবাসী তিন নাও। ডিঙার কেরয়াল-ধ্বনিতে ত্রিভঙ্গ গোখুরা ত্রিমণ্ডলী নৃত্য করে শ্বেতপদ্মে। সপ্তডিঙা ভেসে চলে এক ঘাট ছেড়ে অন্য ঘাটে।

শান্তিপুুরের কথা ডিঙাভাসিদের গল্প-গাথায় কিন্তু আজ পুরীখানি গঙ্গাহারা। ত্রিস্রোতা সরে গেছে পশ্চিমে। কূলবাসী শান্তিমুনিও মোক্ষ-কৈবল্য-নির্বাণ অস্তে ফিরে গেছে অনন্তধামে। ভাগীরথী সংগমে তাই নেই যজ্ঞও। নেই যজ্ঞবক্তা যাজ্ঞবল্ক্য, যজ্ঞপতি বিষ্ণু। কিন্তু ভাগীরথী মৃত্তিকায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে ইতস্তত দুই যজ্ঞীয় বৃক্ষশ্রেণি, খদির ও পলাশ। যজ্ঞের পাত্র নির্মাণ ও-দুই দারুতে। বৃক্ষ জানে নদী-নীর চঞ্চলামতি। ভাগীরথী আবার কোনোদিন ফিরে আসতে পারে স্বভূমে, স্বতটে। তখন পুনর্বীর ঘৃতাছতি হবে যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিতে। তাই প্রতীক্ষা। অন্য এক তিতিক্ষা শান্তিপুুর পুরীখানির মার্জারকূলে। যজ্ঞভোজী মার্জার জানে বৃক্ষবল্লে যেমন খোদিত থাকে স্থলিত পত্রচিহ্ন, শান্তিপুুর মৃত্তিকায় তেমনই আছে ভাগীরথী পদাঙ্গ। তাই যুগে যুগে উচ্চারিত হবে শান্তিসূক্ত, বর্ষিত হবে

শান্তিসলিল। এ-ভূমে ধ্বনিত হবে শান্তরব, বিচ্ছুরিত হবে শান্তরশ্মি কোনো এক ভবিষ্যে। তখন যজ্ঞভাণ্ডগুলি আবার পূর্ণ হবে অমৃতে। উপস্থিত কর্ম হল দক্ষিণ পদখানি দিয়ে বারে বারে বদন সংস্কার। ধনপতি সদাগর দূর থেকে করজোড়ে প্রণাম করে ভাগীরথীর আদিতট শান্তিপূর পুরীখানিকে। তুমি নির্বৃত্তি, তুমি বিরহিতা, তুমি হে মঙ্গল।

নারিকল বৃক্ষের টঙে নিদ্রা যায় কপিদল। কেরয়ালের ধ্বনিতে চোখ মেলে। সপ্তডিঙা দেখে, বোঝে দক্ষিণ পাটনে চলে সদাগর। কপিবর সদাগরকে ঘুমঘোরে বলে, অশোককাননের আশুগুলির যেমন সুবাস তেমনই স্বাদ। ছোটোটি দু-বিঘত, বড়োগুলি চার-পাঁচ। ভরে-ভারে হার মানে অলাবু। জনক-দুহিতা, শ্রীরামমহিষী সীতা তিনখানি আশু দিয়েছিল কপিবরের হাতে। তারই অস্থি থেকে ধরাধামে আশু বৃক্ষ, গঙ্গাতীরে আশুয়া কানন আর এই জনপদ নাম পেল আশুয়ামূলুক। কিন্তু অস্থি যত পুরোনো, দেহখানি তত ভগ্ন, সারভাগ তত স্বল্প, স্বাদ তত অল্প। কপিবর বলে, ওহে ধনপতি, অশোককানন থেকে স্বাদু-আশু এনো এক ডিঙা। পুরোনো আশুয়াতে সাধ মেটে না, আশা পূরে না।

উলুক বসেছিল চলদল বৃক্ষের ডালে। কপিবরের কল্পিত আশুয়া বৃত্তান্তে সে বিমূঢ়, বিমোহ। অম্বিকা হল কাশীরাজ হিরণ্যবর্ণ ও রাজমাতা কৌশল্যার মধ্যমা কন্যা। বিচিত্রবীর্যের পরিণয়ের জন্য ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে সভা থেকে অপহরণ করে আনে। প্রথম তনয়া অম্বা জানায় যে সে সৌভপতিকে পতীত্ব বরণ করেছে। সে কারণে ভীষ্ম তাকে শাস্ত্রের কাছে প্রেরণ করে। কিন্তু ভীষ্মগৃহীতা বালাকে সে গ্রহণ করে না। অম্বা তখন ভীষ্মকে বিবাহ করতে চায় কিন্তু ভীষ্ম অসম্মত। অন্যদিকে কাশীরাজের মধ্যমা কন্যা অম্বিকা ও কনিষ্ঠা অম্বালিকার বিবাহ হয় বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে। বিবাহের সাত বৎসর পর যক্ষজুরায় মৃত্যু হয় বিচিত্রবীর্যের। শ্বশ্রুদেবী সত্যবতী ভীষ্মকে নির্দেশ দেয় অম্বিকার গর্ভ উৎপাদন করতে। ভীষ্ম অসম্মত হলে ব্যাসকে অনুরোধ করে। ব্যাসের কুরূপে গর্ভাধান রাতে অম্বিকা চক্ষু মোদে এবং তারই ফলস্বরূপ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ব। অম্বালিকার মাতৃহের পর আবার ব্যাস ঔরসে অম্বিকার নব গর্ভাধানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু অম্বিকা নিজ পরিবর্তে ছদ্মবেশিনী পরিচারিকাকে পাঠায় ব্যাসের কাছে। সেই সন্তান হল বিদুর। উলূকের নয়ন ভরে লোহে। বড়ো বেদনা এ-তিন কন্যার। যমুনা তীরে চিতায় উঠে প্রাণত্যাগ করে অম্বা এবং এবং জন্ম নেয় দ্রুপদকন্যা শিখণ্ডিনী হয়ে। অম্বিকা আর অম্বালিকা শেষজীবনে হল দুই তপস্বিনী। উলুক কপিবরের দিকে গোলোক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, ‘বেশি রজা খেলে অম্বা-অম্বালিকা-অম্বিকা সবই আশুয়া। উদরের কথা ভুলে দিবসের একটি প্রহর জ্ঞানচর্চা কর নিত্যদিন।

বেদচতুষ্টয়, বেদ ষড়ঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র— এই চতুর্দশ বিদ্যায় বিদ্বত্ত্ব অর্জন কর। তখন কপিবর হতে বিদ্যাবর হবে। বুঝবে আশু আর অশ্বিকার পৃথগত্ব।’ কপিবর হাসে। বড়ো বিনয়ী সে ভাব, রামানুরাগী। বলে, ‘আহা, আমি বলি লঙ্কার কথা, তুমি কও কাশীধামের। লঙ্কার ‘আম্মা’-দু-ভাগ হয়ে একটি হল আম আর অন্যটি মা। তোমরা চতুর্দশ বিদ্যা ভারে আমকে করলে আশু আর মা কে অশ্বা-অশ্বিকা-অশ্বালিকা।’ উলুক বিস্মিত কপিবরের লঙ্কা বিদ্যায় যদিও সত্যাসত্য বিষয়ে সংশয়ী। তাই প্রশ্ন করে, ‘গো ডাকে “হাস্বা” আর মাতা হল অশ্বা। লঙ্কায় গো-মাতা দেখেছো নাকি হে?’ উত্তর মেলে না। কপিবর মগ্ন ঘনঘুমে।

ঘন পড়ে কেরয়াল আর দ্রুত ধায় সপ্ততরী। হিম চাঁদোয়া ভেদ করে উঁকি দেয় গ্রহ-তারার। জোনাক জ্বলে নদীর দু-কূলে। শ্রীকালি চলে বনপথে। তার দু-নয়নে নীল শিলাভূত উজ্জ্বলতা। মৃদুমন্দ বায়ু বয়। দোলে গুয়া-তাল-খাজুরির শুকনো পাতা। চঞ্চল হয় ওকড়া শরের বন। আন্ধারিয়া পথে দুষ্টখণ্ডের দল চলে কার্মুক-কাবি হাতে। বেশ খানিক পিছে হাঁটে এক সতর্ক তরঙ্গু নরমাংস ভোজনের অভিপ্রায়ে।

ডান দিকে পুরী গুপ্তিপাড়া। নৌতল নির্মাণে এমন কারিগর নেই ভাগীরথী কূলে। সার সার গুপ্তি তৈরি হয় তীরে আর ভেসে যায় দূর দূর পুরীতে। চলনে নৃত্যের মুদ্রা, দোলনে ডুলির হিন্দোল। গুপ্তিপাড়ার দারুকর্মে বিরাজ করত দেবাদিদেব মহাদেব, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, গরুড়। বরাহবতার, কূর্মাবতার, মৎস্যাবতার অবস্থান করত ডিঙায়। দারুলতা-পাতা-পুষ্পে অপসৃত হত কাঠের কাঠিন্য। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ভাগীরথীর তীরে একে একে প্রেরণ করল কুস্তকার, কাংস্যকার, শঙ্খকার, কর্মকার, মালাকার এবং বয়নশিল্পী কুবিন্দক। গুপ্তিপাড়ার নায়ে দূর দেশে ভেসে যেত কত-না রূপকর্ম, জগৎ দরবারকে রুচিরতা দিত।

সপ্তডিঙার ধাওনি দণ্ডে পিছে চলে যোজনের বাট। রাত্রির শেষ চরণে হঠাৎই নদীজলে চঞ্চল হয় শফরী, নদীতীরে মাথা তোলে কমট, ঘরে ফেরে কুলির, রসে দোলে নলবন, ক্ষেপে হাসে ক্ষেপে কান্দে ছেলি-নন্দন। গগন কুসুমগুলি ঝরে পড়ে একটি-দুটি কদলীবনে, সীতাখালে, শ্যামলতায়, পরকীয়া প্রমাদিয়া কেশে বগা চণ্ডীগাছায়।

শ্বেতশুভ্র বগা পক্ষীদল উদয়াস্ত অদ্বিতীয় পদে ধ্যান করত ভাগীরথীর। স্তুতি-বন্দনা-গাইত দেবীর—‘সুরূপা, চারুনেত্রী, চন্দ্রপ্রভা, শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতা, সুপ্রসন্না, সুবদনা, শ্বেতালঙ্কারভূষিতা, ত্রৈলোক্যনমিতা, শান্তিপ্রদায়িনী,

পাতকসংহতী, দুঃখ বিনাশিনী, সুখদা, মোক্ষদা, পরমাগতি হে ভগবতী তুমি প্রবাহিত হও অনাদি অনন্তকাল। তোমার সুধাপ্লাবনে কানন সকল গহন, নালিভূমি শস্যশ্যামলা, মীনগুলি রত্নগর্ভা। তুমি জীবকুলকে দিয়েছ আহার ও বারি, শিলাকে আবরণ ও আভরণ, মীন-মকরকে বিষয়-আশয়। শুধু আমরা এই বগাকুল, নিরাশ্রয়। শূকর বটবৃক্ষ, পিকের আশ্র, ক্ষেমংকরীর পিঙ্গল, গিধিনির পর্কটি কিন্তু শ্বেতবসনা নিম্ললঙ্ক বগাকুল নির্বাসী।’ সারস বচনে বেদনার্ত ভাগীরথীর ইচ্ছায় একটি চণ্ডীগাছা ফল বাহিত হল নদীতটে। অল্পবৃক্ষের দু-টি কিশলয় পবিত্র ভাগীরথীর পলিমুক্তিকায় মাথা তোলে। তাকে লালন করে দিনের রবি, রাতের শশী। বালতরু পান করে গঙ্গামৃ, অঙ্গে মাখে গঙ্গামৃৎ, শোনে গঙ্গারামের গীত। ধীরে ধীরে গত হয় ছয় ঋতু। শাখা-প্রশাখা মেলে চণ্ডীগাছা। ঘন হয় তেঁতুলিপত্রের শ্যামল বর্ণ। শ্বেতশুভ্র পুষ্পবোল হাসে। দিন-মাস গতে গগন ছোঁয় দিঘল তরু। অঙ্গে ঈষৎ মধু সংযোগে রসনার সাধ পূর্ণ হয়। মক্ষিকা আসে সুরনদী পথে। মধুচক্র গড়ে চণ্ডীগাছায়। সাঁঝে সারসের দল চাঁদের হাট বসায় বৃক্ষ শাখে। দেহখানি চিতাবহিতে চড়িয়ে এক আত্মা চলেছিল ইন্দ্রধামে। বগা চণ্ডীগাছার রূপ-রস-গন্ধে পিছে ফেরে। উঠে বসে শীর্ষ শাখে। চিরকালের বাসিন্দে হয়ে যায়।

ভিন্ন লোকের বাসিন্দাটির ভয়ে নাইয়া-গাবরদল বগা চণ্ডীগাছা নদীঘাটে চক্ষু মোদে। বাদাম বায়ুতে উড়ে চলে সপ্তডিঙা। প্রাগ্‌জ্যোতিষ বিভায় নাওভাসি জন চোখ মেলে। দেখে দক্ষিণ কূলের তীরভূমিতে কোদো ধান্যের বিস্তৃত খেত। তণ্ডুলের দানাগুলি ঈষৎ স্থূল এবং ভারী। ভোজনে উদরখানি তিন প্রহর পূর্ণ। চণ্ডীগাছার তেঁতুলি আর ভাগীরথীর মীনে সে-অন্ন আনন্দে গ্রহণ করে তীরবাসী কোদালে মানুষজন। তারা গাঁ-গঞ্জে মৃত্তিকা কাটে। খনন করে পুষ্করিণী, পথ গড়ে, গৃহস্থের নতুন গেহের ভিত কাটে। তাম্বূল, গুয়া, নেতবস্ত্রে তাদের বরণ করে নগরিয়া। কোদালিয়ারা জানে ভূতলের কোথায় বাস শিলার কোথায় বা জলের। কোন কোপে কুপিত হয় নাগ আর কোন ঘায়ে মেদিনী ভেদ করে উঠে আসে শিবলিঙ্গ, তা তাদের জ্ঞাত। কাণ্ডার বলে, ‘কোদো ধান্য নাকি কোদালে মানুষজন থেকে ঘাটখানি কোদালিয়া হল কে জানে! তবে ত্রিমুণ্ড বৃদ্ধজন বলে নদীঘাটটি কোদালে মানুষজনের নামে। তাই বামভাগে পরের পুরীটির নাম হালিশহর। ওখানে বাস হালিদের। পরম হালিক হলেন বলরাম, এরা তারই বংশধর। আমরাও হালি হে। ওরা চষে জমি, আমরা চষি জল। হালিশহরে অনেক জল-হালিকেরও বাস। বড়ো বড়ো ডিঙা তৈরি হয় এ-নগরে। দূর দূর দেশ হতে সাধুরা আসে জলযান কিনতে। সেতুবন্ধে বাঁধা থাকে সারি সারি নিষ্পদ।

একজন নাইয়া বলে, কোদালে হল, হালিক হল, এরপর একখানি কুড়ালে ঘাট থাকলে বেশ উত্তম মেল হত যে সাগর-কাণ্ডার!

হাসে বুটন। বলে, বেশ কথা হে। কোদালে থাকলে তো কুড়ালে থাকতেই হয়। ষচন তেমনই বলে,

কোদালে কুড়ালে মেঘের গা

মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে রা।

হালিকে বলগে বাঁধতে আল,

আজ না হয় হবে কাল।

কুড়ালের ঘাট হবে একদিন দেখো।

দিনের আলোয় ভাসে চারপাশ। সপ্তডিঙা চলে ত্রিবেণীর পথে।

## ২৩ মুক্তবেণী

সপ্তডিঙা ত্রিবেণীর পথে। আঘন হিমকণার খানিক ভাগীরথী তরঙ্গে খানিক প্রভাত গগনে। নদীতটের সতবর্গ বৃক্ষপত্রে হেম জলকণা, শ্বেতকমলে রজত। এক ঝাঁক শুক দু-পাখায় শীতলতা ঝরিয়ে পাড়ি দেয় ভিন্ন গাঁয়ে। সারসসারি আশ্রয় ছেড়ে একে একে বসে ভাগীরথী তীরে। দুগ্ধবল তিন শশারুশাবক শমীবৃক্ষের তলে বসে সপ্তডিঙার গমন দেখে। চার গাঙশালিকা কীটমুক্ত করে শতাবরী পত্রগুচ্ছকে। গাছের অন্য শাখে বাদ্যি বাজায় কাষ্ঠকুট। ডাঙ্কজোড় টুবটুব ডুব দেয় ভাগীরথী জলে। প্রভাতম্নানে প্রমেহ ও প্রদর ব্যাধি নাশ। গাঙভাসি জালিক-নাও সপ্তডিঙার বৈভবে বড়োই বিড়ম্ব। সংকোচে সরে চলে কিনারায়। সঙ্গী পালের ফড়িঙা। খাজুরের রসভাণ্ড নিয়ে ঘরে চলে সিউলি। পাক হবে নবাত, নাড়ুগঙ্গাজল, নলেন রসাল। বিলাপ করে মদিরারসিক। একখণ্ড বক্সালে রসটি জমত বেশ। পান করলে চতুর্দিকে যত রং তত রঙ্গ। ভদ্রাসনটি যেন বাসুকির ফণা। মুদুমন্দ দোলে। হায়, সিউলির রস চলে রসাতলে!

পথের ডান ভাগে একটি গোশালা, পাশে এক সুদূরবিস্তৃত তৃণভূমি। তার খানিক আগে একটি পিঙ্গলবৃক্ষ। সেখানে পাক হয় গোদুগ্ধ। গাবর গোটায় বাদাম। শতগজ মধুকর ধীরে চলে, থামে। একে একে দুর্গাবর, শঙ্খচূড়, চন্দ্রপাল, ছোটোমুঠি, গুয়ারেখি, নাটশালা বাদাম নামায়, কর্ণ থামায়। নীরব হয় কেরয়াল-ধ্বনি। ক্ষণিক বিরতি। তীরে নামে সদাগর, কাণ্ডার, নাইয়া, পাইক। বদলায় শরীরের ভাঁজ। কেউ ভাঙে নিম্ব ডাল, কেউ হাঁটে গোঠমুখে। শেষে জড় হয়

চলদল তলে। সারি সারি মৃদভাণ্ডে দুধ ফোটে। নানা বর্ণ নানা বাস। কলসের পর কলস ঘন খিরি। ফেনি সাজানো ধামা ধামা। কোনোটি ইক্ষুরসের কোনোটি খাজুরের। মধুমক্ষিকা আনন্দে মাতোয়ারা। পীযুষ, গ্রন্থি, কর্পূর, এলাচির মিশ্রণে পানাটি যেমন সুস্বাদু তেমন বাসমতী। রাধিকা, ললিতা, শশিরেখা, ব্রজেশ্বরী, ইন্দুরেখার সম রসুইকার হে তুমি রসরাজ। দেখ, সদাগর আর তার সপ্তডিঙার নাইয়া-গাবরদল কি আহ্লাদে কেমন রঙ্গে খায় দুধ-খিরি-ফেনি। যেন যশোদা ত্রেণ্ডে বসে বালকৃষ্ণ ভোজন করে মৌক্তিকাস্ক নাড়ু।

সপ্তডিঙার বাদাম ওড়ে, কেরয়াল জলে নামে, পথ দেখায় কাণ্ডার। সূর্যদেব জলতল ছেড়ে বেশ খানিক ওপরে। তীরবাসী মুনি সকালের পূজা-আহ্নিক এবং দুধদোহন সেরে ইক্ষন সংগ্রহে চলে বনে। সঙ্গী সবৎস গাভী। চলে দুর্বা চারণে। শ্রীফল পত্র, সম্বৃত আতপ তণ্ডুল এবং শর্করাচাঁপার নিত্য প্রসাদির কারণে বন্য তৃণলতায় না মেলে স্বাদ না মেটে সাধ। তাই মুনি সঙ্গে দুর্বাক্ষেত্রে যাত্রা। কাষ্ঠমার্জারী ডালিম-কাঁকুড়ি ভোজ শেষে ক্রীড়া করে বান্ধব সঙ্গে। জাড় বাড়লে রবির তেজ পড়ে, লক্ষ্মে-ঝল্মে তাই তাপ বাড়ানো। উদ্রেক হয় ক্ষুধারও। হরিদ্রাবর্ণ কামরঙ্গ দোলে হিমেল হাওয়ায়। না ভোজনে কবে ঝরে পড়ে! চড়ে কামরঙ্গ বৃক্ষে। এক রামা চলে ছেলিপাল নিয়ে কাননে। ছেলিগুলি রঙ্গ করে রামা সাথে। কেউ ঢোকে ফুল বনে কেউ কুশঝোপে। রামা ডাকে, ‘আই সাঙুলি-বিমলি-ধলি, আই ধসি-চান্দা-উসাবলি।’ ফেরে তারা। উলটো গতি পাখরি, পাঙসি, ঢেঙ্গির। রামার সোহাগি স্বর জাগে, ‘পাখরি-পাঙসি-ঢেঙি, ওরে হাসি-ভাঁসি-বুড়ি-রাঙ্গি, বাছা কালি-বুটি-মহিশা-মঙ্গলি।’ সাড়া মেলে। ততক্ষণে ভিন্নপথি বাগড়ি-দিগড়ি-গেড়ি। রাগত রামার বেগুশাখার আঘাতে ছেলিদল সবাক, স্বপথি। ছেলিরঙ্গে হাসে রবি। জ্বরকাতর একটি ভল্লুক মোলবনের বাইরে এসে রৌদ্র মাখে দেহে। নাসিকা তুলে সন্ধান করে কোনো নব বস্মীক উখিত হল কি না গত মাগশীর্ষ সুদি রাতে। পারঘাটার নাইয়া গেছে ভাগীরথীর ভিন কূলে ডিঙায় যাত্রী তুলে। নাইয়া-বধূ প্রাতের কাজকর্ম সেরে খানিক অবসরে। সতবর্গ বৃক্ষে উপবিষ্ট শুক-শারিকে ঘোড়শী বামা পুণ্যনাম শেখায়,— ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম, পড়ো বাবা গঙ্গারাম।’ পক্ষী দু-টির চরণে হেম আভা, পক্ষে বজ্র শোভা। পণ্ডিত দুই পক্ষী কৃষ্ণ-রাম নাম ছেড়ে প্রহেলিকা শোনায় বামাকে। বলে, উত্তর না মিললে তারা উড়ে যাবে ভিন ঘাটে, ভিন্ন তটে। শোনায়—‘বিধাতা নির্মাণ ঘর নাহিক দুয়ার/যুগী পুরুষ তাহে আছে অনাহার/যখন পুরুষ তাহে হয় বলবান/বিধাতার ঘর ভাঙ্গা করে খান খান।’ থই পায় না বামা। ঘর ভাঙতে পারে একমাত্র ঝড়-ঝটকা কিন্তু বলবান হলেও

সে তো যুগি নয়। উত্তর মেলে না। পক্ষ মেলে দুই দেব পক্ষী। ভগ্ন নাওয়ার তলে পড়ে থাকে শারদশশীর মতো ধবল একটি ডিম্ব।

রং-রূপ-স্বর বদলায় ভাগীরথীর। প্রয়াগ সংগমে গঙ্গা, যমুনা ও অস্তঃসলিলা সরস্বতীর যে তিন বেগি যুক্ত হয়েছিল তারই মুক্তি ত্রিবেণীতে। যুক্ত তিন পৃথক বর্ণ সংমিশ্রিত, তিন স্বতন্ত্র রূপ সমন্বিত, তিন ভিন্ন স্বর সমাশ্রিত। মুক্তে সেই রং-রূপ-স্বর হয় স্বতন্ত্র, ভিন্ন। কিন্তু দু-কূলের শত-সহস্র জনপদ-অরণ্য-প্রান্তর ছুঁয়ে ত্রিশ্রোতার যে সমবেত যাত্রা তা ভিন্ন করে কিন্তু ছিন্ন করে না। তাই ভাগীরথী-যমুনা-সরস্বতী অবাধ হয়েও সমগতি, অসম্বাদ হয়েও সমরূপী, নিরঙ্কুশ হয়েও সমলোকবাসী, স্বতন্ত্র হয়েও সমদেহী, বিশিষ্ট হয়েও সিদ্ধিকামী, কৈবল্যপ্রয়াসী। তাই যে সব জন প্রয়াগের যুক্ত বেগিতে অবগাহন করে তারা চলে ত্রিবেণীর মুক্ত বেগিতে। সপ্তডিঙায় ভেসে আসে দূরাগত লক্ষ লক্ষ স্নানার্থীর করতব। তাদের কাঙক্ষা-অভীক্ষা ধ্বনিতে সমাহিত সপ্তডিঙার নাইয়া-গাবর দল দ্রুত বায় ধাওনি দণ্ড। সে-স্বর যুক্ত হয় তটিনীর বাক সঙ্গে। সেই যুথ ধ্বনি মেশে সংগমের জনরবে। সম্মিলিত সে রব এক উচ্চাঙ্গ ধ্বনি, ধ্রুপদি স্বর, মার্গ নাদ। ত্রিবেণী জল-কল্লোলে সুর সপ্তক—ষড়জ-খরজ, রেখভ-ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ-নিখাদ।

ত্রিবেণী সংগমের জনবারিধি জাগে দূরে। বাদাম নামায় মধুকর। কাণ্ডার বুটন গড় হয়। সংগমের জল ও জন পবিত্র, পুণ্যতোয়া। বাদাম নামায় দুর্গাবর, শঙ্খচূড়, চন্দ্রপাল, ছোটোমুঠি, গুয়ারেখি, নাটশালা। মুক্ত বেগিতে বায়ু-বন্ধনী অবিশেষ। নাইয়া-গাবর-দল কেয়াল থামায়। ঘন হয় শ্রোতের আপন স্বর। সাধু ধনপতি বেরিয়ে আসে রইঘর হতে। করজোড়ে সংগম পথে দাঁড়ায়। অঙ্কুশ নামে। নোঙর করে সাত নাও। তটে নামে ধনপতি, কাণ্ডার, নাইয়া-গাবর। সেতুবন্ধে চলে।

ত্রিবেণী তীরের ভালে ভাসে দ্বিপ্রাহরিক সূর্য। তার উচ্ছল কিরণে উজ্জ্বল নদী, শ্রীফল বৃক্ষ, তুলসী বন, হরিতকি গুচ্ছ, শ্যামল যবক্ষেত, কম্বলী বুঘ, কপিদল, ক্ষৌরকারের দাপনি। ত্রিশ্রোতা সন্ধি স্নানে ক্ষৌরকর্ম বিধি। তাই সরস্বতী-হিরণ্য-কোপীলা, গণ্ডক-দেবিকা-ব্রহ্মপুত্রী, তোম্বর-অরুণা-সূর্য কোশি, যমুনা-চম্বল-সিন্ধু আর যুক্ত বেগি ও মুক্ত বেগিতে মস্তক মুগুন। ত্রিবেণীতে কাবেরী-গোদাবরীর নারী-পুরুষ মুক্ত করে কেশবন্ধ। সেতুবন্ধে কেউ তর্পণ করে সপ্তঋষির, কেউ দিব্য পিতৃব্যের, কেউ ধর্মরাজ যমের, কেউ ত্রোতাবতার রামচন্দ্রের, কেউ ভাস্করের। চন্দনতিলক কাটে ললাট, কণ্ঠ, স্কন্ধ, বক্ষ, কর্ণদ্বয়, বাহুমূলদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, নাভি, পৃষ্ঠ ও মস্তক মধ্যে। কেউ কেবলই ললাটচন্দনী। কারো কপালে ভষ্মের ত্রিগুণ। কেউ গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ সহকারে শিখা বন্ধন করে। উপচারে কেউ ষোড়শ, কেউ দশ,

কেউ পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-গন্ধে পঞ্চম, কেউ অসমর্থ কেবলই গন্ধপুষ্প ও জলদানকারী। কারো হস্তে কাংসপাত্রে দধি-মধু-ঘৃত-শর্করা-দুগ্ধের মধুপর্ক, কারো করতলে জায়ফল-লবঙ্গ-কঙ্কোলাদির আচমনীয়। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ত্রিবেণী সংগমে অবশ্য-দান অঞ্জন। শশীমুখী তিন বালার আঁখিগুলি নিত্যদিন ষড়বিধ অঞ্জনে রঞ্জিত। তাই গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর তটে এত শোভা, স্রোতে এত মায়া, প্রবাহে এমন মর্মর ধ্বনি।

স্নান সারে সপ্তডিঙার নাইয়া-গাবর। তীর্থবাসী কবুতর, কপিকুল, বৃষ পায় যথাযথ উপচার। সাধু ধনপতি স্নানান্তে দান করে বাস, হেম, তিল, ধেনু। তীর্থের ভূশাণ্ডি প্রতীক্ষা করে নদীগর্ভে। শ্রাদ্ধের পিণ্ডে তার উপবাস ভঙ্গ, আত্মার ইন্দ্রলোকে গমন। ক্ষেমংকরী ডাক দেয় মধ্যাহ্ন আকাশে। মহাচিতায় দাহ হয় দেহ। ধুমকুণ্ডলী চলে আকাশতটে। আত্মা ফেরে দেবলোকে। আপনজন চক্ষু ধোয় মুক্ত বেগিতে। দেহবন্ধন থেকে মুক্ত তোমার যাত্রা শুভ হোক। ইড়া-পিঙ্গলা-সুযুনা নাড়ির সংগমস্থল এই ত্রিবেণীতে তুমি ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ কর।

রবি নামে পশ্চিমে। কমে আঘন রৌদ্রের তাপ। বিষণ্ণ বনকপোত ডাকে কপিখ বৃক্ষের ডালে বসে। ডিঙার মাতঙ্গ, কপিদল, কুরঙ্গ, প্লবঙ্গ। কবুতরের ব্যবস্থা হয় ভোজনের। তীর্থান্নে বসে সাধু, নাইয়া, গাবরদল। ব্যঞ্জনে ঘৃতে জবজব নালিতা শাক, ছোলার সূপ, পলাকড়ি ভাজা আর কুমুড়া-আলু-বড়ির ঝোল। নিরামিষ ভোজ শেষে ফেনি দিয়ে দধি। সাধু চলে রইঘরে বিশ্রামে। কিংকর কর্পূর তাম্বুল আনে মুখ শোধনে। বৈকালিক বিশ্রামে যায় সপ্তডিঙা। মধ্যে মধ্যে সেতুবন্ধে সমবেত ধ্বনি, জয় গঙ্গা নারায়ণ। মহাচিতায় নতুন দেহ চাপে। হরিধ্বনি ওঠে। আকাশদীপ স্নান হয়। হেমবর্ণ ধীরে ধীরে পীত, হরিদ্রা। ঘরে ফেরে পক্ষী, বিহারে চলে পতঙ্গ। ত্রিবেণী সঙ্গমে জ্বলে একটি-দুটি ধূপ-দীপ। রজত সিপে কেও তর্পণ করে সুরলোকবাসীদের। যোগপাটায় মুদ্রিতনয়ন সাধু। দূরে সরব হয় শীত-কাতর শ্রীকালি। একে একে নব নব দীপ ভাসে নদী জলে। ত্রিবেণী সংগমে আলোর উৎসব।

সপ্তডিঙা দুলে ওঠে। কেঁরয়ালের ধ্বনি জাগে। বাদাম মাথা তোলে আকাশে। শত-সহস্র সর্পি প্রদীপের আলোয় ভেসে চলে সপ্তডিঙা।

## ২৪ অনুপাম সপ্তগ্রাম

গগনে পঞ্চমী চাঁদ, উর্ধ্বমুখ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র। উত্তরাষাঢ়া তারকা-চতুষ্টয়, কুলাকৃতি। আঘন হিমকণা দানা দানা ঝরে পড়ে কুলামুখ বেয়ে। সঙ্গে চন্দ্ররেণু,

রজতকণা। উত্তরাষাঢ়ার দেবতা জগৎ আর তাই নিশিখানিও জঙ্গম। জল চলে মরুৎ বেগে। ঘন হয় চরণধ্বনি, চলনবানী। ক্ষিতি মধ্যে অতি অনুপাম ক্ষেত্র হল সপ্তগ্রাম, পৌছোতে হবে প্রত্যুষে। তাই দু-কূলের সতবর্ণ-শতাবরী-শিমুলি দ্রুত ধায় পিছে। সচঞ্চল হিমেল হাওয়াও। আঙলা, শমী, পকটির বেশ বদল হয়নি এক সন। পর্ণগুলি পুরানো, বর্ণ মলিন। তোতা রং হরিৎ এখন ধূসর, বিষাদী বন-কপোতী। গঙ্গাবাসী গাঙবায়ু চলে নিশিবিহারে। তিরতির কেঁপে ওঠে চেষ্টাপাতা, কহলার ফুল, চলদল পল্লব, গুয়াবন। জীর্ণ পাতা ঝরে অপাঙ্গের, আতণ্ডির, কুলিতার। দীর্ণ বঙ্কল খসে তিলক, ধূলিকদম্ব, নিসঙ্কার। ঘুরনিয়া বায়ুতে বিষাদ ঝরায় বেণুবন, মঙ্কল ফুল, নাগকেশর। উত্তরাষাঢ়ার মুখখানি উর্ধ্ব, অশ্বখের মূলখানিও তাই। ভাগীরথীতটের চলদল বৃক্ষটিতে সূর্যপুত্র যম আদি অন্যান্য দেবতাদের বাস, তাই এই নিশীথেও বৃক্ষখানি কিরণমণ্ডিত। অধঃ মুখ শাখাগুলি ব্যবহৃত হবে যজ্ঞপাত্র নির্মাণে, অরণিমহুনে, শমী-কাষ্ঠ হিসাবে, যজ্ঞের ইন্ধন রূপে। তেজ বা অগ্নির শিখা হল প্রজ্ঞা আর তাই প্রাজ্ঞ অশ্বখ শাখাগুলি অচঞ্চল। কিন্তু দলগুলি চলমান, তাই বৃক্ষটি চলদল। দল উড়ে চলে হৈম বায়ুতে সপ্তগ্রাম পথে। পুরাণ কালে সপ্তঋষি ভাগীরথীর তীরে গ্রামসপ্তসমাহারে যজ্ঞ করেছিল ব্রহ্মের। সেদিন যজ্ঞক্ষেত্রে অশ্বখের দল বাহিত হয়েছিল। যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নি-প্রজ্ঞা বলয়ে বেদধ্বনি বহন করে আনে বেদপত্র অশ্বখ। ত্রিলোক অবস্থান করে সপ্তগ্রামে, শুক্র-ব্রহ্ম-অমৃত সম্মিলনে সকল যজ্ঞকারী হয় বেদবিৎ। পুরাণ কালস্মৃতিতে অশ্বখের দল ভেসে চলে ভাগীরথী স্রোতে, হিমেল হাওয়ায়। আর হাঁটে আকাশের চন্দ্র-তারা। প্রবাহিত নিশিজাগর জলস্রোতও। জলযাত্রী মানুষজনকে চেনাতে হয় পথ, দেখাতে হয় বাতি, বোঝাতে হয় প্রহর বদল। সপ্তগ্রাম মুখী সপ্তডিঙার সঙ্গী অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র।

আর সচল গঙ্গাবক্ষে চলমান নিম্পদ নানা যান। এর ভেতর বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্রা। যতখানি দীর্ঘ তার এক চতুর্থাংশ প্রস্থে ও উচ্চতায়। ডিঙি, ঝিলে, পাউখা চড়ে মীন ধরে জালিকেরা। ছত্রি তলে বাতি জ্বলে। দু-গলুইয়ে দুই জোয়ান নাইয়া দাঁড় টানে। নিষঙ্গ দণ্ডে এক নিশাচর পাক রাতের রঙ্গ দেখে। শর্করা, নারিকল, ঘৃত ঘড়ার ভিন্ন যান ব্যবস্থা। তারা চলে মধ্যমায়। তরীগুলি প্রস্থে দৈর্ঘ্যের অর্ধ এবং উচ্চতায় দৈর্ঘ্যের এক তৃতীয়াংশ। ভাগীরথী বেয়ে ভারাতারা চলে নানা সেতুবন্ধে। কনক, রজত, তাম্রে ব্রহ্মাদির আকৃতি চিত্রিত যানগুলি। কোনোটির বর্ণ সিত, কোনটি রক্ত, পীত, নীল। নৌমুখগুলির সিংহ, মহিষ, হস্তি, সর্প, হংস, মোরগ, তোতা, ভেক ইত্যাদি নানা আকৃতি। সেখানে ঝোলে মুক্তার স্তবক, স্বর্ণহার। নিশাকালে স্থলজীবন জড়, জলজীবন জঙ্গম। ভাগীরথী স্রোতে ভেসে চলে নানা

পণ্যেপূর্ণ নানান দৈর্ঘ্যের নদীযান। ষোলো হস্ত ক্ষুদ্রা, চব্বিশ হস্ত মধ্যমা, চল্লিশ হস্ত ভীমা, আটচল্লিশ হস্ত চপলা, চৌষট্টি হস্ত পটলা, বাহান্তর হস্ত অভয়া, অষ্টআশি হস্ত দীর্ঘা, ছিয়ানব্বই হস্ত পত্রপুটা, এক-শো বারো হস্ত গর্ভরা, এক-শো বিশ হস্ত মছুরা। যান মধ্যে চলে অলাবু, কুমুড়া, পলাকড়া, কামরঙ্গ, খাম-আলু, বাগ্যান, মান, ওল। সূপ রন্ধনে মুগ-মাষ-বরবটি। রসুইয়ে হিঙ্গ, জিরা, রসবাস, চুয়া, মেথি, জোহানি, মহরি, তেজপাত। মুখশুদ্ধিতে গুয়া, মিঠা তাম্বুল, কপূর, শঙ্খ-চুন। তপ্তলবাহী বড় সম্পানের চালে বসে প্রহেলিকা রচে শুক, ‘মৎস মকর নহে, পানি পানি বুলে/কুস্তীর হাসর নহে, দেখিলে সে গিলে।/গিলিয়া উগরে পুন, দেখে জগজন/হেয়ালি-প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন।’ নৌযানে বসে শুক নিষ্পদের প্রহেলিকা রচে দেখে শারি ভিন্ন প্রবন্ধে চলে। সে শোনায়ে বেহুলার মান্দাস-পন্তন কাহিনী, ‘মর্তমান মধুভাস, কাটিয়া কুলপাই/বাগানে কাটিল কলা, লেখাজোখা নাই।/হাত দশ প্রসার, দিঘল দশ হাত/মঞ্জুষ পন্তন তবে, করিল তাহাত।’ অগ্রমন্দিরা, মধ্যমন্দিরা নৌযানে ভেসে চলে কুলি, করঞ্জা, পানিফল, করুণা, কমলা, টাবা।

প্রহর বদলায়, নরম হয় রাতস্বর, বাদাম শ্বাস ছাড়ে, ক্লাস্তি কেরয়ালে। দূর আকাশের কোলে রজত আভা। সপ্তঋষির যজ্ঞকুণ্ডের রশ্মি দেখে সপ্তডিঙার নাইয়া-গাবর। ওই জাগে সপ্তগ্রাম যেখানে বাণিজ্যে আসে দূর দূরান্তের সদাগর। তাদের বাস কলিঙ্গ, তেলঙ্গ, অঙ্গ, বঙ্গ, কর্ণাট, মহেন্দ্র, মগধ, মহারাষ্ট্র, গুজরাত। সপ্তগ্রামের সদাগর নগরে বসে সুখ-মোক্ষ-ধন লাভ করে। তরী নিয়ে আসে বারেন্দ্র, বিষ্ণু, পিঙ্গল, উৎকল, দ্রাবিড়, রাড়া, বিজয়ানগর, মথুরা, দ্বারিকা, কালী, কাঞ্চীপুর, জয়া, প্রয়াগ, কৌরবক্ষেত্র, গোদাবরী, গয়ার বণিক। বাণিজ্য সফরে আসে ত্রিহট্ট, কাঙুর, কোঁচ, হরেন্দ্র, শ্রীহট্ট, মানিকা, ফটিকা, লঙ্কা, প্রলম্ব, নাকুটের বৃহিতাল। সারিগীতে ভেসে আসে ঝগনা, মলয়াদেশ, বটেশ্বর, আস্থলঙ্কা, হস্তিনানগরীর নাও। নিশিভোরে ধনপতি সদাগরের সপ্তডিঙা সপ্তগ্রামের তীর ছোঁয়। শতশত বৃহিত সেখানে। অধিকাংশ বিশেষ গোত্রের। দৈর্ঘ্য বিলাসী দশ প্রকার দীর্ঘা ভাসে—দীর্ঘিকা, তরণী, লোলা, গত্তরা, গামিনী, তরী, জঙঘালা, প্লাবিনী, ধরণী ও বেগিনী। উত্তাল লোনা পানি বেয়ে এসেছে পঞ্চ উন্নতা—উর্ধ্বা, অনুর্ধ্বা, স্বর্ণমুখী, গর্ভিনী, মছুরা। এক-শো বিশ হাত দীর্ঘ, ষাট হাত প্রস্থ এবং ষাট হাত উচ্চ মছুরার মকরধ্বজা ওড়ে আকাশ জুড়ে। প্রভাত রবি জাগে পূব গগনে। সারস-সারি চলে দিনযাত্রায়।

বেলা যত বাড়ে তত প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে সপ্তগ্রাম। বিচিত্র বেশধারী সদাগরেরা আসে প্রাতঃস্নানে। বাক বিনিময় হয় দেহভঙ্গি ও ভাষামিশ্রণে। আচার-আচরণ ভিন্ন, নিজ নিজ, কিন্তু কোথাও একটা জাতধর্মীয় সদাগর নৈকট্য। এক

জনের পণ তাই সহজেই বদল হয় অন্যজনের সঙ্গে। প্রাতঃভোজ সেরে পাইকেরা নানা ধনে নাও ভরে। সপ্তগ্রামবাসী ধনপতির জাত-বান্ধবেরা আসে কুশল বিনিময়ে। পাশা নামে। অক্ষকীড়ায় মাতে সাধুজন। ব্যবস্থা হয় দ্বিপ্রাহরিক আহারের—ফুলবড়ি দেওয়া নট্যা শাক, খণ্ড দেওয়া দুধ-অলাবু, ইক্ষুরস মেশানো মুগসূপ, আদারস ও মরিচ জারিত কই ভাজা, মান ও বড়ি দেওয়া কাতলের ঝোল, চিস্টিডার বড়া। সপ্তগ্রামবাসী বান্ধবদের গৃহ হতে আসে ক্ষীরপুলি, দধি, খণ্ড। অপরাহ্নে সেতুবন্ধে আবার চলে ক্রয়-বিক্রয়। পরে পাইকদের মল্লযুদ্ধ আর রায়বাঁশিয়া নৃত্য। ঘন বাজে বরঙ্গ, ভেরি, দোসরি, মোসরি, সিংহা, কাড়া, বিরকালি। নদীতীরে শত-শত্ৰু মানুষের সমবেত উল্লাস পাইকের উড়্যা পাকে। অশ্বর কল কল করে বাদ্যের বোলে, মল্লের হুঙ্কারে, রায়বাঁশের ধ্বনিতে। বড়ো আত্মদ হয় নৌচৌরদের। তারা রজ্জু ধরে নাওয়ে ঢোকে। পারাণির কড়িতে ছাড় কেবল গর্ভিণী স্ত্রী, পরিব্রাজক, ভিক্ষু, বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণের। আমি এ-যড়ের কেউ নই তাই জীবন-দরিয়া পারাপারের সামান্য দু-চারটি কড়ি সংগ্রহ করি এই ঘুসি-চৌকিতে। ক্ষুধা হইয়ো না হে সাধুজন। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।

সপ্তগ্রামে পাটে বসে সূর্য। রাঙা হয় ছইঘরের কনকচূড়া, নেতের নৌধ্বজ, গলুইয়ের সিন্দূর, বাতিঘরের রজতদানি, সদাগরের দু-করের হেম তাড়বালা। কমলা হয় নদীজল, স্বর্ণমুগ, দেউলবাসী গোসর্প। সারস-সারি ঘরে ফেরে। ভাগীরথী জলে ডুব দেয় দিনমণি। সপ্তগ্রামের সহস্র ডিঙায় জ্বলে ওঠে বাতি। সাক্ষ্যতর্পণ সারে নদীতীরবাসী। দীপ-ধূপ-পুষ্পে হ্লাদিত হল দেবলোক। উলূক অশ্বখ শাখে এসে বসে। পানিকৌড়ি নিশিন্মান সারে। বটবৃক্ষতলে কিম্বর কঠে গুরু হয় মথুরার গাবর গীত, সেথা শ্রীরাধিকার দুই কুচকুস্ত ভেলায় রাখালরাজ যমুনা পারাপার করে। রাধাবিরহে বিরহিণী বেউশ্যারা সেতুবন্ধে আসে একে একে। সুবর্ণ পানসিগুলিকে দেখে ডিঙাবাসী মানুষজন বক্কাল পানীয়ের ভাণ্ড খোলে। রসপানি বিনা শুকনা ডাঙায় নাও বাইবে কেমন করে? সুদস্তী কৃষ্ণকেশী ঘননিতম্বী মধুস্তনী ক্ষুদ্রভালা বালাটি যায় দুর্গাবরে, সাধু ধনপতির সেবায়। রঙ-রঙ্গে গীত-কৌতুকে মাতোয়ারা সপ্তগ্রামের নৌসারি। বাঁকা শশী কামকটাক্ষ হানে আকাশতটে। গ্রহ-তারা হাসে হিম চাঁদোয়ায়। জয়কার দেয় গুয়া-নারিকল পাতা। ঘন হয় নিশি। নিদ ঝরে ধূলিকদম্ব-নিসঙ্খ্যা-ভূমিচম্পার বক্কল বেয়ে। গীত বাদ্য থামে। বাতি নেভে। শয্যা নেয় সপ্তগ্রাম।

প্রত্যুষে সপ্তগ্রাম বালুবেলায় সবাক এক বাঁক দাঁড় কাউয়া। বিগত যামের উচ্ছিষ্ট অন্ন-মাস-মীন তোলে চঞ্চুতে। সংস্কার করে সেতুবন্ধ। দু-ডানায় সৈকতের লিলুয়ারি বায়ু শোধান সারে। নাওয়ে কামিনী সঙ্গে লীলাচঞ্চল নিশিযাপন হল।

এবার পবিত্র প্রবাহিত স্রোতে অবগাহন করে দেবমাহাত্ম্য উচ্চারণ এবং সাকর্ম-সধর্মে প্রবেশ। নবদিনের নতুন প্রভাতের আবাহন-গীত গায় কাউয়াকুল কিন্তু নাওগুলি নির্বিকার। অসাড় ঘন ঘূমে। সোচ্চারে জাগরণ রব তোলে কাউয়ার দল কিন্তু নিদ্রা কাটে না। গাঢ় হয়। কামপিরিতের নাও চড়ে পাহাড়ে। কাউয়া-কণ্ঠ ভাঙে। ক্লান্ত পাক বসে নাওয়ার কর্ণ, ছই, নিষঙ্গ দণ্ডে। দেখে জালিক জাল তোলে নদীতীরে, ব্যাপারী কুমুড়া-পলাকড়া-বাগ্যান নিয়ে হাটে যায়, কাঠুরিয়া চলে কাষ্ঠ মাথে, হালিক চষে ফেলে আধেক খেত, তেলিয়া বলদ শত পাক সেরে রঙ্গ করে ধবল গাভীর সঙ্গে, কাঠুরিয়া ঘা দেয় শুকনো সতবর্ণ বৃক্ষে, ক্ষেত্রংকরী ‘দুর্গা’ নামে শুচি করে চরাচর—তবু নাও জাগে না। বিলাপ করে মধ্যদুপুরের কাউয়াদল, কামিনী-কাঞ্চন-কামরঙ্গে অগ্নিমাল্য-অম্লরোগ যোগ।

ওঠে রসুইকার। নদীপাড়ের পাকশালে ইন্ধন জ্বালে। অষ্ট ব্যঞ্জন রন্ধন চাপে পঞ্চদশ অগ্নিকুণ্ডে। জলকীড়ার মাতে সপ্তডিঙার নাইয়া-গাবর। সাধু ধনপতি ক্ষৌরকর্ম গতে অবগাহন করে নদীজলে। যখন অগ্নে বসে ততক্ষণে পারঘাটার ঢেঙ্গা-মাণ্ড খাটো-ভাতার লবণিয়া নৈশ আফিঙের বটিকা পাকায়। ধীরে ধীরে সূর্য ডোবে, রাক্ষপতি উদিত হয় গুয়াবৃক্ষের ডগে, বৌদ্ধ বিহারে ধ্বনিত হয় স্ততিগীত, পাশায় বিস্তি ফেলে সদাগর, ঘাট-তাম্বুলী বিড়া বাঁধে। নদীজলে নাও-বাতির আলো খেলে, বংশবনে জোনাক-ঝাঁক হেমদানা ছড়ায়, গীত গায় বন্দর বেউশ্যা। রায়বাঁশ হাতে নগর পরিক্রমা করে পাইক। রঙ্গে-বিভঙ্গে নাচে নদীজল, নাওধ্বজ, নাইয়ার মন।

সপ্তঋষির সপ্তগ্রামের বৃক্ষবন্ধলে খোদিত একটিই বাণী, প্রবাহিত নদীস্রোতে মর্মরিত একটিই ধ্বনি—আনন্দে রহে।

## ২৫ মগরার পথে

দ্বিপ্রহর রাতে দুলে ওঠে সপ্তডিঙা। সপ্তগ্রাম ছেড়ে যাবে সাধু ধনপতির সাত নাও। সহস্র নাইয়া বোল তোলে কেরয়ালে। জলবাসী মীন ঘুমঘোরে পাশ ফেরে। নিষ্পদ যানগুলিকে পথ দিয়ে জলফণী চলে বারি তলে। অষ্টপদ কীট গুটিয়ে নেয় জলজাল। গুনগুন গীত গায় নিশিপতঙ্গ। শুভযাত্রার ডাক দেয় উল্লুক বৃক্ষশাখে। আঘন হিম ওড়ে নাও-বাদামের বায়ুপথে। ‘বাহ’ ‘বাহ’ ডাক পাড়ে কাণ্ডার। ঘন পড়ে কেরয়াল, ত্বরায় জলতরঙ্গ। সপ্তগ্রামের বাতি সেরে দূরে, সপ্তঋষির যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নি-আভা লীন হয় আকাশতটে। ভাগীরথীর দু-কূলে জেগে ওঠে

দ্বিত জনপদ, নারিকল বৃক্ষশ্রেণী, মুর্গার বন, বারিপর্ণী জলাভূমি, ফলবতী  
অনুক্ষেত। সহস্র কেরয়াল স্বরে সপ্তডিঙা ভেসে চলে বিপুল বৈভবে। হিমকণায়  
গ্রহ-তারাগুলি ম্লান কিন্তু ডিঙার সহস্র সর্পি-বাতি উজ্জ্বল। তার ছটা ছইঘরের হেম  
আচ্ছাদনে, গজদন্ত পুষ্পদানিতে, কাঞ্চন যুথিকায়, দারু-দুর্গার হীরক অক্ষিতে।  
তটিনী কণা জ্বলে জলদ্রোণিতে, অঙ্কুশে, ক্ষেপণি দণ্ডে।

বাম নদীকূলে বৃক্ষে বৃক্ষে ঝোলে ব্যাঘ্রচর্ম, কুরঙ্গকৃন্তি। দোলে আঘন বায়ুতে।  
কিছু পরে এক বরাহ বাথান। নিদ্রাতুর শত শত বরাহ, যেন জলঘন শ্রাবণ  
মেঘমালা। দূরে জাগে কলস্বর, আলো ভাসে গুয়া, তমাল, নারিকল শিরে।  
নদীকূলে এক নিশিহাট। মৃৎপ্রদীপের শিখা দোলে হিমেল হাওয়ায়। ভেসে ওঠে  
স্তুপীকৃত মাতঙ্গদন্ত। যেন শস্ত্রাগারে কলধৌত তরবারি কোষ। তার পাশে মুর্গা  
তৃণের গুণে সারি সারি কার্মুক। বিজুলিবরণ তৃণ, খর খড়্গ। পাশে সার সার  
চমরীপুচ্ছ। কিরাট বধূর হাতে হাভিয়া চামর। পর্বতপ্রমাণ মহিষবিষাণ করঞ্জা  
তলে। পণমূলে শিঙ্গাদার শিঙ্গাজোড় বেচে। তার গম্ফু দু-টি গ্রীবাদেশে বাঁধা।  
পাশে ব্যাঘ্রনখ ও ছাওয়াল। কাপড়ি সন্ন্যাসী দেখে ছাওয়ালের হরিদ্রা বর্ণখানি ঘন  
না লঘু। শিখাধারী দ্বিজ পণ দরে গণ্ডক খড়্গ কেনে তর্পণ কারণে। সীতাখালের  
ধারে শশারু, কুরঙ্গ, বরাহ বেচে ব্যাপারী। তার দেহে রাঙা ধড়া, হাতে মোকা  
নারিকল পাত্র। বকাল পানিতে নয়ন দু-টি রঞ্জিত। টেকিশাক, বাঁশকডুল, বাঙড়ি  
ফুটি ও নানান ভেষজ চলদল বৃক্ষতলে। ত্রি-ছিয়া দূরে মাটিয়া পাথরা ও খাপরা।  
তার দক্ষিণে তিন নারীমূর্তি। ছায়া নড়েচড়ে কিন্তু কায়া চক্ষে ধরা পড়ে না।  
হাস্যধ্বনি জাগলেও বদনগুলি অদৃশ্য। সামনে কন্দ, মান ও তণ্ডুলের স্তূপ।  
মধ্যরাতের বাদামগুলি বায়ুভোজনে বিক্রমী। সপ্তডিঙা দ্রুত পশ্চাতে রাখে  
নিশিহাট। নব দৃশ্য জাগে নদীকূলে। সুবর্ণ গোধিকাদল চলে বনবিহারে। কোকের  
পাল হাঁটে শ্রীকালি সন্ধানে। কোকশিশুর বিদ্যাচর্চা দূরস্থ, উদরস্থ করেছে শিক্ষাগুরু।  
গণ্ডকদল রঙ্গ করে তৃণবনে। মহিষ মাতোয়ারা মল্লৈ। কুঞ্জরদল ভোজন করে শত  
শত কদলী বৃক্ষ। ক্ষোভে দু-কপলে করাঘাত করে কপিবর, ফলহীন উপবাসে  
তাকে কাটাতে হবে পুরো বর্ষ। পশুরাজ অনুরাগ-বিরাগ বিহীন। নিশিভোজ সেরে  
মগ্ন কেশর সজ্জায়। কপি বিলাপে কেশরী ভাবে তুচ্ছ-অল্প-মন্দ-হীন-গৌণে বড়ো  
বদ্ধ এই জগৎসংসার। আকাশে ভাসে শশী, পাতালে নাচে নাগ আর অজ্ঞান  
জীবকুল মন্ত অস্তরভ্রায়। পড়ে দীর্ঘশ্বাস। উৎকর্ণ শশারু ত্রস্ত ঝম্প মারে, কণ্টক  
বনে ধায় সজারু, নকুল আশ্রয় নেয় তরু গহ্বরে।

প্রহর পেরোয়। হিম চাঁদোয়ায় ভাসে গগনকুসুম। ডাহিনে নিমাইতিথ ঘাট।  
মধ্য নিশিতে নির্জন সেতুবন্ধটি। সোপানগুলি নিদ্রামগ্ন। জাগর ঘাটবাসী নিষ বৃক্ষ।

তার সাথে হাসে শতশত রাঙা ওড়পুষ্প। ত্রিলোকে যত নিম্ব বৃক্ষ তাদের সব পল্লবে ফোটে রজত নিম্ব পুষ্পগুচ্ছ। এ-পুরীর গঙ্গাকূলে ওড় ফোটে নিম্ব শাখে। আদিত্যের আদি রাঙা বর্ণ ওড়দলে। তটিনীর উজানি স্রোতে বৃক্ষচ্যুত পুষ্প প্রবাহিত হয় ভাগীরথী উৎসে, ভাটি টানে চলে সাগরসংগমে। নিমাইতিথের ওড় পুষ্পের রেণুতে স্বয়ম্ভু ফোটে নদীতীরে, কুণ্ডপুষ্প মাথা তোলে গুহা-গহ্বরে, গোলক দোলে মশানভূমিতে, খ-পুষ্প মধুক্ষরণ করে যোনিদ্বারে। সহস্র নাইয়া নত করে কেরয়াল। করজোড়ে বন্দনা করে তন্ত্র তরুখানিকে।

নরম হয় নিশিস্বর, তরল হয় হিমস্তর। শয়ানে চলে উলুক, ঘরে ফেরে দুষ্টখণ্ড ও নিশিপাল, শয্যা ছাড়ে বেউশ্যা, সুর ধরে নগর-কীর্তনিয়া। বামভাগে পুরী খড়দহ। নম হয় নাইয়াদল। চৈতন্য আজ্ঞায় এ হল নিত্যানন্দের গার্হস্থ্য লীলাভূমি, দুই পত্নী বসুধা ও জাহ্নবী। ভূস্বামীর নিত্যানন্দ কাছে প্রার্থনা করল এক খণ্ড ভূমি। প্রত্যুত্তরে এক খণ্ড খড় ভাগীরথী স্রোতে নিক্ষেপ করে প্রতাপী ভূমিরাজ। বলে, ‘ওহে ধর্মপ্রাণ জ্ঞানতপস্বী ওই তোমার ভদ্রাসন, তুলসীমঞ্চ, নামগৃহ, শয়নমন্দির, পাকশাল, গোশালা, সুখধাম, লীলাক্ষেত্র।’ নিত্যানন্দ সবিনয়ে করজোড়ে গ্রহণ করে দান। তাকায় অতল ভাগীরথীর যাত্রাপথে। গড় হয়। আচম্বিত চলমান স্রোতে আলোড়ন। অজস্র ঘূর্ণন জললতায়। অকাল জোয়ার আসে নদী জুড়ে। দ্রুত কূলে চলে জলবাসী ডিঙা। আতঙ্কে জলতলে যায় মীন-মকর। এক গভীর দহ তৈরি হয় খড় নিক্ষেপিত জলতলে। তারপর গগনচুম্বী জলোচ্ছ্বাস। বিস্ময়ে দেখে তীরবাসী। তারপর সেই জলগম্বুজ যখন জলতলে নামে তখন ভাগীরথী স্রোতখানি সরে গেছে দূরে। জেগে উঠেছে খড়দহ স্থলভূমি। গড়ে ওঠে নিত্যানন্দ কুটির, দিনে দিনে সৃষ্টি হয় জনপদ। খড়দহে শ্যামসুন্দরের মন্দির প্রতিষ্ঠা আর এক কাহিনী। ভাগীরথীর পশ্চিমতটে বল্লভপুর ভূখণ্ডে বাস করত রুদ্র ব্রহ্মচারী। একদিন স্বপনে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বলে গৌড়-বাদশাহের প্রাসাদ হতে একখানি শিলা এনে বিগ্রহ নির্মাণ করতে। রুদ্র জলযাত্রা করে পরদিন প্রত্যুষে। বাদশাহের কাছে উপস্থিত হয় দীর্ঘ স্থল ও জলযাত্রা শেষে। কিন্তু শিলাটি দিতে সম্মত নয় বাদশাহ। নিত্যানন্দকে এক খণ্ড ভূমি দানে অনীহা ভূস্বামীর, ব্রহ্মচারী রুদ্রকে এক খণ্ড শিলা দানে বিমুখ বাদশাহ! বড়োই মানসিক দারিদ্র্য, আত্মিক দৈন্য। তখনই জলকণা নির্গত হতে থাকে শিলাগাত্র হতে। এ বড়ো অশুভ, বড়োই অহিত, বাদশাহজাদা, বোঝায় এক হিন্দু পারিষদ। পরিশেষে রুদ্রকে অর্পিত হল শিলাখানি। ডিঙায় তোলার প্রচেষ্টা চালায় নাইয়াদল। কিন্তু এতই ভার যে পড়ে যায় ভাগীরথী জলে। ভগ্নহৃদয় রুদ্র, শূন্য হাতে ফেরে নিজ গৃহে। একদিন প্রাতে দেখে বল্লভপুরের সেতুবন্ধে ভেসে এসেছে শিলাখানি। অপার বিস্ময়ে হতবাক সর্বজন। নির্মিত হল

শ্যামসুন্দর, রাধাবল্লভ আর নন্দদুলালের তিন বিগ্রহ। নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র গোস্বামীর বড়োই সাধ জাগে শ্যামসুন্দরের মূর্তিখানি খড়দহে এনে প্রতিষ্ঠা করতে। সম্মত হয় না রুদ্র। কিছু সময় গতে স্বীয় ভবনে পিতৃশ্রদ্ধের আয়োজন করে সে। হঠাৎই ঘন জলদে ঢাকে গগন। শয়ানে যায় দিবাকর। শুরু হয় প্রবল ঝঞ্ঝা, ধারাপাত। স্রোতে ভাসে গন্ধপুষ্প, শ্যামাতৃণ, জায়ফল, বিশ্বপত্র। নির্বাপিতপ্রায় যজ্ঞ অগ্নি। সেই সমূহ বিপদে রুদ্রের সহায় হল বীরভদ্র। তার জপে বন্ধ হল বারিবর্ষণ, শুষ্ক হল মেঘগর্জন, স্থিতধী হল ঝঞ্ঝাবায়ু। পুনর্বীর শুরু হল গীতাপাঠ, উচ্চারিত হল বেদমন্ত্র, হোমোগ্নি পল্লবিত হল নব অরণি ও সর্পিতে। স্রীত রুদ্র শ্যামসুন্দরের অপরূপ বিগ্রহখানি দান করল বীরভদ্রকে। খড়দহে প্রতিষ্ঠিত হল মন্দির এবং রাসমঞ্চ। ধনপতি সদাগরের সপ্তডিঙার সহস্র নাইয়া-গাবর সমবেত স্বরে ডাক ছাড়ে—জয় বীরভদ্র, জয়।

তরল হয় আঁধার। কৃজনে মাতে পক্ষীকুল। তীরে তরী বাঁধে জালিক। নাও-বাতি নিভিয়ে মীন নিয়ে গৃহে ফেরে। পারঘাটায় পাটনিপত্তী পানি-পুষ্পে তুষ্ট করে তরণি। নিষঙ্গ-দণ্ডে বসে পূজারীতি নিরীক্ষণ করে ফিঙা। ভাবে, নিত্যদিন এই পারাপার, একূল হতে ওকূল, নিত্য খেয়া দু-লোকে। নিত্য সন্ধ্যারাতে পারানির কড়ি গোনে পাটনিপত্তী। বউটি বিধুমুখী কিন্তু মুখটি খর। কানাকড়ি মিললে নাকাল করে জলচর পাটনিকে। ফিঙা ভাবে ভবনদীর কাণ্ডারির বটুয়াতেও কি এমনই অচল কড়ি পড়ে? তার কপালেও কি এমনই নিত্য গঞ্জনা? নদীকূলের দুই কাউ জলপুষ্পে তরী বন্দনায় কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ। নৈবেদ্য ভিন্ন নিবেদন অপূর্ণ। এক মুষ্টি তণ্ডুলে বধু হয় অন্নপূর্ণা, কানাকড়ি হয় হেমদানা, আর তরীখানি কলধৌত। সমবেত সরব স্বরে সে-কথাই পাটনিপত্তীকে বোঝায় কাউ-জোড়া।

হিমধৌত ঘন সবুজ তৃণভূমি ভাগীরথীর দু-তীরে। চারণে ধেনু নেই কিন্তু প্রান্তরটি বাঙময় শালিকার স্বরে। সূর্যমুখী ফুলদল হাসে উষাকিরণে। প্রজাপতি সপ্ত-বর্ণে ওড়ে ফুলে ফুলে। মুখরা মক্ষীরানির শত মন্দ কথার পর কর্মে চলে অভিমানী মধুকরদল। দূরে ভাসে ফলবতী অন্নক্ষেত্র। হেম হাসি আদিগন্ত। কাণ্ডার বুঢ়ন বলে, কোঙর ধান্যের যেমন বর্ণ তেমন সুবাস। কোঙর তণ্ডুলে নবান্ন, পার্বণের পিঠা, সাধভক্ষণ। অন্নপ্রাশনে কোঙরের পরমাম্ন, শ্মশানযাত্রায় উড়ো খই। জনপদটির নাম হল কোঙরনগর। আর এই নদীকূলে যাদের বাস তারাও কোঙর। জাতিতে সদগোপ। গো-মাতা সুরভির কন্যা কামধেনুর দেহলোম হতে এদের সৃষ্টি। এরা গো দাগে না, গাভী বায় না, ফুকা দিয়ে দুগ্ধ দোহন করে না। চিত্তগুলি দুগ্ধের মতই ধবল।

কাণ্ডার নির্দেশে কেরয়াল থামে, বাদাম নামে, স্থির হয় ডিঙা। কূলে চলে

সদাগর, নাইয়া-গাবর দল। গোষ্ঠে চলে ধেনু মছুর পদে। কাউতাড়ুয়া শিশিরস্নাত নেতবাস শোকায হিমেল হাওয়ায়। ছেলিশাবক নৃত্য করে সারমেয় বৎস সঙ্গে। সাধু ধনপতি নির্মাণ করে মৃত্তিকাশংকর। স্নানাঙ্তে স্থাপন করে দক্ষিণ মুখে। নিজে উত্তরমুখী বসে আচমন করে দু-বার। সামান্যার্থ্য, আসনশুদ্ধি, গুরুপ্রণাম, পুষ্পশুদ্ধি, দিকবন্ধন অঙ্তে সূর্য্যার্যাদান, গণেশাদি পঞ্চদেব পূজা, আদিত্যাদি নবগ্রহ কর্ম সম্পন্ন করে। তারপর মৃত্তিকাশংকরে জল ও আতপ তণ্ডুল অর্পণ। ধ্যানাঙ্তে শংকর শিরে গর্ভহীন দুর্বা, চন্দন, জল, পুষ্প-সহ দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুলে আরাধনা। অঙ্তে সংহার মুদ্রায় একটি নির্মাল্য পুষ্প আত্মাণপূর্বক অর্পণ করে দেবাদিদেবকে। তারপর মার্জনা ভিক্ষা ও পুষ্পটি দিয়ে ঈশান কোণে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন এবং বিসর্জন। বাদ্যের প্রতিধ্বনী ভাগীরথী স্রোতে। চারণের ধেনুদল দেখে সদাগরের শংকর আরাধনা। তারাও নিত্যদিন ধৌত করে শিবলিঙ্গ ধবল দুক্ষে।

কোঙরনগরের পল্লিতে পল্লিতে বার্তা যায় সদাগরের সপ্তডিঙা নদীঘাটে। হালিক থামায় হাল, জালিক গোটায় জাল। ব্যাপারীর দল চলে ওল, পলাকড়ি, ফুলবড়ি, কামরাঙ্গা, মীন নিয়ে নদীতীরে। দধিকর চলে শত ভাণ্ডে দুগ্ধ, দধি, ননি, ঘৃত, ফেনি, খণ্ড ও মতিচূর নিয়ে। জুলে পঞ্চদশ অগ্নিকুণ্ড। সর্পিতে প্রস্তুত ব্যঞ্জনের প্রথম পদটি অর্পিত হয় অগ্নিকে। তিনি তুষ্ট হলে তণ্ডুলকুট, পঞ্চব্যঞ্জন, মীন সব সুপাক, সুস্বাদু। অগ্নিই প্রকৃত রসুইকার, রসনারসিক।

নদীকূলের ভাণ্ডার হতে সারি সারি সর্পিভাণ্ড ওঠে ডিঙায়, সঙ্গে কোঙর তণ্ডুল। ধবল গাভী চলে দলে দলে, পশ্চাতে ষণ্ডা ষাঁড়সারি। ভাগীরথী জলে স্নান সারে কোঙরবাসী। জলকেলি করে কঙ্ক। কাষ্ঠমার্জারী কমহীন দ্বিপ্রহরে নারিকল বৃক্ষসারির দৈর্ঘ্য মাপে। পাত পড়ে সহস্র নাইয়া-গাবরের। ডাঙ্ক ডাকে মুরগার বনে। কষ্ঠ মেলায় ভাণ্ডারের কবুতর। মন্দারি কাণ্ডে সিঁদ কাটে কাষ্ঠকুট। পশ্চিমে ফেরে দিনমণি। দীর্ঘ হয় রঙ্গন, মেহদি, গুয়া, শিমুলির ছায়াদেহ। এক কপিশাবক ব্যস্ত আপন ছায়াখানি করবন্ধে। ডিঙা দুলে ওঠে। সরব হয় কেরয়াল। বাদাম ওঠে। সপ্তডিঙা ছেড়ে চলে কোঙরনগর। সপ্তডিঙার অপরূপ জলযাত্রা অপলক নেত্রে দেখে একাকী কাউতাড়ুয়া।

সহস্র কেরয়াল দ্রুত ধায়। ঘন শ্বাস নেয় নাও বাদাম। নদীকূলের পথ ধরে খর হাঁটে গৃহমুখী গো-শকট। দ্রুত বায়ু কাটে নীড়গামী সারস সারি। কমলা হয় দিনমণির দেহবর্ণ। বামভাগে ছত্রভোগ। কাণ্ডার বলে, দিব্য রথে চড়ে ভগীরথ চলে সাগরে, পিছে আসে গঙ্গা। সে এক দীর্ঘ যাত্রা। গিরি, কাষ্ঠার, মেরু পেরিয়ে। জাহ্নবী বিরহে বড়োই কাতর মহাদেব। শেষে গমন করল গঙ্গার যাত্রাপথ ধরে। এই ছত্রভোগে জলরূপে মহাদেব মিলিত হল জাহ্নবী সঙ্গে। ওই হল অম্বুলিঙ্গ

ঘাট। মিলন কালে জলগর্জন স্তব্ধ হওয়ায় সংশয়াকূল ভগীরথ পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি করতে থাকে। ফিরে দেখে পশ্চাতে। তখন গঙ্গাদেবী করস্থিত জ্যোতির্ময় চক্রখানি উত্তোলন করে দেখায়। স্থানটি নাম পেল চক্রতীর্থ। নিশিটি ছিল চৈত্রের, তিথি শুক্ল প্রতিপদ। বুঝলে হে সর্বজন, চক্রতীর্থ অবগাহনে সুপুত্র মেলে।

সন্ধ্যা নামে। ঘন হয় বায়ুস্বর। সবাক দু-কূলের কাশ বন, তিস্তিড়ীর পাতা, শুকনো নারিকল গুচ্ছ। দক্ষিণে হাত্যাগড়। যে নদীজলে একদিন নৃপতির শত গজ কেলি করত সেখানে এখন ভগ্ন কুঠি, বটবৃক্ষশ্রেণী। এই হাত্যাগড়ে সদাগরি ডিঙা নোঙর করত। গজদম্ভ, গজমুক্তা, গজহার কিনত সাধুর দল। নিশীথে শুনত গজের গীত। সব বাতি আকস্মিক নিভে গেল। হাত্যাগড় হল কুরুক্ষেত্র রণ শেষে নিরানন্দ হস্তিনাপুর। প্রাণহীন পরের জনপদ মেদনমল্লও। নৃপতি নেই তাই মল্লবীর নেই, হংকার নেই, হর্ষও নেই।

মধ্যরাত্রির নদীবুকে जागे কলধ্বনি, ভাসে বুবুদ স্তূপ। নদীর দু-কূলে মাথা তোলে বির আগাছার জঙ্গল। কেরয়াল দ্রুত পড়ে। জলতলে কুব কুব ধ্বনি, যেন সহস্র কবুতর ডাকে বন্দস্বরে। দূর হতে ভেসে আসে ঘন জলনিশ্বন। উত্তাল জলরাশি নাচে, গায়, গর্জায়।

## ২৬ পদ্মাবতী সকাশে ভগবতী

আঘন হিমে চরাচর ধূসর। অষ্টমীর চাঁদ নিশি শেষে ম্লান, মনমরা। ঘন ঘুমে বৃক্ষ-লতা, মীন-মকর, গো-ছেলি, নগর-পুরী, নকুল-অহি। জাড়ে অহিকুল দুগ্ধ-কদলী ছেড়ে বায়ুসেবী, সিজ বৃক্ষগুলির মতো তারাও নিশ্চল। পদ্মাদেবীর দ্বার-প্রহরী টোড়া-চ্যামন কুণ্ডলীকৃত, বেঁঙ্কশ। দেবীর কণ্ঠমালা উদয়নাগ যেন ছিল তুলসীকণ্ঠী, ভূতলে তার শয়ান। দেবীর কটিবন্ধ হেলানাগ ঘুমঘোরে শিথিল। অগ্নিশুদ্ধবসন পরিহিতা দেবী নিশিভোরে বিবসনা, দিগম্বরী। দেবীর কেশবন্ধনী চিরুনিয়া নাগগুলি স্বপন সুখে। বস্ত্রের বন্ধন শিথিল হ'লে কেশবন্ধনে কী লাভ! দেবীর ছত্রধর অনন্তনাগ ছত্রখানি গুটিয়ে সিজ বৃক্ষতলে অনন্ত শয়ানে। হিমকণায় ছত্রহীন দেবীর কেশ যেন কাশ বন। চন্দ্রবদনা পদ্মাবতীর চন্দ্রশিয়র নাগাসনটিও নিষ্পন্দ।

মগরায় ধনপতির সপ্তডিঙা অথচ হুঁশ নেই কারো। পার্বতী সিংহরথে চড়ে পদ্মার মন্দিরে এসে দেখে মহাজ্ঞানী মহানিদে। তাকে জাগরণে আনে এমন কেউ নেই ত্রিজগতে। মগরার আধা জলধি সহস্র কেরয়ালে সদাগর বুঝি প্রত্যুৎপন্নপার হয়। পদ্মাধামে ভগবতীর শত সম্ভাষ-সম্বোধন ব্যর্থ। সহস্র ডাক-হাঁকেও जागे না

অনন্ত, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, ককট কিংবা শঙ্খ। সপ্তনাগ সপ্তম সুরে নিদ্রা যায়। বাসুকি জেগে কিন্তু তার স্কন্ধে এই ধরাধাম। সে সচল হলে ভুকম্প ঘটবে, উথালপাথাল হবে জগৎ। অবশেষে দেবী নাগেশ্বর ফুলবনে দর্শন পেল এক জাগ্রত কালী গোখুরার। মণিহীন ফণীটি ভোজনের জন্য সন্ধান করছিল একটি বিশেষ প্লবঙ্গের। এ সেই প্লবঙ্গ যা ভোজন করেছে একটি বিশেষ শালিকা, যার ভোজ্য হয়েছে এক লক্ষ মহীলতা। ভগবতীর আতঁরব এবং দেবীবাহন পশুরাজের অট্টনাদে প্লবঙ্গ সন্ধানী ফণীটি ফিরে দেখে। দেখতেই থাকে, পলক পড়ে না। বিস্ময়ে সে শতবাক, বিহুলতায় তার অমন চক্রাকার সুচারু নয়ন দু-টি খণ্ডিত পলাকড়ি। যে ভগবতীর শশীবদন সর্বক্ষণ সুপ্রসন্ন, যার মনোহর ত্রিনয়ন, কণ্ঠহার-নূপুর-কেয়ুর-জটামুকুটে যে বিভূষিতা, যার পরিধানে বিচিত্র পট্টবস্ত্র ও ললাটে অর্ধচন্দ্র, যার সুকোমল দশবাছতে খড়্গ-খেটক-বজ্র-ত্রিশূল-বাণ-ধনুঃ-পাশ-শঙ্খ-ঘণ্টা ও মৃণাল, কোটি ইন্দুর ন্যায় যার দেহপ্রভা, আঘন এই প্রত্যুষে সে যেন ডাকিনী, প্রেতিনি, শঙ্খচূর্ণী। তবে কি নবজন্ম হল কোনো দানো, দৈত্য, অসুরের? আতঙ্কিত কালী গোখুরার অত্যাগ্র আতঁনাদে ন্যঞ্জ ওপরে দ্বারী টোঁড়া-ঢ্যামন, পদ্মাকোষ্ঠী উদয়নাগ। হেলানাগ কটিতে এতই দড়ো যে স্বাসে টান দেবীর। চিরুনিয়া নাগমণ্ডলীর দৃঢ় বেষ্টনীতে দেবীকেশ বেণুবন। শশব্যস্ত অনন্ত ঘুম ঘোরে ফণখানি তুলে ধরে সিঁজ বৃক্ষ মাথে। পদ্মার শিরে ঝরে অবসিত রাত্রির অবশিষ্ট আঁধার রেণু আর আঘন হিমকণা।

দেবী ভগবতীকে সিংহরথ হতে পদ্মাবতী নিলয়ে আনার জন্য যায় সহস্র খই-শুভ্র খইয়া গোখুরা, হরিদবর্ণ হলিদাশঙ্খমুঠি আর বিকশিত পদ্মরূপী ‘পদ্মগোখুরা’। তাদের সমবেত নৃত্যগীতে বন ও বসত ছাড়ে যত নকুল, পুচ্ছ তুলে ছোট্টে গিরিকন্দরের পথে। নাগকুলের সমবেত মনসার জাতে গরুড় দল চলে দ্বীপান্তরে। গোখুরা সহস্রের সোচ্চার ‘পদ্মাবতী’ ধুয়ায় কলাপীসারি ভিন গ্রহের পথে। এমনকী অমন আত্মবান যে ভগবতী বাহন সিংহ সেও সহস্রনাগের সরব নৃত্যে মহা আতান্তরে। অন্তরে ত্রাহি ত্রাহি ডাক দেয় ভবতারিণী ভগবতীকে। অভয় দেয় অভয়া। সেই বার্তা সৌঁছোয় গোখুরাকুলে। পশুরাজকে নির্ভয় করতে তার গলে কণ্ঠমালা হয়ে ঝোলে এক পণ খইয়া-গোখুরা। প্রতি পদে একগণ্ডা হলিদা-শঙ্খমুঠি হয় পদভূষণ আর কর্ণবন্ধনী হয় দুই-দুই চারিখানি পদ্মগোখুরা। নিশ্চল কেশরী, নির্ভয়ে নাকি নিয়তি বিশ্বাসে!

রথ হতে অবতরণ করে ভগবতী। তার গমন পথের দু-দিকে সারিবদ্ধ দাঁড়ায় নাগমতি কেউটিয়া দল। তাদের ফণীর মণি হতে বিচ্ছুরিত হয় দৈব দ্যুতি। ভগবতী

ফেলে প্রথম চরণ। মুখর হয় নৃপূরশালি, ঘন বাজে পাসলি। সেই মনোহর ধ্বনিতে কদলীবন হতে বীরভাব নৃত্য মুদ্রায় বেরিয়ে আসে শত শত আড়াই নাগ, পাড়াই নাগ, বয়ড়া। অচিরে দিগন্তবিস্তৃত নলখাগড়া ঝোপ হতে উদ্দাম বধমুদ্রায় প্রকাশঘটে হরিণমারা, বরাচিত, ঢোসবোড়ার। তাদের পশ্চাতে উদয় হয় তেঁতুলপড়া আর লাউলাড়ার নর্তক-নর্তকী। তারা কখনো স্থানুবৎ, কখনো ঈষৎ বামে কখনো ঈষৎ দক্ষিণে হেলিত, কখনো শয়ানে, কখনো আবার ভ্রামরীতে ঘোরে। তাদের অনুসরণ করে শ্যাওড়া কাননের বিগদে বোড়া, চন্দন বোড়া, রক্তবোড়া আর নয়ানজুলির একটি জলবোড়া। যেমন তাদের সূক্ষ্ম পদসঞ্চারণ, তেমন দেহের সূচরু অভিব্যক্তি। ভগবতী-পথের দু-পাশে হাসে রঙ্গন, অশোক, মাধবীলতা। সুবাস ছড়ায় কলিকা, টগর, গন্ধরাজ। পদপ্রান্তে ঝরে পড়ে ফণীমনসা, নয়নতারা, হাজারিবেলা। দোলে দোপাটি, ধুতুরা, ঘেঁটু। পদ্মাধামে ভগবতী আসন গ্রহণ করে শমীবৃক্ষের পত্রে। ভগবতী হল অপরাজিতা ভবানী তাই তার পদপ্রান্তে স্থাপন করা হয় অপরাজিতা লতা। দেবী নীলোৎপলদলশ্যামাং তাই তার হাতে অর্পণ করা হয় অষ্ট দল নীল পদ্ম। যে ভগবতী-ভবানী সেই পার্বতী-উমা-নারায়ণী-দুর্গা-চণ্ডী-শ্যামা। মুখস্বরূপ দেবী শিরে নিবেদিত হয় পদ্মপুষ্প, স্তন-স্বরূপ ওড়পুষ্প, যোনিস্বরূপ কৃষ্ণপরাঙ্গিতা, লিঙ্গস্বরূপ রক্তকরবী, পাদুকাশ্বরূপ দ্রোণপুষ্প। উলুধ্বনি দেয় কালনাগিনী, শঙ্খচূড়, তক্ষক। হঠাৎই অজাগরের স্মরণ হয় অপূজিত দেবীবাহন। অথচ এ হল বিষুগুপ্ত সেই সর্বদেবময় সিংহ যার কেশরমূলে কেশব, গ্রীবায বিষুগু, দেহে সর্বলোক, মস্তক মধ্যে মহাদেব, ললাটের অগ্রভাগে মহাদেবী, নাসাদণ্ডে সরস্বতী, মণিবন্ধে কার্তিকেয়, দুই পার্শ্বে নাগগণ, দুই কর্ণে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দুই চক্ষুে চন্দ্র ও রবি, দন্তসমূহে বসুগণ, জিহ্বায় বরুণ, হৃদয়ে চর্চিকা দেবী, দুই গণ্ডে যম ও যক্ষ, অধরোষ্ঠে দুই সন্ধ্যা, গ্রীবায ইন্দ্র, গ্রীবাসন্ধিতে ঋক্ষগণ এবং বক্ষস্থলে সাধ্যদেবগণ। অজাগরের আহ্বানে পুষ্প চয়ন করে দেবীবাহনের দিকে অগ্রসর হয় সর্পদল। মহোরগের মুখে মালতী, করাতের কুন্দ, শঙ্খচূড়ের শেফালি, কালনাগের কুঙ্কুম, রাজসর্পের রক্তকরবী, বোড়ার বকুল। দাঁড়াশের মুখে অক্ষত বিশ্বপত্র, চিতির তুলসী, হেলের দুর্বা। শিরে মণি নিয়ে পদার্থে চলে কৃষ্ণসর্প।

পদ্মাবতীর সন্তানসন্ততিগুলি ক্রোড় ছাড়তে শ্বাস ফেলে ভগবতী। কোনটি যে কোনদিকে কখন কী কুকর্ম করে কে জানে! এরা মদনের করুণায় দিবারাত্র রতি ভাবে, যশীর প্রসন্নতায় বহুপ্রসবা, যমরাজের কল্যাণে দীর্ঘজীবী। নানা রূপ, রঙ ও গুণের আধার এই বাহনগুলি ব্রহ্মা-বিষুগু-মহেশ্বরের মতো সর্বত্র বিরাজমান এবং সর্বশক্তিমান।

বিষহরীগুলি বিদায় হতে ভগবতী বলে, হাঁরে মা পদ্মাবতী, ধনপতি মগরায় আর তুই এখনও নিদ্রা যাস?

নিদ্র টুটে গেছে পদ্মাবতীর কিন্তু অপূর্ণ সুপ্তির রেশ এখনো পদ্মনয়নে। তন্দ্রালু দক্ষিণ হস্তখানি দিয়ে স্বপ্নিল মণিখানি মোছে। জগৎকারুর সঙ্গে ক্ষণিক সংস্রব ঘটলেও মনসা মুক্ত বালা। তাই শ্বেত চম্বক বর্ণাবিশিষ্টা, চারুকান্তিযুক্তা, স্থূলকুচযুগল শোভিতা, কামরূপা নারীটিকে ঘোরনিদ্রায় নন্দিত করে দেবলোকের কতজনা। তারই প্রকাশ দুই ওষ্ঠের জুস্তগে।

ভগবতী বলে, ও পদ্মা, আমি বলি সাধুর সদর্প সাগরযাত্রার কথা আর তুই বদনব্যাদনে হাই তুলিস মা।

আঁখি কমলের দল মেলে পদ্মা বলে, সাধুর জলযাত্রা তো দীর্ঘ জননী। এতো ত্বরা কেন, কীসের এত অচিরতা?

বিস্ময় ভগবতীর স্বরে। বলে, বলিস কীরে মা, আমার বারিতে পদাঘাত করেও ধর্ম-অর্থ-কামে মজে আছে ধনা। তুই বলিস ত্বরাতির কী? চাঁদ সদাগরের পুজো পেয়ে তুই সদা হাস্যমুখী, কান্তিময়ী, সুখদা। আমার যে বড়ো জ্বালা পদ্মা। ত্রিনয়নে দেখি মৃত্তিকা-শঙ্করে শত শ্রীফলপত্র ও পুষ্পে বন্দনা করে সদাগর। কারো প্রাপ্য বন্দনা, কারো বেদনা। ওরে, ধনপতি ধনে ভরে সপ্তডিঙা। পুরীতে পুরীতে তোলে গাভী, বৃষ, গজমোতি, অজিন, ঘৃত, বক্কাল, গঞ্জিকা। ধনা নিশিয়াপন করে পীনোদ্ভুঙ্গস্তনা, হরিণীচঞ্চলা, হিরন্ময়ী বালা-সঙ্গে। ওরে, আর কত অপেক্ষী হব? ধনার মোক্ষলাভ অবধি?

করজোড়ে পদ্মাবতী বলে, জগন্ময়ী, তুমি জগতের সৃষ্টিক্রুপা, পালনকালে স্থিতিরুপা, সংহারকালে সংহতিরুপা। তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রুদ্রশক্তি, তুমি কেন বিচলিত হবে ধনপতি রোম্বে? কেন নিশি হবে নিদ্রাহীন? মহিষাসুরমর্দিনী, তোমার আঁখি-পল্লব হবে নিদ্রালু, আঁখি-তারা ঘুমানিয়া, আঁখি-পট স্পনাভ। শয়নভঞ্জন হবে সাধুর, জাগর থাকবে সদাগর, বীতনিদ্র হবে ধনপতি।

ভগবতী আত্মহৃদে বলে, কবে হবে রে মা? তুই জ্ঞানশ্রেষ্ঠা, বল দেখি কী করে মগরায় ডরে ধনপতি।

ভগবতীর উচ্ছ্বাসে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পূর্বাকাশ। ঝরে পড়ে নিশিকণা। হিম-ধূম ডুব দেয় ভাগীরথী জলে। ডেকে ওঠে প্রভাতি পাক। ব্রাহ্মমুহূর্তে গীত গায় ব্রহ্মচারী। দন্তধাবন হেতু ঘাট-নাইয়া ভাঙে নিম্নডাল, নাইয়াবধু টানে খদির শাখা, তুলসী বৃক্ষে জলদান করে ব্রাহ্মণী। পদ্মাবতীর বাহনগুলি সিংহতর্পণ সেরে দিবানিদ্রায় চলে বটকোটরে, সিজ বনে, অলাবু মাচানে, দৈবসার বৃক্ষে, শ্রীফল শাখে, শিবলিঙ্গে, কলসতলে, কোঙর ধানের খেতে, পদ্মদিঘিতে, এলাচি কুঞ্জে।

পদ্মাবতী বলে, জননী তুমি এখনই গমন কর মগরায়। গমন পথে চারখানি জলদ কামনা কারো ইন্দ্রের কাছে। বোলো ঘনঘোর, বজ্রনাদি নীরদবাহী বারিদ দিতে। সাধুর অনেক ধর্ম, অর্থ, কাম হল এবার খানিক পুরুষকার কাটুক, মর্দানি মরুক।

ভগবতী দশ হস্তে হিত কামনা করে পদ্মাবতীর। তারপর সিংহরথে চলে মগরায়। মধ্যগগনে স্তুতি করে ইন্দ্রদেবের—তুমি এই ধরাকে দৃঢ় করেছ, স্থির করেছ পর্বতমালা, স্তুতি করেছ দ্যুলোক, সৃষ্টি করেছ সূর্য ও উষা, প্রবাহিত করছো সপ্তনদী। হে মেঘবাহন, আমাকে দাও চারখানি দেয়া, হে বৃষা আমাকে দাও এক অম্বর বারি, হে বজ্রী আমাকে দাও এক গুচ্ছ বজ্র। মগরায় চব্বিশ প্রহর দিবারাত্র বর্ষণ-বজ্রপাত-শিলা শেষে ফিরে যাক। ধনপতির ধনগরিমা বিলীন হোক নদীগর্ভে।

পূর্ব আকাশের রবিরশ্মি ক্রমশ ন্তান হয় ঈশানের ঘনকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ। নতুন এক মিশিকালা মেঘ জাগে অগ্নিকোণে। নৈঋত ও বায়ুকোণ দুটিও কেশকালো ঘনে ঢাকে। উত্তরা বায়ু ধেয়ে আসে হেমস্তের ধুলি মুখে। ওড়ে দীর্ঘ পর্ণ, শীর্ণ বৃক্ষশাখা। দেহ ঢাকে সূর্যের। পূর্ব আকাশে উদিত দিনমণি পাটে বসে পূর্বের। মেঘ কোলে শাখা-প্রশাখা ছড়ায় অগ্নিদেব। যে পক্ষীকুল প্রত্যুষে পাড়ি দিয়েছিল দূরদেশে তারা প্রলয় ভয়ে নীড়মুখী। জালিক মাঝদরিয়া ছেড়ে তীর পথে। হালিকের বলদদুটি গৃহমনা। সদ্য শয্যাভ্যাগী কামুক আবার শয়নে চলে গণিকা সঙ্গে। বৃষ্টি-ফোঁটা পড়ে দু-চারটি। চেহারা যেন ফুলবড়ি, বর্ণটি শুভ্র বিউলির। খানিক খই ফোটার পর ঝমঝম। সবাক সুলপো শাক, কদলীপত্র, শমী বৃক্ষ। রাজহংস মাথা গোঁজে চেষ্টাবৃক্ষ তলে। প্রাতঃস্নান সারে শালিক-শালিকা। জলটোঁড়া নাল্‌বনে নৃত্যে মাতে। মহীলতা উঁকি দেয় ভূতল হতে। মকর-কুন্তীর ভাসে নদীজলে। হঠাৎ পর পর তিনখানি বজ্রপাত। কেউ চলে জলতলে, কেউ ভূতলে, কেউ বা গৃহকোণে। আর একখানি বজ্রে জলে ওঠে ত্রিমস্তক তাল বৃক্ষ। বৃষ্টি ঝরে মুষলধারে। সীতাখাল উপড় চুপুড়, একাকার আঠার খালিজুলি। বিজুলি চমকে খান খান গগনমণ্ডল। শিলা পড়ে ঝরঝর। কুবকুব ধ্বনি ভাগীরথী বুকে। অষ্ট গজরাজ চারি মেঘে জল ঢালে। চতুর্নদ নেমে আসে গগন বেয়ে। সাথি তুরঙ্গ বায়ু। একাকার সর্ব পুরী। আর্ত নাওবাসী স্মরণ নেয় জৈমুনির। রইঘরের চালে শিল পড়ে, যেন ভাদুরে পাকা তাল। বিদীর্ণ হয় চালা। চণ্ডীর আদেশে মধ্য রজনীতে হাজির হয় বীর হনু। সে খানখান করে ডিঙার ছাউনি, চুসাচুসি করে ডিঙায় ডিঙায়।

সিংহরথে বসে কৌতুকে হাসে মাতা ভগবতী।

## ২৭ নদ-নদীর মগরা গমন

উষাকালে নগরিয়া দেখে জল থইথই মগরা। পুষ্করিণী, নয়ানজুলি, সীতাখাল সব ভাগীরথী কোলে আর নদীজল পাকশালে, শয়নমন্দিরে, দেহারায়। গো-শালার চালখানি মাকন্দ বাগানে, আকন্দ ডালগুলি ভালুকা বাঁশের বনে, অলাবু মাচান ভূমিশয্যায়। পুষ্করিণীর মীন দূরদেশে, দোরে চরে আড়, বোদাল, খয়রা। নদীবক্ষে ছিন্নভিন্ন নৌধবজা, ভগ্ন গেহচাল, ন্যুঙ্গ বাদাম। অব্যাহত ধারায় ধনপতি সদাগরের সপ্তডিঙা নীরব, নিশ্চল। অবিরাম বর্ষণে বীর হনু জবুহুবু, রাত্রিব্যাপী সংঘটে ক্লাস্ত। ব্যর্থ বীর দেখে ডিঙাগুলি রঙ্গে দোলে, ব্যঙ্গ করে তাকে। বীর কদলী খায় কাঁন্দি-কাঁন্দি কিন্তু বল পায় না নব ঝম্পে। সাধুর নাইয়া গাবরদল-কেরয়াল হাতে একদৃষ্টে দৃষ্টিবদ্ধ তার দিকে। লঙ্কাবাসী রাবণ বিবর্ণ করেছে সুবর্ণ মুখখানি, লঙ্কাযাত্রী ধনপতির কী অভিপ্রায় কে জানে! অসহায় অভয়া দেখে সপ্তডিঙার বৈভব। যে ডিঙা সাগর তরঙ্গ বায় তার কাছে চারিমেঘ বারি কতটুকু ক্লেশ! শত যোজন প্রাণপিড়াসিল মীন, তিমিসিল যার নোনাপথের নিত্যসঙ্গী কি ডর তার নদীজলে? অভয়া বোঝে কেবল মেঘবারি নয়, সাগরযাত্রী সপ্তডিঙার নির্ণয় ত্রিলোকের নদীসম্মিলন।

ভগবতী প্রথম আহান করে গঙ্গাকে। শ্বেত-চম্বকবর্ণা, মকরবাহনা, পঙ্কজধারিণী মা গঙ্গে, দুই প্রাচীপথে প্রবাহিত হলি হুাদিনী, পাবনী, নলিনী রূপে, প্রতীচী মুখে সুচক্ষু, সীতা, সিদ্ধু ধারায়। মা তোর মন্দাগামিনী মন্দাকিনী বৈকুণ্ঠ হতে ব্রহ্মলোক হয়ে স্বর্গে গেল, ভোগবতী প্রবাহিত হল পাতালে। মা তুই অষ্টধারায়, মীন-কমট-শিংগুমা সঙ্গে, একবার বয়ে আয় মগরায়। ওমা, সঙ্গে আনিস ভৈরবী, পাপ-প্রবাহিণী কর্মনাশা। ধনপতির অপকর্মের বিহিত হোক এই নদীসঙ্গমে। দ্রুতপদ আর মহানদকেও বলিস। হ্যাঁরে, মনে আছে তোর লিখিতমুনির কথা, যে শঙ্খঝবির আশ্রমে ঢুকে অমৃতফল খেয়েছিল। তারপর শঙ্খ প্রদ্যুম্নরাজকে বলে লিখিতের হাত দু-টি ছেদন করায়! শেষে নদীতটে তপস্যা অস্তে নদীজলে অবগাহন করে লিখিত ফিরে পেল বাহু দু-টি। মা গঙ্গে, তুই বাহুদাকে বল বয়ে আসুক মগরায়। বাহুদানের প্রয়োজন নাই, ধনার বাহু দু-টি কেটে নিক। বিপাশাকেও বলিস। বশিষ্ঠ পুত্রশোকে স্বদেহ পাশবদ্ধ করে নদীতে নিমগ্ন হলে বিপাশাই তাকে পাশমুক্ত করে। ও রে মা, বিপাশাকে বল ওই পাশখানি নিয়ে মগরায় এসে পাশবদ্ধ করুক ধনাকে। ও আমার বারিতে পদাঘাত করেছে রে! ডাক দে মা সব নদনদী খালবিলে।

গঙ্গা-ডাকে আমোদর যাত্রা করে জয়পুরের দৈবসার বনানীর মধ্য দিয়ে রাঙা পথে। একেশ্বর দেউলের লিঙ্গখানি বক্র, রূপবান বাঁকুড়া রায় বঙ্কিম, আমোদরও তাই সর্পিলা। কোতুলপুর, কর্মকারপুকুর হয়ে মেশে তারাজুলি খালে। সেখান হতে কাঁটালি, রাধাবল্লভপুর, ঘোড়াদহ গড়িয়ে ঝুমঝুমি স্রোতে। তারপর দারুকেশ্বর ছুঁয়ে মগরার পথে দ্রুত ধায়। গঙ্গা আহানে খামারহাট পর্বত হতে অবতরণ করে দামুদর নদ। বন, শিলা প্রশ্ন করে, নদী যায় কোথা? দামুদর শোনায়ে দেবীনির্দেশ। সমতলের মতি ভিন্ন গতি পৃথক তাই পড়শিদের পরামর্শ পথের দু-পাশের ঝরা-ধারাদের সঙ্গে নিতে। দামুদর সম্মতিতে তরঙ্গ তোলে। নানা জলধারা মেশে দেওনদে। মুরীর পশ্চিমে উচ্ছ্বাসে সঙ্গ নেয় ভেরি। তারপর গোবাই, আয়ার, কোনার, বরাকর এমন কত-না মিলনক্ষেত্র। মধুকুণ্ডা, বুদবুদ, চাঁচাই, গড়চুমুক এমন কত-না জনপদ। চলে দারুকেশ্বর, গাঁ-গঞ্জের মানুষজন ডাকে ধলকিশোর। তার বর্ণটি ভূমিচম্পার মতো ধবল, চলন কিশোরের মতো প্রাণচঞ্চল। তার স্বরে দূর যাত্রার আহ্বাদ ও হর্ষ। সঙ্গী রোক নালা। হুড়ার কাছে কাঁড়া-কাল পাবড়া টিলা হতে দুধশুভ্র দুধভরিয়া এসে মেশে। তারপর একের-পর-এক জনপদ বেয়ে চলা—ডুমড়া, বালিয়া, নতুনগাঁও, দুমদা, চামকরা। ঘোড়দহে সাক্ষাৎ দামুদরের সঙ্গে। শিলা ভেদ করে উদ্গত হয় শিলাবতী। খোয়া-নুড়ি মুখে বন-প্রান্তর মধ্য দিয়ে কুলকুল বয়। কুলবাই-তমাল-পারং কত-না নদীসঙ্গ, খড়কুসমা-নাড়াজোল কত-না জনবসত। একসময় মগরাগামী দারুকেশ্বরের সঙ্গে দেখা। তিরতির প্রবাহিত হয় উষ্মস্রোতা চন্দ্রভাগাও। কোপাই এমনিতেই কোপবতী, তার ওপর তার তটে কঙ্কালী থান। ধনপতি পদে চণ্ডীবাসি ভূপাতিত শুনে সে ধায় মাতঙ্গী লয়ে। সঙ্গে চলে সাধনা-সঙ্গী দানাই। বগাড়ির খাল বগা বয় ঝিরিঝিরি। সঙ্গে যায় বগাদল। মগরার পথে যখন এত নদনদী ধায় তখন মীনও মিলবে অফুরান। জলদদলে চঞ্চু ঘষে সারস-শারি, ঘাই দেবে পক্ষ রোহিতে। মাড়তোলা হতে যাত্রা করে ক্ষীরাই, ময়না ছুঁয়ে কাঁসাইসঙ্গে চলে মগরা পথে। কাঁকি-মুণ্ডেশ্বরী শুঁড়ে-কালনা, বালিপুর, নতিবপুর, হরিশচক হয়ে বাকসায় এসে দেখে রূপনারায়ণও মগরাগামী। তখন নদ ও নদীতে বাক্যালাপ, প্রেমানুভূতি, পরকীয়া। সে-দৃশ্যে পথসাথি রত্নার কী রঙ্গ! এতগুলি নদনদী খাল-খানার মগরা যাত্রায় দু-কূলে মহোৎসব। ঘন তৃণতে হরিৎ চারিপাশ। ধবল ধেনু চারণে চরে প্রতুষ হতে গোধূলি। যাদব নন্দনেরা বটপত্রের শিরোপা পরে বেণু বাজায় কদম্বশাখে। মধ্যযামে কঙ্কণে নেতবস্ত্র জড়িয়ে কুলবধু নদীতটে চলে রাখালিয়া বংশী শুনে। কৃষিক্ষেত্রে বান ডাকে কচি কুমুড়া, পলাকড়া, শাক, বাগ্যান, খাম-আলু, বরবটি, আদার। বৃক্ষে বৃক্ষে শতশত কামরঙ্গ, করুণা, টাবা, কমলা।

কাঁদি কাঁদি চাঁপা, মর্তমান, নারিকল, গুয়া জলশ্রোতের দু-ধারে। শতাবরী, অর্জুন, চকলদা, রঙ্গন, মেছুদি বৃক্ষগুলি দিবারাত্র বাড়ে, গগনে চড়ে। গোপিনীরা কেলি করে নদীজলে। মৎস্যরাঙা, পানিকৌড়ি, ক্ষেমংকরী, সারস বসত গড়ে নদীতটে। বাঁহি, কুলি, করঞ্জা বৃক্ষ কোঁপে আসে ফলে। নব-নব খেয়াঘাট গড়ে পারানিয়া মাঝি। যে-সব কর্মহীন বালক গুরুগৃহে ‘শাকে রস রস বেদ’ করত তারা পুঁথি ফেলে মহানন্দে চলে রোহিত-কাতল-চিতল-চিঙ্গিড়া ধরতে।

ত্র্যম্বক পর্বতের জঠর হতে যাত্রারম্ভ করে গোদাবরী। ভদ্রাচলম্ ও রাজমহেন্দ্রী হয়ে খরতর লহরীতে চলে মগরা পথে। একদা লঙ্কারাজ রাবণ গোদাবরী কূলের পঞ্চবটী হতে হরণ করেছিল জানকীকে। এখনও গোদাবরী স্রোতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় জটায়ুর ‘জানকী’ ‘জানকী’ রোলারুলি। আজ অন্য এক বিলাপ মগরা নদীতে। চণ্ডীবারিতে পদাঘাত করে নরাধাম ধনপতি চলে লঙ্কায়। যত নদনদী জলশ্রোত সব কণ্ঠে একটিই ধ্বনি ‘মাতা’ ‘মাতা’। সব ধারা আজ মগরা যাত্রী। বিচক্ষু দামুদর নদ জামালপুর হতে উদগত হয়ে দশঘরা, তারকেশ্বর, বাহিরখণ্ড, দ্বারহাটা, শিয়াশালা, জাঙ্গিপুর, জগৎবল্লভপুর, নিজবালিয়া, বাসুদেবপুর হয়ে ফুলেশ্বরে গিয়ে দেখে ত্রিনয়না গঙ্গা যাত্রা করে মগরায়। চার চক্ষুর মিলনে হাস্য করে জগৎসংসার। বুড়া মন্তেশ্বর চলে ধীরলয়ে খালিজুলি সঙ্গে রঙ্গরসে। সাগরদেবতা বরুণের পত্নী বরুণাও চলে। তার দেখাদেখি যমুনাও যায় বাদুড়িয়া, স্বরূপনগর, গোবরডাঙা, গাইঘাটা, ইটিগুা পথে। অজয় চলে পাণ্ডবেশ্বর, নবগ্রাম, কেন্দুলি, কাটোয়া বেয়ে। সরস্বতী ধায় সপ্তগ্রাম, দেবানন্দপুর, চন্দননগর, নসিবপুর, জনাই, চণ্ডীতলা জনপদ ছুঁয়ে। যমুনা কণ্ঠে কৃষ্ণ-রাধিকার প্রেমকথা, সরযু স্বরে রাম-সীতার বিরহব্যথা, গোমতী ধ্বনিতে গো-ধনের ‘মাতা’ ‘মাতা’ মরমিয়া ডাক। মান্দারবনীর জঙ্গল হতে যাত্রা করে বিড়াই। কলসিডাঙা হতে ক্যালাঘাই চলে ভগবানপুর, নইপুর হয়ে। স্বর্ণরেখা হাঁটে শঙ্খনদী, সাপুলি নালা, সালদা নালা, রূপাই, কুলবেড়া, কারু আর শোভা সঙ্গে। চণ্ডী আদেশে চলে অকুল দরিয়া ব্রহ্মপুত্র। তার স্বরে কেশরী নিনাদ, মুদ্রায় গজ বিক্রম। কাছে আসে ঘন বরাক স্বর।

মহালদিরাম পার্বত্য বনভূমিতে ছিল মহলাদি, বাঁকা স্রোত। চণ্ডীর নির্দেশ তার কাছে পৌঁছোয় ঈষৎ বিলম্বে। সে অবতরণ করে, মেশে মহানদীতে। তারপর মহানন্দার দীর্ঘযাত্রা। মহিষমারির কাছে খাড়া অধোগমন। নাম পায় পাগলাঝোরা। চলতে চলতে পথসঙ্গী হয় যোগিখোলা, বালাসোন, ডাউক, পিতানু, মেচি, কালকই, নাগর। চলার পথে মহানদী স্থানে স্থানে গড়ে দেয় বিস্তীর্ণ দিয়াড়া। সেই চরে হঠাৎই কোনো এক নিশীথে জন্ম নেয় আকাশচুম্বী বৃক্ষশ্রেণী, বাস গড়ে শত

নাগ, জেগে ওঠে শিবলিঙ্গ, ধ্যানে মগ্ন থাকে মৌনী যোগী, গীত গায় ভ্রমরা, বাতি জ্বালে উলুক। দিয়াড়া বলে, দেবী আদেশে এই আঘনে গমন করছ করো, তবে পৌষপার্বণের আগে প্রত্যাগমন কোরো। মনে রেখো ২৯ শে পৌষ সংক্রান্তিকৃত্যং এবং মকরাদি স্নান।

দেবী আহ্বানে শেষ জলস্রোত কাংসাই নালা অবতরণ করে ঝাবর বন-পাহাড় হতে। আর এক স্রোত সাহারঝোর ঝরে অযোধ্যা পাহাড়ের গাত্র বেয়ে। পথে সাহারঝোর মিলিত হয় ঠাকুর চ্যাটানি প্রবাহে। বেগুনকোদরে কাংসাই যুক্ত হয় সাহারঝোর-ঠাকুর চ্যাটানির সমবেত ধারায়। নাম হয় কংসাবতী। বেগুনকোদর, বরাম, দেউলঘাটা জনপদ ছাড়ে কাঁসাই। দেবদেউল দেখে। পথে মিলন হয় গিরগিরি বান্দু সঙ্গে। প্রবাহিত হয় কাঁসাই। ভেদুয়া আর বারুনিয়ীর বউ-ঝিরা দু-কূলে আসে কলসে জল ভরতে। কিছু হর্ষ কিছু বিষাদ পারাপার হয় দু-গাঁয়ের ভেতর। চলে কংসাবতী। পথে দেখে একা এক কুমারী চলেছে গাঁ-গঞ্জের ভেতর দিয়ে। কংসাবতী ডরে-কাঁটা। কত দুষ্টখণ্ড বন-জঙ্গল-পথে, কে কী বিপদ ঘটায় কে জানে! অজস্র ঝরা, খাল, বিল, নদী হারায় পথ, হরণ করে দুষ্টমতি নর-দানব। কংসাবতী বলে, ‘ও মা, সঙ্গে চ। সঙ্গী থাকলে দূর দেশের পথও দু-ছিয়ে।’ সমবেত স্রোত পরেশনাথের দেউল, দেবী অম্বিকার দেহারা পেরায়। চলতে চলতে তারাফেনি, ভৈরববাঁকি আর রুপিনের সঙ্গে সহেলা। তারপর লালগড়, চাঁদরা, কেশমল হয়ে আঁকাবাঁকা সুদীর্ঘ প্রবাহপথ।

সব নদনদী, খালিজুলির মগরা মিলনে উৎফুল্ল মাকড়াচণ্ডী। ডিঙি বাজাতে বাজাতে সে আবির্ভূত হয় কেশরীযানে অম্বরে। তাকিয়ে দেখে ধবল ফেনায় মগরা আচ্ছাদিত। জলস্রোত গর্জায়, যেন রণমত্ত গজপতি। তরঙ্গ নৃত্য করে নাগ মুদ্রায়, পাক খায় চরকির বেগে। বৃক্ষকাণ্ড ভেসে চলে নদীজলে। পক্ষীকুল চড়ে তাল-নারিকল-গুয়ার বৃক্ষ শিরে। নাগ-নাগিনী দেউলে ওঠে। ধনপতির সপ্তডিঙা ভাসে অথই বারিতে। চারিপাশে মকর, কুন্তীর। রবিহীন দিন শেষ, শুরু হয় শশীহীন রাত্রি। গগনে নেই একটিও গ্রহ-তারা। মাথার ওপরে জলবর্ষী জলদমালা, নীচে উত্তাল জলরাশি।

## ২৮ ডুবুডুবু সপ্তডিঙা

দৈবজ্ঞ মতে যে চান্দ্রমাসে প্রায়শই মৃগশিরা বা তৎসম্মিহিত পূর্বাণর নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয় তাকে চান্দ্র মার্গশীর্ষ বলে। রবির বৃশ্চিক রাশি স্থিতিকালমধ্যে

সংঘটিত হয় বলে রবির বৃশ্চিক রাশি স্থিতিকাল সৌর মার্গশীর্ষ নামে অভিহিত। কোথা চন্দ্র কোথায় বা রবি! মার্গশীর্ষ সুদির এই দশমী রাত্রিতে একটিও গ্রহ-নক্ষত্র দৃশ্যমান নয় অনন্ত আকাশে। অহিভূষিত বৃদ্ধাকৃতিবিশিষ্ট তণ্ডুলাকার উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রখানির জন্য নির্দিষ্ট এই গগন। কিন্তু তার একটি রশ্মিকণাও নেই মহাছত্রের কোনো কোনোতেই। বিগত বাহান্তর প্রহর অম্বর কেবলই অম্বুবাহ। নিরন্তর বর্ষণ, অবিরাম গগনধারা, অনন্ত প্রবাহ। ধনপতির সপ্তডিঙা অতিক্রম করেছে মগরার পারাঘাটা চার প্রহর আগে কিন্তু পরবর্তী সেতুবন্ধ এখনও অধরা। কাণ্ডার বুটন হারিয়েছে পথ, খুইয়েছে কূল। মহিষ আঁধারে যে ক্ষণিকের বজ্রবাতি তাতে দেখে অবিশ্রাম মেঘবারি মেশে উত্তাল-নদী সংগমে। কূলবর্তী ভাগীরথী অজস্র নদ-নদী সমাগমে এ-নিশায় কূলহীন, অপার। সমুদ্রকান্তা নিজেই সাগর, সমুদ্রবল্লভা নিজেই বারিধি, সমুদ্রদয়িতা নিজেই মহাসিন্ধু। উত্তরভাদ্রপদের দ্যুতি নেই মহাকাশে কিন্তু তার ক্ষয় ও ক্ষত বিদ্যমান। তাই প্রকৃতি দুঃশীল ও নিষ্ঠুর। মেঘে ক্রোধ, বজ্রে কাঠিন্য, বায়ুতে নির্মমতা, জলধারায় ধ্বংস।

ধনপতি বিলাপ করে, ঐরি হয়েছে দেবরাজ তাই তার সহস্রাক্ষ বন্ধ ঘনঘমে। বাহান্তর প্রহরে একটিও তারকা জাগেনি আকাশে। ইন্দ্রজালে অন্তরিক্ষে অমানিশা। ইন্দ্রসারথি বায়ুর কোপে সপ্তডিঙার সহস্র বাতি নির্বাপিত। না দেখি তট, না বৃক্ষ। নৌপথ, নৌগর্ভ, নৌ-গবাক্ষ অদৃশ্য। তীরে চলো কাণ্ডার। ইন্দ্রাস্ত্র ক্ষণে ক্ষণে ঝলসায়। সে বাতিতে দেখি শিমুলি, শমী, মাকন্দ বৃক্ষ উড়ে চলে গগনপথে। গুয়া তাল নারিকলশ্রেণী ভাসে অম্বর-সাগরে, ঝম্প মারে হিরণ্য প্লবঙ্গ। বজ্রে বৃক্ষ পিঞ্জরখানি থরথর কাঁপে। মুক্ত হয় দ্বার, প্রাণপক্ষীটি বুঝি এই ওড়ে। কিন্তু পক্ষ মেলোও মুক্তি নেই বিহঙ্গের। উর্ধ্ব ও অধঃ দুই বারিধির মাঝে বায়ুস্তর বড়োই সংকীর্ণ, হ্রস্ব, ক্ষুদ্র। উর্ধ্ব জলে নিমজ্জিত সপ্তডিঙার ধ্বজাদণ্ড, নিম্নস্রোতে ডিঙার বাহির দরগা। কোথা যাবে প্রাণপক্ষী?

নদনদীর রঙ্গকৌতুকে রণ দামামা জলতলে। যেন সহস্র দামাল দন্তী ক্রীড়াচ্ছলে নিক্ষেপ-প্রক্ষেপ করে শত-সহস্র গজমতি। জলকূট ভাঙে-গড়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে। ভাসে-ডোবে নিযুত মোতিধবল জলবুদ্বুদ। নানা স্রোতের নানান তরঙ্গে এক প্রলয় ঘূর্ণন জলসংগমে। চক্রাকার আবর্তনে উৎপাটিত ভুঁই আমলা শেয়াকুল ঝোপ, কাজলি-কদলী বন, ধান্যকুট তাম্বুল বরজ। সপ্তডিঙা যেন কুমারের চাক, পাক খায় আপন আয়াসে। আহ্লাদে পান করে বারি। গাবরদল হাতড়ায় জলদ্রোণি। ডিঙা ঝলকে ঝলকে খায় জল, যেন মরুবাসী নিরশু চাতক। ডিঙা করে টলটল। কাণ্ডার দেখে দ্রোণিদল ভাসে নদী জলে। বিলাপ করে সদাগর। ডুবুডুবু ডিঙা আর জলসেচনী রাজহংসীর মতো লীলাগমন করে স্রোতে। এ-যে

এক অলোক দৃশ্য, অলীক সংঘঠন, অলুক গতিক। শজিনা পুষ্পের মতো জল-শিল বারে পড়ে জলদ্রোণির ওপর। চৌচির হয় দারুপাত্র, যেন কোনও বজ্রমুষ্টি ভাঙে ঘণ্টাকর্ণ পার্বণের মৃৎখল্লিকা। সে দৃশ্য অশনি আলোকে দেখে বুটনও। কাণ্ডার ভাবে যদি জলদ্রোণি যায় অবতলে তবে কেমনে উত্তলে ভাসবে পণবাহী সপ্তডিঙা?

নাইয়া-পাইক বলে, ‘হায় কী করে মুণ্ড বাঁচাই শিলার মতো শিল হতে! জলের গর্জন যেন কাঁড়ার ডাক, কেঁপে ওঠে কেরয়াল। সপ্তডিঙা চলে সাত মুখে। ঝড়ে দু-খান হয় তৃণ, আমরা বুঝি গগনে চড়ি। কর্ণ-ক্ষেপণি সবই আপন মর্জিতে ধায়, যেন চড়কের পাগলা শাল। ডিঙা পাশে ভাসে বিকট দর্শন মকর। মকরাবাসের জন্য সৃষ্টি হল সাগর, কিন্তু শত সহস্র মকর রঙ্গে রঙ্গে এসে পড়ে নদীজলে। মকরাবাস ক্ষেত্রটি হল মগরা। মকরদের নদীগমন কি সপ্তডিঙার নাইয়া-গাবরদের ভোজন করতে? কৃষ্ণসার হরিণের মতো মাথা আর দু-পা তুলে ‘ক্ষুধা ক্ষুধা’ ডাক দেয় মকরদল, মীনের মতো লেজ দিয়ে ঝাপটা মারে জলে। হায় রে, উজানি নগরে কামদাতা মকরন্দ পুষ্পে মধু জমে, মকরন্দ পক্ষী প্রতীক্ষা করে প্রভাতে ‘কুহু কুহু’ ডাক দেবে বলে আর মগরার নদীজলে মকরান্স রান্সসের মতো মকরদল ঘোরে! কুস্তীরগুলি যেন গিরিশুহা। শ্রীকালি, বারশিঙ্গা মৃগ, কৈদুয়া, কেশরী সবই তাদের উদরে বাসযোগ্য। গুহার মুখগুলি দেখি, বাকি দেহ জলতলে। না জানি কত বাঁও তাদের মাপ!’ এক নাইয়া ‘বাম্ফোই’ ‘বাম্ফোই’ বলে রোদন করে। বিলাপে, ‘কী কুক্ষণে বিভুঁয়ে এসে প্রাণ যায়! বিজুলি বাতিতে দেখি শত শত অহি ভাসে নদী জলে। মকর আর কুস্তীরের মধ্যপথে পদ্মগোখুরা, জলবোড়া আদি সহস্র ফণী ঝাঁকে ঝাঁকে ফেরে। জলমধ্যে না আছে নকুল, না কলাপী। তাই বড়ো রঙ্গ তাদের। এই নিশায় বুঝি ডিঙার সূচ্যাগ্র ছিদ্রপথে ঢুকে পড়ে নিশিলতা। হায় হায়, বেহুলা নাই আমার। হরিমতি না জানে তন্ত্র না মন্ত্র। কে ভাঙবে বিষের শতেক গাটুলি? কে ভাসবে কদলী মান্দাসে?’ আর এক গাবর শোকে শিরে হাত রাখে। বলে, ‘শুকুতার পদ পাক হবে উজানি নগরে কাল, পরশু, অনন্তকাল। পলাকড়া, বাগ্যান, কচু, খাম-আলু, বরবটি, কাঁচা কদলী, ফুলবড়িতে পাক হবে ব্যঞ্জন। আদা রস, হিঙ্গ, জিরা পড়বে। কচু তৈলে তেজপত্র, মেথি, জোহানি, মহরি, কালোজিরা, চক্ষি দেবে। শুধু হলদিগুঁড়া পড়বে না পদখানিতে। মগরায় সপ্তডিঙা অতলে গেলে হর্ষহীন হবে উজানি নগর, শুকুতার পাত হারাবে হলদিগুঁড়া। সমস্ত ব্যঞ্জন, সবাকার জীবন তখন বর্ণহীন।’ এক পাইক শীতে জড়সড়। কম্পিত স্বরে বলে, ‘ঝড়ে ওড়ে ডিঙার চাল। এবার বুঝি ডিঙাখানিও বুড়ে মগরানদীতে। আট মুখে বায়ু বয়, যেন সাধুডিঙা অষ্টখান করার মতি।

কুপিত এই পবন যেন মারুতি-মাতা অঞ্জনা যার গর্ভে মরুৎ অনুমতি বিনে স্থাপন করেছিল শিববীর্য। দেবের চেয়ে দেব্যাগুলি দিনে দিনে বেশী উগ্রা। অঞ্জনা স্তনদুগ্ধের বদলে কদলী দিল শিশু মারুতিকে। ওদিকে বিষহরি ঢুকল চম্পা নগরীর চন্দ সদাগরের পুত্র ও বধূমাতার বাসরে, বান্যার প্রধান মহাকুল বর্ধমানবাসী ধূস দত্ত বাগুলির শাপে দ্বাদশ বৎসর বন্দি। চণ্ডীবারিতে পদাঘাত করেছে সাধু ধনপতি, কি গতি সপ্তডিঙার কে জানে! আর কি চর্মচক্ষু দু-খানিতে দেখতে পাব নিজভূম, নিজ দারা, আপন পো! বড়ো মায়া জাগে মনে, বড়োই দুখ উথলে অন্তরে।' এক নাইয়া বলে, ওরে তোদের একটি মাগু, আমার দুটি। ওরে তোদের দুখ অর্ধ, আমার পূর্ণকুম্ভ। কালী যখন শুনবে তার ভাতার ডুবেছে মগরায়, তখন পিঁড়া পেতে কাঁদতে বসবে রে! যুবতী রমণীর পতিহারা হাহাকারে রোদন করবে বাঁশিনিবন, ছেলিদল, বৃক্ষবাসী ঘুঘু। ওরে কাঁদন জুড়বে পতিহারা গুরি। ওরে গুরির রোলারুলিতে অশ্রুপাত হবে আর্দ্রা নক্ষত্রে, বৃষ নয়নে, ভগ্ন রোদনহাটে। ওরে পতিহারা এক বধু গমন করবে মন্দার পর্বতে, অন্যটি ডুবে মরবে গঙ্গাসাগরে।

বিলাপ করে কুরঙ্গ সাধুসঙ্গে তার গতি হবে পাতালে। সেথা নিত্য অনন্তনাগের আশ্রয়লন। বড়ো সাধ ছিল লঙ্কায় জননী সীতার একদা আবাস অশোকবনে বিচরণ করবে। কোথায় সীতা কুটির আর কোথা পাতালবাসী দানা-দৈত্য! তুরঙ্গ প্রবোধ দিয়ে বলে, 'ধরাতল সাতখানি, প্রতিটি এক যোজনের। অতলে গেলে দেখা হবে ময়দানবের পুতটির সঙ্গে। সে সৃষ্টি করে মায়া। এ-তলেই যমের পাতালপুরী। যমের কাননেই নাহয় বিহার করিস, কুরঙ্গ। বিতলে হটকেশ্বর শিব, মিথুনীভূত ভবানী সঙ্গে। তৃণ পাবি কিনা কে জানে কিন্তু সংগীত বাদ্য শুনবি প্রমথদের গীতে। সুতল অবশ্য বাসস্থল হিসেবে মনোরম, ইন্দ্রের অমরাবতীর অধিক ঐশ্বর্যশালী। ওখানে বাস বলি রাজার। রাবণরাজ একবার এসেছিল কিন্তু দ্বারীরূপ বামনের পদাঘাতে পলায়ন করে।' বিমর্ষ প্লবঙ্গের দিকে ফিরে তুরঙ্গ বলে, 'সিংহলদেশে বামনরূপী বিষুং থাকলে কপিবরের বদনখানি কি অমন কৃষ্ণবর্ণ হত?' তুরঙ্গের বাচালতায় রুষ্ট প্লবঙ্গ বলে, 'সপ্তডিঙা অতলে গেলে তুই নিজে কার রথ টানবি মগ্নমনে ভাব। তলাতলে ত্রিপুরাধিপতি ও মায়াবী ময়দানব, মহাতলে কন্দুর সহস্র নাগ-সন্তান, আর রসাতলে নিবাতকবচ ও কালকেয়রা।' মাতঙ্গ বলে, 'কথিত আছে বিষুংর হস্তে নিহত হয় এরা। কেউ বলে ইন্দ্র সারথি ও সখা মাতলি রথে চড়ে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন এদের নিধন করে। তবে অত কোটির সবগুলির কি আর জলতলে দেখা মেলে? পঙ্কজবনে, মণিমতী নগরীর গৃহকোণে, বাস্তুহীন অভেদ্য কবচেও সঙ্গেপনে ছিল ক-জনা। সংসারটি

এখন মহীরাহ। ওহে তুরঙ্গ, সপ্তডিঙা নিমজ্জিত হলে অত দানবের রথ টানবে কেমন করে?’ শুক-শারি কাব্যমনা। মগরার মহাপ্রলয়েও তাই তারা হেঁয়ালি প্রবন্ধ রচে, ‘নীরেতে জনম তার নীর তার কায় / নীর দেখিলে পুনু হালেতে ডরায়, / আপুন্নি বিকাইয়া চারিপুরে চিস্তে হিত / হেঁয়ালি পক্ষীতে বলে বুজহ পণ্ডিত।’

বিলাপ করে এক নাইয়া বলে, বড়ো দুখি এই ভব-সংসার। কারো চক্ষু অন্ধ, কেউ বর্জিত দশন, কেউ ভোগে কোয়াস্বর-পাঁকুই-গোদ ব্যাধিতে। শোকে মুহা হয় মানবকুল আত্মীয় কুটুম্বের অকাল গতে। শোকতপ্ত বাতাস, শোকদগ্ধ মন। এই নোনা বায়ে সাধ ছিল সীতামাতার অশোককানন হতে একটি অশোক বৃক্ষচারা তুলে এনে ভ্রমরার দু-কূলকে শোকহীন করব। বেদনা মোচনের যাত্রায় হায় মগরায় শুনি সদাগরের বিলাপবচন, কাণ্ডারের আক্ষেপ, নাইয়াদের রোদন, গাবরদের রোলাফুলি, পশু-পক্ষীদের হা-হুতাশ। ওগো দেবী গঙ্গে, তুমি ধীর হও খানিক। অস্থির জললতাগুলির পায়ে বেড়ি দাও।

কাণ্ডার বুঢ়ন বলে, কী দৈব বিপাকে এমন দুঃসহ ঝড় কে জানে। জলতলে গর্জন করে শত কেশরী, জল উপরে নৃত্য করে নটরাজ, গগনে উড়ে চলে বৃক্ষ। বিজলি চমকায় যেন অনন্ত-বাসুকির ক্ষর জিহ্বা। ধনপতির পিতৃদেব সাধু জয়পতি যেবার দক্ষিণ পাটনে গিয়েছিল, তখন এই মগরা নদীখানি ছিল মৃত ময়াল। রাত্রাখানিতে গগনে ছিল পুষ্যা নক্ষত্র। অধিপতি চন্দ্র আর আকারটি গো-স্তনের। দুগ্ধধবল ছিল রাত্রাখানি। পুষ্যা পোষণ করছিল কীটপতঙ্গ হতে সপ্তডিঙার অতুল ঐশ্বর্য, বিপুল ধন। আজ ধনপতির যাত্রাপথে উদ্দাম বায়ু, উত্তাল তরঙ্গ, উগ্র বাজ, উতল ধারা। সহস্র জীবনের দায় নিয়ে আমি জলভাসি। হে ত্রিদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, প্রাণগুলিকে যেন সংসারে ফেরাতে পারি। ওগো ইন্দ্র, ভাস্বর, ভগীরথ, নাগরাজ সহায় হও। হে হিমালয়, ধারণ করো খানিক হিম যাতে নদনদীগুলি হয় ধীরগতি।

বিলাপ করে ধনপতি, বিক্রমকেশরীর চামর-চন্দন-শঙ্খের জন্য প্রাণ যায় নিশিপ্রলয়ে। যে রজনী রতিরঙ্গে খুল্লনা সনে কাটার কথা, তা হল কালরাত্রি। কালসর্প ঘোরে নদীজলে, কালানল হাসে ঈশানে, কালবাহন নাদে গগনে। মায়াজালে বন্দি হল শত শত জীব, সহস্র প্রাণ, সপ্তডিঙা। পশুপতি বিনে গতি নেই এই অভ্যকালে। ওহে সবে গীত গাও শংকরের।

মৃত্যু-শঙ্কিত নাইয়া-গাবরদল সোচ্চারে ডাকে ‘শিব-শিব’ ‘মহেশ-মহেশ’।

## ২৯ ছয় নিষ্পদের অতলযাত্রা

মগরার মহাস্রোতে আতঙ্কিত আর্ত ধনপতি জপে মহাদেব নাম। বন্দনা করে—  
হে রুদ্র, সর্ব, উগ্র, অশনি তোমাকে বন্দনা করি তোমার উগ্র রূপে। হে ভব,  
পশুপতি, ঈশান, মহাদেব তোমাকে ভজনা করি তোমার শাস্ত অবয়বে। এই  
অকাল দৈবপাকে তুমি সহায় হও হে ক্ষিতিমূর্তি সর্ব, জলমূর্তি ভব, অগ্নিমূর্তি রুদ্র,  
বায়ুমূর্তি উগ্র, আকাশমূর্তি ভীম, যজমানমূর্তি পশুপতি, সূর্যমূর্তি ঈশান, সোমমূর্তি  
মহাদেব। দেবাদিদেব পঞ্চমুখে স্তুতি করি তোমার পঞ্চ বদনের। সদ্যোজাতে তুমি  
ক্ষিতি, বামদেবে অশ্ব, অঘোরে তেজ, তৎপুরুষে মরুৎ, ঈশানে ব্যোম। ক্ষিতিরূপে  
তুমি কর্পূর-ইন্দুবর্ণ, সৌম্য, ত্রিনেত্র, মৃগ, অক্ষসূত্র, অভয়, বর; চারি বদন,  
মুকুটধারী। বামদেবে তুমি কুঙ্কমবর্ণ, চতুর্মুখ, ত্রিনেত্র, হস্তে বর, অভয়, অক্ষবলয়,  
কুঠার; হাস্যবদন। অঘোরে তুমি অষ্ট হস্ত, অক্ষমালা, মৃগ, পাশ, সৃগি, ডমরু,  
খট্‌গাঙ্গ, শূল, কর্পর; অঞ্জনবর্ণ, চতুর্মুখ, ভীমদংষ্ট্র, ভয়াবহ, ত্রিনেত্র। তৎপুরুষে চারি  
হস্ত, পরশু, মৃগ, বর, অভয়; ত্রিনেত্র, চতুর্মুখ, বিদ্যুদ্বর্ণ। ঈশানে চারি হস্ত, শক্তি,  
ডমরু, অভয়, বর; ত্রিনেত্র, শুক্লবর্ণ।

উত্তাল মগরা নদীর উতল-তরঙ্গ সরব হয় ‘শিব’ ধ্বনিতে। সহস্র নাইয়া-  
গাবরের সমবেত সংহিত স্বর ধ্বনিত হয় গগন জুড়ে। সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি  
জাগে জলতলে। ‘শিব’ নামে স্রোততরঙ্গে ভেসে ওঠে অযুত বাণলিঙ্গ। গঙ্গা,  
যমুনা, নর্মদার পুণ্যবারিজাত লিঙ্গগুলি সরব হয় মগরার স্রোত-সংঘে। ‘শংকর’  
স্মরণে চতুষ্পাদ ধর্ম জেগে ওঠে মসি-কালো নিশীথে। শত সহস্র বৃষভের  
‘মহেশ্বর’ রবে নাদিত হয় অদिति। ঝাঙ্কাবায়ু সে ধ্বনি বহন করে নিয়ে চলে  
দশদিগন্ত। ‘নীলকণ্ঠ’ স্মরণে অষ্টাশীতি সহস্র নিদ্রাতুর সিদ্ধ নয়ন মেলে জগৎ ও  
রবিমধ্য অশ্বর মাঝে। ‘ব্যোমকেশ’ স্মরণে চারণদল পাণিতে তোলে পিনাক-  
মৃদঙ্গ-মন্দিরা। নদনদীর উদ্দাম তাণ্ডব বিপরীতে সে এক হরমগ্ন সুরমাধুর্য।  
‘অম্বিকানাথ’ স্মরণে দু-করে বীণা তোলে কিন্নরদল। মগরায় দেবীর বজ্র  
নির্ঘোষের বিপরীতে মহাদেব-অনুচরদের সুর-ঝংকার। ‘জটধারী’ স্মরণে গগনে  
বিচরণ করে দীর্ঘ স্কন্ধ, স্ফীত-উদর, স্ফটিকবর্ণ, রক্তকেশ যক্ষদল। ধ্যান করে  
‘ত্রিপুরারি’ নাম। রাক্ষস-প্রমথ-গন্ধর্ব-অঙ্গরাদের সমবেত সুরবাদ্যে গগনে  
গজনাদ। অবিরত ভোলানাথ-ভালচন্দ্র-ভূতনাথ আবাহনে, নিরন্তর ত্রিপুরারি-  
কামারি-যোগধারী সম্ভাষে, নিরবকাশ দিগম্বর-কুলেশ্বর-যজ্ঞারি হাঁকারে দেবী চণ্ডীর  
কর্ণকুহরে কুলুপ। শত শিবাবতার, সহস্র নাইয়া-পাইক, অযুত সিদ্ধ-চারণ এবং  
কোটি নন্দি-ভৃঙ্গি অনুচরের সমবেত ‘শিব-শিব’ ধ্বনিতে দেবীর প্রাণ ওষ্ঠাগত।

নিদ্রাহীন মধ্যযামে দেবী বিলাপ করে, ওরে পদ্মাবতী, তুই ঘনঘুমে আর 'শিব-শিব' ধ্বনির হুংকারে আমি যে বধির হই মা। তোর বাহনগুলি অবধি মধুর স্বপন দেখে, আমার ললাটলিখনে অনিদ্রা, অনাসন, অশান্তি। একটি 'শিবা' ডাকে যেমন শত-সহস্র শিবা সবাক হয় তেমন ধনার সহস্র নাইয়া-গাবরের 'শিব' নামে অযুত-নিযুত শিবাচর বৃন্দগীত গায়। কী কুক্ষণে নদনদীগুলিকে ডাকলাম মা! নামগান যে এমন কর্ণবিদারক হয়, জননী-জনকের কালে শুনিনি। ধনা শিবসেবক, তাই শিবাচরগুলির এত রঙ, এমন রঙ্গ। নিত্যদিন সাধু শুদ্ধমতিতে পশুপতির পূজা করে, তাই তার 'শিব' ডাকে এত স্বরাগম। এখন সাধুর সপ্তডিঙা যদি মগরার নদীজলে ডোবে, তাহলে সিদ্ধ-চারণ নন্দি-ভৃঙ্গিগুলি তাণ্ডব শুরু করবে মা। আর শিল-বৃষ্টি-বজ্রে যদি সাধু মরে, দূর হবে আমারও মানন। শুনেছি শংকর স্থানে, দেবগণ বিদ্যমানে, আগে ধনপতির গণন। আবার যে-জন হরকে পূজে তাকে বড়ো ডর রে আমার। শিবসেবককে বধ করা ব্রহ্মা নিধনের তুল্য। আমার এ-কূল ও-কূল দুটিই হারায়। আমি মধ্য দরিয়ায় মৃৎপ্রদীপের মতো ভাসি, অকূলপাথারে শিলাপট্টের মতো ডুবি। ধনাকে নিধন করলে কুপিত হবে মহেশ্বর, সাধুকে নিষ্কৃতি দিলে লাঞ্ছনার বিচার পাবে না লহনা-খুল্লনা-চণ্ডী। ওরে পদ্মাবতী, বল মা কী পথ আমার! লখিন্দরকে কালিনাগের চোট করে তুই বাগে আনলি চান্দ সদাগরকে। আমার না আছে নাগনাগিনি, ধনার না আছে পুত। বল মা কী উপায় আমার? যদি পূজা না মেলে, এই নিশিজাগরণে কী লাভ! আমি বরং নদনদীগণে বলি যে-যার আদি পথে ফিরে যাক। সপ্তডিঙা ভেসে চলুক সহস্র কেরয়াল ধ্বনিতে। মেঘদল ভেসে যাক ভিন আকাশে। ধনপতি ধনধ্বজা উড়িয়ে চলুক লঙ্কাদেশে। কদলীবনে ফিরুক কপিবর। রাক্ষসরাজ রাবণের নিধন দেখেছিল হনুমান, এবার বান্যরাজ ধনপতির বিক্রম দেখুক। সীতাহারক রাবণের দশ আনন হয় ভুলুষ্ঠিত আর চণ্ডীবারি পদাঘাতী ধনা নদী-সাগর দাপিয়ে বাণিজ্যে চলে। ও পদ্মাবতী, লঙ্কা হতে লক্ষপতি হয়ে যদি ধনপতি উজানি ফেরে, আমায় তুই মান্দাসে তুলে দিস মা। আমি লঙ্কা যাব, আমি দ্বীপান্তরী হব।

চণ্ডীর বচন শুনে পদ্মাসনা, সর্পময়ী, কাঞ্চনবর্ণা পদ্মাবতী উঠে বসে। বিষহরীকে মধ্যযামে জাগ্রত দেখে দাঁড়ায় তক্ষক, বাসুকি ও কামগ। তাদের মন্তকের মণি হতে উজ্জ্বল নীলাভ আলো বিচ্ছুরিত হয়। সেই রশ্মিতে নিদ্রা ভাঙে পঞ্চনাগের। পূর্বে ফণ তোলে কন্মাষ গ্রীব, পশ্চিমে পদাকু, উত্তরে স্বজ, দক্ষিণে তিরশিচরাজি এবং উর্ধ্বে শ্বিত্র। পদ্মাবতী বলে, মা ভগবতী, স্থির হও। প্রশমিত করো মনোবেদনা, নির্বাপিত কর হৃদয়ানল। তুমি যদি উতলা হও শিবানুচর আর শিবসাধকদের 'শিব' ডাকে, তাহলে মধুমাসের মৃদুমন্দ বায়ুতে যে আন্দোলিত হবে

পর্বতরাজ হিমালয়। নদনদীর উদ্দাম স্বর, বায়ুর তীব্র কোপ আর শিবানুরাগীদের ‘শিব’ নাম মিলে মধ্যনিশির যে মহারোল—এটিই সাধু শাসনের সন্ধিক্ষণ মা। যত উন্মাদ, উত্তরোল, নিনাদ, সংস্বেব, কলরব, জয়ধ্বনি ততই শুভকারী। শাস্ত্রগতি বিচার করে কার্যনীতি ঠিক করো। যত শৃঙ্খলা ততই শৃঙ্খল মা। নিদে অচেতন এই ত্রিপ্রহর নিশিতে তুমি যদি জলাধিপে অর্পণ কর ডিঙাগুলি, ত্রিভুবনে কেউ অবগত হবে না সেই কর্ম। নতুন প্রভাতখানি হবে আবার নির্মেঘ, নির্মল, কিরণময়। উজবনিতে সপ্তডিঙা নিমজ্জনের সন্দেশ যখন পৌঁছোবে ততদিনে সূর্যের অন্য অয়ন, চন্দ্রের ভিন্ন কলা।

পদ্মাবতীর সুবচনে খানিক সুস্থির দেবী চণ্ডী। কিন্তু তবু খানিক সংশয়, কিছু সংকোচ। সপ্তডিঙা ডুবে গেলে পূজা মিলবে কী উপায়ে? ধনপতি কর-যুগলের পুষ্পজল চণ্ডী শিরে অর্পিত হবে কেমনে? আর সপ্তডিঙার সহস্র নাইয়া গাবরই-বা কেন ক্লেশ পাবে ধনপতির কারণে? চণ্ডী বলে, ‘ও মা পদ্মাবতী, তোর বচনে বড়ো সন্তোষ হল মনে কিন্তু হর্ষ মিলল না। সাধুর প্রাণ গেলে কী করে আমার প্রতিষ্ঠা হবে মা? আর সুশীল-নিষ্পাপ-নিরীহ নাইয়া-গাবরগুলিকে মেরে যে পাপবন্ধ পাতকী হব?’ পদ্মাবতী বলে, তুমি অরণ্যবাসী মা, যেখানে সর্বজন ঈর্ষাহীন, যেখানে বৃক্ষরাজি সুস্বাদু ফলে ফলবতী, যেক্ষেত্র সুবাসিত মৃগনাভির সৌরভে। তোমাকে সহস্র প্রাণের হস্তা হতে বলতে পারি? আমি কি এতই অবিবেচক, বিমূঢ়মতি, কদাচারী! তুমি মঙ্গলময়ী, তুমি বিঘ্নহারিণী, তুমি ললিতকাস্তা, তুমি শারদ আননা, তুমি শ্বেতচম্পকবর্ণা— তুমি কেন হবে প্রাণহস্তা? প্রজাপতি যেমন আপনি পালক হয়েছিল শ্রীদাম, সুদাম আদি গোপ-বালকদের তেমন তুমি ছয় ডিঙার নাইয়া-গাবর ও কুরঙ্গ-তুরঙ্গ-প্লবঙ্গ-মাতঙ্গের সহায় হও। তাদের স্থান দাও গগনে। দ্বাদশ বৎসর যেন তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা না থাকে। ওই সব প্রাণীকুলের প্রহর-দিন-পক্ষ বোধ লোপ করো মা। দ্বাদশ বৎসর পরে যেন ভাবে এক নিশা গেল ঘন ঘুমে, সুখনিদ্রায়। ছয় ডিঙা যাক জলতলে। হংসডিম্ব প্রায় দুর্গাবর ভাসুক অথই অতল জলে। ধনপতি যাক নোনাবায়ে। বাকি কর্ম শীতলচিন্তে পরে নির্ধারণ হবে, মা।

পরম প্রফুল্লচিন্তে বরুণকে ডাক দেয় চণ্ডী। সে আহ্বান পৌঁছায় রাজধানী বিভাবরী পুরীতে। সুবর্ণরথে চড়ে মেঘপাশ হাতে উদয় হয় অদিতিপুত্র। সহস্রনয়ন সিদ্ধপতি, শত নবজলধরে ঢেকে ফেলে অম্বর। যেন সপ্তসাগর আলম্বিত গগনে। জলদ্ সংঘাতে অশনি চমকায়। অগ্নিজাল গগন ছায়। গুরু গুরু গর্জায় জলধর। ব্যাঙ-তড়কা বাজ পড়ে। দাউ দাউ দন্ধ হয় নদীতীরের দেবদারু বৃক্ষ। অবিরাম স্রোত বয় আকাশপট হতে। ক্ষীণকটি, ফুন্নাধর জলপরী দেখে অসময়ে

ভরাকোটাল মগরায়। সে উঠে বসে নদীবক্ষে। এমন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ তটিনীতে আহ্লাদ মেলে না জলক্ৰীড়ায়। এ-খারা কুপিত, রুষ্ট, রাগাক্ত। এ-স্রোত প্রলয়ী, বিলয়ী, বিনাশী। সপ্তডিঙা ডুবুডুবু সে জলহিল্লোলে। ঝড় বয় সর্বগ্রাসী, কালান্তক, সৃষ্টিনাশী। নাটশালা যেন মৃৎপ্রদীপ, এই বুঝি বাতি নেভে। যে তরীতে এত রঙ্গ-কৌতুক, নানান গীত-বাদ্য তার স্বরে এখন শুধুই বিষাদকথা, বিয়োগব্যথা। টাল খায় নাটশালা, পাকচক্রে ঘোরে। পান করে জল প্রতিশ্বাসে। সে যেন চৈত্রের চাতক, মরু পথিক, নিদাঘার্ত মেদিনী, আকণ্ঠ তৃষণ তার। গণ্ডুষে শুষে নেবে সব সরসী, তটিনী, পাথার। নাকাল জলদ্রোণি। জলে ডোবে বাঁক, বরাস, ডালি, ভিতর দরগা, সমগ্র নাও। ক্ষেপণি ভাঙে। নিষগ্ন দণ্ড খসে। কাছি হেঁড়ে। নৌধ্বজা ভাসে স্রোতে। হঠাৎই অদৃশ্য হয় যত নাইয়া-গাবর। শূন্য নাটশালা, নৃত্যরতা দারু-নারী চলে জলতলে। জলতরঙ্গে অসংখ্য নাচনমুদ্রা। বাদ্যের আলাপ, বিস্তার, তান। সে সুরে সেতুবন্ধের হ্লাদিত জলপরি চলে জলতলে। দেউলে যেমন বিগ্রহ, দেউড়িতে সাঁঝের দেউটি, শ্মশানবেদিতে তুলসীবৃক্ষ, তেমন নাট-বুহিতের একজন কুশীলব লাগে। জলপরি যায় জলতলের নাটশালায় বাস গড়তে। গুয়াবৃক্ষে অপেক্ষমাণ কপিবর সে দৃশ্য দেখে। নব জলধরে ডিঙাগুলিকে পর্যুদস্ত দেখে পবননন্দন ঝম্প দিয়ে নামে গুয়ারেখির ছইচালে। তারপর করজোড়ে অষ্টোত্তর শত রামনাম। কিন্তু ক্রোধ ও ক্রৌর্ষের পুত কলির কালে দেবনামেও নানা বাধা, বিপত্তি, বিবাদ, বিসংবাদ। নদীর উত্তাল তরঙ্গে নাকাল গুয়ারেখির শত-সহস্র কাঠা গুয়া সবাক হয় ডিঙাগর্ভে। সে ধ্বনিতে মনে হয় গিরিরাজ বুঝি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গড়িয়ে চলে সাগর সংগমে। দেবীর আরতিতে মগ্ন মারুতির কর্ণে প্রবেশ করে না নিজ 'চণ্ডী চণ্ডী' স্তুতিবাণী। হাতে তাম্বুলখানি পেয়ে বোঝে দেবী তুষ্ট। তখনই গদাপদে আঘাত করে গুয়ারেখির নিষগ্ন দণ্ড, ছইগুহে। তরঙ্গমালা প্রবেশ করে নিষ্পদ যানে। ভেঙে পড়ে নৌদণ্ড। টুবুটুবু নাও ডুবে যায় মারুতির শেষ ঝম্পে। অযুত-নিযুত গুয়া জলবুদ্বদের মতো ভেসে ওঠে নদী জলে। বিজুলি ঝলকে মারুতি দেখে জল ঘূর্ণনে গুয়া সঙ্গে জলতলে চলে দেবীদত্ত তাম্বুল। হাহাকার করে ওঠে হনুমান বীর। প্রবোধ দেয় পবনপিতা, গুয়া সঙ্গে তাম্বুলের গতি তো জাগতিক বিধি, কুলঙ্কর। বিধিতে মানপত্রখানি হারানোর বেদনা কাটে না, বাড়ে। জ্বলে ক্রোধানল। পবনপুত্র ব্যাঙতড়কা ঝম্প মারে ছোটোমুঠির মুড়ৈলায়। যুগপৎ উর্ধ্ব ও অধো জলে নাকাল নাও গহন আঁধারে চলে অতলে। বাহান্ন পাউটি ধান্যপঞ্চক—শালি, ব্রীজি, শূক, শিম্বি, ক্ষুদ্র—নিমজ্জিত হয় নদীগর্ভে। বৃক্ষকোটরবাসী উলুক অন্নের রক্ষক। ভোজ্য, পেয়, চুষ্য, লেহ্য, খাদ্য, চর্বণ, নিষ্পেয়, ভক্ষ্য—এই অষ্টবিধ অন্নের অপচয়ে সে হয় সবাক। মঙ্গলচণ্ডী উদ্দেশে

বলে, ‘এই ধরনীতে তোমার ধ্যান ও পূজা যখন প্রতিষ্ঠা পাবে দিনটিকে নিরন্ন কোরো হে দেবী। আর কপিবরকে করো কদলীভোজী। মনে রেখো, নিরর্থক অন্নক্ষয় অবিধেয়। অন্ন ব্রহ্ম, অন্ন বিষ্ণু। অন্ন সিদ্ধশক্তি, ভিক্ষা দাও মাতাম্পূর্ণেশ্বরী।’ গগনে নেই চন্দ্র ও তার সপ্তবিংশতি কন্যা, চন্দ্রপালও তাই কিরণহীন। ডিঙার যে চন্দ্রশালায় দাঁড়িয়ে আকাশকুসুম চয়নে চিত্তাকুল থাকত রসিক ও ভাবুক মন, সেখানে এখন দণ্ডায়মান দণ্ডধারী পবনপুত্র হনু। শশীহীন মসীঘন অম্বরখানি দেখে তার বড়োই আহ্লাদ। চন্দ্রাহত জীবনে নানান মনোবিকার, বায়ুকোপ। হঠাৎই পবনপুত্র দেখে এক তীব্র বজ্রবিভা গগনে। বজ্রমণিখানি সংগ্রহ করে শঙ্খচূড়ে নিক্ষেপ করে সে। বেদ অপহরণকারী শঙ্খচূড় দৈত্যকে হনন করেছিল মীনাবতার বিষ্ণু, চণ্ডীলাঙ্ক ধনপতির শঙ্খচূড় ডিঙাখানি অগ্নিকে অর্পণ করে কপিবর। বায়ুবাহিত হয়ে অগ্নি গ্রাস করে চন্দ্রপালও।

ধনপতি দেখে অনলের লেলিহান রসনায় দুই ডিঙা বহ্নিকুণ্ড। তারই গগনচুম্বী শিখায় জলদশালা শুষ্ক, বারিহীন। নির্ভার আচ্ছাদনীর মতো ভেসে থাকে আকাশ-তটে। নীচে শত-শত নেত্রধ্বজ জ্বলে যেন সর্পি-সিঞ্চিত অগ্নিশলাকা। বায়ুপ্রবাহে ধ্বজ নড়ে এবং শত-সহস্র ধূমকেতন ওড়ে মগরার আদিগন্ত স্রোতে। আতঙ্কে জলতলে চলে মীন, মকর, কূর্মদল। ধ্বজবহ্নি স্পর্শ করে বাদাম-দণ্ড। মূল্যধার চক্রের নাগ স্বয়ম্ভুলিঙ্গের বেষ্টন খুলে যেভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় সংসার পথে সাধকের যোগসাধনায়, তেমনই অগ্নিশিখা শ্লথপদে আরোহণ করে দারুদণ্ড। হৈমন্তী নিশি দীর্ঘ তাই তার নেই কোনো সত্ত্বরতা। সে গজের মতো ধীরগামী, বসন্তবায়ের মতো মধুর, বিয়দগঙ্গার মতো মন্দগামিনী। কিন্তু লক্ষ্যে সে স্থির, অসংশয়, অমোঘ। তাই অগ্নি-কুণ্ডলিনী ধীরে ধীরে গ্রাস করে দুই নিষ্পদের বাদামদণ্ড। বিগত বর্ষাণের সব বারি বাষ্প হয়ে উবে যায় দারু বহ্নিতে। সুদূরবিস্তারী আকাশস্পর্শী বাদাম এখন ধূনার মতো অগ্নিপ্রিয়, কর্পূরের মতো অনল-বৎসল, সর্পির মতো পাবকবান্ধব। দুই অগ্নিশিখা ছোঁয় উত্তর ও দক্ষিণ বাদাম। যেন দুই সিন্দূর রাঙা দেয়া ভেসে আসে গগনতটে। তারপর ব্যাপ্ত হয় সারা আকাশ। বাদামবহ্নিতে মগরার নদীজল অলঙ্কৃত, জললতা শৃঙ্গার। পাতালবাসী অনন্ত, বাসুকি, শঙ্খ, কুলিক, শ্বেত প্রমুখ যত নাগ বিলাপ করে কি না-জানি কোন সাধুর ললাট জ্বলে এই আঘন নিশীথে। অগ্নি গ্রাস করে একে-একে শঙ্খচূড়-চন্দ্রপালের কর্ণ, নিষপ্প দণ্ড, ছইঘর, ভিতর দরগা। সুদূর বৃক্ষশাখের উল্লুক দেখে ছইঘরের হেম আচ্ছাদনগুলিও গলে ঝরে পড়ে নদীজলে। গগন ছোঁয় অগ্নি স্ফুলিঙ্গ, যেন দুই জতুগৃহ জ্বলে। অন্তরিক্ষবাসী অষ্ট দিগ্গজ— পূর্বের ইরাবত, পশ্চিমের অঞ্জন, উত্তরের সার্বভৌম, দক্ষিণের বামন, ঈশানের সুপ্রতীক, অগ্নির

পুণ্ডরীক, নৈঋতের কুমুদ, বায়ুর পুষ্পদন্ত— চক্ষু মোদে এই অকাল অগ্নিদাহে।  
অষ্টগজের আট পত্নী অশ্রু, তাম্রকর্ণী, অঙ্গনা, পিঙ্গলা, অঞ্জনাবতী, কপিলা,  
অনুপমা ও শুভদস্তা সমবেত বৃহনে একটিই বাক উচ্চারণ করে পরম অসূয়ায়—  
নামে চণ্ডী, কর্মে চণ্ডা।

ধনপতি দেখে অগ্নিরোষে দাহ হয় দুই ডিঙা। জলদর্পী দুই যান রূপান্তরিত হয়  
ভস্মে। যে শঙ্খচূড়-চন্দ্রপালের যাত্রা পথে দু-কূলে প্রতীক্ষা করত নানা জনপদের  
উৎসুক নগরিয়া, তা ধূম হয়ে গগনে চড়ে। ধন পোড়ে, প্রাণ ঝরে। আত-আতঙ্কিত  
ধনপতি দেখে সপ্তডিঙার দুটি ভাসে জলে। বাকি পাঁচের তিনখানি জলতলে, দুটি  
প্রজ্জ্বলিত জল ওপরে। এ-দুই ডিঙায় কী লাভ লক্ষা পাটনে, কী ইষ্ট উজানি  
গমনে? এতগুলি নাইয়া-গাবরে নদীগর্ভে শয়ানে রেখে কী হবে প্রত্যাবর্তনে?  
কেমন করে ধারণ করবে অত আত্মজনের নয়নবারি! প্রবোধ দেবে কোন বাক্যে,  
কোন বাচ্যে, কোনই-বা ভাষ্যে? সেতুবন্ধে পিতৃহারা শত শত শিশু সন্তানে কেমন  
করে ফিরিয়ে দেবে উষ্ম বাহু, কোমল ক্রোড়? পতিহারা সতীদের সীমন্ত-সিন্দূর  
অক্ষয় করবে কী উপায়ে? তার চেয়ে শ্রেয় উজানির সমবেত বৈধব্যে দুই  
বাইন্যানির সহশোক, তাপ, বিলাপ, অশ্রু বিসর্জন। সদাগর-শিশুও হোক পিতৃহারা,  
মাতৃগর্ভে।

ভগ্নহৃদয় অনন্যগতি ধনপতি ‘শিব’ স্মরণে চলে জলতলে। মধুকর-দুর্গাবরে  
সে-দৃশ্যে আতঁরব, হাহতাশ, অনুতাপ। নাইয়া-গাবরদল কেরয়াল ছেড়ে ডিঙা  
কর্ণে। চকিতে বুচন মগরার জলে। উত্তাল স্রোত ভাঙে দুই বারি-বান্ধব হস্ত -পদে।  
সোচ্চারে বলে, ‘দেহটারে ভাসিয়ে রেখে ছোটোসাধু, আমি তোমায় গেহ-গারিতে  
ফেরাব।’ নাইয়া-গাবরদল সমবেতে বলে, ‘সাধু জাগো, সাধু জাগো।’ সাধু-শির  
ভাসে জলে কিন্তু কাণ্ডারহীন মধুকর ঘোরে জলঘূর্ণিতে। যেন চড়কের চকরি পাক  
খায় শিবশালে। ছিন্ন হয় বাদাম, খণ্ড হয় নিষল দণ্ড, শূন্যে চলে ডিঙা কর্ণ।  
পাতাল-গহুরে জানকীর মতো নীরবে যাত্রা করে মধুকর। যেন অধবাসী চার গজ  
বিরূপাক্ষ, মহাপদাম্ব, সৌমেনস আর ভদ্রা কদলীপত্রের মতো ডিঙাখানি টেনে  
নেয় কাছে। বৃষ্টি প্রবোধ দেয়, সপ্ততল পাতাল স্বর্গের চেয়েও ধনাঢ্য, সুখপ্রদ,  
বৈভবী। সূর্যহীন, দিনরাত্রহীন এই পুরী কিন্তু অনন্তমণিতে সদা দীপ্ত। কালহীনও  
হে, তাই অবিনশ্বর।

চণ্ডী কৃপায় ধনপতির উৎপ্লাবিত স্থানখানি অগভীর, নদীজল নিরুত্তাল। কাণ্ডার  
বুচন এসে ধরে হাত। শ্বাস নেয় ঘন। যুবা সাধু জলতলে গেলে কাণ্ডার ভ্রমরার  
সেতুবন্ধে ফিরবে কেমন করে? কী জবাব দেবে উর্ধ্ববাসী সাধু জয়পতি দন্তকে?  
ধনপতি সঙ্গে কাণ্ডার ফেরে সাধু-ডিঙা দুর্গাবরে। শোনায় নানান প্রবোধ, নানা

উপদেশ। সাধু সঙ্গে এবার এক ডিঙায় যাত্রা কাণ্ডারের। এ-কামনা দেবাদিদেবের।  
এবার নির্ভয়। সবকটি প্রাণ এবার এক রশিতে এক গাঠ্যারে বাঁধা।

নির্বাক হয় বজ্র। গৃহে ফেরে জলদ। তরল হয় নিশিডাক। শয়ানে চলে  
মৎসভোজী শ্রীকালিদল।

### ৩০ একা ভাসে দুর্গাবর

প্রলয়নিশি গতে গগনতটখানি নির্মল, নির্ভার। পুবাঙ্গনে জবাকুসুমের আভা। তার  
ছোঁয়া ভারদ্বাজি শাখে, বাকসনা ফুলে, কনকতলায়, চুচুড়া তৃণে। সবাক হয় গৃহী  
চড়াই পক্ষী। কণ্ঠখানি চূড়ায় তুলে দুর্যোগের বৃত্তান্ত শোনায়। একখানি বরাহবর্ণ  
বারিদ দর্শন দিল অগ্নি কোণে। তারপর একে একে ঈশান, নৈঋত, বায়ু দিক  
হতেও মেঘযান এল বাদাম তুলে। সঙ্ক্যামণিপুষ্প দল মেলার আগেই দামাল  
বায়ুর দাপাদপি আর বাজের গগনজোড়া অংশুমালা। শঙ্খের তৃতীয় ধ্বনিতে বর্ষণ  
নামল। এমন জলসত্র ইহজীবনে দেখিনি। খড়ের ত্রিস্তর ঘন আচ্ছাদন দেখে  
গৃহস্থশ্রম গড়লুম হালির শ্রীমন্ত সংসারে। হায়, নিশান্তে আচ্ছাদনটি নদীর তীরে।  
আমি গৃহহারা নই কিন্তু স্বজনচ্যুত। বিলাপ করে বর্বরীও। বাসাখানি তালবৃক্ষে  
মৃদুমন্দ বায়ুতে দুলছিল দিনান্তে। যেন শ্যাম-রাইয়ের ঝুলনায় দোলা দিচ্ছে  
যমুনাকুলের গোপিনীরা। তারপর চিকুর-কাল বাদল জমল গগন গাঙে। বড়োই  
রাশভারী সে জলবাহী বায়ু, যেন মহিষাসুর। তারই শৃঙ্গাঘাতে চৌচির হল আঘন  
আকাশ, নিভে গেল যত গ্রহ-তারা, অকূল হল পাথার-সংগম। আর আমার  
তমালশাখের সাধের সুচারু নীড়খানি ছিঁড়ে বায়ুস্ফেচে চেঙমুড়ি বৃক্ষে। বর্বরী বিলাপ  
করে তমলুক বাসিন্দা তমালিকা এখন চেঙমুড়ু বৃক্ষবাসী চেঙমুড়ী। কই যুগলের  
ভিন্ন বিলাপ খাজুরি বৃক্ষশিরে। মগরা নগরখানি জল থই থই, মগরা নদীটি  
কূলহারা। নিশিবিহারে বেরিয়েছিল তারা। গগনধারা আঘনে বিরল। তাই একটু  
জলকেলি জরট, রুই, খরসুলা, কমট সঙ্গে। নৃত্যে মেতেছিল গঙ্গাবাহনা শত-সহস্র  
মকরও। মনে হয় যেন একপাল কৃষ্ণসার চলেছে তৃণভূমির পথে। তাদের সঙ্গে  
নৃত্য-গীত অস্তে মাণ্ড-ভাতারে রোহণ করলুম খাজুরি বৃক্ষে। আচম্বিত মহাপ্রলয়ের  
মহাপ্রস্থান। উপস্থিত শিউলির রসভাণ্ডে বাস আর ফেরতযাত্রার জন্য বর্ষণের  
প্রতীক্ষা। দধিকরের বদনটি নিত্যদিন সুপ্রসন্ন কিন্তু আজ ঈষৎ বিষম। বিগত যামের  
শীতল বায়ুতে দধিতে বড়োই দ্রবীভাব। দধিকালি করে দেখে দধিখ ফলের চেয়েও  
দধির দাম পাবে কম। দধিখ বৃক্ষবাসী কপিদল পশ্চাৎ পদযুগল তুলে আশীর্বাদ-

সহ দধিকরে আশ্বাস দেয় একটি ফলও নগরবাসী পাবে না অষ্টপ্রহর। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের জন্য সীতামাতার দেওয়া অশোকবনের মাকন্দগুলির মতো কপিথগুলিও তারা বুকে ধরে রাখবে। নিঃশঙ্ক হয় দধিকর কিন্তু ধনপতি ও তার শত নাইয়া-গাবরের কী আশ্বাস!

একা ভাসে দুর্গাবর ভাগীরথীর উদার বিস্তারে। ধনপতি সদাগরের যে সপ্তডিঙার এক প্রান্তে বর্ষণ হলে অন্য অস্ত্রে হাসত রবি, তা এখন একা, বান্ধবহীন। বিলাপ করে তটবাসী কঙ্ক—সপ্তশিখা অগ্নির কালী-করালী-মনোজবা-সুলোহিতা-সধূস্রবর্ণা-উগ্রা নির্বাপিত, একা জ্বলে প্রদীপ্তা নিস্তেজ, নিঃসঙ্গ। নিশিভাগর উলূক নিত্যদিন শয়ানে যায় দিনমণির জাগরণে। ষড়ডিঙার নিরুদ্দেশযাত্রার নীরব দর্শক উলূকের আঁখিপল্লবে নিদ্রার কণাটুকুও নেই, কেবল বিষাদ। নিঃসহায় দুর্গাবরকে দেখে অনুভব হয় সপ্তপর্ণীর ষড়পর্ণ বৃন্তচ্যুত। ধু ধু রুক্ষ রোহিত প্রান্তরে জেগে থাকে একপর্ণ এক সপ্তচ্ছদ। উলূকের নির্বাক বেদনা ধ্বনিত হয় বনকপোতের স্বরে। বিষাদী মকরাদল। সপ্তডিঙা যেন লবণ, সর্পি, ইক্ষু, সুরা, দধি, দুগ্ধ ও জল সমুদ্রবেষ্টিত সপ্তদ্বীপ। হায়, জম্বু, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ ও শাক নিমজ্জিত হল অতলে। জেগে থাকে একা জলবেষ্টিত পুষ্কর, জলভাসী দুর্গাবর। আতঙ্কিত কূটবাসী উত্তরাবায়ু। সদাগরের বহুতল সাগর-ডিঙা বিতলে গেলে সপ্তকুলাচলের কীই-বা স্থিতি-নিশ্চয়তা! তবে কি কোনো এক নিশি-আঁধারে এমনই নিরুদ্দেশ হতে পারে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্যাদ্রি, শুক্তিমান, হেমকূট, বিষ্ণ্য, পারিয়াত্রের কোনো ছয় কূট? তখন কোথায় বাস গড়বে হিম, কোথায় ধ্যান-জপ করবে ঋষিকুল, কোথায় দাঁড়াবে গগনবিলাসী দারু, কোথায় প্রস্ফুটিত হবে সহস্র গুলদার গুম্ম, কোথায় হবে জগতের জলসত্র, কোনপথে প্রবাহিত হবে গঙ্গা, গোদাবরী, কাবেরী, তাম্রপর্ণী, সিন্ধু, সরযু, নর্মদার সপ্তধারা! মগরাকূলবাসী কপিঞ্জল পাক, কাপড়ি সন্ন্যাসী, ছেলিদল, নাইয়া-বধূ তাকিয়ে দেখে এক নিঃসঙ্গ উদ্ভ্রান্ত অনন্যগতি ডিঙা অকূল বিস্তারে খুঁজে ফেরে নিরুদ্দেশ ষড়সঙ্গী।

বুঢ়নের চোখে অপার বিস্ময়। ধনপতির বাবা জয়পতি দত্তের সঙ্গে যে সপ্তডিঙায় সিংহল যাত্রা করেছিল তার ছটি কী করে নিমজ্জিত হয় মগরার নদীজলে! বিগত প্রলয়-রাতে যা দেখেছে সবই কি দৃষ্টি বিভ্রম? মধুকর ডিঙা এক ডিঙাঘাটা হতে ঘাটান্তরে ভেসে যেত দু-ডানায় সুর তুলে, যেন পর্বতমক্ষিকা চলে এক পুষ্প হতে অন্যে। পনস-পিয়াল দারুনির্মিত শঙ্খচূড় দু-কূলে জল কাটত শৈল সমান। ভাগীরথী সলিলে কী করে সমাধি ঘটে তার! চন্দ্রপাল আর ছোটোমুঠি জলে ভাসত যেন শারদ দেয়া। বর্ষার বারিদ নয় যে ঝরে পড়বে। বড়ো যত্নে

বিশ্বকর্মার পঞ্চসন্তান গড়েছিল গুয়ারেখি। যেমন কেশবেশে জেগে থাকে গুয়ামুটি করবী তেমন চলমান স্রোতে গুয়ারেখি ভাসত। শিরভূষণ গুয়া কেমন করে তলিয়ে গেল অতলে! নাটশালা ছিল রঙ্গকৌতুকে হ্লাদিত। গাবরদের ঢোল-কাঁসি বেণু-বাঁশিতে সদা হরষিত। সে আহ্লাদ হরণ করল কোন রসহরী! কাণ্ডার বিলাপ করে ছয় ডিঙা অদৃশ্য হল প্রলয় নিশীথে। বুঢ়ন অবিশ্বাসী সন্দিহান ভাগীরথী তলে গেছে ছয় ডিঙা। ও নিশির আঁখি-বিকার। ডিঙা ভেসে গেছে দূর কূলে, ভিন ঘাটে, অন্য বাটে। বুঢ়ন সোচ্চারে ঘোষণা দেয়— ডিঙা খোঁজ, বাজা শিঙা। ডাক যত যান ভাসে ভাগীরথী জলে। বল, সাধু ধনপতির ছয় নিষ্পদ বিবাগী, নিরুদ্দেশ, নিখোঁজ।

চলে দুর্গাবর বিপদবর্তা নিয়ে। শত নাইয়া কেরয়াল বায় জীবনপণ। হাতড়ায় চৌদিক, যেন অমাবাসী পথিক। পূব, পশ্চিম, উত্তর নাকি দক্ষিণ, কোন্ পথে নিশিয়াত্রায় গেল ছয় ডিঙা? সুদূর উত্তরে নীল জলস্রোতে যেন বাদাম ওড়ে নাওয়ের! কাণ্ডার কর্ণ ধরে দশ অঙ্গুলির দৃঢ় বন্ধনে। দিক বদলায় শত নাইয়া। পাক মারে হাতে, বাঁক দেয় দেহে। সমবেত কর্ম ধ্বনি তোলে— গাবর, গাবর। গাঙীর ও ডহর যে দুর্জয় দুর্গাবর এতকাল যাত্রা করেছে কেবল সম্মুখে সে এখন চক্রাকারে ঘোরে। যে গাঙীর বৃক্ষের শির স্পর্শ করত মহাকাশ, যে ডহ-দারুর অপরাহ্ন ছায়া বিস্তৃত হত তৃপান্তর, নিশিপ্রলয় শেষে তারা নুজ, শিথিল। যেন কু-বাতাসে ছিন্নবাদাম এক ভাঙা নাও। শত নাইয়ার সহস্র টানের পর কাণ্ডার দেখে বিবাগি ছয় ডিঙার একটিও নয় ওই জলযান। আশনা-দারু নির্মিত কর্কট শিকারের এক পাউখা মাত্র। দলচ্যুত ইরাবৎ দেখলে সন্তুষ্ট শশক যেমন শশব্যস্ত অদৃশ্য হয় তেমনই ভয়চকিত নাওখানি নিমেষে উলটোপথি। শত জিঞ্জাসাতেও মুখ ফেরে না তার। তার ভিন মতি, ভিন্ন গতি। সে কর্কটের ব্যাপারী, তার কাছে প্রবঙ্গ কুরঙ্গ-বাহী বড়ো ডিঙার খবর নেই। স্থির দাঁড়িয়ে থাকে দুর্গাবর। ডিঙার কেশচূড়া মুড়েলাখানিতে খেলা করে রবি রশ্মি। নির্বাক গঙ্গাচিল্লক নিরর্থক পাক খায় আকাশবায়ুতে। শুরু হয় দুর্গাবরের অনিশ্চিত পুনর্যাত্রা। এবার দক্ষিণে। জলের স্রোত দক্ষিণমুখী আর তাই ওই পথই স্বভাবী। কিন্তু বিগত যামে বায়ু ছিল উত্তরমুখী তাই পশ্চিমপথে ঘুরতে পারে নাওকর্ণ। উদ্ভ্রান্ত শত নাইয়া, কাণ্ডার নির্দেশে, অনিশ্চিত কেরয়াল টানে। শ্বাস নেয়। ঘন হয় চলনধ্বনি। ঢেউ জাগে। উতল জলশীর্ষে জলবুদবুদ ভাসে। দূর জলতরঙ্গে কি রইঘরের স্বর্ণচাল! ওখানেই যেন অতলে গেল মধুকর! নিকষ আঁধারে নিমজ্জন দেখিনি কেউ কিন্তু উন্মাদ ঝাঞ্জা আর উত্তাল ভাগীরথী স্রোতে মধুকরকে ঝুলনার মতো দুলতে দেখেছে নাইয়াদল। কেরয়াল খর চলে। শত নাইয়ার দেহে প্রবাহিত ঘর্মধারা। ঘন টানে

শ্বাস। ধূসর জলরং নীলে ফেরে। মাথা তোলে গগন-চাঁদোয়া। উত্তাল হয় জলতল। উত্তেজনায় কাঁপে নাইয়া-মুঠি। ওই ভাসে ডিঙা শির। মুহূর্তে ভেসে ওঠে যোজনবিস্তারী ভাগীরথী বাহনের দেহ। মধুকরের শিখর নয়, মকরের পাখনা স্রোত, কেটে ছুটে চলে। দাঁড়ায় দুর্গাবর। উত্তরা বায়ু কাণ্ডারের কপাল মোছে, নাইয়াদের কপোল শুকোয়। দিনমণি চড়ে মধ্য গগনে। পানিকৌড়ি স্রোতে নামে। নিত্য ভাগীরথী স্নানে ও পানে পুণ্য মেলে। কিন্তু পক্ষীটি একাদশী হেতু আজ নির্ভোজী। কাপড়ি সন্ন্যাসীও নিরন্ন। শুক্লা একাদশীতে সে নিরীক্ষণ করে সূর্যের দৃষ্টি হতে চন্দ্রের একাদশ কলার নিম্ভ্রমণ এবং কৃষ্ণা একাদশীতে সূর্যের দৃষ্টি পথে চন্দ্রের একাদশ কলার প্রবেশ। কিন্তু আজ তার দৃষ্টি না সূর্য না চন্দ্রে। তার অচঞ্চল চক্ষু দুর্গাবরে, স্বজন-সন্ধানী দুর্মদ নাইয়া-কাণ্ডারে। দূরাগত কোনো ক্ষীণ আশা তাদের মনে, চন্দ্রকলার মতো। শত নাইয়ার পদ-পানি-বক্ষ-শির-দৃষ্টি আদি অষ্ট অঙ্গ তুরঙ্গ সচল। শত কেরয়াল সতত সবাক। যাত্রা শেষে গন্তব্যে যখন মেলে পাউখা কিংবা মকর তখন দুর্গাবরে কৃষ্ণা একাদশী। সদাগরের শিরে, কাণ্ডারের চক্ষে, নাইয়াদের দেহে বসত করে জ্যোতিহীন তেরো চন্দ্রকলা— বৈশাখের বরুথিনী, জ্যৈষ্ঠের অপরা, আষাঢ়ের যোগিনী, শ্রাবণের কামিকা, ভাদ্রের অজা, আশ্বিনের ইন্দিরা, কার্তিকের রমা, অগ্রহায়ণের উৎপলা, পৌষের সকলা, মাঘের ঘটীলা, ফাল্গুনের বিজয়া, চৈত্রের পাপমোচনী, মলমাসের কমলা।

দূর কূলের বৃক্ষরেখা ঘন হয়। পূব আকাশে ধূসরতা নামে। দিনান্তে ঘরে ফেরে পাখপাখালি। পাটে চলে দিনমণি। ঘরমুখো ছেলিপাল বার বার ফিরে দেখে মগরার নদীজলে জ্ঞাতিহারা নাইয়া-গাবরদল। কাণ্ডার বোঝে নিরর্থক এই ডিঙা সন্ধান। আঁধার নামার আগে যে খানিক দণ্ড-পল তাতে অখণ্ড ডিঙার পরিবর্তে খণ্ড সামগ্রী সন্ধান উচিত কার্য। প্রবাহিত স্রোতে কাণ্ডার খোঁজে জলদ্রোণি, কালাপাতি, গর্ভদণ্ড। নাইয়ারা খোঁজে পারাবত, কুরঙ্গ, প্রবঙ্গ। সন্ধান করে বাঘা, পাটলা, সিঙ্গা, দৈত্যারি কবুতরের দেহ। ভাগীরথী স্রোতে চলে মীন, কমট, কর্কট, কলহংস, জরট, জলফণী, মাকন্দশাখা, ওড় পুস্প কিন্তু ডিঙা-বান্ধব নাইয়া-গাবর মেলে না। নাইয়াদল তাকায় আকাশে। তারা জাগে একটি-দুটি। ওই বুঝি ফুটে ওঠে ভ্রমরাদেশের যত জ্ঞাতিজন। কাণ্ডার বলে, তীরে ভেড়াও হে ডিঙা। আগুন জ্বালো। চক্ষু রেখো নদীজলের পিদিমগাছায়।

ঘরে ফেরে দিনান্তের গো-পাল, বরাহদল, সারসসারি, মক্ষিকাবীক। তারা দেখে ক্লাস্ত বিষন্ন এক সাঁঝ-ডিঙা তীরে চলে। সাগরযানের আকারখানি সুবিশাল কিন্তু মনটি নিরানন্দ। নির্বাক কেরয়াল, নিষ্পন্দ বাদাম, নীরব নাইয়া-গাবর। এ-যেন রামচন্দ্র-সীতার বিমাতার প্রার্থিত বরে অযোধ্যা ত্যাগ, দ্যুতক্লীড়ায় পরাজিত

পাণ্ডবদেব বনযাত্রা, পুষ্করের অক্ষে নিঃস্ব নলের একবস্ত্রে, দময়ন্তী-সহ নগর নিষ্ক্ৰমণ। বিভীতক বৃক্ষ শাখে ক্ষুধার্ত গিধিনির দল যমরাজের কাণ্ডে বিমূঢ়। ছয় ডিঙা অতলযাত্রা করল মগরায় কিন্তু একটিও তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, ধেনু ভাসে না নদী জলে। ছয় ডিঙার নাইয়া-গাবরগুলিও জল ওপরে না ভেসে জলতলে নাও বয়। সহস্র কবুতর উঠল ভ্রমরার ঘাটে সাধু-ডিঙায় কিন্তু একটিও নেই জল ওপরে। অতলে শিবগীত গায়। নারিকল না হয় মগরাতলে শয়ানে গেল কিন্তু শুষ্ঠ, গাচ্ফল, বয়ড়া, গুঞ্জা কেন ওপরে ওঠে না! তারা তো জলভাসী! আর সিন্দূর-লঙ্ককের অতশত টোকরা তুলল ভারিদল, তবু নদীবর্ণ বদলায় না কেন? যেটুকু রক্তিম ভাগীরথীর পশ্চিম স্রোতে তা নিমজ্জিত দিনমণির। অবগাহনের পর খানিক রঞ্জন জলস্তর ভেদ করে ওপরে ভাসে। পূবে আঁধার ঝরে মান্দারি, মাঙ্গন্দ, শমীবৃক্ষে। বিভীতক বৃক্ষশাখে অধিষ্ঠিত হয় কলি। সাধুডিঙা দুর্গাবরের তীরাগমন দেখে বড়োই হ্লাদিত সে। বলে, দিবাকর্ম শেষে এবার নিশিকার্যে প্রবৃত্ত হও হে সাধু! মোহর মেপে আড়ায় রাখো। এ জগৎ শ্রীময়ী কারণ হৈম, এ-জীবন আনন্দী কারণ কলধৌতী। জেনো কনক-কাঞ্চন ব্যতিরেক সবই অর্থহীন, হিরণ-পুরট ভিন্ন সবই নিরর্থক। অর্থের পর মূল্যবান হল অক্ষ। একজন অক্ষধর হলেন সুদর্শনধারক বিষ্ণু, অন্যজন অক্ষকোবিদ শকুনি। অ-করাদি ক্ষ-কারান্তা অক্ষমালাটি ফেলে অক্ষবাটে বোসো। অস্থিপটে পাশকক্ষেপণ করো। এ-কালের যোগ হল অক্ষবিদ্যা, জ্ঞানযোগী হল অক্ষবিৎ। আর নিত্য নিশিতে পান করো সুরা। প্রতিটি ত্রিশাখা বৃক্ষগহ্বরে গড়ে তোলো সুরাভাণ্ড। হরীতকী, আমলকী ও মরিচ ফল সঞ্চিত হোক ওই গর্ভে। শুক-শারি চঞ্চুতে আসুক শালি তণ্ডুল। প্রতিটি গিরি কান্তার, জনপদ, পল্লিগৃহে গড়ে তোলো সুরাভাণ্ডার, সুরালয় হয়ে উঠুক সব গেহ, সুরাশ্রয় করে তোলো সব গারি। দেখ আন্ধারে ঢাকে নদীকূলের পুরী, আঘন হিম নামে গগন বেয়ে, সুবাস ছড়ায় নাগেশ্বর, কহলার, মালতী পুষ্প। তীরে ডিঙা বেঁধে কামযানে চড়ো, কাম-গায়ত্রী মন্ত্রে ধ্যান করো। সোচ্চারে আবাহন করো রতি, ভৈরবী, পদ্ম। কই হে, স্বর শুনি না কেন? শতাধিক নাইয়া-গাবর, একটিও ধ্বনি জাগে না কেন হে সাধু? ওহে তোমাদের কি উর্দ্ধরেতা? অসৌরত লীলা নাকি ধ্বজগুলি ভগ্ন? নিরাশ শনি হতাশ ডিঙাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। ভগ্নোদ্যম কিছু কায়া ছায়াশরীরে তীরে নামে।

নদীতটে মশাল জ্বলে। সন্ত্রস্ত শশারুর দল ঝাম্পে চলে ভিন্ন আশ্রয়ে। পতঙ্গের পাল আত্মাচ্ছতি দেয় ভাগীরথীকূলের অগ্নিকুণ্ডে। নিশ্চিত হয় স্বর্গবাস। শ্রীকালির পরিবার লক্ষ করে নিশিভোজে হংসমাংসের সুব্যবস্থা আছে কি না। হতাশ দৃষ্টিতে দেখে শুধুই তণ্ডুল, মুগের সূপ আর কুমুড়া-বড়ি-পলাকড়ির ঝোল। আকাশতটে

চোখ তোলে। সেখানে রেবতী নক্ষত্র, দেবতা পূষা। দেবতাদের গোপালক পূষা সর্ববস্তুর পালক-পিতা। হংস এবং ছেলিরও। তাই সাধু-নাইয়াদের নিরামিষ ব্যবস্থা। কিন্তু শ্রীকালি দলের জন্যও একাদশী পালন নয় তো এ-নিশীথে? সতর্কে চলে শিকারসন্ধানী শ্রীকালি সংসার। উলুক দেখে শতাধিক নাইয়া-গাবর দারুপুতলির মতো দাঁড়িয়ে— কেউ জলে, কেউ কদলীবনে, কেউ-বা অগ্নিকুণ্ডের গায়ে। ভেসে যায় দেহবস্ত্র, উড়ে যায় কদলীপত্র, পোড়ে অন্ন। চকিতে সচল হয় পুতলিগুলি। আবার নিশ্চল। স্বজন-বান্ধব হারিয়ে মানুষজন নিথর, শোক-দুখে শিলা।

মধ্যরাতে দুর্গাবর পাল তোলে। সপ্তডিঙার ছ-খানি জলতলে, একা ভাসে দুর্গাবর। একা চলে। বড়োই নিঃসঙ্গ সে যাত্রা।

### ৩১ সংকেতমাধব প্রদক্ষিণ

নিশিনিদ্রা শেষে জাগে লোহিত শতদল, সুবর্ণ বালুকারাশি, শ্বেত শুক্তি। নব প্রভাতি বায়ুতে দোলে দুর্বাদল, ফলকেশর পাতা, ঝাবুণ। ‘দুর্গা’ নামে ভাসে সাগরসংগম। বায়ুচর ক্ষেমংকরী ডাক দেয় পবিত্র আবেশে। সিঙ্কু-সারস প্রাতঃস্নান শেষে তর্পণ করে সহস্রাংগুর। সকল ভূত ও সকল ভাবের জন্মদাতা তুমি, হে সবিতা। তুমিই সময়ের সৃষ্টিকর্তা। তোমার চক্রে বারোটি অক্র, তিন শত ষাট দিবস, তিন শত সাত রাত্রি। তোমাকে ঘিরে সপ্ত গণ—আদিত্য, অঙ্গরা, রাক্ষস, নাগ, যক্ষ, ঋষি ও গন্ধর্ব। তারা বর্ষণ করে বারি, হিম, আতপ। ঋষি ওষ্ঠে স্তব, অঙ্গরা দেহে নৃত্য, গন্ধর্ব কণ্ঠে গীত। অশ্বদের প্রস্তুত করে রাক্ষস ও সর্প, বল্গা ধারণ করে যক্ষ। তোমাকে বন্দনা করি হে দেব।

এক প্রহর নিশিযাত্রার অন্তে দুর্গাবর পৌঁছায় সাগরসংগমে। জলধি জলধ্বনি প্রভাতবায়ুতে। সাধু ধনপতি বিধ্বস্ত দেহে, বিষণ্ণ নয়নে তাকায় জলবিস্তারে। ভ্রমরা বেয়ে সপ্তডিঙায় শুরু হয়েছিল যে যাত্রা, তা বাত্ময় ছিল সহস্র কেরয়াল ধ্বনিতে। ভাগীরথী বিস্তারেও মধুকর-দুর্গাবর-শঙ্খচূড় ছিল বৈভবী, চন্দ্রপাল-ছোটোমুঠি-গুয়ারেখি-নাটশালা সবাক। সপ্তডিঙার সমবেত সুদীর্ঘ বিস্তারে মধুকরে যখন মেঘ, নাটশালায় রৌদ্র, দুর্গাবরে প্রত্যাষ, গুয়ারেখিতে ভানুর সর্বোদয়। মগরায় নিমজ্জিত হয়েছে ছয় ডিঙা। এখন একা ভাসে দুর্গাবর। এই বিস্তারি সাগরসংগমে বড়োই নিঃসঙ্গ, যেন যুথভ্রষ্ট একটি তির, ধু-ধু প্রান্তরে একখানি খাজুরি বৃক্ষ, যোজনবিস্তৃত অরণ্যে একাকী এক ছেলি। সেই একখানি ডিঙারও

শত ধ্বজ গত যামের যঙ্গায় অবনত, ছিন্নভিন্ন। উর্ধ্বমুখী দণ্ডগুলি যেন খঞ্জ একচক্ষু শনিদেবের সংকেতযষ্টি। তারা বিদ্ধ করে নীলাকাশ, রুদ্ধ করে পক্ষীপথ। সুদূরযাত্রী এক ঝাঁক সিঙ্কুসারস বিলাপ করে সাধুর ছিন্ন কেতন দক্ষিণপাটনে। ধ্বজাহীন রথ, দেবালয়, ডিঙা, শৌণ্ডিক গৃহ যে অশুভ সদাগর! ত্রিলোক পবিত্র রাখে তিন ধ্বজী— সর্প, অশ্ব, কলাপী। যাত্রাপথে নত হয়ো, হে দক্ষিণ পাটনি।

দূরে জাগে একটি দেউল। ধূলিকদম্ব ও শ্রীফল বৃক্ষের শীর্ষ অতিক্রম করে দেবালয়ের গৈরিক ধ্বজা ওড়ে বারিধি বায়ুতে। কাণ্ডার নির্দেশে কেরয়ালের লাগাম বাঁধে শত নাইয়া-গাবর। সাগরসংগমের পোতস্থানে সারি সারি ডিঙা। কোনোটি দূরযাত্রী, কোনোটি গৃহী। ভিনদেশি জলযানেরও ভিড়। সেখানে কোনো ডিঙার ডানা, যেন জলহংসী। কারও ঘুরুণিয়া কর্ণ, ত্রিকোণা বাদাম। নানা জলধির নানান মতি, নাওগুলিও তাই ভিন মুদ্রার। দুর্গাবর থিতু হয়। বন্দরের দূর কূলে হরিৎ এক প্রান্ত রেখা। যেন মোড়ফুলের লতা-জড়ানো গোপ গৃহস্থের দধিবাহী দণ্ড। নিকট তীরে নারিকল আর গুয়া গাছের সারি। মধ্যে মধ্যে দিঘলপত্রী কেয়া বন। তার সুবাসে উচ্ছল সাগরসংগমের বারি, মাতোয়ারা মীনডিঙা। কেশ-কালী এক জলপাক নাকাল নিষঙ্গ দণ্ডে নিশ্চল হতে। ঝাবুর পত্রে দূরযাত্রার সুর মূর্ছনা। বদ্ধজলে বন্দি ছিলে এতকাল, এবার বিস্তারে চলো। সিঙ্কুতলে শুক্তি, সিঙ্কুজলে অমৃত, সিঙ্কুশালে ইরাবৎ, সিঙ্কুগারিতে লক্ষ্মী, সিঙ্কুশয়ানে বিষু।

দূর হতে ভেসে আসে মাধব-দেউলের শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনি। সমুদ্রমহুনে উখিত মধুর ভাণ্ডারী হল মাধব। মৃত্যুঞ্জয়ী মধুবিদ্যার উৎসও মাধব, যার নানা রূপ— কেশব, গোবিন্দ, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হাবীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বিষু, নারায়ণ। ধনপতি সাগরসংগমে অবগাহন সেরে করজলে তর্পণ করে নারায়ণের। মহাকাশের নারে তুমি অয়ন করো, আমি চলি ধরাতলের উত্তাল নোনা নীরে। তুমি জলযাত্রায় সহায় হয়ো, হে দেব। ধনপতি করজোড়ে ধ্যান করে দিবাকরের, নারায়ণ মণ্ডলে।

নববস্ত্রে সুবর্ণ পাত্রে ফলমূল ও পাঁজলা নৈবিদ্য নিয়ে মাধব দেউলে চলে সদাগর। পথের দু-পাশে করন্দা, করঞ্জা, মাকন্দ বৃক্ষ, পথের ওপর করুণা, কুলিতা, শ্রীফল পাতা। শমী বৃক্ষে এক শুক দম্পতি গড়ে গেহ-গারি। এখন প্রয়োজন নতুন কড়ি বরগার কাষ্ঠ সংগ্রহ, আগড়-অম্বুরের দারু সন্ধান। তাই গামারি, মেহগনি, সাগুন, চন্দনের পত্রশিরা খোঁজ। দারুব্রহ্মের মতো দারুবাটিও সু-বর্ণ ও সুবাসিত হওয়া বিধেয়। পথপ্রান্তে সজিনার দুগ্ধধবল ফুল। যেন শত সহস্র গ্রহ-তারকা বিছানো। হিমধৌত পাপড়িগুলি প্রভাতকিরণে গগনকুসুমের মতো উজ্জ্বল। সাগরসংগমে সারি সারি খাজুরি বৃক্ষ। সিউলির রসভাণ্ড নীচে নামে। এক খণ্ড

বিবাগি দেয়া চলে গগনবিহারে। সেটি দেখে ভারদ্বাজি বৃক্ষের চাতক বাসিন্দাটি সোচ্চারে বারি মাগে— ফটিক হল, ফটিক জল। সেই ডাকে মাতুলুঙ্গ বৃক্ষতল হতে বেরিয়ে আসে কলাপী দম্পতি। অশ্বরমুখী অবোধ চাতক আর গগনবিহারী দলছুট দেয়ার প্রাতঃরঙ্গ দেখে হাসে কলাপীযুগল। এমন কলধৌত দিনে বাদল হলে আকন্দ বৃক্ষে মাকন্দ ফলত।

ধনপতি সাগরসংযমের বালুপথ ও তীর অতিক্রম করে। হোগলা, বেনা, উলু, নলখাগড়ার বন ছেড়ে অশ্বখ-বট-বিশ্ব-আমলকী-অশোকের পঞ্চবটীতে পৌঁছায়। শাখে শাখে চন্দনা, পিক, কোয়েল, পাপিয়া, দোয়েল। সামনেই সংকেতমাধবের দেউলখানি। শ্বেত কবুতর-স্বরে সরব দেহারা প্রাঙ্গণ। পুণ্যার্থীদের নিত্যদিনের শস্য দানায় দেহ সুটোল, পক্ষ উজ্জ্বল, স্বর আনন্দী। দেবাঙ্গন সুবাসিত হরিবৃক্ষের সুগন্ধে। তার জন্ম কৃষ্ণপ্রিয়া শঙ্খচূড়পত্নী তুলসীর কেশ হতে আর তাই তুলসীপত্রের কোনটি লম্বিত, কোনটি কুঞ্চিত, কোনটি আবার অলক। হরিপত্রের সুবাস কখনো কেশবতীর প্রিয় পুষ্প আমলকের, কখনো নন্দনজাত পারিজাত-মন্দার-পারিভদ্রের। তুলসী বনের অগ্নি কোণে একটি প্রাচীন চলদল বৃক্ষ। বহুকিরণমণ্ডিত সূর্যমণ্ডলের অবস্থান বৃক্ষটিতে। ধনপতি জলসেচন করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারায়ণের আবাস বৃক্ষটিকে, প্রদক্ষিণ করে করজোড়ে। ধ্যান করে, হে উর্ধ্বমূল নিম্নপল্লব সনাতন বৃক্ষ, তুমি শুক্র, তুমি ব্রহ্মা, তুমিই অমৃত। আমি এক ডিঙায় সাগরযাত্রী, দক্ষিণ পাটনে আমার সহায় যয়ো। ফেরত যাত্রায় এই বৃক্ষতলে যজ্ঞ করব, হে দেব। বেনি, বীণা, কাঁসর, ভেরি, শঙ্খের মঙ্গলধ্বনিতে স্বস্তিক বাচন করবে দ্বিজগণ। যজ্ঞমণ্ডপের চন্দ্রাতপের নীচে চৌখুরিতে থাকবে চন্দন, হেমঝারার ওপর পুষ্প। যজ্ঞের অরণিমুখে ব্যবহৃত হবে চলদল ও শমীকাষ্ঠ। তিল, তুলসী, গঙ্গোদক, বট, রস্তাঝুক, যব, দুর্বা, কুসুমে আরাধনা করব প্রজাপতির অনলকুণ্ড। পাদ্য-অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, গন্ধ, চন্দন, কুসুম, শত ভুজ্যে তোমার মান করব, হে মাধব।

নিশিঞ্জাগর উলূকের প্রাতঃনিদ্রা ভাঙে সদাগরের বৃক্ষ বন্দনায়। পিঙ্গলের সুদৃশ্য দীপগাছায় সাধুর ব্রহ্ম-বিষ্ণু-নারায়ণের আবাস বন্দনাটি বড়োই দৃষ্টিনন্দন। গব্যঘৃতের সুবাসও পরম ঘ্রাণ-সুখদা। তুষ্ট উলূক সাধুকে পরিতোষ দান করে বলে, নারায়ণ অয়ন করেন অস্তুরিক্ষের অনন্ত নীরে। তোমার সাগরখানি তার কাছে গোপ্পদ হে। নারায়ণ সহায় হবেন তোমার দক্ষিণ পাটনে। নির্বিঘ্নে তোমার ডিঙা উপনীত হবে সিংহল-দ্বীপে। শুধু নিত্যদিন নারায়ণের পাদপদ্মে একখানি কমল অর্পণ কোরো। প্রস্তুত কমল হল কিরণমালা-শোভিত সূর্য। এই সূর্যই বিষ্ণুর নাভিপদ্ম। নাভিপদ্মে সমাসীন সৃষ্টির দেবতা পদ্মযোনি প্রজাপতি ব্রহ্মা।

ওহে সাধু, সৃষ্টি-রহস্যকে মদনভাবে দেখলে জাগ্রত হবে রতি। তখন কমলে দেখবে মোহিনী, ক্ষোভনী, ত্রাসী, স্তম্ভনী, আকর্ষণী, দ্রাবিণী, আহ্লাদিনী, ক্রিন্দা, ক্লেদিনী—কামদেবের নয় কামিনী। যাত্রাপথে আপন কর্মে অতস্ত্র থেকে হে সাধু, চিন্তখানি তদগত রেখো।

গন্ধরাজ, অপরাজিতা, টগর, কোকিলাক্ষ ফুল বনের মাঝে দেউলখানি। দূর্বাভূণের ঘন হরিৎ ক্ষেত্র দেবালয় ঘিরে। ঈশান কোণে চুচুড়া ভূণের আগাছা, পাশে পর পর তিনটি টাবা লেবুর গাছ। ইতস্তত ডালিম, বিম্বুক, বৈঁছি। নৈঋত কোণে গুয়াতরুর সারি, গা ছুঁয়ে কদলীর বন। দেউলখানি দৈর্ঘ্যে শত হস্ত, প্রস্থ ও উচ্চতায় অর্ধশত। আকার মৃত্তিকা-গৃহের মতো। খিলান তিনটি শ্রুভঙ্গ, ধনুকের মতো ঈষৎ বক্টিম। শীর্ষে সুসজ্জিত দশ চূড়া। দাহিত মৃত্তিকা এবং শিলা-নির্মিত অপূর্ব দৃষ্টিনন্দন সংকেত-মাধব দেউলখানি।

দেউল জুড়ে মাধবের দশাবতার রূপ। প্রতিটি অবতার-কাহিনী সুচারু চিত্রশালায় বর্ণিত। সূর্যতনয় মনু স্বীয় আশ্রমে পিতৃতর্পণে রত। অকস্মাৎ একটি শফরী তার করযুখে এসে পড়ে। মনু মীনটিকে রাখে কমণ্ডলুতে। এক দিবসে শফরী বৃদ্ধি পায় ষোড়শ অঙ্গুলি। মনু তখন তাকে স্থাপন করল একটি অলিঙ্গরে। সে নিশীথে মীনটি বর্ধিত হল ত্রিহস্ত। একে একে কূপ-সরোবর-তটিনী শেষে মহাসাগরে তাকে স্থাপন করল মুনি। কালগতে সেই অথথি জলধিও পরিব্যাপ্ত করে ফেলে বিশালদেহী মীন। মনু মীনাবতার বিষুণের স্বরূপ উপলব্ধি করে তার ধ্যানে রত হল। তখন মীনরূপী বিষুণ বলল আসন্ন মহাপ্রলয়ে দেবগণ নির্মিত সুবিশাল ডিঙাখানি মীনশৃঙ্গে বেঁধে নিখিল জীবকে রক্ষা করতে। প্রলয়কাল সন্নিহিত হলে মনু ভুজঙ্গরজ্জু দ্বারা ডিঙাখানি বন্ধন করল এবং ডিঙার সংগৃহীত প্রাণবীজ হতে মানব, অসুর, স্থাবর, জঙ্গম সকল পদার্থ সৃষ্টি করল।

পরের দৃশ্যে সমুদ্রমহুণ। দেব-দানবেরা অনন্ত রজ্জু দ্বারা মন্দর পর্বত বেষ্টিত করে। জলধি মছনে উথিত হয় নানা সামুদ্রিক রত্ন—মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত, নীলকান্ত। উত্তোলিত হয় শঙ্খ, গরল ও অমৃত। কিন্তু দেবাসুর নিরাধার পর্বতের ভার বহন করতে পারে না। ধীরে ধীরে মন্দার নিমজ্জিত হতে থাকে জলধি অতলে। বিলাপ করে দেবদানবগণ। তখন ভগবান বিষুণ কূর্মরূপ ধারণ করল। পর্বতের তলদেশে শয়ন হেতু মন্দার পুনরায় উথিত হল। ধনপতি করজোড়ে বলে, ধরণী ধারণ কারণে চক্রাকার চিহ্নে গৌরবাঘিত তব পৃষ্ঠ। হে জগদীশ্বর হরি, গগন-সাগর মছনকালে তুমি যেমন কূর্মদেহে ধারণ করেছিলে মন্দার তেমন আমার সাগরযাত্রার একমাত্র ডিঙাখানি প্লবমান রেখো।

৭তীয় মৃৎ-চিত্রে সৃষ্টি-উত্তর ধরিত্রীর অনন্ত গগন-সাগরে নিমজ্জনের উপাখ্যান। ধরিত্রীকে উদ্ধারের নিমিত্ত জল-ক্ৰীড়াভিলাষী হরি বরাহদেহ ধারণ করল। সেই যজ্ঞবরাহের দন্তদ্বয় বেদবাহী, যজ্ঞাগ্নি বক্ষ, মুখ অগ্নিচয়ন, জিহ্বা অগ্নি, রোমরাজি কুশধাস, মস্তক ব্রহ্মা। মহাতপস্বী উর্ধ্বগাত্র, হোম তার লিঙ্গ, যজ্ঞস্থান তার বীজ, মহৌষধিস্বরূপ, যজ্ঞবেদী তার অন্তরাত্মা, মস্ত্র তার স্ফিক্, ঘৃতমিশ্রিত সোমরস শোণিত, বেদ স্কন্ধদেশ, হবি দেহগন্ধ, হব্য ও কব্য প্রবল বেগ, যজ্ঞশালা তার শরীর, সে দুতিসম্পন্ন ও নানাবিধ দক্ষিণাসমন্বিত। মৃন্ময় দেউলচিত্রের চিন্ময় রূপে মহাবরাহের চার করে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, বাম কুর্পরে তীক্ষ্ণ দন্তদ্বারা উৎপলাস্বিত সর্বংসহা ধরিত্রী, বদন বিস্ময়োৎফুল্ল। সাধু ধনপতি অবলোকন করে দেবরাজ ইন্দ্র বারি বর্ষণে প্রাণময় শস্যশ্যামলা করছে ধরণীকে।

বামনাবতারে অদিতির স্তবে তুষ্টি বিষ্ণু কশ্যপের ঔরসে অদিতি-গর্ভে জন্ম নিল। দশ মাস অস্ত্রে ভাদ্রের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে ভূমিষ্ঠ হল বামনরূপী বিষ্ণু। সময় গতে একদিন সম্পন্ন হল তার উপনয়ন সংস্কার। উপবীতধারী বামন গমন করল ত্রিলোক অধীশ্বর দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞে। বলি অর্চনা করল বামনের। সংকৃত বামন যাজ্ঞা করল ত্রিপদ ভূমি। প্রদান করল দৈত্যরাজ। তখন বামন ধারণ করল ভুবনব্যাপী আকার এবং ত্রিলোক জয় করে প্রদান করল ইন্দ্রকে। বলিকে প্রেরণ করল সুতলে। সেই বলিরই গৃহদ্বারে গদাধর রূপে দ্বারী হল বিষ্ণু, বলির ভক্তি ও মহত্ত্বে। পার্থিবায়ির আধার পৃথিবী, বিদ্যুতায়ির আধার অন্তরিক্ষ এবং দিবাকর আধার দ্যুলোকের সঙ্গে সুতলের আবাসিক হল বলি-প্রীত ভগবান বিষ্ণু। ধনপতি ধ্যান করে কমণ্ডলু ও ছত্রধারী বামনাবতারের।

নৃসিংহাবতারে বিষ্ণু পার্থিবায়ির তেজোহস্তা হিরণ্যকশিপুকে বধ করে। দেউলচিত্রে মাণিক্যময় পর্বতসম তার দেহকাস্তি, ত্রিনয়ন চন্দ্র-সূর্য-অগ্নি, জানুপরে স্থাপিত করপদ্ম, তনুতে নানা অঙ্গাভরণ, হস্তে শঙ্খ-চক্র-পাশ-অঙ্কুশ-বজ্র-গদা ও পরশু, বদনমণ্ডলে বিশাল দংষ্ট্রা, জলন্ত জিহ্বা, কম্পিত কেশর, কেশরাশি উর্ধ্বমুখ। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মা-বরে নর ও পশু হস্তে অবধ্য, ভূমি ও আকাশে অহত, দিবা ও নিশিতে অবিনাশী, ব্রহ্মা-সৃষ্ট প্রাণী হতে অমর। ত্রিলোকের অধীশ্বর হিরণ্যকশিপু ক্ষমতালিপ্সু, অত্যাচারী, উৎপীড়ক, বিষ্ণুদ্রোহী। আপন সন্তান প্রহ্লাদও বিষ্ণুপ্রীতির কারণে তার অনাচার-অত্যাচারের লক্ষ্য। সেই হিরণ্যকশিপুকে সন্ধ্যা কালে আপন উরুতে স্থাপন করে সংহার করল নৃসিংহাবতার বিষ্ণু। পার্শ্বে নবরাজন প্রহ্লাদের মৃৎমূর্তিটি বড়ো মরমি। কামনাহীন ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রশান্তি সেই মুখমণ্ডলে।

সংকেতমাধব দেউলের চতুর্পার্শ্বে যে প্রদক্ষিণ বেদি তাতে আলাপ করে এক

শালিকা দম্পতি। বিষ্ণুর মীন, কূর্ম ও বরাহবতার রূপে না ছিল দ্বেষ, না দ্বন্দ্ব। জীব-বীজ সকল রক্ষা, মন্দারের নিমজ্জন রোধ, ধরিত্রীর উত্তোলন ছিল অবতার কর্ম। বামনাবতারে এসে ত্রিলোকের ভাগাভাগি। হিরণ্যকশিপুর কালে নিরন্তর দ্বন্দ্ব ও হনন প্রচেষ্টা। মত্তহস্তী, অহি, প্রাণনাশী অগ্নি, গদা, সুদর্শন চক্রের সদা আশ্রয়। ছিন্ন শির আর প্রবাহিত শোণিতে ধরিত্রী হল অসূয়া, নির্দয়, ক্রুরমতি। তখনই সৃষ্টি হল মাসলোভী মাংসসার গৃধ্রীণী। গিরিশিখর, সুউচ্চ বৃক্ষে অবস্থান, ব্যাপ্ত পাখে গগন বিচরণ। সঙ্গী শ্যেন, বাজবহরি, চিল্লক, শাকনল। মীন-কূর্ম-বরাহকালের তিতির, মৌটুসকি, হিরামন, মেঘজীবন, পিক, বর্বরী, মীনরঙ্গ, কাষ্ঠকুট্ট, শারিকা আজ প্রান্তবাসী। কেই-বা কর্ণপাতে লোটনের বাকে, বসন্তীর ডাকে, শুকের প্রহেলিকায়, শালিকার মধুর দাম্পত্য কলহে। মাধব বিগ্রহের দিকে অধোবদনে তাকিয়ে শালিকা-জোড় কামনা করে মীন-কূর্ম-বরাহকালের মধুময়তা ও শান্তি, কামনা করে ধনপতির নির্বিঘ্ন সাগরযাত্রা।

দেউলের পরবর্তী মৃত্তিকা-চিত্রটি হয়গ্রীবের। অশ্বমুখ অবতারের দেহকান্তি শরৎশরীর ন্যায় মনোরম, সর্বাস্থে মুক্তা আভরণ, এক হস্তে চক্র ও অন্য হস্তে শঙ্খ এবং অন্য দুই কর জানু পরে বিন্যস্ত। দশ সহস্র বৎসর যুদ্ধান্তে পরিশ্রান্ত বিষ্ণু কণ্ঠদেশে জ্যায়ুক্ত কার্মুক রেখে নিদ্রামগ্ন। দেবগণ যজ্ঞার্থে তার সন্মানে প্রবৃত্ত হয়ে দর্শন পেল যোগ নিদ্রামগ্ন জগদীশ্বরের। বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গের জন্য ব্রহ্মা সৃষ্টি করল বন্মী। কার্যের পারিতোষিক স্বরূপ ভোজ্য নির্দিষ্ট করল যজ্ঞকালে ভূমিতে পতিত সর্পি। বন্মীগণ কার্মুকের অগ্রভাগ ভোজন করলে জ্যায়ুক্ত কার্মুক আঘাতে বিষ্ণু শির ছিন্ন হয়ে ধাবিত হল লবণাস্রুতে। তখন দেবগণের যাজ্ঞায় বিশ্বকর্মা সূর্যাস্থের মস্তক ছিন্ন করে বিষ্ণুস্কন্ধে যোজন করল। এই ভগবান হয়গ্রীবের হস্তে দুরাত্মা দৈত্যের নিধন ঘটে এবং উদ্ধার হয় অপহৃত বেদ। ধনপতি ভাবে দক্ষিণ পাটনে যে সিঙ্কুঘোটক দেখে সাধুজন তার মুখাকৃতি কি এমনই মনোহর!

সদাগর অবলোকন করে কৃষ্ণ-বাসুদেবের মূর্তি। প্রথম পুত্তলিটি গোপকৃষ্ণের। প্রভাতে সূর্যোদয়ের কালে গোপালক চিরকিশোর কৃষ্ণ চলে গোচারণে। রবিরশ্মির মতো গোসমূহ বিশ্বচারণে বিচরণ করে দিনমানে এবং দিবাঙ্তে গোপতি সূর্যের রশ্মিসংহরণ কালে ফিরে চলে গোপধামে। কালিয়দমন চিত্রে কৃষ্ণ যমুনায় বিষধর কালিয় নাগের ফণীতে চড়ে নৃত্য করে। পরের চিত্রে শ্রীকৃষ্ণের কেশী দানব এবং পুতনা রাক্ষসী বধ। আর এক চিত্রে ব্রজবালক ও গাভীসকলকে ব্রহ্মা পর্বতগুহায় লুঙ্কায়িত রাখার পর শ্রীকৃষ্ণ নিজ মায়ায় অনুরূপ গোপালক ও গাভী সৃষ্টি করে গোচারণে চলে। কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে পার্থসখা কৃষ্ণের গীতাকথন দৃশ্যটি বিশেষ ভাবগম্ভীর। মনোরম কৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন-ধারণ। রাধা

সঙ্গে দোল ও বুলনযাত্রা দৃশ্য দু-টিতে বিরহকাতর হয় সাধু ধনপতি। সে আজ পরবাসী আর খুল্লনা গৃহে থেকেও নির্বাসী। হায়, কী লাভ, কতটুকু উপার্জন এই একনিয়াংজীবনে! এক গ্রাস অন্ন, একচর পথিক, একপক্ষ বিহঙ্গ, একদৃক দৃষ্টির মতো একদেশ, খণ্ডিত, অপূর্ণ।

রাবণের পাপাচারে যখন ত্রিভুবন জর্জরিত তখন মেদিনী গোরূপ ধারণ করে স্বর্গে গমন করল অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করতে। সে অনাচার বৃত্তান্তে বিচলিত বিষ্ণু দশরথের পুত্রেষ্ট্রি যজ্ঞের যজ্ঞাগ্নি হতে প্রাদুর্ভূত হল। এই রামাবতারই বাণবিন্দু করে রাক্ষসী তাড়কাকে। তারপর সীতা সঙ্গে রামচন্দ্রের বিবাহ, সৎমাতার কারণে বনবাস, রাবণরাজের সীতাহরণ, সীতার লঙ্কাবাস, রামচন্দ্র হস্তে রাবণ নিধন, রামচন্দ্রের অযোধ্যায় রাজ্যাভিষেক, সীতার বনবাস, অগ্নিপরীক্ষা ও পাতাল প্রবেশ। ধনপতির দু-নয়ন ভাসে অশ্রুতে। ত্রেতার রামকথা যেন তারই গার্হস্থ্য কাহিনী। দশরথের মতো তারও ধামে দুই সতা, লহনা-খুল্লনা। গহন বনে ছেলি চরানোর কারণে তারও প্রাণাধিক পত্নী খুল্লনার জো-গৃহে প্রবেশ। রামাবতারের মতো তারও লঙ্কাযাত্রা। প্রজাদের মনস্তৃষ্টির জন্য উদরিণী সীতাকে তমসার তীরে বাস্মীকি আশ্রমে নির্বাসন দিল রামচন্দ্র আর বিক্রমকেশরীর নির্দেশে গর্ভিণী পত্নীকে সতার সংসারে রেখে সে লঙ্কাযাত্রী।

গর্ভগৃহে ধনপতি মাধব মূর্তির সামনে কিন্তু সে দেখে ভ্রমরা তীরের আপন গেহ-গারি। তার নয়নবারির দাপনিতে বিস্থিত হয় উজানি নগর, চারিভিতা গড়, বেউড়ের বংশবন, পুরটশোভা কাস্তুরা, কুলপুরোহিত জনার্দন, বাস্কব মুকুন্দ-মাধব-বনমালী-নারায়ণ-রামকৃষ্ণ-জগন্নাথ। নয়ন সমুখে ভেসে ওঠে পশমি বস্ত্রের ওপর লহনার নবমল্লিকা সূচিকর্ম, মন্দির মশারি, শিমুলি তুলার পাড়ি। ধনপতির হেমসাজিতে নানা সুগন্ধি পুষ্প কিন্তু তার ঘ্রাণে খুল্লনা কেশের আমলকী ও অঙ্গের নারায়ণ তৈলের সুবাস। অঙ্গবস্ত্রে নয়ন দু-টি মুছে মাধবকে শত অর্ঘ্য দান করে সদাগর। দেউলের বাইরে আসে। কিংকরেরা মুক্ত করে দানাভাণ্ড। শত শত শ্বেত পারাবত মন্দির চত্বরে মহোৎসবে মাতে। বাজায় সারা দেউল অঙ্গন। ধনপতির স্মৃতিতে ভাসে উজানি গৃহের সিঙ্গা, বাঘা, রণজিতা আদি সহস্রাধিক পারাবতের কথা। তারাও কি ধনপতির স্মৃতিতে বিষাদী, বিধুর?

সাগরের ডেউ সরব, বায়ু চঞ্চল। বালুপথ ভেঙে ডিঙায় ফেরে সাধু। চলদল বৃক্ষতলে রন্ধনের ব্যস্ততা। পাচক জিজ্ঞেস করে সাধু-অগ্নে কী কী ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হবে।

করজোড়ে ধনপতি বলে, উপবাস।

## ৩২ নীলাচল যাত্রা

অপরাহ্ণে নবসাজে দুর্গাবর। মগরার মহাপ্রলয়ে ভেঙেছিল সাধু ধনপতির ছইঘরের আচ্ছাদন, ছিঁড়েছিল বাদামের বস্ত্র। সাগরসংগমে কাষ্ঠকারের যন্ত্রে ফের নিজ রূপে ফেরে সাধু-বাস। জোড়ে ভাঙা কেরয়াল। শিলাকার, লৌহকার আর তাম্রকার বাদাম বাঁধে। দুর্গাতিনাশিনী শ্রীদুর্গার মুখমণ্ডল জাগে দুর্গাবরে। সুবর্ণকার ত্রিনয়নীর মণি বসায়। সাধু ধনপতির ছইঘরের চালে স্বর্ণলতা দোলে। হেমস্তের কাঞ্চন রৌদ্রে হাসে রাজেশ্বরী দুর্গাবর। শুরু হয় লবণজলধি যাত্রা। শত নাইয়া-গাবর সমবেত স্বরে বলে ‘দুর্গা, দুর্গা’, সাধু ধনপতির সঙ্গে স্বর মিলিয়ে হাঁক দেয় ‘হর হর মহাদেব’। দেবাদিদেবের ত্রিশূল ও মহাঢাক বাদাম-গাত্রে গগনে ওড়ে। নেতবস্ত্রের অসংখ্য ধ্বজ বর্ণময় দেহ মেলে ডিঙা গায়ে। গুয়া-নারিকলের দিঘল পাতা বায়ুতে শরীর ভাসায়। শত সহস্র হরিৎ কেতন হাসে দুর্গাবরের জলপথে। দোল খায় দিগন্তবিস্তৃত কদলী বন। গুয়া, নারিকল আর কদলীর ত্রি-মাঙ্গলিক বায়ুতে বাহিত হয় দুর্গাবর। কদলী দেশবাসী এক রম্ভাবতী নারী দিনান্তের স্নানে নামে সাগরসংগমে। সে তার শমী, প্রিয়ঙ্গু, জীবন্তী, ঋদ্ধি, হরিদ্রা, দুর্বা ও মাষপর্ণের আভ্যাদয়িক উপচারটি অর্পণ করে সুদূরযাত্রী জলচরটিকে। গৃহবাসী অবলা বালাগুলির সীমন্ত-সিন্দূর যেন অক্ষয় থাকে, হে ত্রিকালদর্শী মা দুর্গে।

দিনান্তের রৌদ্র কিরণ ছড়ায় চতুর্দিক। ঝিঙাফুল রশ্মি বসে দুর্গাবরের কর্ণে, নৃত্য করে বারিচূড়ায়। ভজনা করে তীরবাসী শবরপল্লির দারুদেবতার। তারপর এক বিশাল গজদলের পিছু পিছু চলে কদলী বনে। ঝিঙাফুল বর্ণ তখন তরল। পশ্চিমাকাশের ওড়পুষ্প ডুব দেয় জলধিজলে। দিগন্ত রেখায় নীলাম্বর ঝুঁকে পড়ে নীলাম্বু ওপরে। দূরে জাগে নীলগিরির সারি। অপরূপ সে-রং, অচিন্ত্য সে-দৃশ্য, অপার্থিব সে-সুখমা। হাঁক দেয় কাণ্ডার বুঢ়ন, ওহে সর্বজন। শোনো নীলগিরির বৃত্তান্ত। কান পাতো সায়র জলে, নারদ গীতে।

জরা শবরের তিরে বিদ্ধ হল শ্রীকৃষ্ণ। আত্মা চলল অমৃতলোকে, নিথর পড়ে রইল দেহখানি। বিলাপ করে জরা, রোদন করে পার্থ। অবশেষে বহন করে নিয়ে চলে সাগরকূলে। চিতাবহি জ্বলে। ঝরে পড়ে কদম্ব পুষ্প, নতশির হয় সকল ধেনু, স্থবির হয় যমুনাধারা, হাহাকার করে দ্বারকার যত পুরনারী। শ্রীমন্তগবদগীতা গীত হয় ঋষিকণ্ঠে, নরগণ যেমন জীর্ণ বাসাংসি পরিত্যাগপূর্বক নববস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সে-রূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নবদেহ গ্রহণ করে। কোনো শস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করতে পারে না, পাবক দহন করতে পারে না, অপ আর্দ্র করতে পারে না এবং মারুত পারে না শুষ্ক করতে। এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য,

অক্লেশ্য, অশোক্য, নিত্য, সর্বগত, স্থাণু, অচল এবং সনাতন। এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অধিকারী।

দিনান্তে চিতাবহি নেভে। নির্ধূম হয় বেলাভূমি। স্থিতপ্রজ্ঞ সমুদ্র বিষাদস্তরু কৃষ্ণশ্রেণীদের বলে, ‘প্রাজ্ঞগণ মৃত বা জীবিত কারো জন্য শোকাহত হয় না। হে ভূতগণ, ব্রহ্মস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হও, ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করো।’ বারিধির জলরাশি গ্রহণ করে মহাপ্রস্থানের সমস্ত দাহিত চিতাদারু, ভস্ম, পিণ্ড, পুষ্প, তুলসী এবং শ্রীফলপত্র। জলধিতরঙ্গে ভাসে চক্র, খড়্গ, মুষল, অঙ্কুশ, পাশ, শঙ্খ, ধনু, কৌমোদকী এবং পীতাম্বর কৃষ্ণ-বস্ত্র। সাগরবেলায় দৃষ্ট হয় শুধু একটিই বস্তু। অগ্নিস্পর্শহীন কৃষ্ণদেহের মধ্যভাগ। সেই দেহাংশ হতে পার্থ ও জরা নির্মাণ করে নীলমাধব। সাগর থেকে উত্থিত হয় নীলগিরি এবং সেখানেই স্থাপিত হয় বিগ্রহটি। কাণ্ডার বুটন বলে, ওই গোপন গিরিগহ্বরে নিত্যদিন জরা শবর যেত মাধব পূজনে। নমো করো হে সর্বজন।

সমস্ত লোহিতবর্ণ গাভী গোশালে ফেরার পর কৃষ্ণবর্ণ গাভীদল চারণে চলে। আঁধার ঘন হয় চন্দ্রপত্নী অশ্বিনীর উঠানে, জলধিজলে, শালগ্রাম শিলায়, মাষকলাই খেতে, যজ্ঞডুমুর বৃক্ষতলে, দূরের নীলগিরিতে। একটি-দুটি জোনাক বাতি জালে শ্বেতবিগি বনে। দীপ জ্বলে, যেন কাংস্যখণ্ড হাसे কাংস্যকারের অয়িকুণ্ডের গায়ে। অজস্র কাংস্য-দানা ওড়ে ঘরে, দ্বারে, কাংস্যকার-পল্লিতে, কুশবনে, নদীবক্ষে, সাগরসৈকতে। দুর্গাবরের নাইয়া-গাবরেরা দেখে দীর্ঘাঙ্গী বাবুবনের দেহ জুড়ে আলোকদানা। ওড়ে সাগরবায়ুতে, নৃত্য করে সাগরগীতে। আকাশ জুড়েও অজস্র জোনাক। হৈম চাঁদোয়ায় হাसे, সাগরতরঙ্গে ভাসে। উথাল-পাথাল হয় দুর্বীর তরঙ্গে। দুর্গাবরও একসময় আলোময় অজস্র পিদিমে। দ্বাদশী চন্দ্রপ্রভা পূর্বাকাশে।

কাণ্ডার বুটন শোনায় চন্দ্রকলার বৃত্তান্ত। চন্দ্রকে ষোলো কলায় বিভাজিত করল ব্রহ্মা। এক কলা থাকে শিব শিরে, বাকি পনেরো কলা নিয়ে চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধি। ক্ষয়পর্বে কলার জ্যোৎস্না যাবে শিবে, সুধা অংশ পান করবে অমৃতলোকবাসী এবং তেজ গমন করবে সূর্যতে। বৃদ্ধিকালে স্ব-স্ব স্থানে পুনরাগমন হবে তাদের। ওহে সদাগর, আগামীকাল ত্রয়োদশী, তার পরদিন পূর্ণিমা। পূর্ণিমা যামিনীতে সাগরজলে স্নান করে উদ্ভিত হবে ষোলো কলায় সম্পূর্ণ চন্দ্র। ধরায় বর্ষিত হবে তেজ, জ্যোৎস্না ও সুধা। আকাশতটে দর্শন দেবে চন্দ্রপত্নী অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, অনুরাধা, পুনর্বসু। সাগরজলে ভাসবে পুষ্যা, পূর্বাষাঢ়া, শতভিষা, পূর্বশ্রৌষ্টপদা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, হস্তা, চিত্রা। ওহে সৈন্ধব-পানির নাইয়াদল, তোমরা

চন্দ্রনন্দিনী উত্তরশ্রৌষ্ঠপদা, বিশাখা, স্বাতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, রেবতীকে না চিনলে কেমন করে পাড়ি দেবে অথই পানি? চন্দ্রশালার ওই আকাশ-কুসুমগুলিই জলপথিকের পথসাথী হে, গড় হও।

প্রহর পেরোয়। ঘন হয় জলধি স্বর। স্তিমিত কেরয়াল ধ্বনিও। যেন মুখর নৃপুৰশালিতে কুলুপ এঁটে যমুনাকূলে নিশিষাপনে চলে শ্রীরামিকা। সরব কেবল ঝাবুবন। নিত্যদিন মধ্যরাতে সে বন্দনা গায় নীলমাধবের। ওড়ুদেশে নীলমাধব বিগ্রহের কথা শুনেছিলেন অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি কুলগুরুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে পাঠান মাধব-সন্ধান। বিদ্যাপতি ছায়াপথ ধরে ধরায় নেমে গিরি, কান্তার, জনপদ ঘোরে। গত হয় প্রহর, দিন, পক্ষ, মাস। অতিক্রান্ত হয় বিশাকানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী, জ্যৈষ্ঠী, আষাঢ়ী, শ্রাবণী, ভাদ্রী, অশ্বিনী, কৃত্তিকার কাল। আঘন হিমে শ্লেথাক্রান্ত বিদ্যাপতি আশ্রয় গ্রহণ করে বিশ্ববসু শবরের কুটিরে। ব্যাধকন্যা ললিতার সেবায় সুস্থ হয়ে ওঠে অচিরে। কিন্তু ততদিনে মৃগনয়না কস্তুরী-সুবাসিনী নির্বর-ভাষিণী ললিতা প্রণয়ে বিদ্যাপতি উদবেল। আবিষ্ট কিশোরীও। কিন্তু সে শবর আর বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ। সম্মত হবে না বিশ্ববসু। তাই প্রতীক্ষা নিত্যদিন, অনিত্যকাল, অনন্ত সময়। অন্যদিকে বিদ্যাপতি দেখে বিশ্ববসু প্রতিদিন প্রত্যুষে চলে দেবার্চনায়। কুতূহলী বিদ্যাপতির জিজ্ঞাসায় ললিতা জানায় বাবা বিশ্ববসু যায় নীলগিরিতে নীলমাধব আরাধনে। বিদ্যাপতি বোঝে অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এই ভগবান বিশ্বরই দর্শনপ্রার্থী। বিশ্ববসু কুটিরে ফেরার পর বিদ্যাপতি নীলমাধব দর্শনের প্রার্থনা জানায়। সম্মত হয় না শবররাজ কারণ এই ছিল বিশ্ব-অভিলাষ যে পরিবারের বাইরের কেউ দেববিগ্রহ দর্শন করলে শবর পরিবারটি লুপ্ত হবে। কিন্তু ললিতার কাতর অনুরোধে অবশেষে রাজি হয় বিশ্ববসু, শর্তসাপেক্ষে। পুরো পথখানিতে বিদ্যাপতির দু-চোখে থাকবে পত্রাবরণ যাতে পুনর্বাস সে নীলগিরিতে না ফিরে আসতে পারে। সম্মত হয় বিদ্যাপতি। তার পরিকল্পনা ভিন্ন। সে তার কটিবন্ধে সঙ্গেপনে রাখে সরিষাদানা যা গোপন রক্তদিয়ে দুটি-একটি ঝরে পড়ে নীলগিরির পথে। মাধবদর্শনে মুগ্ধ হয় বিদ্যাপতি। সুনিশ্চিতও হয় যে বিগ্রহটি ভগবান বিশ্বরই, যা দর্শনে মুক্তি পুনর্জন্মের বন্ধন হতে। কুটিরে ফেরে বিদ্যাপতি এবং যাত্রা করে অবন্তী উদ্দেশে ললিতাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। পক্ষ গতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আসেন শবর কুটিরে এবং নির্দেশ দেন নীলগিরি যাত্রার। কিন্তু সম্মত হয় না বিশ্ববসু। ততদিনে সরিষার কুসুমে নীলগিরির পথখানি পীতরাগ। কদলী বন, নারিকল বৃক্ষের সারি, মান্দারিডাঙ্গা, বন্দীকমালা, চড়াইপথ অতিক্রম করে গুরুকুলের বিদ্যাপতি ইন্দ্রদ্যুম্নকে নিয়ে চলে বিশ্বদর্শনে। সপার্বদ রাজনের যাত্রাপথ হয়ে ওঠে সবাক,

বাহ্য। সমস্ত কলাপী ঢোকে চুঁচুড়া তৃণে, ডানা মেলে নীলকণ্ঠ, কাষ্ঠমার্জারিকা  
 চলে চেষ্টাবৃক্ষের চূড়ায়, শশারু ঢোকে শুষ্ক চলদল পত্রতলে, গহুরে চলে  
 সুবর্ণগোধিকা। সমবেত সোচ্চার মাধব-বন্দনায় আতঙ্কিত কেশরী ঢোকে গুহায়,  
 কুঞ্জর ধায় কদলী বনে, খসে পড়ে পর্বতের শিলা। বনমর্কট ‘হুপ হুপ’ রবে বলে,  
 ‘বৃদ্ধ পিতামহ ছিল শ্রীরামচন্দ্রের সেনাপতি, তার কাছেও শুনি নি এমন সরব যাত্রা।  
 শঙ্খধ্বনিতে শ্রবণে তালা, অন্তরে আতঙ্ক।’ মহাগ্রীব উষ্ট্র বিলাপ করে, ‘আমার  
 দুষ্কপায়ী করভটির দিবানিদ্রা বুঝি টুটে।’ নীলগিরি জুড়ে নাশ ত্রাস। গিরিত্যাগী  
 নকুল উর্ধ্বপুচ্ছ পলায়নের পথে শুধু একটিই বার্তা বয়, ‘ইন্দ্রদ্যুম্ন তরাসে  
 নীলমাধব নিম্বদ্যুম্ন।’ দ্রুত সেই কথা নীলগিরির গুহা-গহুর-শৃঙ্গে বয়ে নিয়ে চলে  
 বারশৃঙ্গ, ঢোলকান, কালসার মৃগ। তরক্ষু, শরভ, শাদূল, ভল্লুক, কোক, বনবরা  
 আদি সমস্ত বনবাসী সন্ধান করে কী সম্পদ নিম্ববৃক্ষে। দেখে পূর্ণিমার মতো  
 শ্বেতশুভ্র পুষ্পরেণু, শুক-ডানার মতো হরিৎ পত্রগুচ্ছ, খরিশ নাগের মতো  
 পীতধূসর দেহবঙ্কল। এক পরম প্রশান্তি বৃক্ষতলে। অন্যদিকে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন  
 গিরিগহুরে প্রবেশ করে অবলোকন করেন গুহা শূন্য, নীলমাধব অন্তর্হিত।

দুর্গাবর ভেসে চলে নীলাদ্রির তরঙ্গ ভেঙে। দূরে কলধৌত জ্যোৎস্নায় ভাসে  
 নীলগিরি। কাণ্ডার বলে, ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্দেশে সমস্ত রাজসঙ্গী ফিরে যায় অবন্তী  
 রাজ্যে। একা রাজন বসেন মাধব-ধ্যানে। অরণ্য ফেরে অরণ্যে। সমস্ত পশুপক্ষী  
 কীটপতঙ্গ আবার আসে স্ববাসে, স্বভূমে। মৌ বয় মক্ষিকা, গীত গায় পক্ষী,  
 জলকেলি করে মাতঙ্গ, গর্ভবতী হয় ভুজঙ্গী। পক্ষ পেরোয়, ঋতুচক্র ঘোরে, বর্ষের  
 পর বর্ষ কাটে। এক নিশীথে কানন-কোটাল শ্রীকালির ডাকের পর মাধবের কণ্ঠ  
 জাগে। ইন্দ্রদ্যুম্নের মর্মপীড়ায় মাধব তুষ্ট। নিম্ববৃক্ষের একখানি গুঁড়ি ভাসে  
 সাগরে। ওটি তুলে যেন মাধব-বিগ্রহ গড়েন। সাগরসৈকতে এসে ইন্দ্রদ্যুম্ন দেখেন  
 ধবল পূর্ণিমাস্রোতে ভেসে আসে কাণ্ডখানি। তীরে এসে ভেড়ে।

কাণ্ডার বুটন বলে, ওই দেখা যায় সেই তীরভূমি। নীলমাধবের আবাস  
 নীলাচল। গড় হও হে সর্বজন, নাম নাও।

দ্বাদশী নিশি শেষে নীলাশু বারিতে জগন্নাথ বন্দনা।

### ৩৩ জগন্নাথধামে ধনপতি

তীরে নামে ধনপতি। দুই করতল রাখে বালুকাতটে। ছোঁয়ায় শিরে। এ সেই  
 পুণ্যক্ষেত্র যেখানে নীলাশু বহন করে এনেছিল নিম্ববৃক্ষের কাণ্ডখানি। এমনই এক

প্রত্যুষে। কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্নের শত-সহস্র পাইকেও তুলতে অপারগ সেই বৃক্ষদেহ। ব্যর্থ কোটাল, ক্রান্ত রাউত। তখনই গগনবাণী শোনে রাজন—বিশ্ববসু আর বিদ্যাপতি স্পর্শ করুক ওই নিম্বকাণ্ড। আসে তারা। এমন আয়াসে তোলে কাণ্ডখানি যেন ক্ষুদ্র এক নিম্বশাখা। পূজিত হয় পবিত্র দারু। নির্মিত হয় দেবদেউল, বাহিত হয় দারুকাণ্ড। কিন্তু কে নির্মাণ করবে দেবদেহ? এক বৃদ্ধ দারুকার উপস্থিত হয় একদিন। সে সম্মত দারুদেব নির্মাণে কিন্তু এক শর্তে। যে একবিংশ দিবস সে নিয়োজিত থাকবে তার এই কর্মে, ওই সময়কালে নির্মাণশালাটি থাকবে দ্বারবদ্ধ। সে একা থাকবে ভিতরে তার হাতুড়ি, করাতি, ছেনি, ভ্রমরক-সহ। সম্মত রাজন। নির্মাণশালার বাইরে চলতে থাকে সুর-বাদ্যে দেবনাম। গত হয় দিন, সপ্তাহ কাটে, পক্ষও যায়। রাজনের মনে তীব্র আকুতি দেব মূর্তিটি দেখার, রানিরও তাই। কিন্তু শর্তের কথা স্মরণ করে বিরত থাকেন। কিন্তু দু-এক দিবস পর মনে হয় ভেতরে যেন কোনো ধ্বনি নেই। এক শীতল নীরবতা বিরাজ করে সেখানে। তবে কি গত হল বৃদ্ধ দারুকার! আতঙ্ক ও মমতায় রানি অনুরোধ করে রাজনকে দ্বার খোলার। রাজ নির্দেশে মুক্ত করে দ্বারী। কিন্তু এ কী! জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার তিন অসম্পূর্ণ মূর্তি এবং অদৃশ্য দারুকার। বিলাপ করেন রাজন। আবার ধ্বনিত হয় গগনবাণী, রাজন যেন এই ত্রিমূর্তিতে পূজা করে। এ-রূপেই মানুষের বেদনা মোচন করবে ঈশ্বর। বিদ্যাপতি এবং বিশ্ববসুর কন্যা ললিতার সন্তারেরা পূজা করুক এই ত্রিমূর্তি, ঈশ্বরের এই অভিলাষ। গগনবাণী শুনে ইন্দ্রদ্যুম্ন চলেন সুরলোকে ব্রহ্মাকে এই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত হওয়ার কামনা জানাতে। এদিকে ধূলিঝড়ে উত্তাল সাগরতট। গগন ছোঁয় বালুস্তম্ভ। একদিন সমুদ্রবালুতে মন্দিরটি অদৃশ্য।

ধনপতি ভাবে অবোধ ঈশ্বরের লীলা। এই সাকার তো পরের পলে নিরাকার, এই দ্বৈত তো পর মুহূর্তে অদ্বৈত, এই বেণুধর যমুনায় তো পর গ্রহরে সুদর্শন চক্রধারী। তেমনই অজ্ঞেয় প্রকৃতির রঙ্গ। বারিবর্ষণে গড়ে গহন কানন আবার অরণ্যবহিতে গ্রাসও করে। তটিনীতীরে গড়ে ওঠে নগর-পুরী আবার সেই স্রোতই ধ্বংস করে জনপদ। সিঙ্খুজল ও বালুরাশিতে বিলুপ্ত হয় নগর, গড়, দেবালয়। জ্ঞানাতীত প্রকৃতি ও পুরুষের জগৎকীড়া। কালগতে আবার জাগে অবলুপ্ত নগরী, নিমজ্জিত ডিঙা, অদৃশ্য দেবগৃহ। বিক্রমকেশরী গালা মাধবের অশ্বখুরে ধাতব ধ্বনি জাগে। বালুরাশি সরায় নৃপতি সঙ্গীরা। প্রথমে ওঠে মন্দিরচূড়ার চক্র। ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় সম্পূর্ণ দেবালয়। ধনপতি দেখে দিগন্তে উদিত রবির হেমবর্ণে উজ্জ্বল জগন্নাথ মন্দিরের চূড়া, সিঙ্খুবায়ুতে উড্ডীন ধ্বজা।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সুরলোক হতে ব্রহ্মাকে শ্রীক্ষেত্রে এনে দেখেন দেবালয়ের দাবিদার

নৃপতি মাধব। রাজন্যবর্গ সাক্ষী বালুকা সরিয়ে নৃপতির দেউল উদ্ধারের। কিন্তু নির্মাতা তো ইন্দ্রদ্যুম্ন! তাঁরই ইচ্ছায় শত-সহস্র শিলাকার, মৃৎকার, দারুকার বর্ষের পর বর্ষ ধরে নির্মাণ করেছে এই দেবদেউল। কিন্তু কে প্রতিষ্ঠা করবে সেই সত্য? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেইসব প্রাচীন মানুষ ত্যাগ করেছে জীর্ণ দেহ। বিভ্রান্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, বিচলিত ত্রিলোকের অধীশ্বর ব্রহ্মা। কী এর সমাধান? তখনই স্মরণে আসে চণ্ড কাউয়ের ঔরসে ব্রাহ্মীবাহনা হংসের সন্তান ত্রিকালজ্ঞ ভুশুণ্ডের কথা। তার বাস মেরু পর্বতের কল্পবৃক্ষে। সে দেখেছে বশিষ্ঠকে পঞ্চবার জন্মগ্রহণ করতে এবং এই জগৎকে পঞ্চবার জলমগ্ন হতে। সে প্রত্যক্ষ করেছে পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র ও বুদ্ধের ছয় জন্ম। সে সাক্ষী ত্রিংসৎ ত্রিপুর দহনের, ধরিত্রীর তৃতীয় পাতাল গমনের, দ্বিতীয় দক্ষযজ্ঞের, দশ মহাদেব করে ইন্দ্রবধের এবং বাণাসুরের প্রাণ রক্ষায় কৃষ্ণ-সঙ্গে মহাদেবের সপ্ত রণের। আসে ভুশুণ্ড শ্রীক্ষেত্রে। সে দেখেছে শুভ-নিশুভ সঙ্গে চণ্ডিকার যুদ্ধ, রাম-রাবণ রণ, পাণ্ডব-কৌরব সমর এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের দেউল নির্মাণ। ভুশুণ্ডের স্মৃতিপটে দীপ্ত বিষ্ণু ও মহেন্দ্রগিরিতে স্থাপু লিঙ্গ-পূজা বৃক্ষকাণ্ডে, দারু স্তম্ভেশ্বরীর আরাধনা, দারু জগন্তের উৎসব, দারু জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার নির্মাণ। ভুশুণ্ড পক্ষ মেলে আপন কলাবৃক্ষের উদ্দেশ্যে। নৃপতি মাধব বলেন ‘একবিংশ ভুশুণ্ডের বিংশ বীতরাগে দেহত্যাগী। একটির দৃষ্টিতে ইন্দ্রদ্যুম্ন কেমন করে অধিকার পায় দেউলের!’ নরেন্দ্র হৃদের কুমটিও দেখেছিল নীলাশু স্রোতে বৃক্ষকাণ্ডের প্রবাহিত হয়ে আসা এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের দেউলনির্মাণ। তার কাছে চলে দুই নৃপতি, শত রাজন্যবর্গ, সহস্র ভুঁইয়া। হৃদজুড়ে অজস্র নীলোৎপল। ইন্দ্রদ্যুম্ন ডাক দেন কূর্মে, বর্ণনা করেন তাঁর বিপত্তির কথা। দেউল আছে, দেবতা আছে, দেবরাজ ব্রহ্মা আছে, অনিশ্চিত শুধু সংকল্পের নামখানি। আন্দোলিত হৃদবারি। নীল কূর্ম শির তোলে। সে দেখেছে নীলাশু স্রোতে নিম্ববৃক্ষের আসা, দেবালয় তৈরি, দারু-দেবতার নির্মাণ। ধনপতি শোনে সেই দূরাগত বাদ্যধ্বনি, মস্তোচ্চারণ এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের নিঃসন্তান মৃত্যু-কামনা। ইন্দ্রদ্যুম্ন বলেন, বিশ্বেশ্বর বিশ্বজনের, রাজন বা তাঁর ধ্বংশধারা কেমন করে হবে তাঁর একক অধিকারী? মুক্ত হোক দেউলের দ্বার।

সিন্ধুস্নান সেরে ধনপতি চলে জগন্নাথ দর্শনে। সমুদ্রের কূল হতে চয়ন করে তুলসী, বিশ্বপত্র ও নানা পুষ্প। কিংকরেরা বহন করে ধূপ, ধূনা ও পূজার নানা উপচার। পথের দু-পাশে বকুল, পলাশ, নাগেশ্বর পুষ্পবৃক্ষ। কলাপী বিচরণ করে বৃক্ষসারির মাঝে। অজস্র বিহঙ্গ বর্ণে দু-পাশ রঙিন, কুঞ্জে পথখানি শ্রুতিমধুর, পুষ্পগন্ধে সুবাসিত। আনন্দঘন শ্রীক্ষেত্র, সুললিত রাধা-কৃষ্ণ নামে, মুখরিত জগন্নাথ বন্দনায়, বাঙ্ঘ্য নীলাশু স্বরে। শুধু এক হৃদয়বিদারী বিষাদ ধনপতির

অন্তরে। ছয় ডিঙা ও অজস্র প্রাণ নিরুদ্দেশ মগরার নিশিপ্রলয়ে। ধন যায় ও আসে কিন্তু প্রাণগুলি তো প্রত্যাৰ্পিত হবে না! এ মনযাতনার কী উপশম? ধনপতি দাঁড়ায় দেবালয়ের সমুখে। অজস্র শ্বেত কবুতর ওড়ে দেবালয় শীর্ষে। সোপান ভাঙে ধনপতি। করজোড়ে প্রণতি জানায়। অর্পণ করে পুষ্প, তুলসী, ধূপ, ধূনা। নয়ন দু-টি মুদে উচ্চারণ করে বন্দনা মন্ত্ৰ। হঠাৎ নিমজ্জিত ছয় ডিঙা ভেসে ওঠে চক্ষুপটে। গগন-গাঙে ভাসে। বাদাম ওড়ে, কেরয়াল ঢেউ ভাঙে। ধনপতি দেহে ক্ষণিকের তীব্র আকম্পন। নয়ন মেলে দেখে সম্মুখে অপরূপ জগন্নাথদেবের মূর্তিখানি। কৃষ্ণ মুখমণ্ডলটি নাগরূপ এবং দেহখানি বৃক্ষস্তম্ভ। সাধুর মনে বরাভয় জাগে। এক-ডিঙা সাগরযাত্রায় দুর্গাবরের ওপরে বিরাজ করবে নাগ আচ্ছাদন এবং দুর্গাবর হবে স্তম্ভের মতো স্থিরবল। কিংকরদল সদাগর নির্দেশে চলে নগর পরিক্রমায় আর সাধু চক্রলোচন জগন্নাথদেবের নাম জপে গৰ্ভগৃহে।

এই মার্গশীৰ্ষ মাসে শ্রীক্ষেত্র বৰ্ণময় লক্ষ্মীবন্দনায়। গৃহে গৃহে কাষ্ঠাধারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অঙ্কুরিত ধান্যে লক্ষ্মীস্থান। দেবী আগমনের বাহির দ্বারখানি মৃত্তিকা ও গোময়ে সূচারু। তার ওপর লক্ষ্মীর পদচিহ্ন। মৃৎ-দেওয়ালও চিত্রময়। কোথাও অজস্র ধান্যমঞ্জরি, কোথাও প্রস্ফুটিত পদ্ম। নানান পক্ষীর ছবি। কোনো গৃহে তারা গীত গায় গোবিন্দের, কোথাও-বা বিহার করে গগনে। কলাপী নৃত্য করে পুছ মেলে। নানা লতাপাতায় গৃহগুলি যেন বনকুটির। বনপুষ্পের সুগন্ধে লক্ষ্মীর প্রবেশ পথখানি সুবাসিত। মার্গশীৰ্ষ মাসের প্রতিটি বৃহস্পতি বার শ্রীবন্দনার। দেবী অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা, ইন্দুবন্দনা ইন্দিরা, বিষ্ণুজায়া ঈ, অধীশ্বর শক্তি ঈশ্বরী, কমলাসনা কমলা, চন্দ্রচিহ্নযুক্তা চন্দ্রা, জলধিকুমারী জলধিজা, ধনদায়িনী ধনদা, ভৃগুদুহিতা ভাগবী। দেবী রমা, দেবী শ্রী, দেবী হরিপ্রিয়া। দেবীর অষ্টশক্তি বিভূতি, কাঙ্ক্ষি, সৃষ্টি, কীর্তি, সন্নতি, পুষ্টি, উৎকৃষ্টি ও ঋদ্ধি। ধনপতি আরাধনা করে দেবীর অষ্ট দূতী বলাকী, বিমলা, কমলা, বনমালিকা, বিভীষিকা, মালিকা, শঙ্করী ও বসুমালিকার।

আর এক লক্ষ্মীর আবাহন কুটিরদ্বারের দুই পূর্ণ কুণ্ডে। সে হল গৃহলক্ষ্মী। ধান্যভাণ্ডারগুলি পূর্ণ, শস্যক্ষেত্র সুফলা অলাবু-কুমুড়া-পলাকড়া-মান-মুগে, সরোবর থই থই রুই-খরুসালা কই-কাতলে, সিঙ্কু জলে পিঙ্গাশ, তারা, চিঙ্গড়া। এ হল মহালক্ষ্মী আবাহনের শুভক্ষণ। নিটোল মৃৎকুম্ভ বোল তোলে মৃদঙ্গের। তার গৈরিক দেহ জুড়ে লক্ষ্মীপ্রিয় সপুষ্পক টুনিলতা। কদলী বৃক্ষও প্রবেশদ্বারের দু-পাশে। নারীশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাণীর প্রতিরূপ হল কদলীতরু, তাই নবপত্রিকাতেও তার স্থান সর্বাপেক্ষে। সাগরবায়ুতে বায়ুদল কদল পত্রিকাগুলি মৃদুমন্দ দোলে। দ্বারের ওপরে একখানি অষ্টবাহক শিবিকা। হরিদ্রাবর্ণ শিবিকার গায়ে কমলবন। দু-পক্ষে

গুনগুন রব তুলে উড়ে বেড়ায় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ মধুপ-মধুপী। ঈষৎ দূরে গুঞ্জার ফুলে বসে প্রজাপতি। তারই নির্বন্ধে মিলন হবে ব্রহ্মা-ব্রহ্মাণীর, বিষু-লক্ষ্মীর, শিব-পার্বতীর। বর্ণ, বশ্য, তারা, যোনি, গ্রহমৈত্রী, গণ, ভ-কূট ও নাড়ী-বেধ—এই অষ্টকুটে রাজ-যোটক মিল। এমনই সুখী ও মধুময় কর, হে জগন্নাথ, নব বর-বধূর গার্হস্থ্য জীবন। যে কর্ম সমাধা করার জন্য দম্পতির মানব জন্ম তা যেন সম্যকরূপে সমাধা করতে পারে।

দ্বিপ্রাহরিক দিনমণি বিরাজ করে মধ্যগগনে। তার উজ্জ্বল কিরণে শরীরে উত্তাপ নেয় বৃক্ষবাসী শীতকাতর অজাগর, কবিরাজ পক করে স্নীপদ তৈল, বৃদ্ধা শুষ্ক করে বুড়ি বুড়ি বড়ি। পল্লিবাসী বধূটির সীমস্তে সিন্দূর, কবরীতে রীঠা পুষ্পগুচ্ছ, বাহুগুণে কনক কেয়ূর, দেহে তোতা-হরিৎ শাড়ি। অনুজা বালাটিকে বড়ির বিবিধ প্রকার ও নানান ব্যঞ্জন শেখায় বৃদ্ধা। কটুতৈলে পাক বড়ি সঙ্গে সর্পি-অন্ন বড়োই উপাদেয়। তবে তৈয়ার হবে মটর ডাইল হতে। মটর মিঠা তাই বড়িগুলিও স্বাদু। বড়ির আকার হবে বেলপুষ্পের মতো, বর্ণও তাই। এক কুনিকা ডাইলে তিনখানি বৃক্ষ-মরিচ, আমার নাড়ু-গোপালের রসনাটি ঝালের। শুকুতার বড়ি কুলথ কিংবা মাষকলাইয়ে। হিঙ্গু লাগে কিঞ্চিৎ। আকারটি হবে কূর্মের। বাগ্যান, কচা, কাঁচকলা, কুমুড়াগুলি সন্তলন হবে সর্পিতে আর বড়ি পড়বে ঘন কাঠির কিঞ্চিৎ পূর্বে। নট্যা শাকে লাগে ফুলবড়ি। আকার কমল-কলির, ডাইল অড়হর। অলাবুর ব্যঞ্জে মুগ ডাইলের বড়ি। আকারটি ভেকের। অনুচা বেলায় মুগ পরিবর্তে তেওড় ডাইলে বড়ি বসিয়ে দেখি ভেকগুলি সব কোলা। সোনা মুগে সোনাভেক বড়ি। কাতলার মান-মরিচ ঝোলে চণকের বড়ি। মীন বড়ি হবে মীনরূপ। আর তিস্তিড়ী রসে বাগ্যান, কুমুড়া, পনস বিচির অশ্বলে মাড়ুয়ার বড়ি এক বুড়ি। লোন দিও যথাযথ। বৃদ্ধা সযত্নে গড়ে ফুলবড়ি, অনুজা সানন্দে খেলে বেজি সঙ্গে।

নীরব মধ্যাহ্নে সরব জলধিতরঙ্গ। ক্ষেমংকরীও সবাক মধ্যগগনে। সাগরস্নান সেরে নাইয়া-গাবরেরা চলে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ভোজনে। দূরদেশ হতে আগত তীর্থযাত্রীরাও চলে দেউল মুখে। বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সারি সারি কঙ্কলাসন, কদলীপত্র। একই পঙ্ক্তিতে পুরোহিত ও ভক্ত, পণ্ডা ও পরিচারক, সাধু ও তার নাইয়া-গাবর। পত্রে ওড়ে ওদন ও গব্যঘৃত। প্রথমে শাগের পদ, তারপর অড়হর ডালি। সঙ্গে খামালু, কচা, বাগ্যানের বেসর। সারু, শাগ আদি ব্যঞ্জনের পদটিও বেশ। ফুলবড়িতে যেমন সুস্বাদু তেমনই সুগন্ধি। তিস্তিড়ী রসে কুমুড়ার খট্টাটিও বড় উপাদেয়। সবশেষে ঘন পরমান্ন। ভোজন শেষ হয় জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার জয়ধ্বনিতে। রসনাতৃপ্তিতে বাসনা জাগে তাস্বলের। খদিরা, গুয়া, চুনা,

লবঙ্গে প্রস্তুত হয় তাম্বুল। পরমানন্দে চৰ্বণ করে সর্বজন। বৃদ্ধজন মুখলে তাম্বুল ছেঁচে। পুণ্যার্থীদের শোণায় মহাপ্রসাদ অবধের অপার মহিমা। ‘অবধ’ হল শবরদের ফুটন্ত পানি। এরই ভেতর তণ্ডুল ফোটে। এর সঙ্গে ব্যঞ্জন বুলন্ত বংশদণ্ডে ঝলসানো সবজি। এ হল শবরদের সৌরাবিধি পাকপ্রণালী। অবধ ভোজনে লুপ্ত হয় সমস্ত ভেদাভেদ। অজ্ঞানতা কাটে, প্রশুষ্টিত হয় জ্ঞানচক্ষু। তখন ওই চক্রলোচনে দেখবে প্রতিটি প্রাণই অমৃতের সন্তান।

দিনমণির হেমকিরণে অপরাহুটি পীতরাগ। বিস্তীর্ণ বালুতটে সাগরবারির নিরন্তর গমন-আগমন। কখনো সঙ্গে আনে একটি-দুটি শুক্তি, মীন, জলকীট। তরঙ্গের প্রত্যাবর্তনে কেউ ফেরে জলধিগর্ভে, কেউ তীরে বসে। নানা ডিঙা বাদাম উড়িয়ে চলে। একটি ডিঙা তীরে এসে কেরয়াল থাকায়, কর্ণ বাঁধে। নামে নাইয়া-গাবরদল। সরব সাগরসৈকত। সাগরতটে বৈকালিক ক্রয়-বিক্রয় চলে। নানা সিঙ্খুজাত দ্রব্য মেলে। পটচিহ্নীরা গীত গায়। বুড়ি-বুড়ি পটচিত্র কেনে সাধুডিঙা। কোনো চিত্রে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা, কোথাও ননিচোরা বালকৃষ্ণ, কোথাও আবার শবরী নারায়ণ। তীরে ফেরে মীন নাও। পুরবাসী এক মোদক আসে মীন সন্ধানে। সে শোণায় জগন্নাথধামের বাঘর চকুড়ি কী মধুর। তণ্ডুল আর বিউলির ডালি দিয়ে তৈরি এই পিঠা। শুষ্ঠ আর বৃক্ষ-মরিচে বড়ো মধুর স্বাদ। কাণ্ডারের সাধ জাগে পিঠা ভোজনে। সম্মত সাধুও। নিশিভোজনের দায়িত্ব নেয় মোদক। তণ্ডুল, ডালি, কথারুফুলো ভাজা, কদলী বড়া, মীন ঝোল ও চকুরি পিঠা নিশিভোজে। দিবাকর পাটে বসে। পশ্চিম নীলাশুর বর্ণ বদলায়। রাঙা হয় জলতরঙ্গ। স্বর্গদ্বারে জ্বলে ওঠে চিতাবহি। দিবাকর অদৃশ্য হয় জলধি জলে। হরিধ্বনিতে বৈকুণ্ঠধামে চলে দেহত্যাগী আত্মা। গগনপথে বাতি জ্বলে গ্রহ-তারা। ঘন হয় নিশি। উলুক বসে বৃক্ষশাখে। জালিক কুটিরুে কুণ্ড জ্বলে। অন্ন-ব্যঞ্জন চাপে। শীতল বায়ু বয়। জালিক-বধু দেহ ঢাকে বস্ত্রে। গুণজন গীত গায়—মোর মনের দুখের কথা বলি গো কাহারে/ ঘরের মানুষ বসত করে কোন নাগিনির ঘরে/আমি হৃদি দুখে দিনরাতি করি হায় হায়/ মীনের কাঁটা ফুটলে গলে কী হবে উপায়?

বালার বিষাদী স্বরে সংসারী সারমেয় মুখ গোঁজে আপন বৃকে, গৃহবাসী নকুল ভিনদেশি নাগিনির উদ্দেশে নখ-দস্ত দর্শায়, গগনদেবতার নয়ন হতে অশ্রু ঝরে, মোদক কথারুফুলো ভাজার ব্যঞ্জে বৃক্ষ-মরিচ দেয় দ্বিগুণ। আঘন শীতল বায়ু বয় উত্তরাপথে। শয়ানে যায় জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা। নিশি-ভোজন সেরে নিদ্রায় চলে পুরীবাসী, বাতি নেভায় ডিঙাবাসী নাইয়া-গাবর। ত্রয়োদশীর রাকাপতি হাসে হিম-চাঁদোয়ার ওপরে।

এক শ্রহর দিবা গতে আবার জাগে দুর্গাবর। ততক্ষণে মীনডিঙা দূর গাঙে। নাইয়া-গাবরদল নিত্যকর্ম অস্তে চলে মোদকপল্লিতে। নিশি-আঁধারে বৃক্ষ-মরিচ পড়েছিল দ্বিগুণ, এবার দিবালোকে চতুর্গুণ মিঠা দু-একটি পদ খাওয়াও দেখি। নধরুকাণ্ডি শ্রৌড় মোদক বলে, ‘মিঠার শেষ নাই। ফেনি মিঠা, ক্ষীর মিঠা, পিঠা মিঠা, ক্ষীরখণ্ড মিঠা। যেটি ভোজন করবে বলো। তবে সবচেয়ে মিঠাটি চাইলে বসো পিঁড়াতে। নয়ন দু-টি মুদে নাম নাও জগন্নাথ দেবের। এমন মিঠা দ্রব্য নাই জগতে।’ নিজ চক্ষু মোদে মোদক। কিছু সময় গতে চক্ষু মেলে দেখে নাইয়া-গাবরদের বদনগুলি নারিকল মালার মতো শুষ্ক। বলে, ‘ডর নাই হে, ব্যবস্থা হবে উদর পূরণের। নইলে কী কারণে ভাণ্ডের এত ক্ষীরখণ্ড?’ মোদকপল্লিতে জ্বলে ওঠে পরপর অগ্নিকুণ্ড। যেন মহোৎসব মথুরায়। আড়িশা পিঠা নামে বুড়ি-বুড়ি। মণ্ডা পিঠা চড়ে। শত কদলীপত্র পড়ে গৃহপ্রাঙ্গণে। গাছ-গাছ শর্করা ফোটে কটাহে। শ্রীক্ষেত্রে এলে, খাজা খাও হে সর্বজন।

দ্বিপ্রহরে নিদ্রা যায় দুর্গাবর। সাধু ধনপতি আর কাণ্ডার বুঢ়ন চলে জগন্নাথ দর্শনে। জলধি যাত্রাখানি দীর্ঘ। লঙ্কাদ্বীপ বহু দূর। তোমার ওই চক্র লোচনে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। তুমি জগতের নাথ হে জগন্নাথ। সহায় থেকো হে দেব।

### ৩৪ পূর্ণচন্দ্রে সাগরযাত্রা

নীলাচলের নীল জলধিতে অবগাহনে চলে দিনান্তের দিনমণি। পশ্চিম আকাশপটে ওড়পুপ্পের রক্ত আভা। তারই বর্ণ কূলমুখী মীনযানের কর্ণে, নীড়গামী সিঙ্কুসারসের ডানায়, জগন্নাথ ধামের ধ্বজে। বাদাম তোলে দুর্গাবর। জলতলে দুলে ওঠে শত কেরয়াল। গোধূলির এই গোপত লগ্নে ধ্যানমগ্ন হয় ভূধর, সুবাসিত হয় কস্তুরীমল্লিকা, সবাক হয় নীলান্বতলের শঙ্খ। এ হল শুভ যাত্রাকাল। এ-যাত্রায় লবণ বায়ু হবে শশারুর মতো বশ্য, লবণ পানি হবে শারদ দেয়ার মতো নির্ভার, শতেক যোজন লবণ জীবগুলি হবে শান্তিবারির মতো শীতল। শিব স্মরণ করে ধনপতি, কাণ্ডার বুঢ়ন নাম নেয় চক্রলোচন জগন্নাথ দেবের, হরি-হরি ধ্বনি তোলে নাইয়া-গাবর। সবাক হয় শত কেরয়াল। সুবর্ণগোধিকাবর্ণ বালুতট ধীরে ধীরে দূরে সরে। সাগর-কেশর স্তম্ভীত হয়, নিবিড় হয় জলতরঙ্গ। রবিচক্র চলে অতলে। রাত্রি নামে দুর্গাবরের নিষগ্ন দণ্ডে, আঁধার জমে জলদ্রোণীতে, ছইঘরের কাঞ্চনযুথিকা সাক্ষ্য সুগন্ধ ছড়ায়। জ্বলে দুর্গাদীপের পঞ্চবর্তি। জললতার লয়ে শিখা দোলে

রত্নদীপমালে। ততক্ষণে চন্দ্রশালে গ্রহ হাসে, তারকা ভাসে। নিশিখানি চতুর্দশী পূর্ণিমার।

জ্যোৎস্নালোকে শুভ্র আকাশতট, ধবল বারি-দিগন্ত, কলধৌত জললতা। উজ্জ্বল শ্বেত তরঙ্গে পাথারটি কখনো আদিগন্তবিস্তৃত মালতী বন, কখনো অযুত রাজহংস, কখনো যমুনাতীরের চারণজোড়া শুল্ক গাভীকুল। ধনপতি-ডিঙা দুর্গাবর অকূল দরিয়ায় ভেসে চলে মালতী সুবাসে, রাজহংস স্বরে, গো-ধেনুর নীরব চরণে। ধীরে ধীরে স্বচ্ছ এক হিম চান্দোয়া নামে গগন বেয়ে। তার ওপর ভেসে থাকে কৃত্তিকা পুঞ্জ। যড়মুখ স্কন্দে স্তন্যপানে এসেছিল ছয় ধাত্রী অমৃতলোক হতে। পানপর্ব অস্ত্রে তারা ফেরে ব্যোমে ছয় নক্ষত্রের পুঞ্জ রূপে। সেই দুগ্ধ নীরবে ঝরে পড়ে এই মাগশীর্ষ শুদি নিশার অনন্ত সিন্ধুতে। মন্দর পর্বতের চড়ইগুহার সমুখে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি অবলোকন করে কপিল কামধেনু। সমুদ্রমহুনে যে বস্তুটি প্রথম উথিত হল তা এই গাভী। তারই দুগ্ধে সবল রতিক্লাস্তা রাধা, সুমিষ্ট ক্ষীরসমুদ্রের বারি, শুভ্র স্ফটিকা-কপূর-বংশলোচনা-গজমুক্তা-পর্বতচূড়া-সাগরকেশর। শত নাইয়া-গাবর অপার মুগ্ধতায় দেখে প্রতিটি কেরয়াল সঞ্চালনে উথিত হয় অজস্র শুক্তি ও মুক্তা। হিম-মুকুরে ভেসে বেড়ায় অসংখ্য কৌস্তভ রতন। করতলে সিন্ধুজলের সাগরমণি তুলতে গিয়ে বিস্ময়ে অবলোচন করে সাগরতলে নীল পর্বত, ধূসর উপত্যকা, হরিৎ ভূগভূমি। যে দিনমণি অস্ত গিয়েছিল পশ্চিম সাগরে তা জেগে আছে জলতলের পর্বত শিখরে। উপত্যকায় ফুটে আছে অজস্র সূর্যমুখী। জনপদ পরিক্রমায় চলে এক ঝাঁক বঁড়িশ-মীন। রোহিত আগ্নেয়গিরির চূড়ায় ভাসে নীল তিমিঙ্গিল দম্পতি। অজস্র নম্বর দেহের আশ্রয়ে অগণিত সজীব উষ্ণ জীব। গর্ভগৃহে প্রার্থনারত মকর অবনতশৃঙ্গে আরাধনা করে বিশুদ্ধ স্ফটিকবর্ণা, শুক্লবসন পরিহিতা, মুক্তামালাশোভিতা গঙ্গাদেবীর।

দূলে উঠে সাগরতল। চঞ্চল হয় জললতা, উতলা জলতরঙ্গ। দুর্গাবরের সরব জলদ্রোণী বার্তা বয় জলস্বহীতির। কাণ্ডার বুঢ়ন হাঁক দেয়, ‘পূর্ণিমার ষোলো কলা কটাল হে, সামাল বাও।’ নৃত্যে মাতে মহাতরঙ্গ। যেন শত শত অজাগর, নাগমতি, কেউটিয়া দল ফণ তোলে। মন্দর মহুনে রজ্জু হয়েছিল বাসুকি। নব মহুনে তার সহস্র কলাপ মেলে নাগরাজ। প্রতিটি কলাপ এক-একটি গভীর গিরিগহ্বর। গিরিশীর্ষে শুভ্র তুষার, রজত কিরণ, গিরিতলে নিষ্প্রদীপ অমানিশা। ডিঙা কখনো তরঙ্গশীর্ষে, কখনো জলগিরি গহ্বরে। কাণ্ডার হাঁক দেয়, ‘দেহে গাঠ্যার বাঁধ হে গাবর-পুতরা। গাঁট বন্ধনীতে জুড়ে হত পরম্পরে। ডর পেয়ো না। শশী রঙ্গে সাগর, তাই এতো রসস্বহীতি।’ নাইয়াদল দৃঢ় ধরে কেরয়াল। লবণ-পানি ঝরে পড়ে উর্ধ্ব শরীরে। নিশিবিহারী এক কূর্ম জলতরঙ্গের দোলায় এসে পড়ে

দুর্গাবরে। সে দেখে সাগরযাত্রী নব নাইয়া-গাবরদের মুখমণ্ডলে এক গভীর আতঙ্ক, মৃত্যুভীতি। সে শোনায সাগরমহুদ্র বৃত্তান্ত। ‘মহুদ্রকালে যখন মন্দর আচম্বিত নিমজ্জিত হতে থাকে তখন বিষু কূর্মরূপে তাকে পৃষ্ঠে তুলে ধরে। এই সাগরতলে আমার বাস। সদাগর ডিঙা সাগরে নিমজ্জিত হবার পূর্বেই ধারণ করব এই দেহে। নির্ভার হও হে নাইয়া-গাবর দল, নির্ভয় হও। আর এই দেহভার আমি স্থাপন করছি ডিঙায়। দেখ স্থিত হবে জলদ্রোণী, দৃঢ় হবে গর্ভদণ্ড, নিষ্পন্ন দণ্ডে বসবে সিঙ্কুসারস, ডিঙাযাত্রী শুক-শারি রচবে নব প্রহেলিকা।’ কূর্মের ভারে স্থিতধী হয় দুর্গাবর। বারিহিল্লোলে ডিঙাখানি তখন দোলিত চাঁচর কেশ, হিন্দোলিত পদ্মকলি, আন্দোলিত শ্যামবট, স্পন্দিত রাধিকা হৃদয়। তারই আবেশে গাবর গীতের সুর জাগে। একখানি মায়ানদ তৈরি করে পার্বতী পাটনী সেজে বসে থাকে। কামুক শিব নাও চড়ে। মধ্য নদে যুবতী তন্ত্রী পাটনির প্রতি শিব রতিলোলুপ হতেই পার্বতী ধাওনি দণ্ডখানি তুলে ধরে পতি শিরে। ওদিকে কাণ্ডার বুঢ়ন পারানির কড়ি গোনে। ভবসাগরের মায়া-ঝড় আর মোহ-তুফানে অতিক্রান্ত হল বৎসরের পর বৎসর। জীবনসায়াকে নাওঘাটায় এখন তোমার আশায় বসে হে জগৎকাণ্ডারি। রতিরন্ধ্র ধনপতি ছইঘরে খুলনা বিরহ-জুরে তৃষাকুল। বিলাপ করে অঝর লোহে— তোমা স্মরণিয়া, পোড়ে মোর হিয়া, আইস প্রিয়ে একবার/তোমা বিনে মোর, প্রাণ হইল ঘোর, জীবন ধরি অসার।

সাগরতরঙ্গে ডিঙাখানি মধ্য-নিশায় তীরবর্তী। বালুতটে ইতস্তত নিঃসঙ্গ দিঘল কিছু বৃক্ষ। নিরন্তর তরঙ্গ বিস্তারে বিস্তৃত হয়েছে বেলাভূমি আর ধীরক্রমে নিষ্পদ হয়েছে ঝাবুসারি। প্রাচীন দু-চারিটি বৃক্ষ কালসাক্ষী হয়ে বালুপদে এখনও অবশিষ্ট। আঘন হিমেল বায়ুতে বৃক্ষ নিষ্পত্র, শুধু দেহগুলি বর্তমান। তার পিছনে গুয়া-নারিকল বৃক্ষসারী চন্দ্রাতপে রজতকাস্তি, সাগরবায়ুতে চঞ্চল। পত্র বেয়ে হিমকণা ঝরে পড়ে সাগরবেলায়।

দুর্গাবরের যাত্রাপথ কখনো সবাক তরঙ্গ ধ্বনিতে, কখনো কেঁরয়াল স্বরে। নাওয়ের ধাওনি দণ্ডে যোজনেক বাট পিছে ফেলে। সাগর কূলে একটি সুউচ্চ তুষারশুভ্র দেউল জাগে। সাগর মহুদ্রে উথিত হল শ্রী দেবী। তার স্মানে সমাগত হয়েছিল গঙ্গা আদি নানা নদী ও দুই গজ। গজ দু-টির প্রতিকৃতি শ্রী দেউল শীর্ষে। অসংখ্য শ্বেত উলূকের নিশিষাপন দেউলে। তাদের শুভ হরিনেত্রগুলি চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল কৌস্তভ মণি। দেউল অন্দরেও পূর্ণশশীর প্রভা। সেথায় পীনপয়োধরা, গুরু নিতম্বা, ক্ষীণকটি, শুক্লাবর্ণা শ্রী শ্বেত পদ্মাসনে উপবিষ্টা। দেবীকে কেন্দ্র করে বিভূতি, কাস্তি, সৃষ্টি, কীর্তি, সম্রতি আদি অষ্ট শক্তি। নেতের ধ্বজ ওড়ে দেউল শীর্ষে। বুঢ়ন বলে, সর্বভূতের ঈশ্বরী হল শ্রী। দেবী তুষ্ট হলে গাভী, সুবর্ণ, ধন-

অন্ন-পানীয় সকলেরই শ্রী বৃদ্ধি। রুষ্ট হলে শ্রীহীন, লক্ষ্মীত্যাগী। নমো হও হে সর্বজন।

বাহিত হয় ডিঙা দক্ষিণ পথে। কূলভূমিতে তমাল, পিয়াল, হিজল বন। দুগ্ধধবল পূর্ণিমা রাত্রিতে ইরাবৎদল চলে নিশিবিহারে। পূর্ণিমা রাত্রির নাদিত তরঙ্গে স্মৃতিজুড়ে সাগরমস্থন। সিন্ধু বারিহিল্লোলে উথিত হয়েছিল চন্দ্র, পিঙ্গল গাভী, কমণ্ডলু, কৌস্তভ, অঙ্গরা, পারিজাত, অমৃত, সুরা, তুরগ আর ইরাবৎ। ইরাবতের দেহ জুড়ে অনন্ত জললিপ্সা, অন্তরে নিরন্তর তরঙ্গমালা। কূলে চলে ইরাবৎশ্রেণি। তাকায় মহাকাশে। দেশে রাকা, কুমুদতী, নন্দা, স্বধা, সঞ্জীবনী, ক্ষমা, আপ্যায়নী, চন্দ্রিকা ও হুদিনী এই নয় চন্দ্র-শক্তি হিরণ্য কলসে সুধা ঢালে সাগরবারিতে। অমাবস্যা কলাহীন শশীকে আশ্রয় দেয় জলধি আর তাই ষোলোকলায় অর্পণ করে অর্ঘ্য। ইরাবৎকুল শুণ্ডে গ্রহণ করে বারিসুধা এবং জলোচ্ছ্বাসে তর্পণ করে সিন্ধুর। অসংখ্য বারিধারা কিন্তু অনন্ত কেবল তুমিই হে।

গগনমুখী ইরাবৎদলের জল-উচ্ছ্বাসে হিম চান্দোয়া বিলীন। শুধু গুয়া-দাড়িম্ব-খাজুর শাখে, রসাল-পনস-রঙা পত্রে, কহ্লার-নাগেশ্বর-কোকিলাক্ষ দলে নীহারকণা। গগনের নীহারিকাপুঞ্জ বিস্তৃত হয় সেই হিমজলে। সে দৃশ্যে উত্তাল সাগর, উদ্বেল ডিঙা দুর্গাবর। এক ঝাঁক বর্ণালি উডুকু মীন জলগর্ভ হতে হঠাৎই বায়ুচর। মুহূর্তে আবার জলতলে। অপরূপ ছবিটিতে নির্বাক, নিশ্চল, নিথর গাবরদল। আপন খেয়ালে ডিঙা চলে অকূল পাথারে। এ-দৃশ্য দেখেনি কেউ পার্থিব জীবনে। কাণ্ডার বুঢ়ন হাঁক দেয়, সামাল, সামাল। হুঁশে ফেরে কেরয়াল, স্রোতে ফেরে ডিঙা। কাণ্ডার বলে, 'সাগরমস্থনে যে অঙ্গরাগণ উথিত হল তারা গেল গগনে। তাদের গীতবাদ্য নৃত্যমুদ্রায় জন্ম নেয় উডুকু রঙিন মীন সাগরজলে।' উডুকু মীনের সাধ জাগে ডিঙা যাত্রায়। এসে পড়ে দুর্গাবরে। আবার ফিরে চলে বারিতে। ডিঙা চলে। সাগরতটে ঝাবুবন-ঘেরা নিদ্রিত একটি জালিক গ্রাম। বালিয়াড়িতে বেশ ক-টি ডিঙা। কোনোটি আট দাঁড়ি, কোনোটি ষোলো, কোনোটি আবার চব্বিশ। নির্মীয়মাণ ডিঙাও আছে বেশ ক-টি। খোলগুলি নানা ভঙ্গিমায় স্থিত। কোনোটির কচ্ছ আকাশে, কারো গুপ্তি অধোমুখে, কারো গলুই তির্যক। অজাগর সর্পের মতো দিঘল কাছি ঝোলে নাদন বৃক্ষে। ঘনবুনট কচাল জাল দোলে বংশ দণ্ডে। এক সারমেয় পরিবার ঘুমোয় কর্ণ, কেরয়ালের গায়ে। নারিকল পাতার আচ্ছাদনে বেশ ক-টি পর্ণকুটির। সামনে নাগেশ্বর ফুলবন। কাউ-জ্যোৎস্নায় গ্রামখানি ভাসে। কাণ্ডার বলে, ওই হল কলধৌতপুর। বসন্ত পূর্ণিমায় ওই সাগরবেলার নিসন্ধ্যা বৃক্ষে ইন্দু এসে বসে। দুগ্ধ-কিরণে ভাসে তট। গগন হতে অঙ্গরাদল নামে হে। ঝাবু বনে তখন মল্লার বাজে। রাতভর নৃত্যগীত, সুরাপান।

প্রহর গতের ডাক দেয় নিষঙ্গ দণ্ডের নিশিজাগর পক্ষী। তরল হয় শশীসুধা। শয়ানে চলে শুশুক, মকর, তিমি, মীন, উলুক, পশ্চিমাকাশের যোগিনী। স্থিতবী হয় বারিতরঙ্গ। বামে থাকে চন্দ্রসিদ্ধ দ্বীপ। সমুদ্রমহুনে এখানে উথিত হয়েছিল নিশানাথ। চন্দ্রপ্রভায় ভাসে দ্বীপখানি। বৃক্ষে বৃক্ষে চন্দ্রবল্লরি লতা, পদে পদে চন্দ্রমল্লিকা পুষ্প। বায়ুতে সুমিষ্ট পুষ্পসুবাস। কলাপী নাচে উন্মুক্ত পুচ্ছে চন্দ্রকের আহামরি রূপে। দুর্গাবর ভেসে চলে।

কাণ্ডার বলে, লবণযাত্রায় পাথারের নানা রঙ্গ। কোথাও দেখবে দ্বীপ, কোথাও দহ। দ্বীপগুলিতে আশ্রয় পাবে, সুমিষ্ট পানি পাবে, ফলমূলও পাবে যত চাও। ভয় হল দহগুলিতে। কোনোটিতে দেখবে ছলনাময়ী বালা, কোনোটিতে নাগ, কুস্তীর, জলৌকা। কালই জলৌকাদহ অতিক্রম। সতর্ক টান দিয়ে কেরয়ালে।

### ৩৫ জলৌকাদহ অতিক্রম

সাগরজলে অসংখ্য শ্বেতকমল। তরঙ্গে দোলে, দল মেলে প্রভাতি আলোয়। নিশিজাগর উলুক নিদ্রাপানে চলে চেঞ্চাবৃক্ষের নিবিড় গহনে। রাকাপতি শয়ানে গেছে, এখন দিনমণির উদয়। জ্ঞানতপস্বীর বিশ্রাম, কর্মযোগীর যজ্ঞ শুরু। দণ্ড-মাঝির দল চলে বইঠা-লগি নিয়ে দরিয়ায় নাও ভাসাতে। কোনোটির বংশ শালমীন, কোনোটি চাঁদকুড়া, কোনোটি আবার কাশ্যপ। দে-পক্ষী, শঙ্খ, কালসর্প, চন্দ্র, সূর্য চলে বারি-কেশরীর আরোহী হতে। তার পিছনে জালিক-কেওট। কোনোটি পলাশবৃক্ষ, কোনোটি নাগেশ্বর পুষ্প। কাপড়ি সন্ন্যাসী সাগরম্নানের অবকাশে সে-দৃশ্য দেখে। করজোড়ে বলে, মহাযানের যাত্রীসকল, শুভ হোক তোমাদের মহাকচ্ছ যাত্রা। কাছি আর কেরয়াল নিয়ে বয়ে চল। মীন যেমন নানা প্রকারের জালও তেমন নানা ঘরের। মীনের আকার অনুযায়ী পাট, লন্ডি, কোড়ালি, খেয়ালি, ফ্যাটা, বাছ, সারগি, বোটা, কচাল, পড়েশি, চুনা, দোন্দি, ঘাই আদি নানা জাল। কিন্তু সন্তানগণ, স্মরণে রেখো, সকল জালই মায়া, মায়াপাশ।

দুর্গাবর ভেসে চলে বাদাম-বায়ুতে। কাণ্ডার বুঢ়ন কর্ণ করে সাগরমুখী। বালুকাট সরে, খর্ব হয় গুয়া-নারিকল-পর্কটী বৃক্ষ, অদৃশ্য হয় পরিত্যক্ত ভগ্ন নাও। অকূল দরিয়ায় তরঙ্গমালা মছর, বারিস্বর কেশরী গভীর। নাইয়া-গাবরেরা নির্ভার উজ্জ্বল উষালোকে।

যে কূর্ম নিজ ভরে কোটাল সাগরে স্থির রেখেছিল ডিঙা আর নির্ভয় করেছিল নাইয়া-গাবরদের, তার কর্ম শেষ। ভিতর দরগা হতে ধীর পায়ে বাহির দরগায়

আসে। তাকায় আঘন গগনে, উষা মুখে। বলে, ‘তুমি স্বাবর-জঙ্গমের আত্মা, সাগরপথে ভাসিয়ে রেখে হে সদাগর ডিঙা।’ নীল কূর্ম প্রবেশ করে নীলাশ্বরাশিতে। ভেসে চলে দুর্গাবর। সাগরের দূর কোলে ওড়ে ডিঙাধ্বজ। সরব হয় কেরয়াল স্বর। একখানি মকরমুখ শ্বেত ডিঙা এগিয়ে আসে। শত গজ দীর্ঘ পঞ্চদশ গজ প্রস্থ জলযানটির রইঘরখানি কলধৌতের। বাল-রবির লোহিত বর্ণে গৃহখানি যেন রক্তমৃত্তিকার রত্নকলস। লিলুয়ারি বায়ুতে খুঞ্চর দেহবস্ত্র ওড়ায় দুই ডিঙার নাইয়া-গাবর, বিনিময় করে হৃদয় উল্লাস। নিষঙ্গ দণ্ডের দুই ময়ূরকণ্ঠী সাগরপক্ষী বদলায় ডিঙা। যে-যার আপন গগনখণ্ডে ফেরে। ধনপতি তাকায় বিস্তৃত সাগরবিস্তারে। ভ্রমরার গৃহী শ্রোত হতে এই জলধিযাত্রা যেন মাতৃক্রোড় হতে পরিত্রাজকের জগৎবিহার। সম্মুখে অকূল দরিয়া, শির পরে অনন্ত আকাশ, ডিঙাতলে অতল জলরাশি। যে ডিঙা ভ্রমরায় বৈভবী, মহাসিন্ধুতে যেন পারানির খেয়া। শঙ্খ দন্ত, যশবন্ত সদাগর, গদাধর বান্যারা ধনকুবের। শঙ্খ দণ্ডের অষ্টঘোড়া রথ রয় নিশিদিন। চান্দ সদাগরের বাহিরমহলে সাত মরাই টাকা। কুঞ্জরে চড়ে ন্মানে যায় গদাধর লা। কে কার অগ্রে পূজা পাবে তা নিয়ে প্রতিটি জ্ঞাতি-কুটুম্ব সম্মিলনে বাকবিতণ্ডা। আর এই সাগরজলে এত রত্ন যা যোলো শত বান্যাঘরের সমস্ত ধনের অযুত গুণেরও অধিক। পারাবতক্ৰীড়াবিলাসী ধনপতি বান্ধব সঙ্গে দোলায় চড়ে পক্ষী ওড়াতে যায়। পায়রি হাতে রেখে পারাবত ছাড়ে। যার পক্ষী আগে ফেরে তার জয়। ঘন করতালি দেয় নগরিয়া শিশু, হর্ষে মাতে বন্ধু মুকুন্দ, মাধব, কংসারি, হলধর সঙ্গে ধনপতি। ক্ৰীড়া শেষে কিংকর আবার পঞ্জরে ভরে মকরজ, ঘনবোলা, সিন্দুরিয়া, রণজয়া, কপালচিটা। সাগরবক্ষে সিন্ধুসারসদের বায়ুসন্তরণ দেখে সদাগর। যেন শ্বেত ধ্বজা ওড়ে গগনে। নির্ভার, উড়ানক্ষেত্রটিও অব্যাহত। কিংকর, পঞ্জর, সদাগরহীন উড়ানে দুই ডানা অবধি বিস্তারী, অনন্তচারী। ধনপতির অন্তরে এক অদ্ভুত আলোড়ন। মনে হয় সেও যেন মুক্ত এক সাগরবিহঙ্গ। পূর্ণিতমতি আনন্দে সাগরবায়ুতে দুই বাহু মেলে ধরে ধনপতি।

নাইয়া-গাবরেরা দেখে ডিঙাসঙ্গী অসংখ্য মীন। তারা চলে বাহির দরগার গা বেয়ে। কেরয়ালের উত্থান-পতনের সঙ্গে অদ্ভুত রঙ্গক্ৰীড়ায় মাতে। প্রতিটি ঝাঁক যেন মৃষিকদল। মৃষিকের মতোই ধূসর গাত্রবর্ণ, চক্ষুগুলি কৌতুকে ভরা। মতিগতি দেখে বোধ হয় ডিঙা-ভাঙারে যে মাষ, মসরি, তণ্ডুল চলেছে মনগুলি সে-সবে মগ্ন। ভোজনান্তে পামরী কন্মলে বসে খানিক ফলাহার মন্দ না, যখন নাট্যাফল আর শুষ্ঠও রয়েছে ডালির তলে। মুখশুদ্ধিতে বিড়ঙ্গ ও দানা-কপূর। কতক মীন আবার বেণুপত্রের মতো কৃষ্ণ কিন্তু দিঘল। ধূলিঝড়ে যেমন শুষ্ক পত্র ওড়ে তেমন তারা বিচরণ করে জলতলে। ডিঙা সঙ্গে চলে মোরব্বা মীনের দল। বর্ণ পিঙ্গল, পিথুল

দেহ, শ্লথগতি। কেরয়ালের তাল-লয়ে বড়ো আনন্দ তাদের। মনোহর লীলায় নৃত্য করে। তাদের রঙ্গ দেখে হেসে মরে প্রজাপতি মীন। তাদের দেহ, বাদাম, বইঠায় রবির ছয় ঋতু-রং। সেখানে গ্রীষ্মের কাঞ্চন, বর্ষার শ্বেত, শরতের পাণ্ডু, হেমন্তের তাম্র, শিশিরের লোহিত, বসন্তের কপিল বসত করে। তারা বিচরণ করে সাগরজলের কুসুমে কুসুমে। গর্ভাধান হয় জলশিউলির, কহলার, কমলিনীর, পারিজাতের। রঙ্গ করে বিদূষকমীন। সেও রঙিন। কিন্তু রংগুলি বড়ো রসময়। পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণ আর ভ্রু-যুগল শুভ্র, ওষ্ঠখানি পিঙ্গল কিন্তু ফুলকাগুলি লোহিত। রঙের স্থানবিশ্রমে বায়ুচরটি মৎসরাঙা আর জলচরটি মীনরঙ্গ। ডিঙা চলে দূর সাগরে। ঘন হয় নীলবর্ণ। ডিঙাসঙ্গী মীনগুলি কর্ণ ঘোরায়ে। ফিরে চলে নিজ জলবাসে। জলোচ্ছ্বাসে ভেসে ওঠে গঙ্গাবাহন এক মকর। কৃষ্ণসার মৃগের মতো মুণ্ডখানি। দুই শৃঙ্গে চারটি শাখা, গঙ্গার চারধারা। সীতা ব্রহ্মলোকে মেরু গিরিতে অবতরণ করে ভদ্রাশ্ববর্ষ অতিক্রম করে পূর্ব জলধিতে যুক্ত হয়, চক্ষুষ মালাবানে অবতরণ করে কেতুমালবর্ষ অতিক্রম করে পশ্চিম জলধিতে, অলকানন্দা হেমকূটে অবতরণ করে ভারতবর্ষ অতিক্রম করে দক্ষিণ জলধিতে, ভদ্রা শৃঙ্গবানে অবতরণ করে উত্তরকুরু অতিক্রম করে উত্তর লবণ-জলধিতে। মকরের দুই সম্মুখ মৃগ-চরণে স্থলযাত্রা, পশ্চাতের মীন লাস্ত্রুলে জলগমন। ধনপতির সাগরযাত্রা দেখে গঙ্গাবাহন বলে, শুভ, শুভ। নিশি নামার পূর্বে জলৌকাদহটি অতিক্রম কোরো সাধু। শোণিতে ওদের নিত্য ভোজ।

দিনমণি মধ্যগগনে। একটি শ্যেনপক্ষী চঞ্চুতে একখানি বিশাল মীন নিয়ে উড়ে এসে বসে ছইঘরের আচ্ছাদনে। রসুইকার ব্যস্ত ছিল কর্কট শিকারে। পক্ষীটিকে দেখে বোঝে ভোজনের বন্দোবস্ত দরকার। চার আখায় ইন্ধন দিয়ে ওদন, মুগ-সূপ, ঘণ্ট, আর কুমুড়া-বড়ি-খামালুর ঝোল বসায়। আর এক আখায় পলাকড়ি ভাজা হয় ঘূতে। গাবেরেরা সংস্কার করে কর্কট। রসুইকার কর্কটস্থূপের দিকে তাকিয়ে বলে, সতীর দশ মহাবিদ্যা, বিষ্ণুর দশাবতার আর কর্কটের দশ পদ। এর অষ্টপদ শীতল, সদালাপী, সৌম্য আর দুখানি অশুভ প্রভাবে কর্কশ ও ক্রোধী। সতর্ক থেকো হে।

দূরে দুই মীনডিঙা ফিরে চলে তীরে। শ্যেনপক্ষী ভোজ সেরে ডানা মেলে। ডালিতলে ভোজন চলে মাতঙ্গ, কুরঙ্গ, কবুতরদের। ডিঙা সাগরতরঙ্গে ভাসার পর কবুতরের সংকট হল চিনা তণ্ডুল আর বটুলা কলাইগুলির জঙ্গমতা। বিস্ময়ে ভাবে কেমন করে সচল প্রাণী ধরে মৎসরাঙ্গা, শ্যোন, কলাপী। রসুইকার পরিবেশন করে ওদন, ঘৃত, ব্যঞ্জন। গগনের দিনমণি ততক্ষণে অপরাহ্নে। শীতল বায়ু বয়। চঞ্চল হয় সাগরতরঙ্গ। তারই সঙ্গে কিছু জলকীট ঝাম্প দেয় জলে। স্ফটিক স্চ্ছ তাদের বর্ণ, গুম্ফজোড়া নলখড়ি বন। বেশ কয়েকটি এসে পড়ে দুর্গাবরে। বিলাপ করে রসুইকার।

ভোজনের আগে মিললে চিঙ্গড়ার বড়া ভাজত সে। কর্কটভোজী নয় সাধু, পরিতোষে খেত চিঙ্গড়ার বড়া। নদীজলের চিঙ্গড়িগুলি ক্ষুদ্র, কৃশ। সিন্ধুজলে সেগুলিই নধর। প্রবোধ দেয় কাণ্ডার। প্রত্যাবর্তনের কালে জলকীটের বড়া খাবে সাধু ও সর্বজন।

অপরাহ্ন শেষে শুরু হয় দিনান্তের পড়ন্ত বেলা। নীলবর্ণ সাগরবারি হয় ধূসর। সিন্ধুসারসের দল দিঘল ডানায় দূরাশ্তে গৃহে ফেরে।। এক বৃদ্ধ সারস ক্লাস্ত হয়ে ঝরে পড়ে জলতরঙ্গে। শেষ প্রচেষ্টা করে নতুন করে পক্ষ মেলার। ব্যর্থ সারস জলতরঙ্গে বায়ুপথ হাতড়ায়। একসময় নিরুদ্দেশ অথই সাগরে। নাইয়া-গাবরের দল আচম্বিত অনুভব করে ভারী ভার কেরয়ালে। সাগরবারি হয়ে ওঠে ঘন, ভারী, অচল। তাকায় ডিঙা তলে। জলের বর্ণ কাজলকৃষ্ণ। যেন জলগর্ভা শ্রাবণ-বারিদ বসত গড়েছে ডিঙাতলে। এক নাইয়া কেরয়াল তোলে বাহু দু-টিকে খানিক বিশ্রাম দিতে। তখনই হতবাক হয়ে দেখে অসংখ্য জলৌকা কেরয়াল গায়ে। নাইয়াদের সমবেত আর্তস্বরে ফিরে তাকায় কাণ্ডার। ততক্ষণে জলৌকাদল বাহির দরগা ধরে ওপরে চলে। যেন মধুচক্র গড়তে চলে মক্ষিকাকুল, সমবেত দূরযাত্রায় ডানা মেলে পঙ্গপাল, নিশি শিকারে যায় শাদূলদল। কাণ্ডার বলে, সামাল, সামাল। ডিঙা চলেছে জলৌকাদহ বেয়ে। বড়োই রক্তরসিক রক্তনেত্র রক্তজিহ্বা জীবগুলি। চুনপানি বানাও হে, চুনপানি ঢালো।

কাণ্ডার নির্দেশের মধ্যে জলৌকাদল ঘিরে ফেলে ডিঙা। স্থবির হয় দুর্গাবর। কর্ণ স্থির, অনড় কেরয়াল। যেন শৈবালদামে রুদ্ধ হয়েছে শ্বোতধারা, প্রবল শীতলতায় জলধি রূপান্তরিত হয়েছে তুষারে। শত নাইয়া-গাবরের দেহ বেয়ে ঘর্মধারা বয়ে চলে কিন্তু অনড় ডিঙা। ডালি তলে আতঙ্কে আর্তনাদ করে কুরঙ্গ, রাম্ফ মারে প্লবঙ্গ, বিলাপ করে কবুতর। ধনপতি করজোড়ে সোচ্চারে ডাক দেয় ‘শিব’ ‘শিব’। নাইয়া-গাবরদল চুনপানি ঢালে অষ্ট দিক, সাগরপানি রং বদলায়। জলৌকাদল চলে জলতলে। দুলে ওঠে ডিঙা, কর্ণ নড়ে, সবাক হয় কেরয়াল। এগিয়ে চলে দুর্গাবর।

পশ্চিমাকাশে দিনমণি প্রবেশ করে জলধিতে।

## ৩৬ নিশিপাটন

করিকর সমান জলযুকগুলি চুনজলে সাগরতলে গমনের পর তরঙ্গমালা রজতশুভ্র। দিনমণি নিত্যদিন নীল-নীরে অস্ত যায়। আজ জলৌকাদহের শুভ্র বারিবর্ণে তার মনে হর্ষ, চিন্তে তুষ্টি। বিষুধাম বৈকুণ্ঠ, ইন্দ্রবাহন অশ্ব, পশ্চিমবাহী

গঙ্গার মতো তার অবগাহন স্থানটি এই আঘন দিনান্তে সিত। দিনমণির আনন্দে হেমকান্তিতে উজ্জ্বল পশ্চিমাকাশ, উচ্ছল ধনপতির দুর্গাবর ডিঙা, উতরোল সাগরলতা। ডিঙার ডালিতলে রঙ্গে নৃত্য করে পবনবাহন পৃথতাস্থ মৃগ, রামনাম করে পবননন্দন কপিবর। শুকপক্ষী হেঁয়ালি প্রবন্ধ রচে—‘তৃষ্ণায় আকুল বড়ো, জল খাইলে মরে/ স্নেহ না করিলে সে, তিলেক নারি তরে / উগারয়ে অন্য বস্তু, অন্য করে পান / সখা সনে আলিঙ্গনে, তেজয়ে পরাণ। সাগরতলে যাত্রা করে সুবর্ণগোলক, দীপ জ্বলে ছইগৃহে। আকাশবাতি ফুটে ওঠে এদিক-ওদিক একটি-দুটি। আঁধারে ঢাকে সিন্ধুজল, দূরদিগন্ত, গগনতট। ঘন হয় জলদ স্বর। কড়িয়াকীট নিশিবিহারে চলে। তাদের গাত্রবর্ণ হেমহলুদ। সমবেতে যখন চলে তখন সরিষা পুষ্পের খেত দোলে উতল বায়ুতে। গলার স্বরটি তীক্ষ্ণ ও ঘন। বৃষ্টি সঙ্গে জয়কার দেয় কাপড়ি যোগী। প্রতিপদ সন্ধ্যার ক্রোড়-আঁধারে বিঘত-দীর্ঘ কীটের চক্ষুমণিগুলি জ্বলে। হরিৎ আলোক-দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয় মণিকোঠা হতে। শত-সহস্র উজ্জ্বল আলোক-অণুতে দুর্গাবর ঘিরে দীপাবলি। কেরয়ালের উত্থান-পতনে আলোকমালা দোলে, যেমন হেমন্তবায়ুতে আন্দোলিত হয় দীপাশ্বিতার চতুর্দশ বাতি। সে-দৃশ্যে আলোড়িত নয়নবিলাসী সাধু ধনপতি। সে প্রতিরূপের সন্ধান করে প্রভাতরবির আতপে, কোজাগর চন্দ্রালোকে, খুল্লনার মদন আহ্লাদে।

সাগরের অগ্নি কোণে আলো জাগে জলযানের। ধীরে ধীরে তিনটি ডিঙা দেহ তোলে। দীপমালার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তিন জলযান। ভেসে আসে জলতরঙ্গ ভেঙে। প্রথমটি সিংহমুখী। পশুরাজ কেশরী বনবাসী তাই ডিঙা ঘিরে নানা সজীব বনলতা, নানান পুষ্প-পল্লবী। ডিঙাখানি নয়ননন্দন এক শ্যামল চলমান বনানী। পরের ডিঙা শ্বেতবর্ণ। তার সম্মুখভাগটি ইরাবতের মুখাবয়বে নির্মিত। তার উপর শ্রীকলার হাট। চিত্রশালায় সপ্তবর্ণের নয়নাভিরাম বিস্তার। কৃষ্ণ নৌকাবিলাসে রঙ্গে ভাসে রাধা ও গোপীদল সঙ্গে। আর এক চিত্রে প্রমোদকক্ষে সদাগর কামিনী সঙ্গে। সাধুর দিঘল কেশ, গৌরবর্ণ, উন্নত ললাট। রামার পরনে দোছোট তসরের শাড়ি, মাথায় আষাড়িয়া নবঘন কেশ, অধরে যাবক রসের বর্ণ। কৃশোদরী রামার অনুপাম কুচগিরি, উরুভার রামরম্ভা জিনি। তৃতীয় ডিঙা গরুড় মহারথী। বাদাম বায়ুতে নির্ভার ভেসে চলে যানখানি। নাইয়াদল কেরয়াল ছেড়ে নৃত্য দেখে নাটুয়ার। ভেরি, দোসরি, শিঙ্গা, বিরকালি বাজে। জলদবাসী কুস্তীর-মকর ত্রাসে চলে জলতলে। সাগরজলের শব্দে আতঙ্ক নিনাদ। এক ঝাঁক উড়ুক্ক মীন বাম্প মারে ডিঙা ডালিতে। সশব্দে ভেঙে পড়ে সারি সারি দীপদণ্ড। ষষ্টিধারী পাইকদল উড়্যা পাক মারে, খড়া ফলকে বিজুলি চমক। ধেয়ে যায় রায়বাঁশিয়া। মীনগুলি ততক্ষণে কেলিরত সাগরতলের পুষ্প বনে।

তিন ডিঙা নৈরুত কোণে নেপথ্যগমনের পর প্রতিপদের চন্দ্র ওঠে গগনে।  
 শ্বেতকিরণে দল মেলে কমলবনের কোরক, হাসে ডিঙাগাত্রের হরিৎ জলজ,  
 জলতলের প্রবাল ক্ষেত্র। কমলবনে গুনগুন গীত গায় শ্বেতমক্ষিকা। কাণ্ডার বুঢ়ন  
 কর্ণ পাতে সুরসংগতে। পদ্মাবতী শ্বেতকাউ বেশে সাগরসঙ্গী হয়েছিল চান্দ  
 সদাগরের, শ্বেতমক্ষিকাগুলি কোন মাগি? করজোরে কাণ্ডার বলে, ‘ছোটোসাধুর  
 সংসারে দু-দুটি মাগ। সাধু পরে রুষ্ট হয়ো না মা।’ ডিঙাগাত্রের জলশিউলি সুবাস  
 ছড়ায় চারপাশ। ভ্রমরা, অজয়, ভাগীরথী বেয়ে দুর্গাবরের সাগরযাত্রায় ডিঙাখানি  
 এখন একটি চলমান উপবন। ঘন জলতৃণ দুর্গাবর গায়ে। অজয় বারিপর্ণী  
 চতুর্দিক। ফণীর মতো সূচাক্ষু ফণ দোলায় চন্দ্রকিরণে। নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে  
 কলমিদাম। তার তলে নৃত্য করে নিত্যরাতে খসে-পড়া নক্ষত্রদল। ডিঙাগাত্রের  
 পক্ষধারকে কঙ্কার হাসে শশীকিরণে। পুষ্পরেণু ঝরে সাগরজলে। বারিতলের  
 প্রবাল ক্ষেত্রটি যেন নদীকূলের বন্দীক গৃহ-সারি, মধ্যে মধ্যে সিজবৃক্ষ। হরিতের  
 পরিবর্তে কোনোটি লালিম, কোনোটি গোলাপি, কোনোটি শ্বেতশুভ্র। শশীকিরণ  
 জলতলে এসে বসত করে প্রবালগায়ে শ্বেতকণা হয়ে। জমতে জমতে ইতস্তত  
 মাথা তোলে শ্বেতপ্রবাল। ক্ষেত্রটি সুবাসিত নাল পুষ্পরেণু সুগন্ধে।

প্রহর গতে ধীর হয় জললতা, নম্র হয় সাগর নিনাদ, নত হয় বারিকণা। ডিঙা  
 যত কূল হতে দূরে সরে তত নিকটে আসে আকাশতট। নবগ্রহ, সপ্তবিংশতি নক্ষত্র,  
 অম্বরচারী অম্বুবাহী, হিমকণা, ইন্দুবাসী পর্বতমালা, নিশার চন্দ্রকর সব যেন আপন  
 পুরবাসী। উজানি নগরের বেউড় বংশ বন, শৈলশিলা গড়, গড়ের হেমচূড়া,  
 ভ্রমরার সেতুবন্ধ, নদীতীরের মিষ্টগন্ধী কেয়াবনের মতোই ওই গগনবাসীরা যেন  
 স্বভূমিবাসী, কুটুম্ব, আত্মজন। জল-অঙ্গনে রাতের শশী জাগে, ফোটে অজয়  
 আকাশ-কুসুম, উড়ে চলে নির্ভার দেয়া। যেমন সর্বজনজ্ঞাত উজানি নগরের কোন  
 মাকন্দটি অল্প কোনটি মধুর, কোন মাতঙ্গটি বশ্য কোনটি বেতাল, কোন বেণুর  
 ধাতটি বাঁশরির কার বংশদণ্ডের, তেমনই জানা ওই সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের কোনটি  
 তাপদাতা কোনটি তাপহারক, কোন গ্রহটির ধনভাব কার তনু, কোন দেয়াটি  
 অম্বুবাহী কোনটি নির্জলা, কোন নিশা কতখানি নিখর আঘন হিমে।

চেনা অম্বরতলে স্বজন সঙ্গে জলযাত্রায় মনটি লঘু, হৃদয় আনন্দঘন। নতুন  
 গীত বাঁধে নাইয়া-গাবর দল। ধনপতি অক্ষকীড়ার মস্ত্র জপে। সিংহল দেশে  
 বেউশ্যাগৃহে মস্ত্রবলে বশ করবে দ্যুত। তারপর ক্রীড়া জিতে পণানুসারে অষ্টপ্রহর  
 রতি। কাম-সাগরে সদাগর ভাসাবে কামিনী নাও। জলতরঙ্গে আন্দোলিত হবে।  
 আচম্বিত জলউচ্ছ্বাসে উৎকম্পিত জলযান। কাণ্ডার বুঢ়ন বলে, ‘সামাল, সামাল।’  
 শত নাইয়া দৃঢ় ধরে কেরয়াল। জলতলে যোজন-তনু এক জীব দেহ তোলে।

মুখখানি যেন দিগন্তবিস্তারী গিরিকন্দর। কাণ্ডার বলে, ‘অক্লেশে তিমি গেলে ওই গিরিগহ্বর বদন তিমিসিল, গড় হও হে।’ নাইয়া-গাবরদল প্রতিপদের কাউ-জ্যোৎস্নায় দেখে চক্ষু দু-টি যেন নিদাঘকালের দ্বিপ্রাহরিক রবি, আকর্ষণ বিস্তৃত দৃঢ় হনু, ‘দংষ্ট্রাগুলি গজদন্ত সদৃশ। সম্পূর্ণ দেহটি একবার জল উপরে তুলে ধরে তিমিসিল। যেন এক জলদানব। দুই দেহ-ক্ষেপণী গগনস্পর্শী তমাল তরু, দেহ-বাদাম নলখড়ি বন। সুদূরবিস্তারী লাস্কুল। যখন দেহ-পশ্চাৎ দোলা দেয় আছাদে, অকাল জোয়ার জাগে জলধিতে। বিভ্রান্ত জলবাসী জীবদল ঝম্প মারে আতঙ্কে। মকরের শৃঙ্গে চড়ে চন্দক মীন, কুস্তীরের পুচ্ছে ঝোলে কর্কট, শুশুকের স্বক্কে বসে সিলমীন। অক্ষ-প্রাণ ধনপতির কোনো দ্যুত বক্ষ মাঝে, কেউ জলকুস্ততলে, কোনটি পদভ্রমণের ভেতর। জালিতলে আন্দোলিত কপিবর বলে, ‘জলজীবগুলি বড়োই অধীর, চঞ্চল। এ-জন্যই শ্রীরামচন্দ্র শ্রীলঙ্কা যাত্রায় বন্ধন করেন জাস্কাল।’ কাণ্ডার বুঢ়ন দেখে তিমিসিলটি দুই হনু মুক্ত করে বম্মীমেশানো মণ্ড যাঁচে। আতঙ্কিত রায়বংশিয়া-পাইকদল ছোটো ছইঘরের তলে। কাণ্ডারের নির্দেশে নানা ভেষজে সুবাসিত বম্মীমণ্ড আনে গাবরেরা। ক্ষীরখণ্ডের প্রতিটি মণ্ড যেন এক একটি ঘৃতঘড়া, দধিভাণ্ড। এক বুড়ি মণ্ড ভোজনে তৃপ্ত তিমিসিল চলে জলতলে। গড় হয় সর্বজন। কাণ্ডার বলে, ওহে নাইয়াদল, এটিকে বলে সাগরভেট। যখন কাণ্ডার হবে নোনা বায়ে সর্বদা ব্যবস্থা রেখে সুবাসিত বম্মীমণ্ডের।

দ্বিপ্রহর রাত্রি গতে স্নান হয় চন্দ্রকিরণ। জলতরঙ্গের শ্বেতবর্ণ বদলায়। নীলজলধি ধীরে ধীরে কৃষ্ণসাগর। কেবল তরঙ্গশীর্ষ স্ফটিকশুভ্র। একটি-দুটি অম্বু হতে একসময় সারা গগনজুড়ে জলদমালার চলাচল। শুরু হয় বিজলি চমক। কাণ্ডার নির্দেশে বাদাম নামায় গাবরদল। বজ্র গর্জনে ধনপতি এসে দাঁড়ায় ডালি উপরে। মধ্যরাত্রির এই নয়নমধুর রূপে বিহুল সাধু। ডিঙাতলে যে প্রবাহিত বারিস্রোত তাই যেন ভেসে চলে গগনতটে। জলধি আর জলদের মাঝের যে জগৎখানি তা যেমন ক্ষণস্থায়ী তেমনই নশ্বর। এ-জীবন কর্পূরের মতো নিত্য বিলীয়মান, দাপনি চিত্রের মতো অস্থায়ী, দীপশিখার মতো প্রাহরিক, জলডিঙার মতো অনিশ্চয়। চিরন্তন সত্য হল ওই সিন্ধুঘোটক যা গগনতট থেকে সাগরের অগ্নি কোণ হয়ে ছোটো আসে জলতরঙ্গের ওপর দিয়ে। তার দুই শ্রবণ উল্লস, গিরিশঙ্গের মতো নিশ্চল। পুচ্ছ অনুভূমিক, যেন অম্বরমুখী গাণ্ডীবের শিজ্ঞিনী। ঘোটকের সরব সপ্রতিভ পদধ্বনিতে বিলীন হয় ধনপতির মগরা আতঙ্ক। সে তড়িৎমালা দেখে, জলধি তরঙ্গে দোলে। ধনপতিকে ডিঙা ডালিতে বিচরণ করতে দেখে কাণ্ডার ভাবে মগরা-স্মৃতিতে আশঙ্কিত সাধু। ছয় ডিঙা নিমজ্জনে সমস্ত বারিদে দেখে ঘোরবর্ষণ, সব জলকণায় জলধি, প্রতিটি তড়িৎরেখায় অগ্নির দশ

কলা। কাণ্ডার ভাবে, সিন্ধুযান সাগরসংগমে জলতলে গেলে এমন আতঙ্ক স্বাভাবিক, যথার্থ। বীরবরের জান রণে, সাধুর প্রাণ পণে। ছয়ডিঙা ধন হারিয়ে ধনপতি বিষাদী। নব জলধরে সাধু ত্রাসিত ভেবে কাণ্ডার বলে, ভাবিত হয়ো না সাধু, ওই মেঘরাজি না বারিবাহনা না তড়িদ্গর্ভা। দেখো, আঘনের উত্তরা বায়ুতে জলদমালা ভেসে যাবে। তখন গগন হবে নির্মেঘ। জাগবে গ্রহ-তারা, হাসবে শশী। রাজহংসের মতো ভেসে চলবে দুর্গাবর।

মধ্যযামের এই সিন্ধুরূপে বিহুল সাধু। কর্ণের কাছে গিয়ে ডালিতে বসে। হতচকিত কাণ্ডার বলে, ‘তুমি এ কী করলে ছোটোসাধু, বিনাসনে বসলে?’ আপন শির-বস্ত্রখানি খুলে এগিয়ে দেয় সে। ছুটে আসে গাবরদলও। সাধু নিজ দেহবস্ত্রটি ডালিতে পাতে। তারপর প্রশ্ন করে কাণ্ডারে, তুমি কী করে বুঝলে এই মেঘমালার মতি? কী করে জানলে এই মেঘপুঞ্জ না ধারাদর, না বজ্রবাহন?

কাণ্ডার গগনতটে তাকিয়ে বলে, ওটি হল অলক দেয়া, চূর্ণ কুস্তলের মতো। দেখো, বণটি শুভ্র, দেহ নির্ভার। ওরা আপন রঙ্গে আসে, চলেও যায় নিজ মতিতে। ওরা হল গগনশোভা। কোনো ডর নাই হে ছোটোসাধু।

ধনপতি প্রশ্ন করে, কোন অশ্রুবাহে ভয় কাণ্ডারের?

হাসে বুঢ়ন। বলে, সাধু, যে কাণ্ডার একবার সিন্ধু পেরোয় সে কোনো কিছুতেই ভয় পায় না। নোনা বায় না পেরোলে যেমন কেউ কাণ্ডার হয় না হে, তেমন সাগর না ভাঙলে হয় না সদাগর। এই লবণযাত্রা শেষ করে দেখবে গ্রহ-তারা মেঘ-বারির সব মতি তোমার জানা। অলকের মতো বর্ষণ নেই কুস্তলেও। দেখো, চক্রবলয় ঘিরে তাদের বাস। বাদলমেঘ হল পুষ্কর। অবিশ্রাম ধারাপাত। মেঘকেশের মতো ঘন উর্গাতেও অবিরাম বর্ষণ। যত-না বর্ষণ তার চেয়ে বেশি দুর্যোগ সিঁদুরিয়া মেঘে। ঝঞ্ঝাও বড় বায়ুবাহ। তবে সদা সতর্ক থেকো সংবর্তে। মহাপ্রলয় অস্তে সপ্ত জলদের প্রথমখানি হে। বিষুণর মুখগহ্বর হতে এর সৃষ্টি। কালাগ্নির পর শত বৎসর ধরে সংবর্তে নিরন্তর বর্ষণ।

ধনপতি তড়িৎমালার দিকে দুই বাহু তুলে বলে, আর ওই জলদবিহারী বজ্রবাহী সিন্ধুঘোটক?

কাণ্ডার কর্ণখানি ঈষৎ দক্ষিণে ঘুরিয়ে বলে, চপলা, চঞ্চলা, ক্ষণপ্রভা। এ মেঘদীপে না আছে অশনি, না অগ্নি। নিরর্থক তর্জনগর্জন। ছোটোসাধু, সাগরযাত্রায় অগ্নিকলাগুলিতে চোখ রেখো। অগ্নিই জীবন, অগ্নিই শমন। অগ্নিবাণে ঝরে পরে মেঘবারি। সাগরযাত্রায় ওই মিষ্টপানি বড়ো আবশ্যক হে। শত ভাগে ভরে নাইয়া-গাবর। আবার ওই অগ্নিপিণ্ডেই জ্বলে ওঠে বৃহিত।

বজ্রাঘাতে ডিঙা প্রজ্বলনের উল্লেখে সাধু বিষণ্ণ। মগরার সেই আগ্নেয় স্মৃতি এখনও দক্ষ করে অন্তর। সাধুকে নির্বাক দেখে কাণ্ডার বলে, সাগরযাত্রায় যত প্রমাদ ততই প্রমোদ হে। তাই লবণজলের কাণ্ডার বারে বারে সাগরে ফেরে, সিন্ধুফেরত সাধু ফিরে ফিরে দরিয়ায় চলে। শোনো, অগ্নির দশকলার দর্শন মেলে জলধি বুকে। এরা হল ধূসার্চি, উগ্ৰা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সূর্যপা, কপিলা, হব্যবহা আর কব্যবহা। এই গগনতলে দর্শন মেলে অগ্নির সপ্ত জিহ্বা— করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, সুবর্ণা আর পদ্মরাগা। দেখো কিন্তু তাড়িত হয়ো না ছোটোসাধু। সব ক-টিই কামিনী। এবার ওঠ, শয়ানে যাও।

দ্রুত ধায় ডিঙা। আকাশতট বর্ণ বদলায়। মেঘমালা নিরুদ্দেশ। সব গ্রহ-তারার স্বস্থানে, আপন দুতিতে। নিশি গড়ায়। শত কেরয়াল সরব গমন ধ্বনিত। জলবাসী মীন, মকর, শুশুক নিশির শেষ গ্রহরে নৃত্যে মাতে দুর্গাবর ঘিরে। ভাবে, সমস্ত প্রাণীকুল চলে সমবেতে, এ-জীবটি সঙ্গীহীন, স্বজনহারা, নিঃসঙ্গ। আমাদের সংসঙ্গে আনন্দী হোক। ডিঙা যত এগোয় তত দীপ্তময় হয়ে ওঠে পূর্বদিগন্ত। কিছু পথ পরে দূরে জেগে ওঠে এক কলধৌত দ্বীপ, যেন ফণী শিরে মণি। শত নাইয়া-গাবর সমবেতে রোল তোলে— শঙ্খদহ, শঙ্খদহ।

ডালিতলের জীবগুলির নিদ্রা ভাঙে উপরের সোচ্চার রবে। চক্ষু মেলে দেখে এক অপূর্ব শ্বেতদ্যুতি সিন্ধুজলে। যেন কলধৌত নীলাম্বু। কপিবর গজদলকে বলে, তোমরা মুখগুলি শুণ্ডে ঢেকে বেশ মিতবাক। বাক্য ব্যয় নাই, বদনটিতে কেবল ভোজন। তা দেখবে তো শঙ্খদীপ, নাকি কেবলই কদলীবৃক্ষ নিধন?

গজদল বলে, ওহে শঙ্খ দুটি। একটি জলজ, অন্যটি গজজাত। ত্রয়োবিংশতি-বর্ষের গজের দন্ত হল শঙ্খ। শঙ্খধ্বনিত যেন অনন্তভাষা, গজশঙ্খ স্পর্শে তেমন পুণ্য সঞ্চয়। সমুখে দেখলে করজোড়ে গড় হয়ো।

কপিবর স্বগতোক্তি করে, একেই বলে হস্তিমূর্খ, পুণ্য সঞ্চয় করে গণ্ডাস্থিতে।

কাণ্ডার হাতে কর্ণ ঘোরে দ্বীপমুখে। ধীর লয়ে চলে দুর্গাবর। দ্বীপের নারিকল-গুয়া বনে বিহার করে চঞ্চল সাগরবায়ু। দোলে বৃক্ষদলের দিঘল পত্রগুচ্ছ। প্রতুষ হয় শঙ্খদ্বীপে। ক্ষেত্রমংকরী 'দুর্গা' নামে ঘোষণা দেয় রাত্রিবসানের। শঙ্খদ্বীপে ধ্বনিত হয় পাঞ্চজন্ম, দেবদন্ত, পৌণ্ড্র, অনন্তবিজয়, সুঘোষ ও মণিপুপ শঙ্খ।

ডিঙা ছোঁয় দ্বীপের কলধৌত শুক্তিময় বালুকাবেলা। কাণ্ডার বলে, ডিঙা বাঁধো।

## ৩৭ শঙ্খদ্বীপে ধনপতি

প্রত্যুষ হয় শঙ্খদ্বীপে। নীল জলধি মাঝে দ্বীপখানি যেন একটি শ্বেত শতদল। দুর্গাবরের শত নাইয়া-গাবর অবাক বিস্ময়ে সে দৃশ্য দেখে। সাধু ধনপতি ভাবে এ-বুঝি নিশ্চিন্ত। দুই করতলে নয়ন দু-টি মোছে। বোঝে যে শুক্তি জলধি তলে জন্ম নেয় এটি তার ভৌম বিকাশ। আঘন হিম্নাত দ্বীপখানির দিকে তাকিয়ে ধনপতি ভাবে কী তুলনা এ শঙ্খ সৌধের— সহদেবের মণিপুষ্পক, নকুলের সুঘোষ, যুধিষ্ঠিরের অনন্ত বিজয়, ভীমের পৌণ্ড্র নাকি অর্জুনের দেবদন্ত? সহসা প্রবল উচ্ছ্বাসে উর্মিমালার শ্বেতশিখর ভেঙে পড়ে দ্বীপতটে। ধনপতি দুই বাহু উর্ধ্বাকাশে নিক্ষেপ করে বলে ওঠে, ‘সাধু, সাধু।’ ফিরে তাকায় কাণ্ডার বুটন। অপ্রস্তুত বিব্রত সদাগর। শঙ্খদ্বীপের দিকে দক্ষিণ বাহুখানি তুলে বলে, ‘হাম্বিকেশ হস্তে পাণ্ডজন্য।’ হাসে বৃদ্ধ কাণ্ডার। ধনপতির পিতা জয়পতির সঙ্গে সে যখন দক্ষিণপাটনে আসে তখন শঙ্খদ্বীপের অপরূপ রূপে আত্মহারা হয়েছিল সেও। এখন কাণ্ডারের চক্ষুপ্রদীপ দু-টিতে স্নেহের টান। পদে পদে বর্ণবিভ্রাট। কিন্তু মন দাপনিতে এখনও যৌবনের সেই পটখানি ভাসে।

কাণ্ডার নির্দেশে বাদাম নামে, কেরয়াল থামে। কর্ণ ঘোরে দ্বীপ মুখে। ডিঙা চলে আপন বিলাসে। জলদতরঙ্গ সাথে বয়। দুর্গাবর স্পর্শ করে শঙ্খদ্বীপের বালুতট। ততক্ষণে পূর্ব দিগন্তে ওড়পুষ্পের রক্ত আভা।

সরব জলদ লতা বিস্তৃত বালুতটে ফিরে আসে বারে বারে। যেমন কাপড়ি সন্ন্যাসী অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হত দেব-সমুখে তেমনই আজানুবিস্তৃত ঢেউ ধৌত করে বালুকাবেলা। অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলির আসে স্রোত সঙ্গে। যেন অর্ধ-প্রস্ফুটিত নাল ফুল। যখন ঝাঁকে আসে কূলে শত পুষ্পের অর্ঘ্য পড়ে বিস্মুগপদে। কুলিরগুলি সংখ্যায় যেমন অগণিত, বর্ণেও তেমন বিচিত্র। দেহের উপরিভাগ উদিত রবির মতো রক্তাভ, দশ পদ পীতাভ লোহিত, চক্ষুমাল্য নীলা, তলদেশ পীতরাগ। তটে যখন সমবেত হাঁটে যেন তিতির ঝাঁক চলে প্রাত্যহিক বনবিহারে। কেউ কেউ দাঁড়ায়। দশ ভুজে বালুকাবেলায় গেহগারি গড়ে। নির্দোষ বাস্তব তলে বয় জলধি, ওপরে ভাসে পুনর্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষা। সুখনিবাসের চন্দ্রশালায় বিরাজ করে শশী। অনন্ত সাগর নিরন্তর আগম-গমনের এক যাত্রায় সঙ্গে করে নিয়ে চলে গৃহী কুলিরকে। অন্তবাসী ছিলে, এবার অনন্তে চলো, অনাদিতে প্রবেশ করো।

নীল বারিধি থেকে উদিত হয় লোহিত দিনমণি পূর্ব দিগন্তে। তার রক্তিম রাগ শঙ্খদ্বীপের নারিকল-গুয়ার দিঘল পত্রে, সিঙ্কুসারসের ডানায়, দুর্গাবরের হেমগৃহে,

শঙ্খদ্বীপের মুকুতাসুপে। ডিঙা কূলে ভেড়ে। ডিঙাগাত্রে গজিয়ে-ওঠা অজস্র জলপুস্পের কয়েকটি তুলে তীরে নামে কাণ্ডার। পুষ্পার্ঘ্যে বন্দনা করে শঙ্খদেবতা অগস্ত্য মুনিকে। ‘ফেরতযাত্রায় তোমার ছত্রখানিকে ষোলো উপচারে অর্চনা করব। উপস্থিত কয়েক প্রহরের আশ্রয় মাগি।’ কাণ্ডার প্রথমে সমুখে, তারপর বাম ও দক্ষিণে প্রণিপাত হয়। পেছন ফিরে নাইয়া-গাবরদের বলে, ‘এই লবণসমুদ্র মাঝে দ্বীপ-সরোবরটি সুমিষ্ট পানির। জলপাথিকের বড়ো সুখাশ্রয় এটি। বৃক্ষফলগুলি মিষ্ট, পক্ষীগুলি মধুরভাষী। গড় হও হে সর্বজন।’ করজোড়ে তীরে অবতরণ করে ধনপতি। একে একে নামে নাইয়া-গাবরদল। নত হয় বালুতটে। আঘন হিমে তটখানি ঈষৎ শীতল। বালু ওপরে এক আশ্চর্য কারুকৃতি। কোথাও সাগরস্রোত তীরে রেখে গেছে দিব্য পাটশাড়ি, কোথাও সাজিয়ে রেখেছে সারি সারি শঙ্খ, মুক্তা, শুভ্রিকুসুম। কুলির দশপদে এঁকেছে অনুপম আলিপনা। সিঙ্কুঘোটক মধ্যরাতে আপন আহ্নানে ছুটে গেছে কূল ধরে। তার দ্রুত গমনের বিস্তারী পদচিহ্ন বালুকাবেলায়। ডিঙা পেছনে রেখে সামনে এগোয় ধনপতি। তীর অতিক্রম করে ভূখণ্ডে পৌঁছে দেখে সামনে ঘন নীলদূর্বাভূমি। এ-বর্ণের কোনো প্রতিরূপ তার অজানা, অচেনা এর কোনো উপমা। শজিনাপত্র, শ্যামপলাশ, মরকতমণি, সূর্যবাহক হরিতাম্ব সবই নয়ননন্দন কিন্তু এ-শ্যামল অদ্বয়। যে ধনপতি করজোড়ে অবতরণ করেছিল তীরে সে এখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হয় তৃণক্ষেত্রটিতে। সমগ্র দেহ জুড়ে হঠাৎই সে অনুভব করে এক আশ্চর্য শিহরন। যেন কোনো অপ্সরার মায়াবী কুন্তল স্পর্শ করে আঁখিপল্লব, কপোল, অধোর, কর্ণলতিকা। এক মধুর সুবাস এই দূর্বাদলে। যেন কোনো প্রাচীন মদিরা যার মাদকতা মাতন তোলে প্রতিটি শোণিত কণায়। ধনপতির সাধ জাগে দুই করতলে এই সুরভি পান করতে ঠিক যে মুদ্রায় সাগরমন্ডন শেষে দেবতারা গ্রহণ ও পান করেছিল সিঙ্কু-সুরা। ধনপতির শ্রবণে প্রবেশ করে তৃণপতঙ্গের গীত। সাগরতরঙ্গের সিংহনাদ আর বৃক্ষশাখে পক্ষীকুলের সরব বাক্যালাপের বিপরীতে পতঙ্গ স্বর যেন কোনো অভিসারিকার নির্ঘোষ নিশিডাক। পঞ্চেন্দ্রিয়ে ধনপতি গ্রহণ করে শঙ্খদ্বীপের স্পর্শ, সুবাস, স্বাদ ও দৃশ্য। অনন্ত বিস্ময়ে দেখে দূর্বাপত্রে হিমার্ক। জলবিন্দুগুলি যেন হেমকণা, সুদূরবিস্তৃত হরিৎ ক্ষেত্রে দীপ্ত, দীপ্ত।

সিঙ্কুসারসের গগনবিস্তারী ধ্বনিতে উঠে বসে ধনপতি। এ যেন এক নির্ঘোষ আর তাই মুহূর্তে সচল হয়ে ওঠে নারিকলের দিঘল পাতা, সরব হয় গুয়াবন। সাগরতরঙ্গেও উচ্ছ্বাস, মহাকল্লোল। ধনপতি দাঁড়ায়। তার আলুল কুন্তল দোলে। হাঁটে ধনপতি। অসংখ্য নারিকল বৃক্ষশ্রেণী দু-পাশে। বৃক্ষতলে নতুন বর্ষের বৃক্ষদল। বৃক্ষস্থল জুড়ে অজস্র বস্মীকগ্‌হ, লবঙ্গলতা, ইকড়া বন, কনকধুতরা

ফুল। বনজঙ্গল অতিক্রম করে ধনপতি। দূর থেকে দেখে এক আশ্চর্য সাগরতট। সেখানে বিশালাকৃতি অজস্র শ্বেত শিলাখণ্ড। কোনোটি শুশুক দেহ, কোনোটি কুণ্ডীর, মকর, তিমিসিল, টমক, শিঙ্গা। সেগুলির ওপর বসে শতাধিক সিঙ্কুসারস। দিনের প্রথম প্রহরের উজ্জ্বল কিরণে পক্ষীগুলি যেন কপিল কন্তুরীমুগ। পক্ষ মেলে দু-টি সারস। একে একে বেশ কয়েকটি। ডানাতল রজতশুভ্র। নীলগগনে যেন ভেসে চলে নির্ভার শারদ দেয়া। কবুতরবিলাসী ধনপতির দু-চোখে অপার বিস্ময়। সে দেখে সিঙ্কুসারসের বৈভবী বায়ুউড়ান। তার গার্হস্থ্য চক্ষু দু-টি যেন গৃহাশ্রমের গণ্ডি অতিক্রম করে ভূ-পরিব্রাজনে চলে ত্রিবন্ধ মস্করা-দণ্ড হাতে। ধনপতির আঁখি-দাপনিতে সিঙ্কুসারসের গগনবিস্তারী বায়ুসন্তরণ।

হিরামন পাখির বাক উল্লাসে সংবিতে ফেরে ধনপতি। তীর ছেড়ে এগিয়ে চলে দ্বীপকেন্দ্রে। চোখে পড়ে মাকন্দবৃক্ষ-ঘেরা একটি দীর্ঘ জলাশয়। কাকচক্ষু জলে অজস্র কমল। সাগরবায়ুতে পদ্মরেণুর সুবাস সরোবর ঘিরে। ধনপতি জলে নামে। মেঘ বারিতে এর সৃষ্টি ও পুষ্টি। মাকন্দবৃক্ষের হিরামন পক্ষীগুলিকে দেখে ধনপতি বোঝে এ-কোনো সদাগরের রোপণ করা বৃক্ষ, বৃক্ষবাসী পক্ষীগুলিও তারই রেখে যাওয়া। কিন্তু সাগরের বায়ু-জলে মাকন্দবৃক্ষের পত্রগুলি বিস্তৃত, পক্ষীর ডাকটি প্রলম্বিত। কমলগুলিও সুবিশাল, যেন বিষুৱ শতেক দল নাভিপদ্ম। কমলপত্রে বসে রঙ্গ করে সাগরবাসী কূর্মযুগল। শঙ্খদ্বীপের দেবতা অগস্ত্য মুনি যাত্রা করেছে দক্ষিণা পথে। অক্ষশালা ও কমণ্ডলু হস্তে মুনিবর প্রত্যাগমন না করা পর্যন্ত বিদ্যা পর্বতের একনিষ্ঠ ভূমিষ্ঠ প্রণতি এবং কূর্মযুগলের অখণ্ড প্রেমালোপ। কমলবনের শঙ্খচূড় দম্পতি বলে, রতিহীন প্রেম আর যতিহীন বাক হল ফণহীন ফণী। তবে রতি হবে রতি পরিমাণ, চারি ধান্যে এক রতি, একখানি গুঞ্জাফল।

সরোবর অতিক্রম করে উকল্যা ও কুশতৃণের এক ঘন বন। সাগরবায়ুতে অনুপম তরঙ্গ সে বনে। তৃণদল নত হয় বাম থেকে দক্ষিণে আর বায়ুস্রোত বয়ে চলে এক তট থেকে অন্য তটে। দুই তরঙ্গের মাঝে ক্ষণিক বিরতি। তখন বনের একটি অংশ ফণীর মতো উন্নতশির। এই হিমকালে কুশবন ধবল, যেন বৃদ্ধ মুনিবরের পক্ষকেশ। অগস্ত্য মুনি যাত্রা করেছিল দক্ষিণের পথে, ধনপতি ভাবে তবে কি তারই বাস ছিল এই দ্বীপে? কুশবনের শ্বেত তরঙ্গে উদ্বেলিত ধনপতি দেখে বনের দূর প্রান্তে হেঁটে চলে বঙ্কল ও অজিন পরিহিতা এক নারী। ধনপতি ভাবে এ বুঝি দৃষ্টিভ্রম! আঁখি মোছে দেহবস্ত্রে। দ্বিপ্রাহরিক সূর্যের উজ্জ্বল আলোকে সেই অপরূপা বামা প্রবেশ করে গগনচূষী ঘন অরণ্যে। তবে কি এই অরণ্য কিরাতভূমি? নাকি ওই দ্বীপবাসিনী অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা! এ-জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর মেলে না সিঙ্কুস্বরে। শুধু এক অনতিক্রম্য তৃণতরঙ্গ বয়ে চলে ধনপতি আর

ওই বনবাসী বামার মধ্য দিয়ে। হিরামন পক্ষীর সমবেত সুরমূর্ছনা ভেসে আসে সাগরবায়ুতে। নীলাশু স্রোতে নিরন্তর মল্লার রাগ। প্রতিটি বারিকণা মল্লারী, নিত্য বসন্তী। সিঙ্কুজলে স্নানে নামে ধনপতি। উত্তাল তরঙ্গে দেহ পাতে, জললতায় শরীর ভাসায়। প্রতিটি রোমকূপে গ্রহণ করে মল্লার মূর্ছনা। জলধি জলে অনন্ত লহরী, অক্ষয় উচ্ছ্বাস। নিত্যদিন লোপামুদ্রা অবগাহন করে সিঙ্কুবারিতে। সিঙ্কুনারী সপ্তসাগরের মতো চিরযৌবনা।

অপরাত্নে ভোজনে বসে সদাগর, কাণ্ডার, নাইয়া-গাবর। পদ্মপত্রে ওদন পড়ে। ব্যঞ্জনের প্রথম পদ বাগ্যান, কুমুড়া, কচা, কাঁচকলা আদির সুত্তা। ঘূতে ভাজা পলাকড়ি ও ফুলবড়ির ব্যবস্থা মুগসূপ সাথে। কটুতৈলে ভাজা সিঙ্কু-চিঙ্গিড়ার বড়া পড়ে ভোজনপত্রে। দুর্গাবরের জলযাত্রায় ডিঙার বাহির খোলে অজস্র জল-উদ্ভিদ এবং শম্বকের বাস। তার এক ভিন্ন পাক সাগরমান ও নারিকল সাথে। বড়ো রঙ্গে খায় নাইয়া-গাবরদল। শেষে মধুর পায়স।

ঘরে ফেরে দূরযাত্রী সিঙ্কুসারস। শুশুকদল দিবানিদ্ৰা শেষে চলে বৈকালিক জলবিহারে। দিনমণি পাটে বসে সাগরকূলে। শঙ্খদ্বীপের সমুদ্রতটে দিনান্তের কমলা বর্ণ। দূর সমুদ্রে ভেসে চলে দু-টি ডিঙা। বিচিত্র দেহবর্ণের উডুকু মীনদল নৃত্য করে তরঙ্গশীর্ষে। ভোজন শেষে ডিঙাযাত্রী কুরঙ্গ, প্লবঙ্গ, কবুতর প্রস্তুতি নেয় নিদ্রার। নাইয়া-গাবরদের কর্মবিরতি এ-নিশায়।

আঁধার নামে। জ্বলে ওঠে ডিঙার শত বাতি। গীত-বাদ্যে সরব হয় দুর্গাবর। বক্কাল পানীয়ের ভাণ্ড খোলে। জলতলে সান্ধ্যবিহারে চলে মকর-কুস্তীর। ঘন হয় সিঙ্কুস্বর। গগনদীপের বাতি দোলে সাগরতরঙ্গে। রাত ঘন হয়। চন্দ্রেণু ঝরে পড়ে হিম সাথে শঙ্খদ্বীপের কুশবনে, নারিকল বৃক্ষশিরে, শুভিস্তূপে। প্রহর গত হয়। নীরব দুর্গাবর। গভীর নিদ্রায় ডিঙাবাসী। একা জাগর ধনপতি। বিলাপ করে শঙ্খদ্বীপের এমন নয়নাভিরাম নিশি-ঐশ্বর্য অথচ সঙ্গী নেই সহদর্শনের। কাতর হয় খুল্লনা বিরহে। বিলাপ করে একটিও বেউশ্যাবালা নেই এমন রম্য দ্বীপে, এমন মদনমঞ্জরি নিশীথে।

## ৩৮ দিগ্ভ্রাস্ত দুর্গাবর

কাণ্ডার বলে, গত হল ত্রিপ্রহর রাত্রি, এবার জাগো হে সর্বজন। জলযাত্রার সময় হল।

দুর্গাবরের শত নাইয়া-গাবর ওঠে। দেখে ঘন ঘুমে মগ্ন শঙ্খদ্বীপ। তৃতীয়ার শশী হাসে আকাশে। মুখখানিতে ঈষৎ অবগুষ্ঠন আঘন শিশিরে। আকাশ-বাতিগুলিও তাই, যেন ধ্যানরত মুনি। বটবৃক্ষতলের কুরঙ্গ দল ডিঙায় চড়ে রঙ্গে। বেশ হল শঙ্খদ্বীপে নিশিযাপন। জলপরিরা বড়োই নৃত্যপটিয়সী এ-সাগরবেলার। দক্ষিণী মুদ্রাগুলিও নয়ননন্দন। কপিদলও শঙ্খদ্বীপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কদলী ও কুঁদরু, দু-টিই অতীব সুমিষ্ট। পশ্চাৎ পদযুগলে কদলীবৃক্ষ ও কুঁদরুলতাকে চিরায়ু আশীর্বচনে কপিদল ডিঙায় ফেরে। দুগ্ধবতী গাভীদল এবং মহাবৃষভও শঙ্খদ্বীপের তৃণচারণে মুগ্ধ। মুগ্ধঘাস নয়, রসনার প্রকৃত বাসনা মেটে ভার্গবে। শঙ্খদ্বীপের নীল ও শ্বেতদূর্বা যেমন ঘন তেমন সুবাসী। মহানন্দে গলকষল দুলিয়ে ডিঙায় চড়ে বলদপী বৃষভসারি, সঙ্গী স্তনগর্বা গাভীদল। প্রহরগতের ডাক দেয় বৃক্ষবাসী পক্ষী। কাণ্ডার নির্দেশে সরব হয় শত কেরয়াল। বাদাম ওঠে। ‘হর-হর’ নাম নেয় সাধু, শত নাইয়া-গাবর। তটবাসী কুলির অধিপতি চন্দ্রের কাছে দশ পদে কামনা করে সাধুর শুভ সাগরপাটন।

ডিঙা চলে। জলতলে রঙ্গ করে উড়ুকু মীন, মকর, শুশুক। গগনে আর্দ্রা নক্ষত্র, ধাতটি আর্দ্র। চারপাশে আঘন হিম। সিক্ত সাধু-ডিঙার ছইঘরের আচ্ছাদন, শত ধ্বজ, বাদাম, বাহির দরগার বৃক্ষলতাবন। শুশুকদল কলধৌত বদনগুলি আকাশপানে তুলে দেখে হিম চাঁদোয়ায় আর্দ্রা সঙ্গে অবস্থান করে প্রশান্ত, সদালাপী ও কামরসিক মিথুন। বোঝে দিনটি হবে রবিহীন, ঘন হবে হিমকণা। চক্ষু নিমেষে সাগর আর গগন ঢেকে যায় শ্বেত ধূমে। অদৃশ্য হয় শঙ্খদ্বীপ। আঁখি মোছে নাইয়া-গাবরদল। অমন রজত কমলখানি গেল কোথায়, কোন মস্ত্রে মুহূর্তে লুপ্ত হল গুরু শক্তি! ধনপতি প্রতীক্ষা করে উষার। কিছু পল পরে রবিতাপে লুপ্ত হবে হিমকণা এবং প্রাণ পাবে দৃষ্টি। তখন দ্বীপখানি আবার নীলাশ্বরে পূর্ণশশী, নীলাশ্বুতে ইন্দীবর, নীলগিরিতে হিমাদ্রী। জলতলে তাকায় কাণ্ডার। অদৃশ্য জললতা আর জলবাসী মীন-মকর-তিমি। কেবল পথসাথি শুশুকদলের আঁখিমণিগুলি উজ্জ্বল, যেন অমানিশির গ্রহ-তারা। কাণ্ডার তাকায় দুর্গাবরের কর্ণ হতে পশ্চাতে। চোখে পড়ে না ছইঘরের সুবর্ণ আচ্ছাদনটিও। কাণ্ডার হাঁক দেয়, মতি ভালো নয় হে গগনের। দিনমণির দেখা কখন মিলবে তা তিনিই জানেন। দেউটি জ্বালো।

শত দীপে দুর্গাবর যেন রাজ-রাজেশ্বরী। হিম-আস্তরণে অদৃশ্য ছইঘরের হৈম আচ্ছাদন আবার হেসে ওঠে। পীতরাগে রাঙা হয় সারা ডিঙা। শঙ্খদ্বীপের পর এ-এক স্বর্ণকুট। যেন সাগরবাহিত হয়ে চলেছে অগস্ত্য মূনির সন্ধানে অগ বিদ্য পর্বতকে সচল করতে। বাহির দরগার কহ্লার, জলশিউলি, সিঙ্কুকুমুদ দল মেলে নিত্যধর্মে। হিমবারির নিশিন্মানে দেহ-মন নির্মল। প্রতীক্ষা করে উষালোকের।

নিত্যদিন সূর্য্যার্থে তাদের অহরারন্ত, সূর্য্যস্তবে দিবসযাত্রা। আর্দ্রা-মিথুন দৈব অঘয়ে কোথা সূর্য্য কোথা দিন! কলধৌত নিশিখানিই যেন বিস্তার পায় নিশান্তে। তাই নবরাত্রির সূচনা হবিদীপে। পুষ্পদলে নব প্রস্তুতি নিদ্রার। বিকশিত দলগুলি নয়ন মুদ্রে আবার কোরক। চক্ষু বোঁজে ডিঙাকাননের পুষ্প। বড়োই মধুর দিবাস্বপ্ন, ধীরে চলো হে নাইয়া-গাবরদল। মম্বুর হয় কেরয়াল। সরব চলনধ্বনি খানিক স্তিমিত। হিমালয় হতে উত্তরা বায়ু বয় সাগরবুকে। বাদাম-বাহিত দুর্গাবর চলে দক্ষিণপথে। এখন বায়ুই কাণ্ডার, হিমঢাকা অদৃশ্য জলযাত্রায় বায়ুই বাহক। নাইয়া-গাবরদল গীত গায় আহ্লাদে—‘তরুশাখা বাড়তে বাড়তে গগনে। কার্পাস তুলার গাছেও অজস্র ফুল। ওই দেখ ঘরের উঠানে পেখম মেলে নাচে ময়ূর-ময়ূরী। আমার শ্রবণে বজ্রকণ্ডল, গলে গুঞ্জমালা। ওহে নাগর, এ-সব ছেড়ে যাও কোন দেশে?’ সুরটি প্রলম্বিত, যেন কোনো দূরদেশ যাত্রীর উদ্দেশ্যে বলা। ভ্রমরাকুলের উজানি হতে দখিন দরিয়া একু দীর্ঘ পাটন। দুর্গাবরের গীতখানিও তাই সিন্ধুরাগের অশ্রুত আলাপে সুদূরবিস্তারী। ধনপতির ছইঘরেও প্রবেশ করে সুন্দরীর বেদনকথা। বাইরে আসে সাধু। দেখে সিত হিমবসনে জগৎখানি ঢাকা। বাদাম ও নিষন্নদণ্ডও অদৃশ্য। দৃশ্যমান কেবল ডিঙাযাত্রী মানবজন আর ডিঙাগাত্রের এক শত বিঘত জলবিস্তার। সাধু ভাবে কী বৈভবী এই হিমকণা যা গ্রাস করে রাতের শশী, দিনের রবি, মহাসিন্ধু, আদিগন্ত। অবিনাশী সনাতন সত্য হল দীপাঘ্নিতে উজ্জ্বল ডিঙাতলের শত বিঘত প্রবাহিত জললতা আর দীপমালার সর্পিসুবাস।

প্রহর গড়ায়। দ্বিপ্রাহরিক আহারের সময় গত হয়। কপিবর সরব রামনামে। বৃষভদল সোচ্চারে স্মরণ করে মহাদেবে। শুক-শারি পদ্য রচে, ‘গন্ধ বেন্যা উত্তম জাত, প্রাতঃ সিনান ভোজন রাত।’ স্নান সারে প্রত্যাষে কিন্তু ভোজনে বসতে রবি পাটে। রবির দেখা নেই, আহার জুটবে তো? শুক-শারির গৃঢ় প্রশ্ন কুরঙ্গের শৃঙ্গে বসে। কুরঙ্গ ভাবে, কী আশ্চর্য্য এই পক্ষী-যুগল, খাদ্য নিয়েও পদ্য বলে। ক্ষুৎপিপাসায় আমার তো সাধ জাগে গুঁতাতে। কুরঙ্গ মস্তকচালনা শুরু করার আগেই গাবরেরা ঢোকে নানান শস্যাদানা, ফলমূল, তৃণলতা নিয়ে। শৃঙ্গের পরিবর্তে লাঙ্গুল নাড়ে কুরঙ্গ, কপিবর ঝোলে ডিঙার ওলন রজ্জু ধরে। শুরু হয় সরব ভোজন। ফলাহার অস্ত্রে লোহিত বৃক্ষমরিচ খেতে খেতে শুক-শারি রচে নব পদ্য :

গৌরী কহেন, শুন, ওগো ত্রিলোচন,  
গন্ধ-বণিক কথা করহ শ্রবণ।  
ধনবান, দাতা, বলী বাণিজ্য কারণ,  
ব্যবসায়ে সদা রত শীতল বচন।

লক্ষ্মীর সেবন করে ব্যয় করে ধন,  
সাক্ষাৎ হইলে করে জ্ঞাতি সম্ভাষণ।  
সতত থাকয়ে তার জাতি প্রতি মন,  
তাহাকে বলি যে গন্ধ-বণিক লক্ষণ।

সাধু ও নাইয়া-গাবরদের আহারের বন্দোবস্ত চলে। চুপড়ি চুপড়ি চিড়া ভেজে জলে। ভাণ্ড ভাণ্ড দধি আসে। সঙ্গে নবাত, ফেনি, ক্ষীরখণ্ড আর কাহন পাঁচেক উত্তম মর্তমান কদলী। সাধুর মর্তমানে অগ্নিমান্দ্য তাই তার জন্য সুপক্ক চাঁপা।

ডিঙাসঙ্গী শুশুকদলও মধ্যাহ্নভোজনে ব্যস্ত। যে লালিম ওষ্ঠগুলি বিগত তিন প্রহর ছিল কুলুপ বদ্ধ, এখন ধীরে ধীরে মুক্ত হয়। সাধু-ডিঙার ক্ষীরখণ্ড উপাদেয়, খাজুরি-রসের নবাত আর শর্করার ফেনিগুলিও মধুর। এবার খানিক আমিষ ভোজন সিদ্ধমীনে। উন্মুক্ত করে ওষ্ঠ। প্রবাহিত জললতায় ভেসে আসে বাইন, বংশপত্রক, চন্দ্রক, অংশুকায় মীন। প্রবেশ করে শুশুক উদরে। একটি ভুজঙ্গী চলেছিল একখানি নধর ভেকে ভোজন সারবে বলে, সেটি ভোজ্য হয় শুশুকের। সে দৃশ্যে আতঙ্কিত একদল কূর্ম দ্রুত ধায় বিপরীত পথে। রঙ্গে লুটোপুটি যায় সিল মীন। দুর্গাবরের কেরয়ালে চড়ে নৃত্য করে খানিক। দু-চারিটি ডিঙায় উঠে খানিক দধি মাখে দেহে। দধি মঙ্গলময়, শীতল করে দেহ-মন।

অপরাহ্নে কাণ্ডার বুটনের শিথিল ত্বকে নতুন বলিরেখা। রাত্রি আসে কিন্তু হিমধূম কাটে না। চতুষ্পার্শ্ব তেমনই ঘন সিত আবরণে ঢাকা। না চক্ষুগোচর হয় দিকমণ্ডল, না গগনতট। এ-যাত্রা বড়ো অনিশ্চিত। অন্য কোনো ডিঙাও পড়ে না দৃষ্টিতে যার কাছে মিলবে পথনির্দেশ। সিঙ্কুসারসের যাত্রাপথ দিগদর্শী কিন্তু এই আঘন শিশিরপাতে কোথা সিঙ্কু কোথায়-বা সারস! যত পল কাটে প্রহর গড়ায় তত ছোটো হয়ে আসে দিনপর্ব এবং ধবল শিশিরকণায় মসি জমে। নাইয়া-গাবরদল ভাবে উজানিনগরের ঝাঙাফুলে এখন বুলে বেড়ায় প্রজাপতিদল, গোশালে ফেরে গো-পাল, দল মেলে সন্ধ্যামণি পুষ্প, শঙ্খ বাজে দেবালয়ে, গৃহে চলে হালিক, যাবকের রসে অধর মার্জন করে বেউশ্যাবালা, উলুক আঁখি মেলে ভ্রমরাকূলের নিসন্ধ্যা বৃক্ষে। দুর্গাবরে কিবা রাত্রি কিবা দিন। উত্তরা বায়ুতে বাদাম মেলে অনন্ত প্রতীক্ষা হিমমুক্তির। দেহবস্ত্রে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে জলদেবতার অষ্টোত্তর শত নাম। কিন্তু তাও কত প্রহর হে? নাইয়াদলের নির্বাক জিঙাসা পরস্পরে। কাণ্ডারের মুখখানি সন্দিহান, চক্ষু দু-টি সংশয়ী, ধবল ভ্রু-যুগল বন্ধিম। উত্তরা বায়ুর মর্জিতে কতদূর বাহিত হবে ডিঙা? যদি এমন দৃষ্টিবিভ্রমী দিবা কিংবা নিশিতে সর্পদেহে ঢোকে দুর্গাবর, তখন নিশ্চিত মৃত্যু ফণীর হলহলে। আর যদি দিক বিভ্রমে বাহিত হয় দূর দেশে, তখন ইহ জনমে উজানি প্রত্যাবর্তন দিবাস্বপ্ন। জলে কুস্তীর,

‘তমি, মকর আর ডাঙায় কেশরী, শাদূল, মন্ত মাতঙ্গ। দুষ্ট, খণ্ড, ঘুসি চৌকিদার ঘাটে-ঘাটে। নিশিটিও সুবিধের না, নৈঋতে যোগিনী। সুরসুন্দরী, মনোহরা, কনকাবতী, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী ও মধুমতীর মতি নঙ্গ দর্শন সূচার কিন্তু উলুকিকা, লোহজিহ্বা, রুধিরপায়িনী, প্রেতবাহনা, দন্তশূকরা-আদি বাকি ষট্পঞ্চাশতের কেউ যদি চতুর্থী নিশিতে উপস্থিত হয় সাধু ডিঙায়? বলে, বহুকাল কাটল এই ভববন্ধনে, এবার চলো স্কন্দালোকে! চর্চা করো স্কন্দপুরাণ, পাঠ করো চৌর্যশাস্ত্র।

হিমদেহে নিশি রং গাঢ় হয়। ঘন হয় জলদ স্বর। মীন, মকর, তিমি নিশিবিহারে চলে দূর জলে। নীলগিরির মতো বিশাল এক নীল তিমি চলে দু-পাশে জলতরঙ্গ তুলে। দ্রুত দূরে ধায় সমুদ্রধেনু। স্তন্যপায়ী আত্মজটি বুলে থাকে দুধকুণ্ডে। নীলচক্র অষ্টভুজা দেখে তিমি তার সর্বর্ণ কিন্তু গোত্রের অমিল বলে একটি জলদৈত্য আর অন্যটি কমল-কলি। জলদ তরঙ্গে কয়েক বার দুলে সে চলে দূরাশ্রয়ে। দুর্গাবরও দোলে জল-জোয়ারে। মতি বদলায় চঞ্চলা উত্তরা বায়ু! রাত্রি ত্রি-প্রহরে স্থিত হয় যাতে জনপদে না ঝরে বৃক্ষপাতা, না কাঁপে নিশিজাগর নগরপ্রহরী, না নড়ে খেতবাসী কাউতাড়ুয়া। দুর্গাবরের বাদাম নির্বায়ু, শত ধ্বজ নিষ্পদ, ডিঙা নিশ্চল। শত নাইয়া-গাবর কেরয়াল নামায় ডিঙা তলে। সবাক হয় দুর্গাবর। জল কাটে। বয়ে চলে অকূল দরিয়ায়। কাণ্ডার ভাবে সর্পদহ আর এক যোজন পথ। নিশির বাকি যামে সে-পথ অতিক্রম করবে ডিঙা। দহ প্রবেশের পূর্বেই দিনমণি উঠবে পূর্ব দিকভালে, হিম যাবে ঝরে, গগনে উড়বে সিঙ্কুসারস, দর্শন মিলবে দূরযাত্রী নাওসারির, জলধি হবে আদিগন্ত দৃশ্যমান।

ডিঙা চলে। প্রবাহিত হয় অনন্ত জললতা। উথিত হয় অগণন বারিতরঙ্গ। প্রহর গত হয়, নতুন প্রহর আসে। তাও যায় কিন্তু সর্পদহ অনাগত। একের পর এক প্রহর বাহিত হয় সাগরতরঙ্গে। গত হয় দুই দিগ্ভ্রান্ত নিশি। না দেখা মেলে শশীর, না রবির, না দহের। দিশাহীন যাত্রায় নাইয়া-গাবরদের শরীর অবসন্ন, কেরয়াল ক্লান্ত, দেহবস্ত্র স্বেদাক্ত। আতঙ্কিত সাধু তাকায় কাণ্ডার পানে। ডিঙা যে বেপথি! কী উপায় এই অকূল পাথারে? ডিঙা থামে কাণ্ডার নির্দেশে। নাইয়া-গাবরদল নির্বাক। বিষণ্ণবদনে তাকিয়ে থাকে জলতলের মীন, মকর, শুশুক পানে। ওদেরই ভোজ্য হবে দিকহারা ডিঙাবাসীজন। ডিঙাসঙ্গী শুশুকদল সে-রঙ্গেই যেন দর্শায় দেহকলা জলকেলি ও বায়ুঝাম্পে। ডিঙার বাহির দরগায় এসে ঘ্রাণ টানে সর্পিসুবাসে। ডিঙা ঘিরে নৃত্য করে। তারপর সমবেতে আসে ডিঙা মুখে। কাণ্ডার বৃন্দ দেখে শত-সহস্র শুশুক কাণ্ডারি হয়ে সমুখে চলে। যেন চৈত্রসংক্রান্তিতে শত-শত সন্ন্যাসী চলে চড়কতলায় শিবনৃত্যে। নাইয়া-গাবরদল হাতে নেয়

কেরয়াল। জল কাটে। ডিঙার চলনধ্বনি জাগে। রাজেশ্বরী সাধুডিঙা শত দীপে আগে চলে। জলতরঙ্গ ওঠে-নামে, বাহিত হয় বারিলতা। প্রহর কাটে। হিম ঝরে। জলে ভাসে সিঙ্কুসারসের পক্ষপালক। মধ্যাহ্নে দিনমণি হাসে মধ্যগগনে। দৃশ্যময় হয় অনন্ত অপার সিঙ্কুবিস্তার। ফিরে চলে শুশুকদল। কাণ্ডার অর্পণ করে ডিঙার সমস্ত বন্দীকমণ্ড দিগদর্শী শুশুকদলে। সোচ্চারে বলে, গড় হও হে সর্বজন সিঙ্কুজলের দিগ্গজগুলিকে।

নাইয়া-গাবরদের বদনগুলি আবার ফুল্ল। ব্যবস্থা হয় ডালিতলের জীবগুলির ভোজনের। চিড়া-দধি মাখা হয় ডালি ওপরেও। উপবাসে গেছে কত যে প্রহর! উৎকণ্ঠায় না ছিল ক্ষুধাচিন্তা, না তৃষ্ণাবোধ। প্রাণ ফিরে পেয়ে অভুক্ত জঠর চর্ব্য খোঁজে চোষা চায়। সাধুর ছইগৃহ হতে আসে ডালিভরতি দাড়িম্ব, ধামাপূর্ণ ক্ষীরখণ্ড, কান্দি কান্দি নারিকল আর পাটভরা ফেনি। সাধুর কনকথাল বসে ডালি ওপরে। সাধু ইচ্ছায় আজ সর্বজন সঙ্গে ভোজন। চিড়া, খই, দধি-আদির প্রথম মণ্ডটি সাধু দান করে জলধবাসী জীবকুলকে, ‘তোমরা অকূল পাথারে পথসাথি, রবি-শশীহীন প্রহরে অতল বাতি, পথভ্রান্ত জলপথিকের দিগদর্শী।’ জলযাত্রীদের ভোজন দেখে দু-টি ডিঙাবান্ধব সিলমীন। বিচরণ করে ডিঙাডালির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। এক ভাণ্ড দধি নিয়ে খায়, দেহে মাখে। বিস্ময়ে ভাবে সমুদ্র-ধেনুদের দোহন করলেও কি মিলবে এমন স্বাদু দধি! এমন অমৃতের স্বাদ পেলে তখন সকল জলধিজীবই হবে স্তন্যপায়ী।

কাণ্ডার বলে, ওহে খানিক পরে পাটে বসবে রবি, নিভে যাবে দিনমণি। রাত্রিতে সর্পদহ অতিক্রম। শশীকিরণে পার হব। ধীরে টানো কেরয়াল। শ্বাস নাও খানিক, জিরেন দাও দেহে।

## ৩৯ সর্পদহে সদাগর

হিম আবরণে যে অনন্তসিঙ্কু ছিল দৃষ্টি-অগোচর, দিনান্তের অন্তগামী রবিকরে তাই একমাত্র দীপ্যমান। লক্ষ জললতা নৃত্য করে আদিগন্ত জলধিতে। তিন দিন শয়ানে থেকে দিবাকরও এই দিনান্তে অংশুময়। তারই দীপ্ত প্রকাশ জলতরঙ্গে। কাণ্ডার বুঢ়ন পরম বিস্ময়ে চক্ষু মোছে। যে আঁখি-প্রদীপে তৈলাভাব, তাতে এত বিভা এল কোথা হতে? বড়োই উজ্জ্বল দেখি দরিয়া দিগন্ত, নিষঙ্গ দণ্ড আর ওই উড্ডীন ডিঙাধ্বজা! হতবাক নাইয়া-গাবরদলও। এ কি জললতা না কি রজত-তরঙ্গ? কেরয়াল টানে বিচ্ছুরিত জলার্কের সহস্র রশ্মি বিদ্ব ক করে মীন-মকরের চক্ষুমণি,

নাইয়া-গাবরদের নয়ন-তারা। জলচরগুলি চলে জলধিতলে, জলযাত্রীরা দুই করে গড়ে অন্তরাল।

জলপথ অতিক্রম করে দুর্গাবর। বৈকালিক ক্রীড়ায় মাতে ডিঙা-অতিথি এক কর্কট যুগল। কর্কটের জলরাশি আর তাই জলধির মতো উদার, অনন্ত, পবিত্র এবং অন্তর্মুখী। কিন্তু অশুভ যোগে সংগোপনে বেঁটন করার অভীক্ষা। ডিঙাবাসী মুষলী বারবার স্মরণ করায় সংসার-বন্ধন মায়া-মোহের বিকার। দেখায় কলধৌত নেতবস্ত্র ত্যাগ করে দিনমণির গৈরিক বেশধারণ। বোঝায় দিনান্তের যথাযথ কর্ম হল ইন্দ্রিয় সংযতপূর্বক শব্দাদির অগোচর, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, নির্বিকার, অচল ও শাস্ত্র নিগূর্ণ ব্রহ্মোপাসনা। বলে, দেখো গিরির মতো কেমন স্থিতিধি হয়ে ওঠে জলধি। মীন-মকর নিঃশব্দে অবলোকন করে দিনপতির নীরব প্রস্থান ও নিশানাথের মৌন প্রবেশ। শোনো, জলতরঙ্গে ধ্বনিত হয় বীজমন্ত্র। বিশভুজের দশকলা বন্ধ করে শাস্ত্র, সমাহিত, নিষ্পন্দ, মৌনী হও।

জলতলে নিরুদ্দেশ হয় দুই কর্কট। যাত্রাটি মুষলী-ভাবে নাকি মদন ভাবনায় কে জানে! উত্তরা বায়ুর গতি বৃদ্ধি পায়। স্ফীত হয় বাদাম, দ্রুত চলে কেঁরয়াল। কাণ্ডার দেহ জড়ায় উষ্ণ বস্ত্রে। নাইয়া-গাবরদল নেতখণ্ডে মুণ্ড-মুখ ঢাকে। বায়ু বহন করে আনে পদ্মের পরাগরেণু, কুসুমের সুবাস। সাধু ঘ্রাণ নেয় ঘন। সুগন্ধি হয়ে ওঠে সারা অন্তর। যেন ফুলশয্যার শয়নমন্দির। হ্লাদিত দুর্গাবরের শত নাইয়া-গাবর স্বাদু পুষ্পবাসে। কাণ্ডার ব্যস্ত গন্ধ বিচারে। পুষ্পগুলি সত্যই জলধি জলের নাকি মায়াকাননের? সৌরভটি নিবিড় হলে কুসুমগুলি গগনবিহারী। তখন কুসুমাসবে মাদকতা, কুসুমশরে দেহ জর্জর, কুসুমসুন্দরীর কুহক ঢাকে গেহ ছাড়া গ্রীহার। কাণ্ডার সোচ্চারে বলে, শীতল উত্তরা বায়ু আর নিশি সুরভি শুভ নয় হে। সতর্ক থেকেও সর্বজন। মতি রেখে কেঁরয়ালে। নিশিশেষে সর্পদহ অতিক্রম।

প্রহর পেরোয়। ষষ্ঠীর শশী ভাসে গগনে। হিমহীন সাগরললাটে যেন এক কলধৌত কর্ত্রিকা। একটি-দুটি নৈশবিহারী দেয়া ভেসে চলে চন্দ্রপথে। তখন খানিক আলো-অন্ধকারের রঙ্গরস। জলধি বিস্তারে তারই পটচিত্র। দূরে দক্ষিণে জাগে এক রজত আভা। যেন কোনো মহাশক্তি ভাসে অনন্ত তরঙ্গে। দুর্গাবর জল ভাঙে, পার হয় নিশি যাম। একসময় শুক্তিখানি রূপ নেয় এক রম্য রূপালি দ্বীপের। সাধু ধনপতি পরম বিস্ময়ে দেখে সিঙ্কুসৌধখানি। এ-হল রমণ্য দ্বীপ যার বৃক্ষশ্রেণী শোকহীন, বায়ু প্রীতিপ্রদ, পুষ্পগুলি রভস-গন্ধি, অলিদল রমিত, অঙ্গরাগুলি মোহন ভেল। রমণ্য দ্বীপের নিধুবনে চিরবসন্ত। সেথায় প্রতিটি বৃক্ষফল পয়োধর, প্রতিটি বৃক্ষশাখা শিবলিঙ্গ। রমণ্য দ্বীপের প্রতিটি বালুকণায় অনুরাগ, প্রতিটি শ্বাসে আসক্তি, প্রতিটি পক্ষীস্বরে রতিরাগিণী। কী এক মোহিনী

মস্ত্রে যেন আকুল হয় সাধুর মন! সে দ্বীপখানির চম্পক বৃক্ষে দেখে রম্ভনারী, তীরে দেখে স্থলপদ্মিনী, বায়ুতে পলাকড়ি লতার ভাসমান মূল। অষ্টঅঙ্গ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে ভোগ্য ওই সুরত ভূখণ্ড। সাধু বলে, ডিঙা থামাও। যামিনীর বাকি প্রহর গত হোক রমণ্য দ্বীপে।

কাণ্ডার বুঢ়ন হতবাক। ধূসর চক্ষু দু-টি তুলে দেখে সদাগরে। কী হল সাধুর— নিশিবিহার নাকি বায়ুকোপ? যে দ্বীপের বালুকাতট স্পর্শ করেনি কোনো ডিঙা কোনোদিন, সেখানে এই ত্রি-প্রহর রাত্রিতে কেয়াল বাঁধবে দুর্গাবর? ওদিকে গগনে বিরাজমান অশ্বেষা। কেতুর জন্মনক্ষত্র। আকৃতি কুণ্ডলাকৃতি নাগের। তাই প্রতিটি কর্মে বড়ো সঙ্গোপন, বেষ্টন, গোপন রমণ। প্রকৃতি কুটিল, অন্তর জটিল, মুখ গহুরে গরলভাণ্ডার। কী হবে সাধুর, কী ললাটলিখন শত নাইয়া-গাবরের? কিস্তি যুক্তি বৃথা, ভাবনা অর্থহীন। কাণ্ডার ভগ্ন স্বরে নাইয়া-গাবরদের বলে, দৃঢ় ধরো কেয়াল, কর্ণ ঘোরো দ্বীপমুখে। সামাল হে সর্বজন।

স্বর বদলায় দুর্গাবরের, নাদ বদলায় সিঙ্কুর। নিষ্পদ যান দ্বীপ পথে এগিয়ে চলে ধীর লয়ে। ধনপতি সদাগর নিশিযাপন করবে চিররম্য স্থলভূমে তাই পথ পরিবর্তন। কুমারী দ্বীপে পদার্পণের আবেগে উদ্বেল সাধু, উৎকণ্ঠিত কাণ্ডার। সাধু দেখে শশীকিরণে মায়াময় নারিকলবীথি, গুয়া বন, খেজুরি বৃক্ষ। সিঙ্কুবায়ুতে সরব দারুপত্র। কাণ্ডার দেখে লবণস্রোতের উত্তাল রূপ। আকস্মিক উদ্ভুঙ্গ এক উর্মিমালা সশব্দে ভেঙে পড়ে দুর্গাবরের বাহির দরগায়। দুলে ওঠে ডিঙা। সচকিত কাণ্ডার। এ-যে বাসুকির ফণ! এই দীর্ঘ লবণযাত্রায় এমন আক্কেলশী লতা এমন অসূয়া তরঙ্গ একটিও দেখেনি নাইয়া-গাবরদল। যত দ্বীপ সন্নিহিতে চলে ডিঙা ততই উত্তাল হয় তরঙ্গ। সাধু-নির্দেশে দ্বীপ পরিক্রমা করে দুর্গাবর। সন্ধান করে সেই সংযত সাগরপানি, সেই সংহত বালুতটে যেখানে নিরুদ্বেগ ডিঙা বাঁধবে কাণ্ডার। দ্বীপ পরিক্রমা চলে। সরব হয় কেয়াল, ঘন হয় গাবর-গীত, রুম্ব হয় তরঙ্গধ্বনি, তীক্ষ্ণ হয় দ্বীপবায়ু। শত-সহস্র তরঙ্গ কেশরীর মতো সদর্পে আসে, ফিরে যায় প্রত্যাগমনের নির্যোষে। গত হয় নিশিপ্রহর। শশীমুখ ঢাকা পড়ে সিঙ্কু পানিকণায়। নাইয়া-গাবরদল শ্বাস নেয় ঘন। স্বেদজলে দেহ ভেজে। শশী ডোবে সিঙ্কুজলে। নেভে গ্রহ-তারা। রাঙা হয় পুবাকাশ। সিঙ্কুসারস ঘোষণা দেয় নবদিনের। দিনমণি ওঠে। ছইগৃহের দ্বারে দাঁড়িয়ে সাধু ভাবে সত্যি আঁখি-দীপের সর্পি শুকিয়েছে কাণ্ডারের।

অর্ধশত নাইয়া-গাবর নিদ্রা যায় অবসাদে। ভাসে দুর্গাবর, রমণ্য দ্বীপের শান্ত সমাহিত তীর সন্ধান চলে ধীর লয়ে। ডিঙা তলের মীন, শুশুক, তিমিদল সাধুর অসাধ্য কর্ম দেখে। প্রহর গড়ায়। ডালিতলের জীবগুলির ক্ষুধা জাগে। সরব হয়

নানা স্বরে। ক্ষুধার প্রহেলিকা রচে শুক-শারি। কাণ্ডার বুঢ়ন অবসন্ন দেহ পাতে ডালির ওপরে। কর্ণ ধরে এক জোয়ান নাইয়া। হ্লাদিত হয় সাধু। এবার ডিঙা স্পর্শ করবে বালুতট আর কুমারী রমণ্য দ্বীপে প্রথম অঙ্কিত হবে মানবকুলের পদচিহ্ন। সাধুর তড়িনায় নিদ্রা ছেড়ে উঠে পড়ে নাইয়া-গাবরদল। সরবে টানে কেরয়াল। সাধু ঘোষণা দেয় সর্বজনে পারিতোষিকের। যত মহার্ষ-বস্ত্র ওই দীপে—মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য, গোমেদ, বজ্র, বিক্রম, পদ্মরাগ, মরকত, নীলকান্ত—সবের অংশীদার হবে তারা। ভোজনের ব্যবস্থা হবে চতুর্দশ পদ ব্যঞ্জনে। বক্কাল পানীয় মিলবে অফুরান। মঘা নক্ষত্রের সপ্তমী নিশিখানি হবে অকূল রঙ্গের।

চিড়া-দধি-খণ্ডে ভোজন সেরে শত নাইয়া-গাবর সোৎসাহে তীর খোঁজে। দিনমণি মধ্যগগনে হাসে। ঘন হয় সিঙ্কুস্বর, উত্তাল হয় সাগরবারি। নাইয়া-গাবরদলের শিলা-কঠিন পেশি ধাওনি দণ্ড টানে পণ রেখে প্রাণে। ডিঙা ধায় দ্বীপ মুখে। তীর প্রত্যাবর্তী তিন তরঙ্গের উদ্দাম পরিঘাতে আবার দূরস্থানে দুর্গাবর। সারা অপরাহ্ন কাটে ডিঙা ও তরঙ্গের প্রতিযোগে, বিরোধনে, সংঘাতে। দিবাবসানে দিনমণি চলে সাগরতলে। অবসন্ন বিষণ্ণ নাইয়া-গাবরদল তাকায় সাধুপানে। তখনই ডিঙাতলে তৈরি হয় এক গভীর দহ আর জোড়া জলকূট ভেঙে পড়ে ডিঙা ডালিতে। যেন বজ্র পড়ে গুয়া বনে। কাণ্ডার বুঢ়ন সোচ্চারে বলে, 'সামাল সামাল, মাতাল পানি।' তার সতর্ক ধ্বনি মেলাবার আগে দ্বিতীয় ঢেউ ডিঙা চড়ে। সঙ্গে কুলির, কূর্ম, শুশুক, অষ্টপদ। দিনমণি যখন প্রবেশ করে জলধি গর্ভে, তৃতীয় জলস্তম্ভের ঘন আঘাতে দুই নাইয়া কেরয়াল-সহ সিঙ্কুজলে। আতঙ্কে সমবেত সোচ্চারে নাইয়া-গাবরদল। দিনাস্তের ধূসর জললতায় খানিক দূরে ভেসে ওঠে একে একে দুই নাইয়ার মুণ্ড। আবার অদৃশ্য হয় তরঙ্গতলে। একখানি দীর্ঘদেহী তিমিস্থি চলে সান্ধ্যভোজনের জন্য একটি পুষ্ট তিমি সন্ধানে। এক নাইয়ার দেহবস্ত্রটি ভাসতে দেখে ভাবে বুঝি কোনো নবজীবের সৃষ্টি হল লবণজলে। সানন্দে গ্রাস করে বস্ত্রটি। বড়োই বেস্বাদ! নাইয়া দু-টিকে দেখে দাঁড়ায়। কিন্তু আগের বস্ত্রটির মতো এ-দুটিও স্বাদহীন কি না ভেবে বাঁক নেয় ভিন্ন পথে। কাণ্ডার হাহাকার করে, এই বুঝি আঁধারে ঢাকে সিঙ্কুজল। আর এক উদ্ভুঙ্গ স্রোতে দুই নাইয়া ভেসে আসে ডিঙা কাছে। তখনই রশি ছোঁড়ে ডিঙাজন। সস্ত্রস্ত দুই নাইয়া সতর্কে রশি বাঁধে দেহে। তারপর ধীরে ধীরে দেহ দু-টি ডিঙায় উত্তোলন। কাণ্ডার বুঢ়ন সোচ্চারে বলে, দ্বীপ থাক দ্বীপে। করজোড়ে গড় হও। তারপর চলো সর্পদহ মুখে।

অবসন্ন ডিঙা ধীর লয়ে বয়ে চলে। সাগর প্রশান্ত, তরঙ্গমালাও শমিত। পিছনে জেগে থাকে কৌম ভূখণ্ড। জলবেড়িতে বাঁধা থাকে রমণ্য দ্বীপ। কাণ্ডার বলে,

দক্ষ ও প্রজাপতির দুই কন্যা বিনতা ও কদ্র। দুই ভগিনীর শুভবিবাহ হল কশ্যপ সঙ্গে। পত্নীদের কাছে জানতে চাইল কী বর চায় তারা। কদ্র কামনা করল এক সহস্র নাগ এবং বিনতা যাক্কা করল দুই গুণধর সন্তান। যথাসময়ে কশ্যপের ঔরসে কদ্র সহস্র এবং বিনতা দু-টি ডিম্ব প্রসব করল। পাঁচ শত বৎসর গতে কদ্রের ডিম্বগুলি হতে সহস্র বৎসরের জন্ম হল। বিনতার ডিম্ব দু-টি অক্ষত। অধৈর্য বিনতা ভেঙে ফেলে একটি ডিম্ব। তা হতে জন্ম হল অপুষ্ট উরুহীন অনুরূ। এই অনুরূ হচ্ছে অরুণ। রুপ্ত অরুণ মায়ের ধৈর্যহীনতা ও সতার প্রতি অসূয়ার কারণে অভিষাপ দিল পাঁচ শত বছর দাসী হয়ে থাকতে হবে কদ্রের কাছে। যদি দ্বিতীয় ডিম্বটি ধৈর্য সহকারে লালন করে তাহলে যথাসময়ে জন্ম হবে এক পূর্ণদেহ সন্তানের যে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে বিনতাকে। সেই দ্বিতীয় ডিম্বখানি থেকে জন্ম হয় গরুড়ের, যার হাতে মুক্তি মেলে বিনতার। তখন গরুড়ের ওপর কদ্র ভার দেয় নাগগুলি লালনপালনের। এই রমণ্যক দ্বীপে বেশ কিছুকাল বসবাস করেছিল বিনতা ও কদ্র। কদ্রের সহস্র সন্তানের বাসস্থল সর্পদেহে। ডিঙার দু-পাশে নজর রেখে হে।

সপ্তমীর শশীকিরণে প্রতিটি জললতাই যেন কদ্রের সন্তান। কোনোটি ফণধর বাসুকি কোনোটি ফণহীন জলবোড়া। নাইয়া-গারবদল ডঙ্ক ভয়ে জড়সড়। কেরয়াল জল ছেড়ে গগনমুখী। দুর্গাবর সাগরজলে স্থবির। কাণ্ডার বলে, এত ডর কীসের? মহালতার সব ক-টি মহাশয়। শোনো তাহলে দশ নাগের কাহিনী। লখা বাপধনের বাসরগেহে যখন অনন্তলতাকে যেতে বলল পদ্মাবতী, সে সম্মত হয়নি হে। বলে তার গরলে সে ধ্বংস করতে পারে ত্রিভুবন কিন্তু—

মনিষ্য দংশিতে আমি না হয়ে উচিত,

যশ পৌরুষ নাই শুনিতে কুছিত।

মহাপদ্মা লতার বাক্য হল ত্রিভুবনের যত বীর তার দর্শনে ভঙ্গ দেয় রণে। বলে—

অক্ষির নিমিখে আসি সকল বিনাশি,

মনিষ্য দংশিতে আমি বড় ঘৃণাবাসি।

করুট প্রণমিয়ার কথাটি শোনো—

সমান পাইলে আমি সবংশে বিনাশি,

তবেতো প্রশংসা হয়ে লুকেতো প্রশংসি।

বৈকল্প বলে তার গরলের যোগ্য একমাত্র ইন্দ্র। তার রুচি নাই মনুষ্যে—

তত্ত্বমন্ত্ৰ কিবা জানে মনিষ্য ছায়ায়,

ইহাকে দংশিলে আমা কে বুলিব ভাল!

মনুষ্যদংশনে বিরাগ সকলের। উৎপল লতা বলে—

এ-কর্ম আমার সেবকে ওই পারে,

তারে করিবারে বল আমি সকলেরে?

তক্ষক বলে পরীক্ষিতে সে দংশন করে ব্রহ্ম শাপের তরে কিন্তু আর নয়—

সেই হনে মনিষ্য দংশিতে করি ঘৃণা,

দংশিবারে পারে লখাই সর্প একজনা।

সেই লতাটি হল পাণ্ডুর। তার জবাব হল যাকে মান্যতা দেয় সকলে, সে এমন কর্ম করে কেমন করে?

তাতে তুমি অল্লজ্ঞান কর আমরা,

দংশিয়া দিবার বল মূর্খ বালকেরে?

কুলিক বলে—

পরিণাম করি আমি খেমা করি যাই,

আরজন হৈলে তারে গণ্ডুষে মিলাই।

বাসুকি উত্তরই দিল না পদ্মাবতীর বাক্যে। অবশেষে কালনাগিনী। লখা বাপধনকে দংশনের পূর্বে তার সে কী ক্রন্দন সাধুর মন্দিরে! নিদ্রিত লখার তিনটি পদাঘাতের পর সে দংশন করে বাপধনের দক্ষিণ চরণে। তাই লতাতে ডর নাই হে। যে-যার গেহগারিতে সুখে থাকুক। আমরা করি আমাদের কর্ম। আর এই ডিঙা বন্ধনী দিই চাঁড়-ঈষরের মূলে। বিষ লতাগুলি হবে বনলতার মতো শীতল।

যামিনী চলে প্রত্যুষ মুখে। নিশান্তের শশীকিরণে কলধৌত জললতা। সঙ্গী কঙ্কর নন্দন। সর্পদহের নাগধ্বনি ভেসে আসে বায়ুপথে। যেন ঘন শ্বাস ছাড়ে বাবুবীথি। দূর হতে দুর্গাবরের নাইয়া-গাবরদল দেখে জললতার ওপর নৃত্য করে শত-সহস্র অর্কর, অনীল, অপরাজিত, অশ্বতর। যেমন তাদের সুচারু রূপ তেমন নৃত্যের মুদ্রা। বুঝি এদের নিকটেই নৃত্যকুশলতা অর্জন অপজন্মা মঞ্জুকেশী, সুকেশী, সুলোচনা, সৌদামিনী, দেবদত্তা, মনোরমা, সুনন্দা আদি পঞ্চদশ অঙ্গরার। যত ডিঙা এগোয় তত নিবিড় হয় নৃত্যগীত। আদিক, আপূরণ, আপ্ত, আর্যক আদি নাগ মাতে তাণ্ডবে। কাণ্ডার বুঢ়ন বলে, সতর্কে কেরয়াল টানো হে। যেন নৃত্যে তাল ভঙ্গ না ঘটে নাগকুলের।

ডিঙা চলে কালিয়দহ বেয়ে। সেখানে বাস কঙ্কর প্রধান পাঁচ বৎসের। শেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কূর্ম ও কুলিক নিশানাথের বন্দনা করে মহানৃত্যে। ক্রমশ ন্মান হয় নিশিকুসুম। প্রাগ্জ্যোতিষ বিভায় উজ্জ্বল হয় পূর্ব দিগন্ত। ধূসর বর্ণ ছেড়ে জলধি ধারণ করে নীলাম্বর। গজশুগুরুপী ইরাবৎ আরতি করে দিনমণির। তার সঙ্গী কুঞ্জর, কুমুদ, কৌরব্য, কালীয়ক, কন্মাস। বয়ে চলে দুর্গাবর সুদীর্ঘ সর্পদহ।

দিনমণি চলে দিবা পর্যটনে। গত হয় একের পর এক প্রহর। সারা জলপথখানি জুড়ে কেলি করে শত সহস্র কঙ্ক-নন্দন। প্রতিটি তরঙ্গশীর্ষে ক্রীড়ামতি জ্যোতিক, তিত্তির, দধিমুখ, ধনঞ্জয়, নিষ্ঠানক, নীল, পিঙ্গল, পিঞ্জরক, পিণ্ডারক, পুঙ্কর, পুষ্পদংষ্ট্র, পূর্ণদংষ্ট্র, বামন, বালিশিখ, বিমলপিণ্ডক, বিরজা, বিশ্বক, বিশ্বপাণ্ডুর, মণিনাগ, মুদগরপিণ্ডক, মুমুদাক্ষ, মুষকাদ, মহোদর, শঙ্খ, শঙ্খমুখ, শঙ্খশির, শবল, শ্রীবহু, শল্যক, শালিপিণ্ড, সংবর্তক, সুমনা, হরিদ্রক, হালক, হস্তিপদ, হস্তিভদ্র, হেমগুহ। দিনান্তে দিনমণি যায় সাগরমন্দিরে শয়ানে। ওড়পুষ্পের রক্তরাগ সিদ্ধু লতায়। শত লঙ্ককবর্ণা প্রভাকর নাগ শির তোলে তরঙ্গশীর্ষে। অষ্টমী গগনতটে তারই রক্তিম আভা।

বয়ে চলে দুর্গাবর নিশিতরঙ্গে।

## ৪০ রামের জাঙ্গল

তরঙ্গ ভেঙে ভেসে চলে সাধুডিঙা। আকাশে অষ্টমী-ইন্দু। তারই তলে মধ্যযামে অষ্টমঙ্গল সিদ্ধুঘোটক ছুটে চলে সাগরজলে। পুচ্ছ, বক্ষ, খুর চতুষ্টয়, কেশ ও মুখ এই অষ্ট অঙ্গে বিচ্ছুরিত হয় সিতকিরণ। ঘোটকটি লঘুপদ কিন্তু ডিঙাটি অবসন্ন। নিদ্রাতুর কেরয়াল, সুখস্বপনে জলদ্রোণি।

কাণ্ডার বলে, বহুযোজন হে সমুখের পথ। চিড়া-খণ্ডে ভোজন সেরে শয়ানে যাও আধা-নাইয়া। বাকি আধা ধীর চলো। বায়ু অনুকূল, তরঙ্গও সংযমী। অর্ধরাত্রি গতে হস্ত বদল কোরো। আর ডালিতলের জীবগুলিকে ভোজ দিও বেশি করে। রাত্রখানি দীর্ঘ।

ভোজন প্রস্তুতিতে আবার প্রাণচঞ্চল দুর্গাবর। ডিঙাতলে কুরঙ্গদল চর্বণ করে সহস্র কিশলয়। ইন্দ্র হল সহস্রনেত্র, বিষ্ণু সহস্রচরণ, সূর্য সহস্রকিরণ আর বোদালমীন সহস্রদংষ্ট্রা, তাই কুরঙ্গদলের সহস্রভোজনে মতি। কথের আশ্রমে মেনকা-কন্যা শকুন্তলাও নিত্যদিন কুরঙ্গদলে সহস্র পর্ণে ভোজন করাত। ভক্ষণরত কপিদল রামরাজ্যের কথায় মগ্ন। প্রপিতামহ-প্রপিতামহীর নিকট আপন কর্ণে শোনা রামরাজ্যটি ছিল কদলী বনে চিরহরিৎ। সীতামাতা পরম আহ্লাদে কদলীপত্রে কদলীকুসুম আর কদলীদণ্ডের ব্যঞ্জন খেত। কদলী মান্দাসে চড়ে গতায়াত, কদলী ক্ষারে নেত্রবস্ত্র ধৌত করা, কান্দি কান্দি কদলী ভোজন, কদলী নারী সঙ্গে মধুভাষ— এমন সর্বগুণ বৃক্ষ নাই হে। আর ত্রিপুরী দেশে কদলীনগরে বাস ছিল

যে কুরঙ্গগুলির তাদের নাম ছিল কদল। তাদেরও বদভ্যাস ছিল বসন টানার। শকুন্তলা, প্রমীলা আদি কামিনীগুলির কী বিড়ম্বনা বল দেখি! সাধুর গৃহবাসী পারাবতকুলের নিত্য কর্ম হল রঙ্গ-রং, ধর্ম হল ষোড়শপদ ভোজন। সিংহলযাত্রীরা দেউলবাসী, তাই ভক্তিভাবে তারা স্বপ্নাহারী। বাটুলা, চিনা, মাড়ুয়া খোঁটে দু-চারিটি। মধ্যে মধ্যে নাম নেয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের। শুক-শারি যুগল চলেছে সিংহলবাসী স্বজনদের সঙ্গে দিয়ে উজানি নগরে আনয়ন করতে। তারা রচনা করে প্রহেলিকা। শিববাহন বৃষগুলির হিমালয়সদৃশ বর্ণ, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ, ত্রিলোচন। মধ্য নয়নটি শ্বেত অঙ্গকেশে অঙ্কিত। সকলে ভাবে তারা বুঝি দিগম্বরের ধ্যানে মগ্ন। কপিকুল নিকটে এসে সযত্ন পর্যবেক্ষণে বোঝে উন্মেলিত কামুক নয়নে তারা মগ্ন দেখে সিংহলগামী গাভীদলে।

ব্যবস্থা হয় নাইয়া-গাবর ভোজনেরও। চিড়াতে দুধ, কদলী, নারিকল, ফেনি, খণ্ড পড়ে। তার সুবাসে ম-ম করে ডিঙা। ভোজনে বসে অর্ধশত নাইয়া-গাবর। যত দিন কাটে, নিশিভোজনের সময়টি হয়ে ওঠে তত নীরব। মনে জাগে ভ্রমরাকুলের গেহগারির কথা। কারো মনোবেদনা নববধূর জন্য, কারো মনকথা গর্ভবতী প্রৌঢ়া পত্নীটির কারণে, কারো মনঃপীড়া পরকীয়া যুবতী হেতু। অজস্র বামা-রামার অশ্রুত নাম সংকীর্তন দুর্গাবরে— অমলা, বিমলা, চাঁপা, কমলা, ভারতী, পদ্মাবতী, রতি, কলাবতী, বল্লভা, দুর্লভা, রম্ভা। অর্ধশত নাইয়া-গাবর ভোজনে সেরে কেঁরয়ালে বসে। বাকি অর্ধশত ফলাহারে স্মরণ করে হিরা, তারা, মদনমঞ্জুরি, কৌশল্যা, যশোদা, রোহিণী, মন্দোদরী। মনের নানা অনুরাগ। কখনো মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, জ্ঞাতিজন, বান্ধবজনে, গো-ছেলির জন্য, কখনো-বা গৃহবাসী সারমেয়, মার্জার, শশারু, নকুল, কূর্ম, হিরামনটির কারণে। সবাক হয় ডিঙাবাসী মুঘলী। তাদেরও বাস গৃহে। সমস্ত সত্য প্রতিষ্ঠা পায় তাদেরই কণ্ঠধ্বনিতে। বিস্মরণ হলে চলে কী করে! সাধু ধনপতি খই-দুধে নিশি-আহার সেরে তাকায় অকূল জলবিস্তারে। সরব সিঙ্কুবারি কিন্তু তবু যেন এক অভাবিত সুদূরবিস্তৃত নিস্তন্ধতা ডিঙা ঘিরে। এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতাও যদিও ডিঙায় শত নাইয়া-গাবর। ধনপতি ভাবে নিঃসীম অস্বরতলে অতল জলধিতে এমনই কি অবাস্তুর সব সাধু আয়োজন? সত্য শুধু ওই মুঘলী স্বর?

বদলায় প্রহর। জাগরিত হয় নিদ্রিত নাইয়া-গাবরদল। পরিবর্তিত হয় কেঁরয়ালের করতল। বুড়ন শয়ানে যায়। প্রধান নাইয়া কর্ণ ধরে। শ্রোত ভাঙে শুশুক। নিশিবিহার সেরে গৃহে ফেরে তিমিঙ্গিল। গগনে বিরাজ করে উত্তরফল্লুনা নক্ষত্র। প্রতীক শয্যা। পূর্বাকাশের রং পরিবর্তিত হয় দেখে শয়ন গোটায় নক্ষত্র। সূর্যদেবের অশ্বগুলির ইতোমধ্যে চণক ভোজন সমাপ্ত। উষ্মক, বৃহতী, জগতী রথ

পরিক্রমা শেষে জগৎ পর্যটনে প্রস্তুত। অনুষ্ঠুভ, পঙ্ক্তি ও গায়ত্রী লক্ষ করে গোধূলিতে যে অগ্নি গ্রহণ করেছিল সূর্যের সব প্রভা তা প্রভাতে ধীরে ধীরে সূর্যে ফেরে। এটিই যাত্রার শুভক্ষণ। সপ্ত অশ্ব সমবেতে চলে ধরাধামে।

নিশিগতে বর্ণময় পুবাঙ্গন। সপ্ত অশ্বের শুভ কেশরে পূর্ব বারিধি কলধৌত। কলা, ক্ষণ, পল, প্রহর গতে অনন্ত নীলাম্বর সৌধশিখরগুলি রজতশুক্ল। উষিক, বৃহতী, জগতী আদি সপ্ত রথবাহীর নয়নমণির নীলবর্ণে সিঙ্কুনীর নীলিম। জলতরঙ্গে ভাসে নীলোৎপল শতদলে। পদ্মপত্রে জলার্ক হাসে। গগন জুড়ে শত-সরস বালরবির মহারঙ্গ। নীলপুচ্ছ একটি শ্যোনপক্ষী মধ্যাহ্নে মধ্যগগন হতে অবলোকন করে সে দৃশ্য। হ্রুদিত হয় নিশি গগনের অগণিত নক্ষত্রের মতো দিন গগনটিও অজস্র জ্যোতিষ্ক পেল। মহানন্দে একটি মীনেন্দ্র ধরে দুর্গাবরের নিষগ্ন দণ্ডে বসে আহার সারে। ভোজন করে সাধু, কাণ্ডার, নাইয়া, গাবরদল। ডালিতলে দু-কুড়ি রজ্জা কোলে কপিবর বলে, ‘শ্রীরামচন্দ্রের কপি সেনাপতি ছিল নীলবীর। সে মূত্রত্যাগ করেছিল রাবণরাজের স্বর্ণ মুকুটে।’ কুরঙ্গকে প্লবঙ্গ বলে, ‘ওটি রাম হস্তে রাবণরাজের শিরচ্ছেদের পর। তার পূর্বে শত হস্ত দূরে ছিল লঙ্কাপতির রথ হতে।’ বিষাদী নীলক ভাবে তার সপ্তজাতি বয় সূর্যের যান আর তার যাত্রা সাধুর ডিঙায়। সিংহল নগরে তার ললাটে কার রথ কে জানে— নৃপতি নাকি নরাধম!

দিনান্তে দিনমণি চলে সিঙ্কুতলে। জলার্কের পরিবর্তে গগনে আবার গ্রহ, নক্ষত্র, নবমীর নিশাপতি। প্রবাহিত হয় স্রোত, গত হয় প্রহর, গগনতটে বিরাজ করে হস্তা নক্ষত্র। দেবতা দিনমণি তাই অরুণ, আদিত্য, তপন, দিনকর, ভাস্কর, ভানু, মার্তণ্ড, মিহির, রবি, বিভাকর, সুর ও সহস্রাংশু নিজ নিজ গুণাবলির কারকতা ওই নক্ষত্র-মুষ্টিতে। তরঙ্গ উত্তাল, জলরাশি ফেনিল, বায়ু শীতল, দেহ শিথিল কিন্তু মুষ্টিতে সঙ্কল্প রেখো হে নাইয়া-গাবরজন। দীপ্তি, শক্তি, বিক্রম গ্রহণ করো হস্তার নিশিকিরণ হতে। আর দু-প্রহর গতে মিলবে শ্রীরামচন্দ্রের জাঙ্গাল। দেখবে সেই সেতুপথ যা অতিক্রম করে রামসেনা প্রবেশ করেছিল লঙ্কাদেশ। শোনো সেই জাঙ্গাল নির্মাণ কথা।

অশোকবনে শোকাবল সীতামাতা আর সিঙ্কুকূলে পত্নী বিরহাতুর শ্রীরামচন্দ্র। মধ্যখানে অনন্ত জলতরঙ্গ। কপিবর লঙ্ঘন করেছিল উল্লম্বনে কিন্তু কী উপায় শ্রীরামচন্দ্র-লক্ষ্মণের? সীতাপতি ত্রিরাত্রি কুশল্যায় কাটায় সাগরদর্শনের কামনায়। বৃথা যাত্রা। বিফল বারিধি বরণও। অবশেষে কার্মুকে টংকার দেয় রামচন্দ্র। জলহীন হোক জলধি, নীলাম্বু হোক নির্জলা, পাথার হোক দু-কূলদর্শী। মুহূর্তে জলধি জলে জলপতির আবির্ভাব। জলধি নির্জলা হলে মরুময় হয়ে উঠবে

ধরিত্রী, কান্তার হবে কণ্টকবন, প্রান্তরে তখন কেবলই উষ্ট্রদল। তুমি বিশ্বকর্মা পুত্র নলে স্মরণ কর হে দশরথনন্দন, সেই নির্মাণ করবে তোমার জাঙ্গাল। পিতা বিশ্বকর্মা যখন মন্দের পর্বতে ধ্যানে মগ্ন ছিল দেবতার, বালক নল উপাস্য মূর্তিখানি বারে বারে নিষ্ক্ষেপ করছিল জলধিতে। বিশ্বকর্মাভার্যা বারংবার জলতল হতে তুলে আনছিল সেই বিগ্রহ। ধ্যানশেষে বিশ্বকর্মা সেই শিশুরঙ্গ শুনে বর দিল নলের নিষ্কিপ্ত কোনো বস্তুই নিমজ্জিত হবে না বারিতে। তাই বারিধির যথার্থ স্থপতি হতে পারে একমাত্র নল। কিন্তু কী উপায় উর্ধ্বমুখ কার্মকের? জলপতির অনুরোধে সেই শিঞ্জনী শ্রীরামচন্দ্র নিষ্ক্ষেপ করল দ্রুমকুল্য মরুকাস্তারে। স্থানটি নাম পেল ব্রণকূপ। শস্যশ্যামলা হয়ে উঠল প্রান্তর। একদিন যেখানে ছিল কেবল উষ্ট্র সেখানে এখন মহিষ, গর্দভ, বৃষ, মাকড়, নর।

প্রহরে হঠাৎই বায়ু বয় ঘন। কাণ্ডার বলে, 'সামাল সামাল।' বাদাম নামায় গাবরদল। নাইয়া দৃঢ় ধরে কেয়াল। উত্তাল তরঙ্গ। বাসুকির মতো ঘন শ্বাস ফেলে সিঙ্কুবারি। ধ্যেয়ে আসে মেঘদল। বৃষ্টি ঝরে। কাণ্ডার বলে, 'এটি হল সাগরের বায়ুকূপ। গাটবন্ধনীতে ডিঙা বাও। প্রহর গতের আগেই বায়ু হবে মছর, বন্ধ হবে বর্ষণ। দেখো তখন তরঙ্গও হবে সুস্থির।' নাইয়া-গাবরদল আতঙ্কিত, এই বুঝি তরঙ্গ গ্রাস করে ডিঙা। সাধু ধনপতি নাম নেয় মহেশ্বরের। করজোড়ে বলে, 'লঙ্কাযাত্রার কালে শ্রীরামচন্দ্র সিঙ্কুকূলে প্রতিষ্ঠা করেছিল শিবলিঙ্গ। হে দেব, আমি প্রত্যাবর্তন কালে প্রণিপাত হব রামেশ্বরের যুগল লিঙ্গেশ্বরে।' যেমন চকিতে আবির্ভূত হয়েছিল মেঘদল তেমনই অকস্মাৎ বর্ষণ শেষে তাদের অন্তর্ধান। ঝঙ্কাবায়ুও ক্রমশ শান্তমতি। উত্তাল তরঙ্গ প্রত্যুষে সুস্থির। সুদূরে সাগরবক্ষে ভেসে ওঠে রামের জাঙ্গাল।

ডিঙাতলে কপিবর বলে, জাঙ্গালটি ছিল এক শত যোজন দীর্ঘ ও দশ যোজন প্রশস্ত। মহাস্থপতি নল প্রথম দিবস গড়ে চতুর্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিবসে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিবসে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিবসে দ্বাবিংশতি যোজন এবং পঞ্চম দিবসে ত্রয়োবিংশতি যোজন। শ্রীরামসেতুর নির্মাণ শুনলে, এবার শোনো মহাকপিকুলের জন্মকথা। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিল জাম্ববানকে আর তারই নির্দেশে দেবতা, ঋষি, বিদ্যাধর, যক্ষ, চারণ, সিদ্ধ, কম্পুরুষ, নাগ, তাক্ষ্য বীর্যে অঙ্গরী, কিন্নরী, গন্ধর্বা, বানরী, যক্ষকন্যা, পন্নগকন্যা এবং বিদ্যাধরীদের জঠরে জন্ম হল কপিদের। ইন্দ্রতনয় হল বালী, সূর্যতনয় সুগ্রীব, বৃহস্পতিতনয় তারক, কুবেরতনয় গন্ধমাদন, অগ্নিতনয় নীল, অশ্বিনীতনয় মৈন্দ ও দ্বিবিদ, বরুণতনয় সুষণ, পর্জন্যতনয় শরভ, বায়ুতনয় হনুমান। আর ওই জাঙ্গালস্থপতি নল, ত্রিলোকের সকলেই জ্ঞাত, বিশ্বকর্মানয়। সিংহলকূলে পদার্পণের পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রের

রামানুচরগুলির আবির্ভাব কাহিনী জানবে না? দেখো সিংহল দেশের গেহগারিতে সারি সারি হনুমানধ্বজ।

দিনমণি উদিত হয় সিন্ধুজল হতে। তারই আলক্ত বর্ণে সুদূরে জেগে ওঠে নলনির্মিত জাঙ্গালের একটি অংশ। অপার্থিব সে দৃশ্য, অলৌকিক সে রূপ! সাধু আত্মহারা সেই অপরূপ রূপে। নাইয়া-গাবরদল বাক্‌রুদ্ধ। কী তুলনা এর? ব্রহ্মলোকের হিরণ্ময় মণ্ডপ, পুষ্কর রথ নাকি বাল্মীকির পর্ণাশ্রম? যে সিন্ধুতরঙ্গ সদা চঞ্চল, অশান্ত, উত্তাল তা সেতুস্তম্ভে প্রণিত, উৎসর্গিত, নিবেদিত। ওই সিন্ধুপথে উত্তরফল্গুনী দিবসে দ্বিপ্রাহরিক অভিজিৎ মুহূর্তে শ্রীরামচন্দ্রের যাত্রার স্ত। তারপর দীর্ঘ দুই পক্ষকালব্যাপী পদযাত্রা। শ্রীরামচন্দ্রের পদরেণু সেতুস্তম্ভে, জাঙ্গালপথে। কাণ্ডার বলে, ওহে গড় হও সর্বজন।

ডিঙা চলে সাগরতরঙ্গে। গত হয় প্রহর। উজ্জ্বল দিবালোকে আনন্দঘন দুর্গাবর। চিড়া, খণ্ড, গো-দুগ্ধে প্রাতরশন সারে নাইয়া-গাবরদল। দ্বিপ্রহরে তগুল ভোজনের ব্যবস্থা। গাবরদল মীন ও কর্কট ধরে জালি ফেলে। সন্ধান করে চিঙ্গড়ার ঝাঁক। কাঁটা হয় গোটা দশ কুমুড়া। ভাজা হবে কটুতৈলে। ডিঙা গাব্রের নলিতা শাক সাগরবায়ুতে অলাবুপত্রের মতো দীর্ঘ ও ঘন হরিৎ। তোলে রন্ধন পণ্ডিত। পাক-সুবাসে আমোদিত সাধুডিঙা। দুর্গাবর দ্রুত ধায়। যত শ্রম তত ক্ষুধা, যত ক্ষুধা তত স্বাদু ব্যঞ্জনের পদ। সিন্ধুসারস সন্ধান করে মধ্যাহ্নের মীন। অল্পে বসে সাধু। নাইয়া-গাবরদল কেউ রসনা কর্মে, কেউ কেরয়ালে। ডালিতলে ভোজন শেষে দিবানিদ্রা। কপিবর ঘুমঘোরে অস্ফুট স্বরে বলে, নিত্য হনুমান চল্লিশা শ্রবণে সজ্ঞানে সুরলোক গমন।

ভোজন সমাপ্ত হতে অপরাহ্ন। ততক্ষণে নীলাম্বু ধূসর, বায়ু শীতল, দিনমণি দিগন্তরেখায়। একটি দিঘল নাওয়ার দর্শন মেলে দক্ষিণ সিন্ধুকোলে। দূর থেকে বোধ হয় যেন চৌষট্ কেরয়ালি কোশা। দিনান্তের রবিকিরণে উজ্জ্বল ডিঙার হেম নিষ্পন্ন দণ্ড। বুঝি কোনো রাজানুচর সপার্যদ চলে দ্বীপ প্রদর্শনে। দিনমণি অস্ত যায়। নাইয়া-গাবরদল দেখে পশ্চিম সিন্ধুতে ওড়পুষ্পের রাঙা বর্ণ। কাণ্ডার অবলোকন করে দক্ষিণ দিগন্ত। চক্ষু দু-টি সংস্কার করে দেহবস্ত্রে। না, এ নয় কোনো ঝঞ্ঝা দেয়া। অশনিও নেই মেঘস্তম্ভে। ও হল স্থিতধী গগনশোভা। কাণ্ডারের মুখমণ্ডলে মধ্যাহ্নের রবিকিরণ, পূর্ণিমার শশীশোভা। কপোলভালের শিথিল কুণ্ডিত ত্বক মহানন্দে ব্যাপ্ত হয়ে কর্ণাঞ্চলে। কাণ্ডার বলে, নিশিখানি অতীব সুরূপা চিত্রা নক্ষত্রের। প্রতীক হল নাগমণি আর দেবতা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। তৃতীয় প্রহরে যক্ষরাজার দেশ চন্দ্রকূট অতিক্রম।

ডিঙা চলে কেরয়াল স্বরে। দুর্গাবর দীপে জলতরঙ্গ কলধৌত। প্রহর গতে

তরঙ্গে প্রবাহিত হয়ে আসে চাম্পেয়, কলম্ব, কৃষ্ণকলি, নাগকেশর, সেবন্তী পুষ্প। গত হয় ক্ষণ-পল। জললতায় ভাসে নারিকল পত্র, গুয়াগুচ্ছ, পনস শাখা, কদলীকাণ্ড। কাণ্ডার বলে, কুবের ছিল যক্ষ, কিন্নর আর রাক্ষসদের অধিপতি। নিবাস সিংহলদেশ। বৈমাট্রেয় ভ্রাতা রাবণ তাকে বিতাড়িত করল লঙ্কাদেশ হতে, অপহরণ করল পুষ্পকরথ। তখন তার বাস হল চন্দ্রকূটে। পরে সাগরদেবতার তুষ্টিতে যত ধন তত রত্ন। মহাদেবেরও বড়ো নিকটজন ছিল ধনদাতা ধর্মদাতা কুবেররাজ। তারই বীজধান্যে কালিন্দীকূলের দেবীচকে হরের কৃষিকর্ম। ফলনটি হয়েছিল বড়ো ভালো। পরিজন-কুটুম্বদের শস্যভাণ্ডারগুলি অবধি পূর্ণ। আর জগতের সমস্ত ধনরত্নের অছিও এই কুবের। পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কূর্ম, মুকুন্দ, নীল, নন্দ ও শঙ্খ এই অষ্ট কলস হল ধনভাণ্ডার।

দূরে ভেসে ওঠে চন্দ্রকূট পর্বত। যেন এক মায়াপুরী। বর্ণটি ঈষৎ পীত। সাগরতট কুবেররাজের সুবর্ণমুকুটের মতো হেম। কূট ওপরে ভাসে একটি ধূসর দেয়া, কূটাধিপতির নরবাহী মহাযান। কুবেররাজের ছয় ঋতুর তিনটি কাটে এই সীতাকাল অনুবর্তী চন্দ্রকূটে বাকি তিনটি অলকানন্দা তীরে অলকাপুরীতে। কাণ্ডার বলে, ব্রহ্মলোক হতে অবতরণ করে সীতা শ্রোত গন্ধমাদন হয়ে মিলিত হয়েছে এই সাগরবারিতে। অলকানন্দা হেমকূট হয়ে অবগাহন করেছে দক্ষিণ পাথারে। আর ভদ্রা শৃঙ্গবান হয়ে উত্তর সিঙ্ঘুতে, চক্ষু মাল্যবান হয়ে পশ্চিম বারিধিতে। দূর হতে সীতাস্রোতে গড় হও। এর জন্ম বিষ্ণুপাদ হতে হে।

প্রত্যুষ হয় সাগরবক্ষে। পূর্ব দিগন্ত রজতকাস্তি। একদল সিঙ্ঘুসারস চলে দূরযাত্রায়।

## ৪১ আড়খান

ধনপতি তাকায় পূর্ব দিগন্তে। আদিত্য উদিত হয় নীলাম্বু হতে। করজোড়ে দিনমণিকে বরণ করে সাধু। তৃপ্তাকন্যা সংজ্ঞা তোমার জ্যোতি ও তেজ সহন করতে না পেরে তোমাকে বিভক্ত করল দ্বাদশ খণ্ডে। পৌষে তুমি বিষ্ণু, মাঘে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য, চৈত্রে বেদজ্ঞ, বৈশাখে তপন, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাড়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতাঃ, কার্তিকে দিবাকর এবং আঘনে মিত্র। এই ষড়শীতি সংক্রান্তিতে তোমাকে তোমার মিত্ররূপে আরাধন করি হে দেব।

ডিঙাতলে কপিবর বলে, সাধু মিতুর ধ্যান করে দুর্গাবরে আর বারো ঘটে ইতু পুজো হয় উজানিতে। প্রসাদের জন্যে মনটি বড়ো উতলা হে।

একোদ্বিষ্ট একাদশীতে কপিদলের প্রাতঃস্নুধায় বিরক্ত কুরঙ্গদল। এই অনূচরগুলি নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র কী প্রকারে রামরাজ্য পরিচালনা করেছিল কে জানে! লঙ্কাকাণ্ড ব্যতিরেক আর কোনো সুকর্ম সম্পাদন করেনি চার কালে। কুরঙ্গপতি বলে, ওহে কপিবর, এই একোদ্বিষ্ট একাদশীতে বিধেয় হল উপবাস। একমাত্র প্রেতকুলই আজ অন্নগ্রহীতা।

হাসে কপিবর। বলে, প্রসাদ হল দেবনৈবেদ্য। এর না আছে কাল, না স্থান-পাত্র। তৃণ ও পত্র ছেড়ে এবার হতে খানিক ফলমূল ভোজন করো। বুদ্ধি প্রখর হবে। আর শোন মৃত-বিশেষের উদ্দেশ্যে করণীয় শ্রাদ্ধটি একোদ্বিষ্ট নয়, ওটি একোদ্বিষ্টবিধিক।

তুরঙ্গদল বিস্মিত কপিবরের পারলৌকিক বিদ্যায়। ভাবে রজ্জা খেয়ে কী প্রকারে এমন ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে উঠল! কপিদল এ-সব স্থূল জিজ্ঞাসার উর্ধ্বে। ততক্ষণে তারা মুদ্রিতনয়নে সচ্চিদানন্দ ভাবে।

অকূল পাথারে ভেসে চলে ডিঙা। দূর দিগন্তে দু-টি ডিঙা যায় বাদাম তুলে। কাণ্ডার করতলে রবি আচ্ছাদনে বুঝতে চায় ডিঙারূপ, বাদাম-চিত্র। একটি ডিঙা ধীরে ধীরে সরে যায় দূর হতে দূরে। একসময় দৃষ্টির অগোচর। অন্যটি বামে বাঁকে। কাণ্ডার নিষ্পদের চলনমুদ্রাটি ঠিকই চেনে। সিংহল দেশেরই এই ডিঙা। বুড়নের মুখখানি উজ্জ্বল। এবার দেখা মিলবে আরও অনেক জলযানের। দেখা হবে জলপথিকের সঙ্গেও। আর ডর নেই পথবিভ্রমের। এই সংক্ৰান্তি নিশিখানিই খানিক বিভ্রমী। মিত্র আর বিষ্ণুর মধ্যবর্তী আদিত্যহীন চারখানি প্রহর অতিক্রম করলে যাত্রাটি নির্বিঘ্ন, নিরাপদ, নির্ভয়।

যত প্রখর হয় দিনমণি তত উজ্জ্বল হয় সাগরতরঙ্গ। শুশুকদল চলে জলবিহারে। মধ্যে মধ্যে দেহগুলি তুলে ধরে তরঙ্গ ওপরে। নাইয়া-গাবরদল রঙ্গ দেখে। ডিঙা চলে শত কেরয়াল স্বরে। ধীরে ধীরে শুভ্র হয়ে ওঠে নীলাম্বু। সহস্র শ্বেতকুসুমে অভাবিত এক দৃশ্য সাগরবক্ষে। মধ্যে মধ্যে পুষ্পের কমলাবর্ণের বস্ত্রগুলি ভেসে ওঠে। এই সুদীর্ঘ সিঙ্কুপথে কখনো কখনো এক-দু বড়ি সাগরকুসুম চক্ষে পড়েছে কিন্তু এমন কানন হয়ে ওঠেনি সাগরবারি। দু-চারটি মধ্যে মধ্যে কেরয়াল টানে এসে পড়ে ডিঙা ওপরে। সযত্নে গাবরদল তোলে করতলে। যেন ভারদ্বাজি তুলে তৈরি শত সলিতার এক কোমল গুচ্ছ। সিঙ্কুজল এত উত্তাল উদ্দাম কিন্তু সিঙ্কুকুসুমগুলি যেন সুরলোকের ইন্দ্রকাননের দেবপুষ্প। কুসুমগুলিকে আবার সিঙ্কুজলে ফিরিয়ে দেয় গাবরদল। রঙ্কন-পণ্ডিতের নয়ন

দুর্গতে ন্যায্য। তার কাছে কিবা সিদ্ধকুসুম কিবা সিদ্ধঘোটক। তার লক্ষ্য কেবল ভোজে। সে সিদ্ধজলে সুচারু জালখানি নিষ্ক্ষেপ করে শিকার করে দ্বাদশপদ গলদা চিঙ্গড়া। সিদ্ধজলে রঙ্গে কাটল বহুকাল হে, এবার পরহিতে নিজেকে উৎসর্গ করো। মনে রেখো হোমাগ্নির মতো জঠরাগ্নিও পূত। যজ্ঞসমিধের মতো পবিত্র কুণ্ডে নশ্বর দেহটি অর্পণ কর। যুক্ত হও আদিত্যের সর্বব্যাপী বিভায়।

মধ্যাহ্নভোজনে সিদ্ধসারস গগন হতে জল ওপরে নামে। শ্যেনদৃষ্টিতে মীনদলের চলাচল দেখে। শত-সহস্র হেম মীন রঙ্গ করে জলতরঙ্গে। শফরীর চেয়েও ক্ষুদ্র তাদের দেহাকৃতি। যেন গাত্রহরিদ্রায় বৃন্দাঙ্গুলির হলদিয়া অভিজ্ঞান বধু-ললাটে। দৃশ্যটি নয়নাভিরাম কিন্তু উদরপূরক নয়। শুণ্ডধারী নীলকান্ত খয়েরা মীনগুলিও তথৈবচ। শিশু-বগার ক্ষুধা মিটতে এক বুড়ি। কৃষ্ণবর্ণ চর্মচটিকা মীনগুলি আকারে মন্দ না কিন্তু দেহে মাশ বড়ো কম। সন্ধ্যাভোজে চললেও মধ্যাহ্নভোজনে অচল। একই অবস্থা রাঙা বুলবুল, বংশক, মার্জার মীনগুলির। বড়োই ক্ষীণতনু। একটি নধর মদগুর দেখে বড়োই প্রীত হয় সিদ্ধসারস। কণ্ঠখানি চঞ্চুতে রুদ্ধ করতে পারলে কণ্টকগুলি ভেসে থাকবে বায়ুতে। মুদগরের মতো এই মদগুরগুলি বড়ো প্রিয় ছিল রাবণরাজের। তিনি গত হওয়ার পর সিংহল জলধির বহু বস্তুই অভোগ্য। এই আঘন সংক্রান্তিতে ভোজ্য হোক সিদ্ধসারসের। কিন্তু বিধি বাম। গিরিশঙ্গের মতো একখানি কূর্ম উদয় হয় জলধি বুকে। সম্ভ্রান্ত মদগুর যায় জলতলে। বিষণ্ণ ক্লান্ত সারস বসে সাধুর ছইঘরের আচ্ছাদনে। হলিদা বোদাল যুগল জলকেলি করে সাগর তরঙ্গে। সারসের ক্ষুধার্ত নয়ন দু-টি দেখে তারা ডুব দেয় অতলে। এক ঝাঁক দিঘল শকুল চলে আহার সন্ধানে। কিন্তু দেহাকৃতি যত-না মীনের তার চেয়ে বেশি ফণীর। চলনের মুদ্রাটিও নাগিনির। অবশেষে কলধৌত এক নররাজ দম্পতি দৃষ্টিগোচর হয় সিদ্ধসারসের। মুহূর্তে রাজনকে জলধি হতে গগনে তোলে। সন্তান-সন্ততি পালনে থাকুক নররানি।

ডালি ওপরে অগ্নে বসে নাইয়া-গাবরদল। ডালিতলে ভোজন চলে কুরঙ্গ-তুরঙ্গকুলের। কপিদল রস্তা খায় বুড়ি বুড়ি। বিলাপ করে, নীলাচল ছাড়ার পর আর কুন্দুরু মেলেনি ভোজে। সে বিকল্পে শৃঙ্গাটক। কিন্তু সিদ্ধপানি এতই চঞ্চলা যে ফলের আশা বৃথা। সাধুর গাবরগুলি শুভমতি। নিত্যদিনের ফলাহারটি তাই সুচারু কিন্তু বৈচিত্র্য বড়ো কম। সুখ দেবধামে। নানা সুস্বাদু ফলভোজন, সাধুসঙ্গে নিশিযাপন। দিবারাত্র মোক্ষচিন্তা। আর এই সাধু পণবন্দি। ডিঙাতলে কেবলই বেসাতি। নিরর্থক অর্থচিন্তা। সিংহল দেশে পৌঁছে প্রথম কর্মটি হবে অশোককাননে সীতামাতার পদাঙ্ক স্পর্শ করে সহস্র শ্রীরামচন্দ্র নামগান।

অপরাত্নে জলধি তরঙ্গে ভেসে চলে তিনটি সাধুডিঙা। ছইঘরের রূপালি

আচ্ছাদনে দিনান্তের স্নান দিনমণি। শ্রীশ্রী মিত্র সুরলোকে ফিরে যাবে বাৎসরিক যাত্রা সেরে। বিদায়বেলার বিষাদী ধূসর কর্ণ জলতলে, দূরদেশি ডিঙার বাহির দরগায়, শুশুকের পৃষ্ঠদেশে। যে ঘোটক-ক্ষুর কর্কটক দিবারাত্র ছুটে চলে সিঙ্কুজলে, এই আঘন অপরাধে সেও নিথর। কামনা করে মিত্রের শুভ দুলোক যাত্রা। তিমিসিল তরঙ্গশীর্ষে মুণ্ডটি তুলে নত হয় অন্তগামী মিত্রের কাছে। বলে, পথে অগস্ত্য মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে বোলো তার যাত্রার দিনটি যাত্রা নাস্তি বিধান দিয়েছিল দৈবজ্ঞ গণকদল। কালগতে পয়লা ভাদ্রের মতো প্রতি মাসের প্রথম দিনটি যাত্রারহিত। মুনি এক বার পুনরাগমন করলে দিনগুলির স্থবিরতা কাটে। আর এতকাল প্রণিপাতে বিদ্যুৎ অপারগ সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগণের গমনপথ অবরোধে।

সন্ধ্যা নামে। হিমকণা ঝরে সিঙ্কুজলে। ক্লাস্ত কেরয়াল পথ ভাঙে ধীর লয়ে। ঘন হয় সাগরস্বর। পিণ্ডে তুষ্ট আত্মা ফিরে চলে স্বভূমে। ক্ষণিকের এক প্রবল সাগরবায়ুতে সূচিত হয় সেই যাত্রা। কাণ্ডার বুটন সোচ্চারে বলে, ‘রাম, রাম, সামাল, সামাল।’ পাঁচটি ডিঙাধ্বজ বায়ুচরের মতো উড়ে চলে গগনপথে। ডিঙা ওপরের ‘রাম’ ‘রাম’ ধ্বনি ডিঙাতলে কপিদলের কর্ণে প্রবেশ করে। তারা সমবেত স্বরে শুরু করে নিশিব্যাপী রামনাম। পৌষ-প্রত্যুষে যখন শেষ হয় পুণ্য নামগান, ততক্ষণে ডিঙাখানি আড়বারে। বিষ্ণু বিরাজ করে পূর্ব দিগন্তে। এক অপূর্ব প্রভা অমূল্য বিভা সিঙ্কুবারিতে। কাণ্ডার বুটন বলে, স্থানটির নাম হল আড়খান। দক্ষিণ দেশে ‘আড়’ হল মগ্ন। জলস্থানটি বিষ্ণুভাবে মগ্ন হে। পৌষের প্রথম দিনে অর্করূপ বিষ্ণুর উদয় হয় এই সিঙ্কুনীরে। তাই সারা পৌষ দক্ষিণ দেশে বিষ্ণুর আরাধন সুমধুর আড়বার গীতে। বিষ্ণু নামে জয় দাও হে সর্বজন।

দুর্গাবর দ্রুত ধায় বাদাম বায়ুতে। বিষ্ণু জগদ্বিহারী তাই অন্তরিক্ষের বায়ু পৌষে ধরাবাসী। উত্তরা বায়ুর লঘুপদ যাত্রায় নাইয়াদলের মহারঙ্গ। ডিঙা গ্রহর পার হয় অক্লেশে। বিষ্ণুকিরণ সময়গতে উচ্ছল, উজ্জ্বল, সাগরবিহারী। কোথাও তরঙ্গমালা কলধৌত, কোথাও-বা হেমকাস্ত। জলতলে গীত রচে আড়বান অণ্ডাল, গীত গায় তিরুপ্পান।

দ্বিপ্রহরের পর আকস্মিক দক্ষিণ দিগন্তে জাগে একটি-দুটি দেয়া। জমে গগনে। এ যেন সিঙ্কু জালিকের জালে-ওঠা সেই মৃৎকলস যার ভেতর হতে প্রথমে নির্গত হল ধূম ও পরে দৈত্য। নাইয়া-গাবরদলের বদনগুলি শুষ্ক, মন চিত্তাক্লিষ্ট। স্বর ভাঙে কেরয়ালের, তাল কাটে গাবরগীতের। অপরাহ্নের বিদায়ি রৌদ্র শায়িত ছইঘরের আচ্ছাদনে। ডালি ওপরে দাঁড়িয়ে ধনপতি দেখে দক্ষিণ গগনে স্থিত নীরদমালা। যেন দিনান্তের বারিদ বারি কেউ ঝুলিয়ে রেখেছে দিগন্তে। কাণ্ডার

বুঢ়ন সতৰ্ক চক্ষু দু-টিতে নিৰীক্ষণ কৰে দেয়াস্তূপেৰ রঙ-ৰূপ। না, গতিতে মতি নেই। স্থাবর ধূমজাল নীলাকাশে বসত কৰে। বুঢ়নেৰ দুই নয়নমণিতে আলোকছটা। বলে, আর দূর নাই হে লঙ্কার ময়াল। ওই দেখো নিৰ্জলা বায়ুবাহ, নীৰহীন নীৰদ। সিঙ্কুপথিকদেৰ পথ চেনাতে বৰুণদেবতা ধ্বজগুলি বেঁধে রাখে গগনে।

ধীৰে ধীৰে দিনমণি অবগাহন কৰে পশ্চিম দিগন্তে। সন্ধ্যা নামে সাগরজলে। ময়াল দেয়াৰ মতো জলতরঙ্গও হয়ে ওঠে ধূসর। শুশুকদল রঙ্গ দেখে উড়ুকু মীনেৰ। দুৰ্গাবৰেৰ সৰ্পিবাতিতে জলতলে চলে কূৰ্ম। সময় হল বিষুগ্ৰস্ত জপেৰ। শিৰে আঘাত পেয়ে হরিদ্রা বোদাল ঘূৰে দেখে মুৎকলসেৰ মতো একখানি বৃক্ষচ্যুত ডাবু ভাসে জলে। সে শিৰ দিয়েই ডাবুটি তুলে দেয় তরঙ্গশীৰ্ষে যাতে বাহিত হয় দূৰে। একটি নধর কৰ্কট দেখে নাইয়াহীন একটি পানসি ভাসে জলে। সে ওপৰে উঠে বসে। ডাবুৰ মতো কৰ্কটেরও বাহিৰাবরণ দৃঢ়, অন্তৰটি কোমল। ডাবুৰ ভিতৰে জল আর কৰ্কটের জলরাশি। অন্যদিকে কৰ্কট জাতি কৌমবাসী। তাই স্বগোত্রের কৰ্কটদল আরোহণ কৰে নিম্পদে। অবশেষে নাইয়াৰ ঘোষণা, চলো যাই লঙ্কার ময়াল।

যত ঘন হয় নিশি তত বায়ু হয় চঞ্চল। নাইয়া-গাবৰদল অকস্মাৎ লোনা বায়ে মৃত্তিকা সুবাস পায়। ভাবে এ নিশ্চিত কোনো জলপরিৰ নিশিৰঙ্গ। তাকায় চতুষ্পাৰ্শ্ব। দ্বাদশীৰ শশীখানি ক্ষীণতনু আর স্বাতী নক্ষত্রটি দেহস্থিত প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান বায়ুৰ প্রাবল্যে বড়োই চপল। কাণ্ডাৰ বুঢ়ন হাসে। সোচ্চাৰে বলে, জলপরি মুন্ময়ী নাকি হে যে বায়ুতে মৃত্তিকার সূচ্যণ পাবে? এ-বায়ু লঙ্কাধীপেৰ। প্রতীক্ষা কৰো। প্রহর গতে বায়ু হবে আরও নানা বাসে সুবাসিত।

তারপর অদৃশ্য সেই সিংহল ময়াল তার নানান সৌৰভে আমোদিত কৰে রাখে সিঙ্কুবায়ু সারা নিশি। সাধু ধনপতি ছইগৃহেৰ গবাক্ষে বসে আত্মাণে অনুভব কৰে ময়াল বিস্তৃত কেয়াবন, চন্দন বৃক্ষসারি, তমালবীথি, কস্তুরী মুগদল। গোঠেৰ গাবৰ প্রবাহিত বায়ুতে বিচাৰ কৰে সূৰভীৰ উৎস—রান্না, শটি, নবমালিকা, স্বৰ্ণযুথিকা, মাধবী, অনন্তা, সন্নকী, রুদ্রজটা, পুষ্কা, মাতুলুঙ্গা, শতপুষ্পা, ক্ষুদ্রজীৱক। তুলসীপত্রের সুবাসে দিনমণি বিষুঃ উদিত হয় পূৰ্ব দিগন্তে।

নাইয়া-গাবৰদেৰ কাৰও জাগরণেৰ পালা, কাৰও শয়ানেৰ। ধীৰে চলে ডিঙা। এক সারি গাঙচিল্লক মীনশিকারে আসে দরিয়ায়। শীতের নিশিটি দিঘল আর তাই কারো দৃষ্টি চিত্রফলে কাৰও রাঘববোদালে। একটি মহাচিল্লক একখানি রাম-শকুল চঞ্চুতে তুলে ফিৰে চলে ময়ালে। গত হয় প্রহর। পঞ্চ নাও চলে দূরযাত্রায়। সোচ্চাৰ কুশল বিনিময় শেষে বুঢ়ন শোনে নিশিগতে হাদুয়াদহ। ভেসে চলে

দুর্গাবর। দিনমণি গগন-সোপান ভেঙে একসময় মধ্যগগনে। নাও গর্ভে ব্যবস্থা হয় ভোজনের। আহারে তৃপ্ত শুক-শারি রচনা করে প্রহেলিকা—‘একবর্ণ নহে সে অনেক বর্ণ কায়/আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায়।’ সারা লক্ষাযাত্রায় পক্ষীযুগলের নব নব প্রহেলিকায় ক্লান্ত কপিদল বলে, ‘তোমাদের যেমন পাণ্ডিত্য তেমন শাস্ত্রজ্ঞান। তা তোমরা রাজসভায় না থেকে ডিঙাযাত্রী কেন হে?’ পিঞ্জরবাসী পক্ষী-যুগল বলে :

পাকা খাজুরের গন্ধে      লোহিত চর্মের ফান্দে  
দেখি লোভে হইনু উত্তোরোল  
দারুণ দৈবের ইচ্ছা      আছিল বন্ধন দশা  
দৈবযোগ না গেল বিফল।  
সকল গুণের ধাম      ভানু-বংশে রাজা রাম  
কোদণ্ড ধরেন রঘুমণি  
রাম সহ গেল বন      সীতা হরে দশানন  
রামায়ণে এই কথা শুনি।

কপিবর নির্বাক যে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস আর শুক-শারির ফান্দবন্দি একাকার পক্ষী পদে। সিংহলযাত্রাও যেন সমার্থক। তবু পক্ষীযুগলের শাস্ত্রজ্ঞান বিচারের জন্য জিজ্ঞাসা করে, ‘রঘুমণির কোদণ্ডটি কেমন ছিল একটু বিনা কাব্যে বলবে? তোমরা নিজ কণ্ঠেই তো বলেছ, যে পদ্য রচে সে নিজে বুঝতে নারে কিন্তু পরেরে বুঝায়।’ মৃদু হাসে শুক। বলে, বর্ষণের পর উর্ধ্ব তাকিয়ো, দর্শন পাবে সপ্তবর্ণ দণ্ডখানির। শ্রীরামচন্দ্রের কার্মুকটি দিয়ে গগনদেবতা ধরিত্রীর বারি তোলে গগনে। ওটি না থাকলে কবে ধরিত্রী মগ্ন হোত সলিলে আর অশ্বর হোত মরুময়।

শুকের শাস্ত্রজ্ঞানে অভিভূত কপিদল নতমস্তকে নীরবে দিবানিদ্রা যায়। ডিঙা চলে অপরাহ্নের সিন্ধুবারিতে। অকস্মাৎ হাহাকার করে ওঠে কাণ্ডার। দেখে তরঙ্গে ভাসে জলদ্রোণি, গর্ভদণ্ড, রন্ধনপাত্র। নৌভঙ্গ হয়েছে অকূল দরিয়ায়। কতজন জলজীবী জলতলে গেল কে জানে! গেহগারির স্বজন অপেক্ষায় থাকবে দিন, মাস, বৎসর। তারপর এক যুগ পরে পারলৌকিক ক্রিয়া। সব সম্পর্ক ছেদ। নয়নের সব লোহ ঝরে ঝরে চক্ষুজোড়া নির্জলা। গ্রহণ করো দীর্ঘশ্বাস আর করতলের এই বারি। কাণ্ডার বলে, করজোড়ে নত হও। আর সতর্কে চল হে।

পাটে বসে দিনমণি। পশ্চিম সিন্ধুজলে ওড়পুষ্পের রাঙা বর্ণ। ধনপতি ভাবে ভ্রমরার পশ্চিম কূল এমনই অলক্ত এই দিনান্তে। হয়ত খুলনা সেতুবন্ধে প্রতীক্ষায়। রামা ভাবে এমনই একক্ষণে সপ্তডিঙা যাত্রা করেছে লক্ষাপথে, ফিরবেও সহস্র কেরয়ালধ্বনিতে। জানে না সাধু এক ডিঙার লক্ষাযাত্রী। বিষাদ নাইয়া-গাবরদের

মনেও। বড়ো সাধ জাগে আপনজনের সঙ্গে পেতে। আঁধার নামে। হিম ঝরে।  
সর্পিবাতি জ্বলে। ডিঙা চলে আপন তালে। গত হয় প্রহর। ব্যবস্থা হয় নিশি  
আহারের। বিশাখা জেগে থাকে ব্যোমে। অম্বরব্যাপী তার একটিই ভাষা— প্রেম,  
প্রীতি, মায়া, মমতাবিহীন কর্ম ও লক্ষ্য স্থির থাকো। কর্ণ ধরো দৃঢ় মুষ্টিতে,  
কেরয়ালে টান দাও পূর্ণশ্বাসে। বয়ে চলো নিশির চার প্রহর।

প্রত্যুষে নাইয়াদল দেখে দুর্গাবরের বাহির দরগায় বেশ কিছু জলজ পুষ্প।  
ডিঙাগাত্রের যে লতাপত্র তাতেও নানা বর্ণের কুসুম কিন্তু এগুলি ভিন্ন। প্রবাহিত  
হয়ে এসেছে দূর হতে স্রোতে। এক নাইয়া ক্ষেপণি দিয়ে তুলে দেখে দুগ্ধধবল  
তাদের বর্ণ। দশটি দলে বড়োই দৃষ্টিনন্দন সে রূপ। কাণ্ডার একটি পুষ্প করতলে  
রেখে বলে, ‘শুধুই জলভাসি নই হে, এ-হল জলজ। দেখো দলগুলি কী কোমল!’  
এই নাইয়া বলে, ‘হাদুয়াদহের হাদিকুসুম নাকি?’ কাণ্ডার উত্তর দেয়, ‘আমারও  
তাই অনুমান হে।’ ডিঙা চলে। প্রহর গড়ায়। শুষ্ক নারিকলপত্র ভাসে জলে। বর্ণ  
বদলায় তরঙ্গের। ঈষৎ হরিৎ। মধ্যাহ্নে দিগভ্রান্ত এক পানিকৌটি-যুগল অনন্ত  
দরিয়ায় দিগন্ত খোঁজে। একটি সিঙ্কুসারস দেখে সে দৃশ্য। সাধ জাগে স্বচঞ্চুতে  
হাদুয়াদহে স্বস্থানে পৌঁছে দিতে কিন্তু পানিকৌটির প্রাণবায়ু এতই সীমিত যে নির্গত  
হতে পারে মধ্য বায়ুপথে। শেষ অবধি গাবরদের দীর্ঘ কর্মকুশলতায় জালবন্দি  
পানিকৌটি-যুগল। গুপ্তিগেহে শুক-শারি, তুরঙ্গ, কুরঙ্গ সঙ্গে চলে লঙ্কাদেশ। বিমর্ষ  
পানিকৌটি-দম্পতিকে প্রবোধ দেয় শুক-শারি। বলে, দৈবের কাছে সুবুদ্ধি,  
পুরুষাকার সব ব্যর্থ।

ধর্মপুত্র নৃপমণি

যথা ভীম গদাপাণি

গাণ্ডীব ধরেন ধনঞ্জয়

কি কর পুণ্যের লেখা

বাসুদেব যার সখা

তথা কেন হৈল শত্রুভয়।

অপরাত্নে হাদুয়াদহ ভেসে ওঠে দূরে। লতাগুন্ম ঢাকা এক বিস্তৃত হরিৎক্ষেত্র।  
তার ওপর অসংখ্য ছোটো ছোটো শ্বেত পুষ্প, যেন অনন্ত অম্বরে অসংখ্য  
গ্রহতারা। পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করে মক্ষিকাদল, গুনগুন গীত গায়। শত-সহস্র  
বিচিত্র বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মীন রঙ্গ করে হাদুয়াদহে। পানিকৌটিদল টুবটু ব ডুব দেয়  
দহ ঘিরে। কেরয়ালের কোমল স্বরে দুর্গাবর এসে দাঁড়ায় লতাগুন্মের কাছে। পথ  
রুদ্ধ। কাণ্ডার নির্দেশে দু-বুড়ি খরশান কাতি বাঁধা হয় নিষ্পদে। ডিঙা চলে।  
লতাগুন্ম কাটে। দু-পাশে ঘন সবুজ হাদির মাঝে প্রকাশ পায় জলপথ। আবার  
সরব হয় কেরয়াল। শুরু হয় গাবরগীত। হাদুয়াদহ অতিক্রম করে ধনপতি বলে,  
পানিকৌটি জোড় কোথায় হে? ছেড়ে দাও ওদের আপন বাসে।

তীব্র উচ্ছ্বাসে দহজলে অবগাহন করে দুই পক্ষী। দিনমণিও অস্ত যায় পশ্চিম দিগন্তে। এগিয়ে চলে ডিঙা। বায়ুতে ভেসে আসে দহপুষ্পের সুবাস। অম্বরে জাগে অনুরাধা নক্ষত্র। স্নেহ, সখ্য, মমতার ছোঁয়া গগনতটে। ঘন অন্ধকার সিন্ধুজলে। ভেসে চলে দুর্গাবর। গত হয় প্রহর। ব্যবস্থা হয় নিশিভোজের। দূরে ভেসে চলে একটি-দুটি সাধু-ডিঙা। উজ্জ্বল হয় জলতরঙ্গ। আবার ঘনঘোর জলধি। ডিঙা তলে তিমি চলে নিশিবিহারে। নক্ষত্র-মীন বাতি জ্বালে সাগরজলে।

সিংহল ময়ালে আলো দেয় গগনের গ্রহ-তারা।

## ৪২ কমলে কামিনী

অমাবস্যা সাধু নিরন্নভোজী। তাই রন্ধনপণ্ডিত এক প্রহর বেলা গতে নিরামিষ পাকে ব্যস্ত। কুমুড়ার দানা ছাড়ায়। পেষণ অস্ত্রে বেসারি ও খণ্ডযোগে বড়ার একখানি রসনা ব্যঞ্জন। ডিঙাগাত্রের পলাকড়ি লতাগুলি লবণবায়ুতে নধর। ফলগুলিও পুষ্ট। এক-কুড়ি নধর পলাকড়ি সংস্কার করে গাবর। আদা, ইক্ষুরস আর মরিচ গুঁড়া দিয়ে ঘনকাঠির আর এক পদ। সঙ্গে মুগের সুপ। সাধু রৌদ্র সেবন করে ডালি ওপরে বসে, রন্ধনপণ্ডিত গোধুম মাখে। ভাণ্ডের সর্পি শীতল বায়ুতে শিলাকঠিন। গাবর তরল করে রৌদ্রতাপে।

ডিঙা চলে কালিয়দহ পথে। কাণ্ডার বলে, কৃষ্ণ অভিপ্রায়ে সহস্রফণ কালিয় আশ্রয় নিল ওই কালিয়দহে। নাগটি যেমন বিষধর তেমন তার রূপ হে। মুখগহ্বর হতে নির্গত হত একবার ধূম আর একবার অগ্নি। যমুনাতে যখন আশ্রয় নিয়েছিল, কূলে একটি বৃক্ষলতা ছিল না। সব পুড়ে ছাইভস্ম। থাকার বলতে একটি কদম্ববৃক্ষ। অমৃত নিয়ে ফেরতযাত্রায় গরুড় ওর সাথে বসেছিল বলে রক্ষা পেয়েছিল বৃক্ষটি।

রৌদ্রে ঈষৎ নরম সর্পিতে কাঠি নাড়াতে নাড়াতে জোয়ান গাবর বলে, কদম্ববৃক্ষে বসতো কৃষ্ণও। সাথে ঝুলত রাধা-আদি গোপিনীদের দেহবস্ত্র। রাখালরাজের কী রঙ্গ!

বৃদ্ধ বুঢ়ন বলে, রঙ্গ নয়, রোষ। কালিয় তখন যমুনাবাসী। যেদিন শত-সহস্র ধেনু যমুনার গরল পানি পান করে দেহ রাখল, কৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষ হতে অবতরণ করল কালিয় শিরে। নিধনের অভিপ্রায়ে কালিয় বেঁটন করে কৃষ্ণকে। তখনই স্ফীত হতে থাকে কৃষ্ণদেহ। কালিয়ের যে মুখগহ্বর হতে নির্গত হত ধূম ও অগ্নি,

তা পূর্ণ হল নিজ দেহ শোণিতে। অবশেষে সহস্রানন নাগের কাতর প্রাণভিক্ষায় কৃষ্ণ তার বাসস্থান নির্দিষ্ট করল কালিয়দহে। কৃষ্ণের পদচিহ্ন কালিয়-ফণায় তাই গরুড়ের সঙ্গে তার বৈরিতারও শেষ। কালিয়দহের পানিও বড়ো অদ্ভুত হে। লবণসমুদ্রে কাউয়াচক্ষু মিঠাপানি।

দ্বিপ্রাহরিক আহারপর্ব চলে। নাইয়া-গাবরদের চিড়া, খণ্ড, ফেনির ব্যবস্থা। শেষে ক্ষীর। গুপ্তিতে তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, কপিকুলের ভোজন চলে। শুক-শারি বলে, পানিকৌড়ি যুগলের জীবন বড়োই সংকীর্ণ। হাদুয়াদহের লতাগুপ্তে বদ্ধ। আর একটি নিশি দুর্গাবরে থাকলেই চর্মচক্ষে দেখত কালিয়দহ। নয়ন সার্থক হত শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক দর্শনে।

ডিঙা চলে মছুর লয়ে। এক গাংবাসী ক্ষেমংকরী ভোজ সেরে নিষগ্ন দণ্ডে এসে বসে। তাকায় সাগর বিস্তারে। দিবসের এই তৃতীয় প্রহরটি যেমন মগ্ন তেমনই মৌনী। প্রবাহিত হয় সিঙ্কু, বায়ু বয়, দিনমণি চলে পশ্চিম দিগন্তে কিন্তু তবু এক শিথিলতা জল, স্থল, নভেঃ। যদি দিবা-রাত্রির অষ্টপ্রহর হত এমনই স্থিতধী, শান্ত, আত্মভাবস্থ? ক্ষেমংকরী দেখে বুঢ়নকে। হাতখানি কর্ণে, চক্ষু দু-টি নিথর। যেন জীবনসিঙ্কুর কাণ্ডারি, অনন্ত তার যাত্রা। কর্ণ তলে অতল জলধি, কর্ণ ওপরে অসীম অম্বর। না আছে পাড়ির সত্বরতা, না কড়ির কড়াক্রান্তি। লঙ্কার ময়াল হতে ভেসে আসে মাকন্দবোলের সুবাস সিঙ্কুবায়ুতে। শুধু ক্ষেমংকরী নয়, সে সৌরভে আলোড়িত সারা দুর্গাবর। কাণ্ডার বলে, 'আজ মাকন্দবকুল অমাবস্যা হে। সূর্য ও চন্দ্রের এই সহবাস তিথিতে মাকন্দবনে পিক ডাক দেয় প্রতি প্রহরে।' ক্ষেমংকরী ফিরে চলে আপন বৃক্ষাবাসে। দিনমণি ভূ-পরিক্রমা শেষে অদৃশ্য হয় বারি-দিগন্তে।

এক প্রহর নিশি গতে দুর্গাবর কালিয়দহে। যেমন মসীকৃষ্ণ সিঙ্কুজল তেমনই কেশকালো চতুর্দশীর অমানিশা। একটিই ভরসা, কালিয়নাগটি কৃষ্ণভাবে সুহাদ। কেরয়াল ধ্বনি আর তরঙ্গ স্বরে ডিঙা চলে দ্রুত লয়ে। গগনের জ্যোষ্ঠানক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে বুঢ়ন বলে, 'কালিয়দহে বিরাজ করত চিরপূর্ণিমা। লতাটির সহস্র ফণের মধ্যখানে গিরিচূড়ার মতো তখন সেই অমূল্য মণিটি। জলযাত্রীরা বলত নিদাঘের রবি, কোজাগরের শশী। সেই মণিখানি কৃষ্ণকে দান করল কালিয়। তখন হতে কালিয়দহ দিবানিশি কৃষ্ণবর্ণ।' নাইয়া-গাবরদল সপিদীপে দেখে তরঙ্গ প্রবাহিত হয় নাগনৃত্য মুদ্রায়। এক অভাবিত নিশিরঙ্গে সহস্রফণ কালিয় ও তার যত আত্মজন। কাণ্ডার বলে, ধীর চল হে বাদাম বায়ুতে। নজর করো গগনতটে। যে আকাশমণিগুলি তুষারধবল, ও সবই কালিয়ের। প্রতি বৎসর শ্রাবণের কৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে আকাশতটে গেঁথে আসে ক্ষুদ্র একখানি মণি। কৃষ্ণের করুণায় তার গরুড়-নিরাতঙ্ক সংসারজীবন।

নিশির তৃতীয় প্রহরে ভগবতী উপস্থিত পদ্মাবাসে। পদ্মাবতীকে নিদ্রা থেকে তুলে বলে, ওমা, ধনা যে কালিয়দহের গগনে তারকা গোনে। সিংহল দেশ আর কতই-বা দূর? এবার তোর রঙ্গ দেখা দেখি।

পদ্মাবতী নয়ন দু-টি বহু কষ্টে মেলে বলে, ধনপতি ত্রিপ্রহর রাতে তারকা গোনে কেন? ওর কি বিনিদ্রা ব্যাধি?

ভগবতী রুগ্ন হয়ে উত্তর দেয়, ধনার কীসের ব্যাধি সেকথা সর্বজনে জানে। ওটি হল কামজ্বর। সাগরে আর কোথায় পাবে বেউশ্যা তাই হেমবর্ণ তারকা থেকে কলধৌতগুলি ভিন্ন করে। তুই যে ঢলে পড়িস মা। ত্রিনয়ন খানিক সংস্কার কর ঘটবারিতে।

হিমশীতল বারির কথা শুনে আচম্বিতে নিদ্রা যায় ছুটে। যে নয়নটি চিরঘুমে সেটিও আতঙ্কে থরথর। পদ্মাবতী করতলে নয়ন সংস্কার করে বলে, মা, বলো কী তোমার বিধান।

ললাটে করাঘাত করে ভগবতী। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তা অবগত হলে কি আর তোর কাছে ত্রিপ্রহর পৌষ নিশীথে ছুটে আসি রে? ধনা বনবিহারী হলে ওকে নিশিগতের আগেই আমার বাহনটি দিয়ে দংশন করাতুম মা কিন্তু ও যে সিঙ্কুবাসী জলচর। বল তুই কী কার্য সম্পন্ন করবি কালিয়দহে।

মধুর ভাবে পদ্মাবতী বলে, ও হবে মা, উচিত ব্যবস্থা হবে। উদ্ভিগ্ন হয়ো না তুমি।

ভগবতী চিন্তাক্রিষ্ট বদনে বলে, আর একখানি দিন, অষ্টপ্রহর। যা তোর বাসনা কর। ভগবতী নাকি ধনপতি, কে পাবে আরতি এ-ধরায়, তুই-ই নির্ধারণ কর। প্রত্যুষ হয়। আমি নিজবাসে গমন করি মা আমার।

এক প্রহর দিবা গতে দুর্গাবরের নাইয়া-গাবরদল দেখে গত দিনের ক্ষেমংকরীটি নিষগ্ন দণ্ডে বসে। কালিয়দহের বিস্তৃত জলবিস্তারে ওড়ে সহস্র সিঙ্কুসারস, পাক খায় বেশ কিছু কূলবাসী শ্যেন কিন্তু ক্ষেমংকরী মুহ্যমান। তার দৃষ্টি না মীনে না গগনে। সে নিষ্পন্দ দৃষ্টিতে দেখে ডিঙাযাত্রীদের। গত হয় সময়। দিনমণি চড়ে মধ্যগগনে। তেমনই দণ্ডপরে স্থিত ক্ষেমংকরী। তার তা না আছে ক্ষুধার চিন্তা না পিপাসার। ডিঙাতলের তুরঙ্গ-কুরঙ্গ-কপিকুল সরবে ভোজন সারে। নাইয়া-গাবরদলও সবাক নানা কর্মে। নীরব শুধু ক্ষেমংকরী, নিথরও। চিন্তাক্রিষ্ট কাণ্ডার দেখে পদজোড়া মধ্যে মধ্যে সরে যায় দণ্ড হতে। ক্ষণিক ডানা মেলে আবার বসে। ক্রমশ দ্রুত হয় এই ওড়া আর বসা। একসময় দণ্ড ফিরে ঘিরে শুধুই চক্রাকার আবর্তন। খসে একটি-দুটি গাত্রপালক, ঝরে নরম দেহ আবরণ। একসময় এক

চাপা আঁতরবে পড়ে যায় ডিঙাডালিতে। সরবে ‘দুর্গা’ ‘দুর্গা’ বলে ওঠে কাণ্ডার। চঞ্চুতে মিষ্টপানি দেয় এক গাবর কিন্তু প্রাণটি ততক্ষণে দেহ-পিঞ্জরার বাইরে। দহশ্রোতে ভেসে যায় ক্ষেমংকরী দেহ।

আতঙ্কিত কাণ্ডার, আশঙ্কিত নাইয়া-গাবরদল। কী অশুভ বার্তা আনে শুভংকরীর এই অপমৃত্যু? অপরাহ্নের নিষঙ্গ দণ্ডের ছায়া শায়িত হয় ডালি পরে। দিনান্তে তিমিদল চলে সাগরবিহারে। সংসারটি বৃহৎ, শতের। কাণ্ডার কর্ণ ঘোরায়ে ডিঙাখানি দক্ষিণে সরিয়ে তিমিদলকে বামে স্থান ছেড়ে দিতে। আকস্মিক দুলে ওঠে ডিঙা। অমাবস্যার ভরা কোটালে জলোচ্ছ্বাস সিঞ্চুতলে। মীন-মকর ছোট্টে উর্ধ্বশ্বাসে। দুই দানব তিমিসিল রুদ্ধ করে জলপথ। তারপর আক্রোশে আঘাত হানে তিমিদলের ওপর। তরঙ্গে মহাহিল্লোল। কাণ্ডার সোচ্চারে ঘোষণা দেয়, ‘সামাল সামাল’। নাইয়া-গাবরদল বজ্রমুষ্টিতে ধরে কেঁরয়াল। ডিঙা দোলে উত্তাল তরঙ্গে। ধীরে ধীরে বর্ণ বদলায় সিঞ্চুর। কালিয়দহ ঘন লোহিত বর্ণ। দুর্গাবর ঘিরে শোণিতপ্রবাহ। নাইয়া-গাবরদল শঙ্কিত, হতবাক, চিঙ্কাক্লিষ্ট। কী লিখন বিধির এই সিংহল সিঞ্চুতে! বিষ্ণু যায় নিশিষ্যানে। সারসের শেষ সারি কুলায় ফেরে।

ক্রমশ কালো হয় গগনতট। দূর দিগন্তে আঁধারের ঘন স্তূপ। দৃষ্টির সীমা সংকীর্ণ হতে হতে ডিঙাবন্দি। একটি-দুটি গ্রহ-তারা ফোটে নিকষ-ঘন আঁধারে। দীপ জ্বলে। কেঁরয়াল ও তরঙ্গের যুগলবন্দি ডিঙার বাহির দরগায়। ধীর লয়ে চলে দুর্গাবর। সময় গতে উদ্ভিত হয় মূলা নক্ষত্র। তার দেবতা অলক্ষ্মী। প্রতিপদের অম্বরে কেবলই নৈঋতী, পরম অবিশ্বাস পরব্রহ্মে। ছইগৃহের বাইরে আসে সাধু। কী এক অপূর্ব সুবাস ভেসে আসে বহু দূর হতে! উতলা হয়ে ওঠে সাধু অপার্থিব সেই সুরভিতে। ভাবে এ কি পারিজাত, মন্দার নাকি পারিভদ্র। বিচরণ করে ডিঙার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে। কাণ্ডার বলে, ‘ছোটোসাধু, কী কারণে এত অস্থিরতা? গেহ-গারির জন্যে মনোবেদনা নাকি মা লক্ষ্মীদের জন্যে দুশ্চিন্তা?’ ধনপতি এগিয়ে আসে কর্ণের কাছে। বলে, ‘এই সুবাস কোন পুষ্পের? আসেই-বা কোন দিক হতে?’ কাণ্ডার শ্বাস টানে ঘন। কোনো বাসই নেই, সু কিংবা কু। ললাটে করাঘাত করে কাণ্ডার। চক্ষু দীপে তৈলাভাব, এবার ঘ্রাণেন্দ্রিয়টিও অসাড় হল। কাণ্ডারের বিলাপে দুই গাবর কাছে আসে। তারা প্রবোধ দিয়ে বলে ঘ্রাণেন্দ্রিয় যত শীঘ্র বিকল হয় ততই মঙ্গল কারণ জগৎসংসারে যত-না সৌগন্ধ তার চেয়ে অধিক দৌর্গন্ধ। বিধাতার ওপর গভীর অভিমানে নীরব হয় বুঢ়ন কিন্তু সদাগরের প্রক্ষে দুই গাবর ডালির ওপর ও তল পরিক্রমা করে। গুপ্তির প্রতিটি কোণে ঘন শ্বাস টানে। কোথাও নেই পারিজাত, মন্দার, পারিভদ্র। এমনকী টগর, আকন্দ, মুচকুন্দও নেই সারা দুর্গাবরে। মহানন্দে কাণ্ডার আকণ্ঠ হাসে।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে ধনপতির নিদ্রা ভাঙে এক অভাবিত দৃশ্যে। নীলাশু জুড়ে অসংখ্য শ্বেতকমল, রক্তকুমুদ, ইন্দিবর। পদ্মপত্রে টলটল করে হিমসঞ্চিত জলকণা। সহস্র অলিদল গুণগুণ গীত গায় কুমুদবনে। ছইগৃহের দ্বার খুলে বাইরে আসে সাধু। বিস্ময়ে দেখে প্রতিপদ নিশিতে কালিয়দহে পূর্ণিমার রজতশোভা। পদ্মাবতী যুক্তিতে অভয়ার মায়াজাল কালিয়দহে। সিঙ্কুজলে অমলা ভাসে কমলবৃত্ত হয়ে আর সুরসুন্দরী, মনোহরা, কনকাবতী, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী আদি চতুষষ্টি যোগিনী সে-বৃত্তে পত্র হয়ে জাগে। কমলটির যেমন নয়নাভিরাম বর্ণ তেমন তার হৃদয়হর সুবাস। অভয়া হাস্যবদনা কামিনী রূপে উপবেশন করে কমলটিতে। তার বাম করে করিবররূপী পদ্মাবতী। মায়াবদ্ধ ধনপতি সে অনন্য দৃশ্য দেখে অনন্ত বিহুলতায়। সাধু-অলক্ষে অভয়া পুষ্পধনুকে সন্ধান করে শর। শরমুখে একটি প্রস্ফুটিত অরবিন্দ। জ্যামুক্ত পুষ্প সিঙ্কুপথ অতিক্রম করে আঘাত করে সাধু-হৃদে। ক্ষণকাল গতের আগেই ধনপতি ঘন কামাবেশে। তারপর একে একে অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল শর যোজন ও আহনন। তাপন, শোষণ, শুভন ও সম্মোহনে কামোন্মাদ সাধু সংজ্ঞাহীন। কাণ্ডার নির্দেশে চক্ষে জল দেয় গাবরদল, ব্যজনী নাড়ে। আতঙ্কিত নাইয়া-গাবরদল। কাণ্ডার বলে, ডর নাই হে। অমাবস্যা কারণে দু-দিবস গোধুম ও সর্পিতে উষ্মবীৰ্য খাদ্য ভোজন, তাই দেহ-বিপত্তি।

চৈতন্যে ফিরে ধনপতি দক্ষিণ হস্তখানি বিস্তার করে বলে, ওই দেখ চতুষষ্টি কমলে রাজনন্দিনী হাসে পঙ্কজ বনে।

মহাশঙ্কিত কাণ্ডার বলে, দহজলে কামিনী? বল কী ছোটোসাধু? জাগরণে এ কি স্বপন দেখ তুমি?

ধনপতি বলে, ওই দেখো কামিনীর দক্ষিণ করে কুঞ্জর। কী অপূর্ব শোভা প্রতিপদের এই কালিয়দহে নন্দিনীর চিত্তহারী রূপে। এ-কন্যা কেন থাকবে দহে, এর যথাযথ মন্দির তো হৃদে।

আতঙ্কিত কাণ্ডার বলে, ওহে ছোটোসাধু, আমরা না দেখি কুঞ্জর না কামিনী, তুমি যা দেখ সবই আপন নিশিবিকার। শালবান বড়োই কঠোর নৃপতি। লুণ্ঠন করবে সব ধন, নাশ করবে প্রাণ। সাধুধর্ম পালন করে নির্বিঘ্নে ফিরে চলো নিজ দেশে। দু-প্রহর নিশি গত হয়েছে। যাও নিদ্রা যাও বাকি দু-প্রহর। কাল দিবা গতের পূর্বেই ডিঙা ভিড়বে সিংহলকূলে। তখন না হয় স্থিরচিন্তে স্থলকামিনীর চিন্তা করো।

প্রেমানলে দগ্ধ হয় সাধু। তর্পণ মুদ্রায় দুই কর তুলে বলে, কামিনীর ওই অপরূপ কান্তির কী দিই তুলনা! ও রুচি মৃগাল, হিমকর, নবপল্লব, কনককমল-

জিনি। কে ওই রামা—স্বাহা, স্বধা, শচী, মদন-সুন্দরী, কলাবতী, সরস্বতী, রমা, চিত্রলেখা, তিলোত্তমা, সত্যভামা, রম্ভা নাকি অরুন্ধতী?

কর্ণধার বলে, কেউ নয় ছোটোসাধু। ওগুলি হল সিংহলদেশের কুস্তীর। ওদের নেঞ্জের আঘাতে নাও ওলটায়।

আপন ভাবে বিভোর সাধু প্রেমাবেশে বলে, রামা-চরণে মুখের নূপুরশালি, যেন সহস্র রাজহংস সরবে কেলি করে কালিয়দহে। দশ করশাখার শীর্ষে পুনর্নবে বিরাজ করে দশ ইন্দু। রামার দুই কর যাবকে রঞ্জিত। কোকনদও সে বর্ণের কাছে ম্লান। কামিনীর বদনটি শরদ-ইন্দু, অধর পক্ব বিশ্ববর, বিলোচন খঞ্জনের। ভুবনমোহিনীর তনুতে প্রভাতভানুর ছটা, ভালে সিন্দূর ফোঁটা। বালা অতীব কৃশোদরী, দুই কুচগিরি গুরুভার, নিবিড় দুই কনককলস নিতম্ব। বদন ঈষৎ মেলে বালা একবার গ্রাস করে কুঞ্জরটি একবার উগারে। এ-কি জাগরণে স্বপন দেখি!

ত্রাস-তাড়িত কাণ্ডার বলে, ছোটোসাধু, শুধু স্বপন না, এ-হল আলম্ব বিধি-স্বপন। এতে নিশীথে রবি ওঠে, দিবাকালে শশী। তুমি নয়ন সংস্কার করো অলিঙ্গর জলে।

কামকাতর সাধু বলে চলে, রামা ঈষৎ হাসে আর তার দন্ত পঙ্ক্তির বিজিত বিজলিতে গগনমণ্ডল ভাসে। বালার বদনকমল সুবাসে অলিদল মকরন্দ ত্যাগ করে মধুর গীতে উড়ে আসে। তুমি সাক্ষী কর্ণধার।

হতাশ বৃদ্ধ বুঢ়ন বলে, তুমি দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হে সাধু। সকল বিদ্যার বন্ধু তুমি, অশেষ গুণের সিদ্ধু। আমি না দেখি কামিনী, না পাই কমলসুবাস। নাসিকা থেকেও আমি বাসহারা, নয়ান থেকেও অন্ধ।

কামশরে মায়াবদ্ধ সাধু মধ্যযামিনীর কালিয়দহের দিকে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করে বলে, যোজন গভীর সিদ্ধুজলে কেমন করে প্রস্ফুটিত হল কমল আর এই তুরঙ্গ-গতি তরঙ্গে কেমন করেই বা অবলা জন স্থির উপবেশনে থাকে! যে কমল বহন করতে পারে না প্লবঙ্গের ভার তা যেমন করে ধারণ করে কমলিনী ও কুঞ্জরের ভার? এ কেমন কামিনী যে বিনা বিস্তারে গ্রাস করে গজনাথে! ওষ্ঠের খদির-তাম্বুলের রক্তরাগ গজগ্রাসের পরেও পূর্ববৎ সমুজ্জ্বল। ডিঙায় দণ্ডায়মান পুরুষজন কিন্তু কামিনীর না আছে কুষ্ঠা না ত্রাস।

সাধুর লক্ষ্যটি যত্নে দেখে কাণ্ডার। অনুভব হয় বামভাগে সহস্র গজ দূরে জলকুমারীর লীলাক্ষেত্রটি। আকস্মিক কাণ্ডার 'সামাল সামাল' ধ্বনিতে কর্ণ দ্রুত ঘোরায়ে বামে। নাইয়া-গাবরদল কেরয়াল ধরে দৃঢ় মুষ্টিতে। নিদ্রিত নাইয়া-গাবরেরা শয্যা ছেড়ে কেরয়ালে। দুর্গাবরের শত ক্ষেপণীতে চতুঃষষ্ঠিদল কঞ্জ লণ্ডভণ্ড করে কাণ্ডার। জলকুমারীকে প্রেরণ করে সিদ্ধুতলে। অলিদল কুমারীর

বদন ত্যাগ করে মকরন্দে যায়। পূর্ণিমাশশী ফেরে প্রতিপদে। অমলা ও পদ্মাবতী কালিয়দহ ত্যাগ করে পুনরায় স্বস্থানে। ধনপতিকে কাণ্ডার বলে, কুঞ্জর ফিরে গেছে কাননে, কামিনী নিদ্রাকর্মে শয়নমন্দিরে। তুমিও এবার শয়ানে যাও ছোটোসাধু। আর যারা শয্যা ছেড়ে কেরয়ালে বসেছে তারাও নিদ্রা যাক।

সাধু প্রবেশ করে ছইগৃহে। শয্যা নেয়। চক্ষু মোদে। গত হয় সময়। বাজে নৃপুরুষনি। সাধু বসে। উঠে এসে দাঁড়ায় ডালি ওপরে। দেখে অগাধ সলিলে এক অপরূপ কানন। সেখানে ডাক দেয় পিক, নৃত্য করে কলাপী, অলিদল পঞ্চম গায়। মত্ত মধুকর বিচরণ করে সারা কানন আর তাদের পক্ষ বায়ুতে তরুলতা আচ্ছাদিত হয় পুষ্পপরাগে। কুঞ্জবনটি সুদৃশ্য পলাশ-কাঞ্চন-কুন্দ-রঙ্গনে, সুবাসিত মালতী-শেফালিকা-ভৃঙ্গমোহী-মাধবীপুষ্পে। কুঞ্জবনে ঝুলন্ত একটি মনোহর চন্দ্রাতপ। সেটির চতুর্পার্শ্বে অসংখ্য নেতধ্বজা ও শ্বেতচামর। পাট সূতলিতে গ্রন্থিত শুভ্র মুকুতা ও সুরঙ্গ প্রবালের মালা চন্দ্রাতপ ঘিরে। তারই মধ্যস্থলে ভুজ তুলে নৃত্য করে বালা। তাকে কেন্দ্র করে আনর্তিত বিদ্যাধরীগণ রবাব-মরুজ-ডম্ফের বাজনধ্বনিতে। সিঙ্কুজলে সাধু দেখে নন্দিত নন্দিনীনন্দন। ভাবে রামাবেষ্টিত ওই রামা ইন্দ্রাণী, উষা, লক্ষ্মী নাকি ডাকিনী, হাকিনী, যোগিনী, কামের কামিনী? কী চরিত্র ওই কন্যার? কী ওর বাসনা? ও সাধুর ভাবী শয্যাসঙ্গিনী নাকি শঙ্কাতামিনী?

কাণ্ডার বলে, নিশির ত্রি-প্রহর গত হয়। শয্যা যাও ছোটোসাধু। যে দৃশ্য শত নাইয়া-গাবরজনের কেউ না দেখে তা তোমার নিশিবিহার। কাল মধ্যাহ্নে ভোজন কোরো তণ্ডুল ও তরল সূপ। বাদ দিয়ে ঘৃত ও মীন।

আকস্মিক অদৃশ্য হয় কমল ও কামিনী। কাননটিও নিরুদ্দেশ। সাধু ভাবে কেবল নন্দরানিকে বালকৃষ্ণ দেখিয়েছিল বিশ্বরূপ আপন বদনে। তেমনই কি কমলবনের কামিনীর অপরূপ কান্তি প্রদর্শন শুধু তার জন্য? একান্ত আপনার!

ডিঙা অতিক্রম করে কালিয়দহ। প্রত্যাষ হয় সিঙ্কুবুকে।

## ৪৩ লঙ্কাতীরে দুর্গাবর

সাগরজলে মীন তরী ভাসে। নিষগ্ন দণ্ডের পিঙ্গল চূড়াটি শূন্য, নিরাভরণ। সিঙ্কুসারস দুরযাত্রী আর গাংচিল্লক কূলে, অনন্যোপায় দিনমণি চড়ে দণ্ডশীর্ষে। তরঙ্গে দোলে তরী, বিচ্ছুরিত বিষুকিরণ বিহার করে আদিগন্ত জলধি। একটি পর্বতপ্রমাণ কূর্ম দেহাবরণ হতে মুণ্ডখানি কিঞ্চিৎ প্রকাশ করে বলে, 'চূড়াটি হল

দগুশিরের আবরণ, বিষ্ণুকিরণ হল আভরণ।’ শঙ্কিত কূর্মশাবকটি ভাবে এই শীতল শৌষপ্রাতে পিতৃদেব প্রবেশ করে বর্ণবিশ্লেষণ ও অষ্টাদশ ফলা বর্ণনে। সে ‘টুব’ করে ডুব দেয় সিদ্ধজলে। চলে জলতলের গিরিগহুরে প্রভাতি নিদ্রায়।

কাণ্ডার বলে, ওহে সর্বজন, কর্ণ, নাসিকা ও মুখগহুর ঢাকো অঙ্গবস্ত্রে। কূল হতে শীতল বায়ু বয়ে আসে। আর সতর্কে টানো কেরয়াল। পর্বত শিলার বসত ডিঙাতলে।

ডিঙা চলে বাদাম উড়িয়ে। তরঙ্গে ভাসে নারিকল, গুয়াগুচ্ছ, মাকন্দশাখা। কেউ তরঙ্গে তরঙ্গে চলে দূর জলে, কেউ ফিরে যায় বালুতটে। নাইয়া-গাবরদলের চক্ষুমণিতে আনন্দরশ্মি, ওষ্ঠে হর্ষরেখা। মহাকচ্ছ যাত্রা শেষে আবার সমুখে জাগবে বৃক্ষসারি, মাথা তুলবে পর্বত, চারণে চরবে ধেনু, শাখীতে নীড় গড়বে পক্ষী; জল কর্ষণ করবে জালিক, মহলদিতে দুলবে কহলার, হাটে চলবে ব্যাপারী, ঘাটে যাবে বধু, রামনাম করবে বিভীষণের আত্মজন, নগর পরিক্রমায় যাবে কোটাল, দেহকলা দেখাবে বেউশ্যা, স্থির হবে নিশিশ্যা। বিরঢ়াক বাজবে ঘন, উড়্যা পাক মারবে পাইক, খাওয়া হবে বারমাস্যা পাকা তাল, অবগাহন করবে রত্নমালার ঘাটে, রঙ্গ করবে রঙ্গিনী সঙ্গে। দেখবে সীতা-কানন, সংগ্রহ করবে অশোক পুষ্প। বাস নেবে সহকারের। মদিরারসিক এক গাবর বলে রাবণের কনিষ্ঠা পত্নী ধান্যমালিনী বড়ো মধুর ধান্যেশ্বরী বানাতে। ধান্যমালিনী সপতী পরলোকে কিন্তু লঙ্কাদ্বীপের শৌণ্ডিকালয়ে নিত্যরাতে তার আরতি। বিলাপ করে কপিবর, অশোককাননে শিশুপা বৃক্ষতলে ধান্যমালিনী রাবণ-অগোচরে কত দুঃখ-শোকে সান্ত্বনা দিয়েছে সীতামাতাতে, কলি কাল বিস্মৃত হল সেসব কথা। কলির প্রতীক্ষা ধান্যেশ্বরীর, তিতিক্ষা ধনেশ্বরীর, অপেক্ষা কামেশ্বরীর।

রন্ধন-পণ্ডিতের দুই কিংকর ব্যস্ত কর্কট শিকারে। চার চক্ষু ঘন নিবিষ্ট জলধিতে। ক্ষুদ্রাকার দু-টি কর্কটের দর্শন মেলে। ফেরতযাত্রায় দিঘল হবে ভেবে ছেড়ে রাখে জলে। পরের দু-টিও তেমনই। অজস্র কর্কটের গতায়ত চলে সিদ্ধুতে। যে নধর মহাকর্কটগুলি আহার করেছে গত এক পক্ষকাল তার একটিও মেলে না এক গ্রহর জলকর্ষণে। ওদন, সুপ, ব্যঞ্জনের পাক সেরে রন্ধনপণ্ডিত কর্কটসন্ধানে এসে দেখে সাধুর ফেরতযাত্রার জন্য শত শত কর্কট প্রতীক্ষা করে ডিঙার বাহির দরগায়। পণ্ডিত কপালে করাঘাত করে বলে, ‘সিদ্ধুসারসের স্থানে গগনে ওড়ে গাংবাসী চিল্লক, সাগরকিনারে মহাকর্কট মিলবে কী করে হে! তোমাদের বুদ্ধিনাশে মধ্যাহ্নে সর্বজনের নিরামিষ ভোজন।’ দুই কিংকর বোঝে ডিঙা কূলবর্তী তাই একটিও মহাশকুল পড়ে না চোখে, না মহাকূর্ম। অবশেষে শফরী শিকার। অপরাহ্নের আহারে কটুতৈলে ভাজা। সাধু ধনপতি হেমথালে

ভোজন করে তগুল। রন্ধন-পণ্ডিত বিলাপ করে তার বড়ো সাধ ছিল সাধুর জন্য কর্কটের একটি পদ পাক করবে কিন্তু বিধির বিধান ভিন্ন। তাই শফরীতে আমিষাহার। সাধু হাদে মদনশরের শেষ রেশ। সে ভাবে অদ্রিকা অঙ্গরার কন্যা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর কথা। রূপবতী কন্যা চম্পক-অঙ্গুলিতে খেয়া বয় তটিনী তরঙ্গে। তীর্থ পরিক্রমা অস্ত্রে পরাশর সেতুবন্ধে অঙ্গরা-কন্যাটিকে দেখে হয়ে পড়ে কামার্ত। কিন্তু কন্যা উন্মুক্ত বালুতটে মিলনে সংকুচিত। তখন পরাশর সৃষ্টি করল হিমকণা। সেই তুষার আবরণে আচ্ছাদিত হল গিরি, কানন, জনপদ। পরাশর বরে মৎস্যগন্ধা হল সুগন্ধি গন্ধবতী। ধনপতি গভীর বিষাদে মনমধ্যে বিলাপ করে হিমকণায় এখনও ঢাকে গঞ্জ, গিরি, সরিৎ, সাগর কিন্তু নেই কোনো সত্যবতী। যে আছে সে অপরূপা কিন্তু অধরা, কামপ্রদ কিন্তু কুঞ্জরমতি। শফরীগুলি সযত্নে সরিয়ে রেখে ‘শিব’ স্মরণে ভোজন শেষ করে সাধু।

বর্ণ বদলায় দিনান্তের দিনমণি। কলধৌত কিরণমালা জগৎ পরিক্রমা শেষে স্ব-বাসে ফেরে। ধূসর আকাশতটে কমলা গগনখালি। কাণ্ডার ঘোষণা দেয়, ‘শিলাচূড়া বামে। কর্ণ ঘোরে দক্ষিণে হে।’ জল-ওপরে একটি নাতিদীর্ঘ শৈলকানন। গুটিকয় বৃক্ষ, কিছু পক্ষী আর উভচর কিছু প্রাণীর বাস সেখানে। শিলাচূড়ায় বসে একটি বৃহৎকায় সিঙ্কুসারস। সে অবলোকন করে দিনান্তে দিনমণির সিঙ্কুজলে অবগাহন।

আকস্মিক এই নাইয়া দূর সিঙ্কুকোলে দেখে এক হরিংরেখা। সে হর্ষে চিৎকার করে ওঠে, ‘ডাঙা ডাঙা’। মুহূর্তে স্থির কেরয়াল সারি, মছুর ডিঙা। সরব সাগর ধ্বনি। কাণ্ডার চক্ষু-জোড়ার সংকোচনে পৌঁছোতে চায় প্রান্তরেখায়। দেখে শুধুই পীতধূসর জলতরঙ্গ অকূল বিস্তারে। আর এক নাইয়া বলে, ‘ওই ওই।’ দিনমণি প্রবেশ করে মহাকছে। শৈলকাননের পক্ষীদল মাতে বাকরঙ্গে। সিঙ্কুসারসের সোচ্চার ডাকে নিশি নামে। এক নিবিড় নীরবতা শৈলদ্বীপে। সর্পিবাতি জ্বলে দুর্গাবরে।

সন্ধ্যা প্রহরে উত্তরাকাশে বিরাজ করে যোগিনী। সময় গতে সরে অগ্নি কোণে। পূর্বাষাড়ানক্ষত্র প্রকাশ পায় গগনে। তার তলে দূর দিগন্তে ভাসে একসারি মীন ডিঙা। দ্বিতীয়ার ক্ষীণ তনু শশী মাথা ওপরে। দক্ষিণের উর্ধ্বাকাশে এক আলোক-আভা। ডিঙা চলে শত কেরয়ালে। গত হয় প্রহর। ডিঙাতলে ব্যবস্থা হয় নিশি আহারের। ডিঙা ওপরে প্রতীক্ষা সিঙ্কুতীরের।

সময় গতে এক নাইয়া আঁধার তটে সারিবদ্ধ বাতি দেখে আত্মহারা। সে দৃশ্যে ‘সমবেত উচ্ছ্বাস দুর্গাবরে। কাণ্ডার বলে, ‘করজোড়ে নত হও। বৃক্ষবাসী উলুকদল জলভাসীদের পথ দেখাচ্ছে হে।’ ডিঙা চলে মহানন্দে। আবার আঁধারে ঢাকে সিঙ্কুকূল। কাণ্ডার হাঁক দেয়, ‘বাহ বাহ’। কেরয়াল জল কাটে দ্রুত। অগ্নিকুণ্ড

বালুতটে। নত হয় কাণ্ডার। সুরলোকে যাত্রা করে কোনো লঙ্কাবাসী। নাইয়া-গাবরদল দেখে চিতাঘ্নিতে হেমকান্ত বালুতট। নিষঙ্গ দণ্ডে এসে বসে এক নিশিঙ্গাগর পক্ষী। ডিঙা চলে। সমুখে একটি বাতিময় সেতুবন্ধ। কাণ্ডার বলে, ‘বাদাম নামাও হে, দেখ রত্নমালার ঘাট।’ ধীর চলে ডিঙা। প্রত্যাষে স্পর্শ করে তীর। নাইয়া-গাবরদল সমবেতে নাম নেয় ‘রাম রাম’। ডিঙা বাঁধে লৌহ আলানে। সাধু তটে নামে ‘শিব’ স্মরণে।

গাবরদল কূল ভেঙে মৃত্তিকাতটে ওঠে। খনন করে গহ্বর, বহন করে আনে খাস্তা-দণ্ড-যষ্টি। সাধুর তাম্বুঘরের পত্রপাটি ও চন্দ্রাতপ নামায়। স্মরণ করে রক্তবর্ণ, দণ্ডপাণি, স্বর্ণমুকুট ও হেম যজ্ঞোপবীতধারী বাস্তুদেবের। সাধুর লঙ্কাবাস বিয়ুহীন বরাভয় কোরো হে। নির্মাণ চলে সাধুবাসের। আনে পালঙ্ক, পাড়ি, পামরি কম্বল, সকল্লাথ। নাইয়াদল আপন শয়ন ব্যবস্থা করে অশোক, মাকন্দ, শিংশপা, চলদল, বট বৃক্ষতলে। বৃক্ষবাসী পক্ষীদল কূজনে অ্যাপায়ন করে অতিথিদের। পাইকদল বিস্তৃত তীরভূমি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। উড়্যা পাক দেয় এক বুড়ি। বেজে ওঠে নবরঙ্গ, ভেরি, দোসরি, মোহরি। সরব হয় বিরকালি, শিঙ্গা, কাড়া, পড়া। দামার দামাল নাদে চমকিত হয় সর্বজনা। তবকি তবকে রোল ওঠে। সিংহল নগর চমকিত, দ্বীপবাসীর কর্ণে তালি। পক্ষীকূল নীড় ছেড়ে অম্বরযাত্রী, কূলবর্তী কুলির মধ্যসিঙ্কু পথে, গজদল গিরিগহ্বর মুখে। ডম্বুর, জগবাম্প, সানি, রণ-বেণীর সুরবাদ্যে কম্পিত লঙ্কা। পাইক অসিতে বাঙালি খেলে। কাণ্ডাফলার বিজুলিতে বটবৃক্ষের ভগ্ননিদ অজাগর নয়ন মোদে। রায়-বাঁশিয়া ধায় মণ্ডলীতে। নেজার তাণ্ডবনৃত্য চলে গগনে। ধমক নিশানে সিঙ্কুতীর সরব। ভয়ংকরী সুভট্ট সঘনে গগনে হানে সুছন্দরী আর সিখিবাণ। যেমন তাদের হৃদয়বিদারক ধ্বনি তেমন নয়ন-দাহক রূপ! বিস্ময়ে সে ধ্বনি শোনে সিঙ্কু, দেখে দিনমণি।

নৃপমণির প্রত্যাষ-নিদ্রা টুটে বাদ্যের রোল আর নাইয়া-গাবরদের হুলাহুলিতে। রাজনের নিদ্রাতুর পঞ্চপাত্রও ত্রাসিত। দিনের প্রথম প্রহর গতে পাত্রগণ রাজদ্বারে। নৃপ সন্ধান করেন কোটালের। শত কিংকর লঙ্কা জুড়ে ঘন ঘন ডাক পাড়ে ‘কোটাল’ ‘কোটাল’। গজস্কন্ধে কোটাল দ্রুত চলে রাজদ্বারে। দর্শন দেয় রাজসভায়। নৃপতি বলেন, ‘বধির নাকি হে তুমি, না শোন দামামার ধ্বনি? অঙ্ক, না দেখ সুন্দরী-সিখিবাণ?’ কোটাল কালু দণ্ড যুথ পাণিতে বলে, ‘আজ্ঞে নররাজ, লঙ্কা রাজ্যে বাদ্যের ভার বাদ্যকারের, বাণ বীরবর সেনাপতির।’ কুপিত নৃপতি বলে, ‘লুটেপুটে খাও বেটা দেশের বিধাতা, দ্বীপের ভালো-মন্দ বারতা বয়ে আনতে পার না? বাদ্যকার আর বীরবরের দোহায় দাও? যাও, রত্নমালার ঘাটে। কীসের এত বাজন-গর্জন, জেনে ত্বরান্বিত নিবেদন করো। যদি ঘরদল হয় তবে নিয়ে

এসো এই পুরে, পরদল হলে দূর করো মেরে। বৈদেশিক হলে নিয়ে এসো এই  
ঠায়ে, দোহাই না শুনলে বিদায় করো প্রহারে।' সসাজ গজে চড়ে কোটাল।  
ধাওয়াধাই চলে রত্নমালায়। ঝমঝম গজঘণ্টি বাজে। কালু স্কন্দে বর্ষা দণ্ড।

মানান্তে সাধু বসে বিশ্ববৃক্ষ তলে। সমুখে অনন্ত নীলাশু, উর্ধ্বে নীলাকাশ। সাধু  
শোনে আগম পুরাণ। শিব হল সূক্ষ্মদেহী। বায়ু যেমন অদৃশ্য, অনাবয়ব, শিবও  
তাই। সদাশিব কখনো সূক্ষ্ম কখনো স্থূল। সূক্ষ্ম দেহে বায়ুর মতো নিকলা কিন্তু স্থূল  
দেহে বারির মতো দৃশ্যমান। আর মহেশ রূপে সকলা ও দৃশ্যমান। শিবসৃষ্টির  
কালে জন্ম হল পঞ্চশক্তির—পরশক্তি, আদিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও  
ক্রিয়াশক্তি। এদের নানা রূপ, নানান ক্রিয়া। পরশক্তি, শান্তি, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও  
নিবৃত্তি এই পঞ্চশক্তি হল যথাক্রমে শিবসদাখ্য, অমূর্তসদাখ্য, মূর্তসদাখ্য, কর্তৃসদাখ্য  
ও কর্মসদাখ্য। এই পাঁচ সদাশিব বা সদাখ্য যথাক্রমে বামদেব, তৎপুরুষ, অঘোর,  
সদ্যোজাত ও ঈশান নামেও খ্যাত। এই পাঁচটি সম্মিলিতভাবে হল পঞ্চব্রহ্ম।

পঞ্চব্রহ্মের ধ্যান শেষে নয়ন মেলে সাধু দেখে মহেশ স্থানে মূর্তিমান কোটাল  
দাঁড়িয়ে। তার গুম্ফজোড়া দিঘল, চক্ষুজোড়া পাকল। সে ঘন স্বরে জিজ্ঞাসা করে,  
রাজপুরে প্রবেশ করে দামামা বাজাও কোন বীতভয়ে?

সাধু নির্বাক। আগম পুরাণে জগদ্বন্ধন হতে মুক্তির কথা, কোটাল বাচনে  
রাজপুরের আশ্ফালন। কী অপার দূরত্ব!

সাধুকে নিরুত্তর দেখে কালু দণ্ড শোনায়ে রাজার বিধান, ঘরদল হলে রাজদ্বারে  
গমন, পরদল হলে প্রহারে বিদায়।

নাইয়া-গাবরদল বিশ্ববৃক্ষ ঘিরে। আসন ত্যাগ করে দাঁড়ায় সাধু। বজ্রনাদে বলে,  
আমি না ঘরদল, না পর। বিদেশি বৃহিতাল এসেছি পাটনে। শ্রীতি পেলে অবস্থান  
করব লক্ষ্য দেশে, নইলে ভাসাব ডিঙা। ধনপতি সদাগরে এত বিধান শোনাও  
কীসের?

কণ্ঠ চড়ে কোটালের। বলে, ডাকা-চুরি হলে দায় কোটালের শিরে। আমার  
দিগারি পঞ্চাশ কাহন আগে দাও, পরে অন্য কথা।

উত্তেজিত সাধু বলে, তোদের দেশে এসে জলও গ্রহণ করিনি আমি, আমাকে  
চক্ষু পাকাল করিস কী কারণে? কী কর্মের-বা দিগারি তোর?

কোটাল নেজা নেড়ে বলে, তুই সাধু না, পক্ষ দুষ্ট-খণ্ড। ও ভরাটিও মিছা।  
রাজপুরে ঢুকে ডাকা দিবি স্বজনে।

ক্ৰোধানলে সাধু বলে, যে আপনি দুষ্ট সে সর্বজনে খণ্ড দেখে। আপন  
বাপেরেও তার না থাকে পাত্যারা।

বাগ্যুদ্ধ বুদ্ধি পায়। এগিয়ে আসে কর্ণধার। শ্রীতিবাক্যে প্রবোধ দেয়

কোটালকে। ব্যবস্থা হয় তার দিগারিরও। তুষ্ট কোটাল, বদনটি প্রফুল্ল। গজারোহণের আগে কালু দণ্ড বলে, একদা কুবেরবাস এই ত্রিকুট। ত্র্যম্বকসখা, বৈশ্রবণ, পৌলস্ত্য, একপিঙ্গল আদি কুবেরের সপ্তনামের একটি হল ধনপতি। নির্বিঘ্নে লঙ্কাদ্বীপে বাণিজ্য করো হে সাধু। কেউ স্পর্শ করবে না তোমার একটি পণ।

কোটাল চলে রাজদ্বারে। কপিবর বৃক্ষতলের কুরঙ্গ-তুরঙ্গদলকে বলে, পণ বাঁচলেই কি প্রাণ বাঁচে হে! এ-দ্বীপেই হনুমানজির ছায়া ধরে গমন বোধ করেছিল সিংহিকা। হনুমানজির হস্তে মৃত্যু হয় তার কিন্তু ছায়া-বিদ্যাটি এখনও বিদ্যমান লঙ্কাদ্বীপে। তাই কোটাল যা কিছুই বলুক; পথে নিজ নিজ ছায়াখানিতে সতর্ক দৃষ্টি রেখো হে সর্বজন।

ব্যবস্থা চলে ভোজনের। ভোজনান্তে বিশ্রাম। দুর্বল নরদের রক্ষা করার জন্য যে রাক্ষসজনের জন্ম দিল ব্রহ্মা তাদের একাংশ কেমন করে নরদেবী হল সে বৃত্তান্ত শোনায় কপিবর অপরাহ্নে। দিনান্তে সিদ্ধুতলে চলে দিনমণি। দীর্ঘ জলযাত্রায় নাইয়া-গাবরদল অবসন্ন, নিদ্রাতুর। নিশির প্রথম প্রহর গতের আগেই ঘনঘুমে রত্নমালা ঘাট। জাগর কেবল তৃতীয়ার শশী, উত্তরাষাঢ়া আদি গগনের তারা-গ্রহ আর বৃক্ষবাসী উলুক।

## ৪৪ সাধুর রাজসভা গমন

পূর্বগগনে ওড়পুষ্প দল মেলে, সিদ্ধুজল রাঙা হয়। সিদ্ধুসারস চলে দূরযাত্রায়। তীরবাসী ক্ষেমংকরী দিঘল ডাক দেয় নীলগগনে। সরব নীলাশু, ঝাবু বন, নারিকল পাতা, শাম্মলি বৃক্ষকোটর।

সাজ সাজ রব রত্নমালা সেতুবন্ধে। সাধু যাবে সিংহলেশ্বর দর্শনে, যোজনা চলে ভেটদ্রব্যের। কিছু এসেছে সাধু সঙ্গে দুর্গাবরে, কিছু সংগৃহীত হয় লঙ্কাদ্বীপ হতে। ভার ভার মর্তমান কদলী, মজা গুয়া, পক্ক তাম্বুল, মাকন্দ, পনস, নারিকল সজ্জিত হয় রত্নমালার সোপানে। আসে গজ-বাঁধা শালি তণ্ডুল, মধু, বাস, দধি, শর্করা, ফেনি, নাড়ু-গঙ্গাজল। পঞ্চাশ কান্দি বারমাস্যা পাকা তাল, শত বুড়ি করুণা ও কমলা আর সহস্র পিণ্ড রসাল খাজুর। যে বায়ুচরগুলি সহচর সেগুলি হল শত জোড়া কপোতের ছা ও চামঠুলিতে চক্ষু ঢাকা সয়চান পক্ষী-যুগল। দ্বিশত শ্বেতশুভ্র রাজহংস চলে হংসী সঙ্গে পিঞ্জরে। নৃপতির জন্য ভূমিচরগুলি হল কেশরী, ব্যাগ্র,

কালসার মৃগ, ছাগ, খাসি ও রণ-মেঘ। নৃপতির আরোহণের জন্য পাঁচখানি জিন-বন্ধ তাজি তুরঙ্গ যার খুরা স্পর্শ করে না অবনী। নৃপতির মৃগয়া-সঙ্গী হবে যে সারমেয়দল তারা চলে সতর্ক পদে। নাসিকা ও কর্ণরন্ধ্রও অতন্দ্র। দুই পাইকের স্কন্ধে চলে শিখিপূরে বিরচিত মণি-মুক্তা উপনীত আতপত্র। কৃপাণ, রাস্তা লাঠি, ভোট, পাটি আদি মিলে একশত পঞ্চাশ ভেট। আগে-পিছে ভার চলে। লঙ্কাদ্বীপের নাগরিয়া গৃহদ্বারে এসে বিস্ময়ে দেখে সেই মনোহর দৃশ্য। নানা পুষ্পে সুবাসিত, নানা রঙে সুদৃশ্য, নানা ধ্বনিতে সুখশ্রাব্য সেই শোভাযাত্রার সঙ্গী শত শত নগরিয়া শিশু, পথবাসী সারমেয়, বৃক্ষবাসী কপিদল। গৃহী মার্জার, নেউল, শশারুও চলে শিশুদলের ক্রোড়, স্কন্ধ, পদে পদে। এক বিবাগীজনও চলে পাইকদলের পিছে পিছে। কর্ণের স্বর্ণলংকারে তার মোহ নেই, সাধ শুধু গৌড়দেশের এক-জোড়া তাড়বালার। পরিখা অতিক্রম করে রাজদ্বারে এসে উপস্থিত হয় ভারীদল।

রাবণরাজের প্রাসাদটি সিঙ্খগর্ভে কিন্তু নরপতি শালবানের রাজবাটিও তেমনই সুরক্ষিত ও নয়নাভিরাম। পরিখাটি গভীর এবং খরস্রোতা। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় প্লাবন আসে পরিখায়। রাজহংস কেলি করে জলতরঙ্গে। মূল প্রবেশদ্বারের সম্মুখে শত রক্ষী শতগ্রী হস্তে। পাইকদল স্থিরচক্ষে দেখে কণ্টকিত চারি হস্ত লৌহ বর্তুলগুলি। ভাবে এরই একাঘাতে শত সেনা নিধন করেছিল রাবণরাজ লঙ্কায়ুদ্ধে। রাজপুরীর প্রাকারটিও যেমন সুউচ্চ তেমনই সুদৃঢ়। ওপরে স্থানে স্থানে অপূর্ব পুষ্পকানন। অজস্র লোহিত, নীলাভ, হরিদ্রা, হরিৎ, নীললোহিত, আপিসল, স্বর্ণাভ কুসুমে সুদৃশ্য ও সুবাসিত চতুর্দিক। সিংহদ্বার অতিক্রম করে বাম ও দক্ষিণে দু-টি বাদ্যমণ্ডপ। তারপর সহস্র শতদলে শোধিত দু-টি জলাশয়। সে দু-টি অতিক্রম করে দক্ষিণে একটি চিত্রশালা এবং বামে পানশালা। তাদের ঘিরে ঘন সবুজ তৃণপ্রাঙ্গণ। তারপর অপূর্ব সেই সুউচ্চ রাজপুরী। প্রস্তর ও দারুণ এক গগনচুম্বী বাটী রাজনের। দশ হিরণ্ময় চূড়ার সহবাসী খণ্ড ভাসমান দেয়া। বাটীগাত্রে রাম-সীতা চিত্র, বিভীষণ স্ততি। চৌদিকে চারটি চলদল বৃক্ষ। সাগরবায়ুতে বৃক্ষপত্র আন্দোলিত হয় অনুচ্চ স্বরে, শুষ্কপত্র উড়ে চলে বাটী, পরিখা, চিত্রশালা পথে।

সাধুর আগমনবার্তা সভামধ্যে ঘোষণা করে রাজরক্ষী। সাধু যথাযথ সম্ভাষণ করে নৃপরাজ ও তার পঞ্চপাত্রকে। তারপর ভেটদ্রব্য রাখে। নৃপতি বলে, ‘এসো হে সদাগর। বলো কোন দেশে তোমার নিবাস, কেমন তোমাদের নৃপরাজ।’ সাধু বলে, আমার বাস গৌড় দেশে। চামর, চন্দন, শঙ্খ আদি ধনের অভাব রাজভাণ্ডারে তাই রাজাশ্রয় সিঙ্খপথে সিংহল দেশে আগমন। আমি জাতিতে গন্ধবণিক, উৎপত্তি দত্তকুলে, নাম ধনপতি। স্থিতি গঙ্গার নিকট অজয়ের তটে উজ্বলিতে। রাজামহাশয় তাপে ধনঞ্জয় আর প্রজাপালনে রাম। তেজে যেন রবি, গীতে নারদ,

সতে যুঁধিষ্ঠির, দানে সুরতরু। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনই কবিত্ব সুমতি সুস্থির নৃপতি। দন্তীবিদ্যায় যেমন বিশারদ তেমনই অশ্বশিক্ষায় নল। পাত্ৰধি বংশের রাজা রঘুনাথের রাজ্যে না আছে রক্ত না দুখি। সর্বজন সুখী সেথায়।

নরপতি বলেন, ‘এবার বলো কী বদলের আশে তোমার এই সিংহল দেশে আগমন। কী ধন নেবে তুমি তোমার ডিঙায়, দেবেই-বা কী?’ সাধু বলে, ‘কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ নেব, নারিকল বদলে শঙ্খ, বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ নেব, শুষ্ঠ বদলে টঙ্ক। আকন্দ বদলে মাকন্দ নেব, পায়রা বদলে শুয়া, গাছফল বদলে জায়ফল নেব, বয়ড়ার বদলে গুয়া। সিন্দূর বদলে হিঙ্গুল দিবে, গুঞ্চার বদলে পলা, পাটশন বদলে ধবল চামর, কাচের বদলে নীলা। লবণ বদলে সৈন্দব দিবে, সোলফার বদলে জিরা, প্লবঙ্গ বদলে কুরঙ্গ দিবে, হরিताल বদলে হিরা। চন্দন দিলে চঞ্চ পাবে, গড়া দিলে পাগ, মুক্তা দিলে শুভ্রা পাবে, ঘোড়া দিলে ভেড়া। নরপতি, ক্রয় করে এনেছি মাষ, মুসরি, তণ্ডুল, মধুরি, বরবটী, বাটুলা, চিনা। ঘটে ঘটে এনেছি তৈল ও ঘৃত। ডিঙায় আছে শত দুগ্ধবতী গাভী ও বেশ কটি বলবান বৃষ। আর আছে একটি কপিদল। তারা রামনাম শোনাতে লক্ষা দেশে।’ খুশি নরপতি। অঙ্গীকার করেন বদলের। ভূষণ ও চন্দনে সাধুকে তুষণ করেন, রন্ধন বেভারের জন্য দেন শতেক কাহন। সাধু ফেরে রত্নমালার ঘাটে কিংকর-পাইক সঙ্গে।

রন্ধনপণ্ডিত মহানন্দে বিশ ভারী সঙ্গে সংগ্রহ করেছে অলাবু, কচি কুমুড়া, পলাকড়া, শাক, বাগ্যান, সারি কচু, খাম আলু, মান, ওল, কামরঙ্গ, কুলি। লবণ-মীনে বাসনা মেটেনি রসনার। তাই মিষ্টজলের রহিত, কই আর চিঙ্গড়া কেনা। খাসি কেনে পঞ্চাশটি। সাধু রাজদ্বার হতে ফেরার পর কদলীপত্রে ব্যবস্থা হয় দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের। সাধুর জন্য কনকথাল। তণ্ডুলের পর ঘৃত ও ভাজা পলাকড়ি। তারপর একে একে সুকুতা, ঝোল, সুপ, ঘণ্ট, শাক। সকলে প্রশংসা করে রন্ধনের পাক। পাঁচ পদ মীন ও মাংস পড়ে। রত্নমালার সেতুবন্ধ আমিষ সুবাসে আমোদিত। বদরী-শকুলের অম্বলে প্রীত সর্বজন। দধি ও ফেনিতে সম্পূর্ণ হয় পঞ্চাশ পদ। কর্পূর-তাম্বুলে হয় মুখের শোধন। তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, কপিদল ততক্ষণে ভোজনাগ্রে দিবানিদ্ৰায়।

রাজপুরোহিত অগ্নিশর্মা নিত্যদিন বিশ্বহীন দ্বিপ্রহরে অবগাহন করে শৈবলিনীতে। তারপর শত জলাঞ্জলি। তীরে উঠে বস্ত্র পরিবর্তন করে দ্বিজ ধামে ফেরে। গৃহদেবতার নিত্যপূজা শেষে যায় রাজসভায়। দ্বিজের কাষ্ঠপাদুকার ধ্বনিতে দণ্ডায়মান সর্বজন। আশীর্বচন অগ্রে বসে কঞ্চলাসনে। চারিদিকে ভেটের আয়োজন দেখে কৌতূহলী। বলে, ‘কী বিষয় রায়, পঞ্চপাত্রের ক্রোড়ে নানা উপায়ন দেখি? এত মনোহর দ্রব্য এল কোথা হতে?’ রায় সহাস্য বদনে বলেন,

‘গৌড় হতে আগমন হয়েছে সাধু ধনপতির। সে নানা উপটৌকনে প্রণতি জানিয়েছে।’ যেন ঘটাহুতি হয় হোমকুণ্ডে। অনলের মতো জ্বলে ওঠে অগ্নিশর্মা। অভিযোগে বলে, ‘হায় সিংহল দেশে একী বিধি ব্রহ্মা অপত্যের? সবাকার ক্রোড়ে উপায়ন আর দ্বিজ উপেক্ষিত! বিধি-ব্যবস্থার বেলা আমি নিত্যদিন আর কর্মকারণের কালে আমি উদাসীন? হয় আমি ত্যাগ করব লঙ্কা দেশ, নয় যাগযজ্ঞ বর্জন করে দধি, দুগ্ধ, লবণ, শর্করা, জতু আর মাষ বেচব সেতুবন্ধে।’ দ্বিজ চলে নিজ ধামে। রাজপাত্র এসে পড়ে পদে। বলে, ‘দানগ্রহণ ও দানকরণ তো আপনার জাতধর্ম দ্বিজ। আপনি অনুপস্থিত থাকলে আপনার উপায়নটি আপনার নামে উৎসর্গ করে রাখা বিধেয়। কৃপা করে প্রতীক্ষা করুন, সাধু আসবে আপনার সম্মাননা নিয়ে।’ রাজ নির্দেশে কালু দণ্ড পুনরায় চলে রত্নমালার সেতুবন্ধে গজ চড়ে। কুপিত কালু মনে মনে বলে, যাক্কা করে মান, ব্রন্দন জুড়ে সোহাগ!

অপরাত্নে ধীরগতি পৌষী বায়ু, মন্দচল সিঙ্কু-তরঙ্গ, ক্ষীণকণ্ঠ ঝাবু বন, মহুর নগরকোটালের গজ। দণ্ডকে দণ্ডবৎ হওয়ার নগরিয়াও নেই তাই পথপার্শ্বে। শুধু একপাল ছেলি কুলিপত্র চর্বণ করতে করতে উদাসনয়নে গজগমন দেখে। অনুচ্চ স্বরে বলে, ‘গজকেতু হল ইন্দ্র, গজানন হল গণেশ, গজপতি হল কালু দণ্ড, গজানন হল অশ্বখবৃক্ষ আর গজা হল তিল ও শর্করায় প্রস্তুত মিষ্টান্ন। কালু দণ্ডের নিত্যদিনের প্রণামি এক ধামা গজা সম্প্রতি মোদকের আপণ হতে।’ একঝাঁক তটবাসী মক্ষিকার শখ হয় গজসঙ্গের। দুই কর্ণ-ব্যাজনীতে সমুখের পতঙ্গগুলি ওড়ায় গজপুঙ্গব কিন্তু পশ্চাতের দলটি নাছাড়। অগত্যা গজ চলে রণ পদে। সে দৃশ্য আতঙ্কে দেখে নিষদ্র দণ্ডের পক্ষী আর আশ্রাতক বৃক্ষের কাষ্ঠবিড়ালি। অচিরেই নগরকোটাল রত্নমালায়। জনমানবশূন্য সেতুবন্ধ। শুধু তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, গাভীদল বৃক্ষতলে। তাদের কেউ গোনে সিঙ্কুতরঙ্গ, কেউ স্মৃতিমেদুর পূর্বশ্রমে। কোটালের হুঙ্কারে রঙ্ঘনশাল হতে বেরিয়ে আসে রঙ্ঘনপণ্ডিতের দুই পার্শ্বচর। কচি পাঁঠা ও বৃদ্ধ মেঘের কারবারি তারা, গজ দেখে হতবুদ্ধি। নগরকোটালের দিঘল দণ্ডটিতে হতবাকও। অবশেষে অবধাবন করে কোটাল সন্ধান করে সাধুর আর জিজ্ঞাসা করে কোথায় কাণ্ডার, নাইয়া, পাইকদল। সবিনয়ে দুই পণ্ডিত-সহচর নিবেদন করে, ‘সাধু দিবানিদ্রায়, কাণ্ডার সীতাবাস অশোকবনে, খানিক নাইয়া-কিংকর নগর ভ্রমণে খানিক বেউশ্যালয় সন্ধানে। আর পাইকদল সাধুর জন্য অক্ষতযোনি অপ্সরার খোঁজে নগরে।’ গুপ্তধারী কোটাল বলে, ‘সদাগরে বলো রাজপুরোহিত এসেছে রাজসভায়। রায়ের আদেশ যেন ত্বরায় রাজদ্বারে।’

দুই পণ্ডিত-সহচরের সোচ্চার ঘোষণায় নাইয়া, কিংকর, পাইকদল অচিরেই সেতুবন্ধে। সংবাদ যায় সাধুর কাছেও। সাজানো হয় পাটের দোলা। সাধু চলে

দ্বিজদর্শনে। পথপার্শ্বের আশ্রিতক বৃক্ষের এক শুষ্ক শাখে কর্কশ ডাক পাড়ে একটি ঘনকৃষ্ণ কাউয়া। সঙ্গীজন ভাবে কে জানে কী বাধা সাধুর সিংহল বাসে! চলে দোলা। পাইকদল সরব হয় চলন বোলে। বামে পর্কটি বৃক্ষে বৈকালিক রৌদ্রের উষ্ণতা মেয় একটি ভুজঙ্গ। শঙ্কিত হয় পাইকদল। ষোড়শপদী দোলা চলে দ্রুত লয়ে। দক্ষিণে সুগন্ধি কেয়া বন। সুবাস নেয় পাইকদল। আকস্মিক দুলে ওঠে বনপ্রান্ত। একদল পীতধূসর শৃগাল চলে নীরবে। পাইকদল দেখে পরস্পরে। কী বিপাক প্রতীক্ষা করে রাজধামে?

সাধু পুনরায় সভায় প্রবেশ করলে দ্বিজ বলে, ‘জলপথটি বিঘ্নহীন ছিল তো সদাগর? সুস্থ ছিল দেহ-মন? আর শোনাও তো কিবা নায়ে এলে লঙ্কাতটে’ সাধু বলে, সপ্তডিঙা আর সহস্র নাইয়া নিয়ে আঘন গোধূলিতে যাত্রারম্ভ। ভ্রমরা-অজয় হয়ে ডিঙাসারি উপনীত ইন্দ্রাণীর সেতুবন্ধে। হরিপদদ্বন্দ্বা ধৌত অলকানন্দা বেয়ে গীত-নাটে দীর্ঘ যাত্রা। দক্ষিণ ও বামে যত গ্রাম-নগর তার কটিরই-বা নাম নেব! একসময় ডিঙাসারি স্পর্শ করে ত্রিবিনির তট। প্রভাতে স্নান সম্পন্ন করে যথাবিধি পিণ্ডদান ও ঘটে গঙ্গা-নীর সংগ্রহ। তারপর রাত্রিদিন নাও বেয়ে উপনীত মগরায়। সেথা দৈবের ফলে বহুতর ঝড় বৃষ্টি এবং ছয় ডিঙার নিমজ্জন। এক ডিঙায় তারপর পর্বতসমান জলভঙ্গ অতিক্রম জাহ্নবী ও সাগরসংগমে। সংকেতমাধব প্রদক্ষিণ সেরে সিঙ্কু বেয়ে নীলাচলে প্রভু জগন্নাথ দর্শন। বাকি লবণযাত্রায় নানা সুখ-দুখের পদ। নানান দ্বীপ-হ্রদ অতিক্রম করে শেষে সুদৃশ্য সিংহল দেশের কালিয়দহে প্রবেশ। শত-সহস্র শতদলে সিঙ্কুবারি আচ্ছাদিত। মধ্যনিশার সেই অপরূপ শোভার না দেখি তুলনা। তারপর অবধানে শুন ভূপ, আপন নয়নে দেখি এক শশীমুখী খঞ্জনলোচনা কুমারী বসে সুবিস্তৃত একটি কমলে। পরের দৃশ্যটি বিবরণে পরানে ডর আসে, রায়। অঙ্গনাটি একটি গজ একবার গ্রাস করে আর উগারে পরবার। অতি কৃশোদরী ওই বালা কেমন করে মস্ত গজ নিয়ে লীলা করে, আমার অজ্ঞাত।

সাধুর বচনে হাসেন রাজা শালবান, উপহাস করে রাজপাত্রগণ। মহাপাত্র বলে, ‘এত তরাস সঙ্গে কেউ লবণ-পাটনে আসে সাধু? কিবা সুভাগ্য তোমার, কৃশোদরী গ্রাস করেনি তোমায়।’ অন্য পাত্র বলে, ‘যে বালা মস্ত গজ গ্রাস করে, সাধুর নিষ্পদে তার কিবা বিঘ্ন?’ সংযোজন করে, ‘গ্রহণে রাহু গ্রাস করে শশী, আর শশীমুখী কালিয়দহে গ্রাস করে সাধুডিঙা, কোনো বিবাদ নাই হে গৌড়বাসী।’ কটুক্তি শুনে সাধু বলে, ‘স্থানগুণে ভর্তসনা কর অতিথিকে। রায়, আমি বন্ধন করে আনতাম গজ ও কামিনী, শুধু নৃপচূড়ামণির অনুমতি বিনা সে কর্ম করতে পারিনি।’ রোষযুথ নৃপমুনি বলেন, ‘এই সাধু ভণ্ড। রাজসভা নয় এই যোগ্য স্থান।

ধর্মশাস্ত্র বিচার করে এর উচিত দণ্ড নির্ধারিত হোক।' সাধু স্ফোভে বলে, 'ঠাকুরানি-বলে নৃপ বাকে সাধু ভণ্ড। আমি নৃপ সঙ্গে প্রতিজ্ঞাতে বন্ধ হতে রাজি।' রাজা শালবান বিস্ময়ে বলে, 'প্রতিজ্ঞা? মসীপত্রে? কী প্রতিজ্ঞা শুনি!' সাধু দৃঢ় প্রত্যয়ে বলে, 'আমার বচন মিথ্যা হলে লুপ্তিত হোক বৃহিতের ধন। মাতঙ্গ, কুরঙ্গ, তুরঙ্গ প্রবঙ্গ, রাম-কথাকার কপিদল, হেঁয়ালি প্রবন্ধকার শুক-শারি, সুকুতা-চঞ্চ-গুঞ্চা, আকন্দ-বিড়ঙ্গ-শুষ্ঠ, সব নৃপের। যদি মিথ্যা হয় সাধুবাক্য তবে নত মস্তকে প্রবেশ করব রাজ কারাগারে। বন্দি থাকব দ্বাদশ বৎসর।' বিস্মিত লঙ্কাপতি সাধুর বাক-ভঙ্গিমায়। এ কি আত্মস্মরিতা না কি আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয় না কি আত্মবিনাশ? নৃপ শালবান বলে, 'পুনর্বীর ভাবো হে পরদেশি। জেনো তোমার কল্পচিন্তন যদি শোনে ভিনদেশি সাধুজন, লঙ্কা হবে বর্জ্য দেশ, ত্যাজ্য দ্বীপ। যে রত্নমালা সেতুবন্ধে নিত্য বাঁধা থাকে শত নাও তা হবে বন্ধ্যা, বিলুপ্ত বন্দর। বলো কালিয়দহের কমলে কামিনী সুরাপানে দৃষ্টিভ্রম, বায়ুকোপে মনোবিকার।' উত্তেজিত সাধু উদাস্তকণ্ঠে বলে, 'যেমন সত্য গগনের রবি-শশী, সপ্তসাগর, লঙ্কাদ্বীপ, তেমনই সত্য সিঙ্খজলে কমল, কামিনী, কঙ্ক। এ নিশীথে দেখাব নৃপ, রাজপাত্র, সর্বজনে।' রুষ্ট নৃপ বলেন, 'যদি সত্য হয় তোমার বচন, সাধু তোমার প্রাপ্য অর্ধরাজ্য আর অর্ধসিংহাসন।' বাচন প্রতিজ্ঞা, মসিপত্রে লেখে সভাজন। অপরূপ কমলে কামিনী দর্শনে রাজা ঘোষণা দিলেন 'সাজ' 'সাজ'। কালিয়দহ গমনের প্রস্তুতিতে পুরে ধায় সর্বজন।

## ৪৫ লঙ্কাবাসীর রত্নমালা যাত্রা

দেউলে দেউলে বাজে শঙ্খ-ঘণ্টা। আকস্মিক বেজে ওঠে শিঙা। ধীরে ধীরে ঘন হয় রোল। কর্ণপাতে লঙ্কাবাসী। ভাবে জল-কম্প নাকি অন্য কোনো সংকেত! সরব হয় ঢাক, ঢোল, কাড়া, পড়া, মৃদঙ্গ, করতাল। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি জাগে জল, স্থল, অন্তরিক্ষে। জ্বলে ওঠে দীপ গেহগারি, শিলাগড়, নদীঘাটা, আঁশিঘাটায়। দোরে এসে দাঁড়ার গৃহস্থ, গড়মুখে সেনা, নদীঘাটায় নাইয়া-বধু, আঁশিঘাটায় সিঙ্খজালিক। বাদ্য রোলে সঙ্গ জোড়ে ডম্ফ, মোহরি, বীরকালি। শালবানের 'সাজ' 'সাজ' ঘোষণায় বাদ্য থামায় রূপাজীব, ভাণ্ডের মুখ বাঁধে মদোৎকট, ব্রহ্ম তাকায় কাণ্ডার বুঢ়ন। শত পিনাকে সুর তোলে বাদ্যকারদল—কালিয়দহের জলে, কুমারী কমলদলে/গজ গিলে উগারে অঙ্গনা। লঙ্কাবাসী শোনে সপ্ত জনম অশ্রুত,

অভাবিত, অকল্পিত সেই অপূর্ব কথা—অতি কৃশোদরী বালা, মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা/শশীমুখী খঞ্জন লোচনা। শশব্যস্ত দ্বীপবাসী বালাদর্শনে চলে রত্নমালার সেতুবন্ধে।

শ্রীট গ্রহাচার্য তার পত্নীকে বলে ‘এই পঞ্চমী দিনটি বড়ো মঙ্গলকর। পুংরত্নধারণ, নাওয়াত্রা, নাট্যারম্ভ, ঔষদকরণ, হলপ্রবাহ, বীজবপন, ধান্যস্থাপন, ঋণদান, ধান্যনিষ্ক্ৰমণ ও রাজদর্শনে শুভ যোগ। গগনে বিরাজ করে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। এই নিশীথেই গজ-কঙ্ক-কামিনীর দর্শন হওয়ার কথা।’ গ্রহাচার্য-পত্নী মন্দোদরী ঈষৎ উচ্চৈস্বর। সে সঘন স্বনে বলে, ‘রাজদর্শন হলে যাত্রা করো। কৃশোদরী কুমারী দর্শনের কোনো প্রয়োজন নাই, বিশেষত দক্ষিণে যখন যোগিনীর অবস্থান।’ হতাশ গ্রহাচার্য দারুপাদুকাযুগল খুলে রাখে। অনল কেওট মহাসিন্ধুর জালিক। কুস্তীরঘাটায় দিঘল নাউ। আকস্মিক তার গেহে উদয় আঁশিহাটার মহাজন নধরকান্তি চিত্তর পাণ্ডের। তার বড়ো সাধ সিন্ধুগর্ভে শতদল দেখার, সঙ্গে কৃশোদরী কামিনীটিও। অনল কেওটের ছত্রিশ-দাঁড়ি ডিঙার নিতাদিনের মীনের ক্রোতা চিত্তর। ‘না’ বলতে বাধে অনলের। বলে, ‘সিন্ধুজলে আমার জীবন কাটল হে, কমল কি কামিনী দেখিনি কখনো। যা সত্যিই দর্শনের তাহল ধূসর কুস্তীরদল আর নীল কূর্ম। কূলে মীন বেচে বেচে তোমার কৃষ্ণ কেশ এখন ধবল সাগর ফেনা। একবার চলো দূর জলে। এ-পক্ষেই।’ চিত্তর মুণ্ডখানি দোলায় করিশুণ্ডের মতো। তারপর বিষম বদনে বলে, ‘কিন্তু জলযাত্রীগুলি যে দাঁড়িয়ে তোমার দোরে!’ অনল কেওট বাহির দ্বারে আসে। সেথা মৃদঙ্গ-মন্দিরা-খমক হাতে বাজনদল, দোহার সঙ্গে গাইন, নৃত্য পটীয়সী রামাদল, চিত্তর পাণ্ডের রসকামিনী এবং নিশিভোজনের তণ্ডুল-ব্যঞ্জন-ছাগ। অসহায় অনল দেখে মীনডিঙার রঙ্গ দলটিকে। বেজে ওঠে বাদ্যযন্ত্র, গীত ধরে গাইন—‘মধুকর সনে বধু, বিকচ কমলে মধু/পান করি গাএ সুললিত।’ অনল কেওট শিরবস্ত্রটি নিতে ফেরে গেহে। চর্মচক্ষে কালিয়দহে নবদলে শশীমুখী দেখার আশা পূরণ হবে ভেবে নৃত্য জোড়ে মঞ্জুকেশী, দেবদত্তা, সন্ততি। মুখর নূপুরশালি আর মন্দিরা ধ্বনিতে দোহার স্বর চড়ায়—গীতে সমাহিত মন, দুই কূলে মৃগগণ/রহে যেন চিত্রের লিখিত।

রাজা শালবনের ‘সাজ’ ‘সাজ’ ঘোষণায় সাজনে বসেছিল রাজমাতা। অভরণ-পেড়ি এনে চেড়ীদল মার্জনা করে শুভ কেশ। বাঁধে গুয়াগুটি কবরী। সেটি ঘিরে কুসুমের গাভা। মণিকর্ণপুর পরায়। মণিময় পাঁচখানি হার ঝোলায় কণ্ঠে। মাতার দেহে চড়ে তসরের শাড়ি। পাটচেড়ী করজোড়ে বলে, ‘মা-জননী, ডিঙা তৈরি সেতুবন্ধে। ছইঘর প্রস্তুত, সুবর্ণ ঘাগরও বাঁধা হয়েছে কেরয়ালে। মহাপাত্র খবর করেছেন কী অর্থ তোলা হবে ডিঙায় কমলকুমারী পূজনে?’ বাহুযুগে কনক-কেয়ূর

পরতে পরতে রাজমাতা বলে, ‘শুধু কমল ধরলে কালিয়দহের দেবী কমলাসনা লক্ষ্মী। গজ আছে যখন গজলক্ষ্মীও হবে হয়তো। আবার কমল ফুটেছে মহাসরসী সিন্ধুতে। তাহলে সরস্বতী অপূজিত থাকবে কেমন করে? সরস্বতী হলে পদ্মাবতীও থাকবে, অতগুলি পদ্মের কানন যখন কালিয়দহে। তা মহাপাত্র আমায় প্রশ্ন করে কেন রাজপুরোহিত যখন রাজসভায়? যার ভেটের জন্য নৃপ ও সাধুর প্রতিজ্ঞা, মসিপত্র লিখন, কালিয়দহ যাত্রা এত সব, কোথা সেই দ্বিজ? সে দিক বিধান।’ মাতার খঞ্জনলোচনে অঞ্জন পরায় চেড়ী শুকুটুটি।

নৃপের মাতুল সন্ধ্যা গতে সবে মনোনিবেশ করেছে অক্ষকীড়ায়। কিংকর পানপাত্র, মদিরা ভাণ্ড রেখে অনুপানের ব্যবস্থায় ব্যস্ত। এমনসময় নৃপের কালিয়দহ যাত্রার সংবাদ কিংকরমুখে পৌঁছেয় মাতুলালয়ে। করী-পদ্ম-শশীমুখীর কথায় মাতুল ভাবে কিংকর গঞ্জিকা সেবনে প্রলাপ বকে। মাতুল ধমক দেয় তার অপলাপের জন্য। তখনই ঠমকের বোল ভেসে আসে সিদ্ধুবায়ুতে। হ্লাদিত কিংকর সুর ধরে মহানন্দে—‘তিলফুল জিনি নাসা, বঙ্ককি জিনিয়া ভাষা/ভুরুযুগ চাপ-সহোদর।’ শর্শবাস্ত মাতুল ভাবে এ কী অনাচার লঙ্কা দেশে, অমন ভুবনমোহিনী বালা একা বসে জলধিজলে! অক্ষ ছেড়ে মনোহর বেশ পরে। সংস্কার করে ঘন দিঘল কেশ, অঙ্গে লেপন করে কুমকুম, গণ্ডস্থলে মণ্ডন করে সিন্দূর। কর্ণপুর ও তাড়বালায় সজ্জিত হয়ে নির্দেশ দেয় দ্বারে সসাজ বারণ আনার। কিংকর পরিবেশন করে একে তিন পাত্র সুরা—একটি স্থল গমনের, একটি জলযাত্রার এবং একটি অকলঙ্ক শশীমুখী উদ্ধারের।

লীলাবতী আদি শত রানি কুমারী পদ্মিনীর জন্য নির্দিষ্ট করে দক্ষিণদ্বারী দশ কুটুরির একটি শয়নমন্দির। কামিনী কমলকাননবাসী তাই মন্দিরের সমুখে একটি শতদল সরোবর। সেথা রাজহংস কেলি করে হংসী সঙ্গে। গুনগুন গীত গায় অলিকুল। মাকন্দবৃক্ষে ছয় ঋতু ডাক দেয় বসন্তী। শতরানিও গমন করবে কালিয়দহে। চেড়ীদল শত মানিক ভাণ্ডারে আনে অভরণ পেড়ি। অবধানে আলুয়ায় দৃঢ়বন্ধন দড়ি আর দোছোট করে পরিধান করে তসরের শাড়ি। প্রসাধন করে আষাঢ়িয়া নবঘন কেশ। শ্রবণ ওপরের কনক-বউলি যেন সজল জলদে বিজুলি। বাহ্যুগে কনক-কেয়ুর আর পদে বাজন-নৃপুর। কবরীতে পরে মল্লিকা-মালা আর যাবকের রসে মাজন করে অধর। দক্ষিণ করে হেমবারি নিয়ে যখন শত রানি আরোহণ করে ঘোড়ন-খাটুলি, শত মন্ত করাল যেন সমবেতে ডাক দেয়।

গগনে পঞ্চমী শশী, গজপিঠে নরপতি। ধরিত্রীর ওপরে অঘন হিম আস্তরণ, নৃপমস্তকে ধবল আতপত্র। শিঙা ও টমকে ঘোষিত হয় যাত্রারম্ভ। নিশান চলে

সমুখে। তার পশ্চাতে নানান অস্ত্রধারী খানখানা। সিঙ্কুস্বর স্তিমিত কাড়া, মৃদঙ্গ, ডম্ফ, মোহরি আদি বাদ্যের ঘন রোলে। নানা অঙ্গ সাজে সজ্জিত রথী চালনা করে রথ। রথের কনক কলস চূড়ায় ওড়ে নেতের পতাকা। রথশিরে শোভে ধবল চামর। বীরবর সেনাপতি আরুঢ় রথে। তার করে কোষমুক্ত ক্ষুরধার অসি। রথ আগে চলে গাউল গম্বলদল। পদাতিক বাহিনীর কোমরবন্ধে কৃপাণ, দুই করতলের দৃঢ় মুষ্টিতে নিশান।

নিশিঙ্গাগর উলুক বট বৃক্ষশাখে বসে দেখে রণসাজে রাজার সিঙ্কুঘাটে যাত্রা। বট বৃক্ষতলে এক যোগীর বাস। তার ভোজন নরকপাল পাত্রে, দেহাচ্ছাদন ছিন্নবস্ত্রে। উলুক যোগীকে প্রশ্ন করে, ‘দেখ নাকি নৃপের কালিয়দহ যাত্রা?’ যোগী বলে, ‘দেখি।’ উলুক বলে, ‘কেমন লাগে হে বর্ণময় শোভাযাত্রা?’ দিব্য যোগী বলে, ‘ধুতুরার গরলে সংজ্ঞা হারায় মানুষজন। প্রভাব কটিলে চৈতন্যে ফেরে। অবিদ্যার গরল দূর হলে সত্যের অর্থ প্রকাশ পাবে নৃপ ও সাধু কাছে। তখনই হবে সিদ্ধিপ্রাপ্তি।’ হাস্যে মাতে উলুক। বলে, ‘সিদ্ধি নয়, কমলে কামিনী দর্শন করতে পারলে সাধু ধনপতির প্রাপ্তি হবে অর্ধরাজ্য ও অর্ধ সিংহাসন, তুমি এমনই পরিধান করবে ছিন্ন বস্ত্র।’ নির্বিকার যোগী উত্তর দেয়, ধ্বজা উড়িয়ে গজাসনে চলেন নৃপ, সিঙ্কুজলে ভাসে পণপূর্ণ সাধু ডিঙা। আমার রাজ্য ভিন্নতর। সেথা ধ্বজাটি মোক্ষের, বাহন মহাযান আর আসনটি ত্রিভুবন জোড়া। কালিয়দহ নয় হে, জগৎবাসীর চূড়ান্ত গন্তব্য হল খসর্পণ।

শত তুরঙ্গ চলে রত্নমালার ঘাটে। সেগুলির ওপর অধিষ্ঠিত ভুঁইয়া রাজাদল। তাদের সঙ্গী নিজ নিজ অস্ত্রধারী সেনা। তাদের কেউ যবন কেউ কিরাত কেউ শক, কেউবা খোরসানি, মোগল, পাঠান। আশুদলে চলে তাতারের উজবক যোদ্ধা। ধনুকে চড়া চড়িয়ে বেড়াজালের মতো ধায় ধানকিদল। তার পশ্চাতে রাঙ্গি দেহবস্ত্রে নয় শত টাঙ্গিয়াল হাঁটে মহাকালের মতো। তাদের পদধ্বনিতে ঝরে পড়ে পথপার্শ্বের শিমুলিবৃক্ষের পাতা, চেঞ্চাশুঁটি, কামরাস্তা ফল। বিড়ঘড়্যা পাইক ধায় সিংহনাদে। তাদের শিরে স্বর্ণটোপর, পায়ে স্বর্ণনূপুর আর করে রায়বাঁশ। বর্ষাফলকের অগ্রভাগ যেন নাগজিহ্বা, তীক্ষ্ণ ও শাগিত।

বীর কালু দণ্ড চলে বার শত লাঠিয়াল সঙ্গে। রণাচণ্ড লাঠিয়ালদের দণ্ডগুলিতে অজস্র গাঁইট। বজ্রের মতো ভেঙে পড়ে দুষ্টখণ্ড শিরে। অজস্র রজপুত চলে অসি হাতে। তাদের মস্তকোপরে মতি-বসানো রঙিন উষ্মীষ। চলে কাশীরাজ শল্য, রণকেতু রণমাল, যুগন্ধর বীর পুরন্দর। রাজমাতা চলে কিংকরী সঙ্গে, তার পিছে লীলাবতী আদি শত রানি। তাদের রক্ষকদল বেত্রপাণি। আর চলে দলে দলে লঙ্কাবাসী। গীত গায় মহারঙ্গে—বন্ধুক কুসুমছটা, কপালে সিদ্ধূরফোঁটা/

প্রভাতকালের যেন রবি।

সাধু ধনপতিও প্রস্তুত রত্নমালা সেতুবন্ধে। শত নাইয়া প্রতীক্ষা করে রাজাগমনের। প্রস্তুত ডিঙা দুর্গাবরও। নবসাজে সজ্জিত। সিন্ধুবায়ুতে ওড়ে শত ধ্বজা, জ্বলে সারি সারি সপিদীপ। অজস্র পুষ্প ও মাকন্দপত্রে দুর্গাবর এই পঞ্চমী নিশীথে রাজরাজেশ্বরী।

ওয়া-নারিকল বৃক্ষ শিরে আলো জাগে। ঘন হয় ডম্ফ, মোহরি, বীরকালি স্বর। ওড়ে নৃপতির ধ্বজা। রাজন আসেন রত্নমালার সেতুবন্ধে।

## ৪৬ না কমল না কামিনী

গোশকট ধীর লয়ে চলে রত্নমালার ঘাটে। ছইয়ের তলে মৃৎকলসে সর্পি-দীপ। কিংশুক দারুণ শকটটি নতুন কিন্তু বলদ জোড়া যাত্রী-দম্পতির মতোই প্রাচীন। যুবক চালকের ত্বরা কিন্তু তাদের না বদলায় মতি, না বাড়ে গতি। গজ, রথ, তুরঙ্গের যাত্রা যখন শেষ সেতুবন্ধে, শকট তখনও শতায়ু শাল্মলি বৃক্ষতলে। চালককে প্রবোধ দেয় বৃদ্ধ, ‘আমরা তো কালিয়দহে গমন করব না হে, প্রতীক্ষা করব সেতুবন্ধে। চলুক নিজ তালে।’ কর্ণ জোড়া আন্দোলিত করে সমর্থন করে দুই দুঃখবল বলদ। আর দেবীর কর্ম যখন গজ নিয়ে তখন তারা এত উতলা হবে কেন? তবু শুণ্ডে জলকুম্ভ থাকলে কথা ছিল, কিন্তু এ তো গজ-লাঞ্ছনা! বৃদ্ধ সহসা উৎকণ্ঠিত হয়ে সহধর্মিণীকে বলে, ‘হ্যাঁ গো কুবেরের মা, গজটি রাজা শালবান নয় তো? তাহলে মহা অঘটন ঘটবে লঙ্কা দেশে। তখন আবার একটি রাম-রাবণ রণ!’ আতঙ্কিত বৃদ্ধা করজোড়ে বলে, ‘একি অলক্ষুণে কথা দ্বিপ্রহর রাতে! ধান্য কর্তন আধা বাকি, খাজুরশর্করা ভাণ্ড আধাশূন্য, শ্বেতসর্ষপ সবে হরিদ্রা, সুমালী সদ্য ঋতুমতী, রণ কীসের?’ বিব্রত বৃদ্ধ বলে, ‘রণ কোথা? এত রণবাদ্য শুনি তাই ভীতি জাগে। ও গজ, রাজা শালবান হবে কোন দুঃখে? তিনি হলেন গজরাজ।’ সিদ্ধান্তে নিশ্চিত বৃদ্ধ। সন্দ্বিগ্ন বৃদ্ধা মুখগহ্বরে তাম্বুল-মণ্ড ভরে বলে, ‘তবে ওটি কে?’ অপ্রস্তুত বৃদ্ধ ত্রিকাল-ত্রিলোক সন্ধান সেরে উত্তর দেয়, ‘নবরূপে গজাসুর।’ কিন্তু অসুরের কথায় বৃদ্ধা নবাতঙ্কে। বলে, ‘সবে বোল ধরল মাকন্দ শাখে, রাম-নামি কপিদল এল গোড় থেকে...’ বৃদ্ধ বলে, ‘তাহলে গজটি হল ওই ভিনদেশি বণিক, কর্মদোষে লাঞ্ছনা কামিনী হাতে। কামিনীদের তুষ্টি রাখা ভালো। শ্রীরামচন্দ্র তাই আশ্বিনের শুক্লপক্ষে দক্ষিণায়ন নিশিতে অকালবোধন করল দেবী দুর্গাকে। গত হল রাবণরাজ।’ আতঙ্কহীন বৃদ্ধা আনন্দে নিদ্রা যায়।

শকট চলে আপন মন্দ মুদ্রায়। শকটচালক গীত গায়—‘সলিলে কৈরব ভাসে, ক্ষেণেকে দাড়াই বৈসে। বিরহী জনের চিন্তে শূল।’ ধীরে ধীরে সঘন হয় সিদ্ধুধ্বনি, উজ্জ্বল ডিঙাঘাটার আকাশ। বাদ্যধ্বনি রত্নমালার ঘাটে।

কূল ছাড়ে সারি সারি নিষ্পদ। প্রথমে চলে রাজা শালবানের উর্ধ্বা ডিঙা ‘সিদ্ধুঘোটক’। দ্বি-শত কেরয়ালে তুরগ তুরঙ্গের মতো শূন্যে ভাসে। জল মধ্যে কেবল দ্রুত গমনের ‘ছপ’ ‘ছপ’ ধ্বনি। ছইগৃহটি স্বর্ণের। সর্পিবাতিতে বর্ণটি জ্বলন্ত জতুগৃহের। গৃহগাত্রে উপবন, ঘন হরিৎ তৃণভূমি। চারটি তুরঙ্গ বিচরণ করে সেথায়। ডিঙা ব্যবহৃত দারু হল মন-পবন বৃক্ষের। রাবণরাজের পুরী ঘিরে যে গ্রাহবতী-মহাবেগ পরিখা ছিল, তাতে ভাসত মন-পবন দারুডিঙা। নির্মাণ করেছিল শুক্রাচার্য দশাননের প্রমোদভ্রমণের জন্য। পঞ্চমী নিশীথের কালিয়দহ প্রমোদ না প্রমাদ জানেন না নৃপতি। প্রতিটি সাগরতরঙ্গ যেন তাই কালিয়নাগের ফণ। যদি সত্য হয় সদাগর বাক্য, কমলে অধিষ্ঠিত থাকে গজগ্রাসী কামিনী, তাহলে অর্ধরাজ্য আধাসিংহাসন সাধুভোগ্য। মিথ্যা হলে ডিঙা দ্রব্য প্রাপ্তি লঙ্কাবাসীর। আধা-আতঙ্কিত নৃপ ধবল জলতরঙ্গে দেখে শতদল কমল, জলবুদ্বুদে কুমুদ কোরক।

পরের অনুর্ধ্বা ডিঙায় চলে রাজমাতুল কার্তিকেয়। তার যেমন সুচারু কেশবিন্যাস, তেমনই পরিপাটি অঙ্গবস্ত্র। কার্তিকেয়ের দক্ষিণ হস্তে শক্তি, বাম হস্তে শতদল। কামিনীকে অভয়দানে খরশান বরশা, প্রেমদানে কোমল কমল। রাজমাতুলের ডিঙাটির নাম ময়ূরপঙ্খি। তার বাহির দরগায় সহস্র চক্ষু। উশীররাজের দেশে মরুত্তের মাহেশ্বর যজ্ঞের সময় রাবণের আগমনে ইন্দ্র আত্মরক্ষা করে ময়ূররূপে আর তাই ইন্দ্র বরে সহস্রাঙ্গী ময়ূরপেখম এবং মাতুলডিঙা। কেকা-রবে শত ময়ূরী নৃত্য করে ছইগৃহে। গীত গায় অঙ্গরাদল— রাজহংস রব জিনি, চরণে নুপুরধ্বনি/দশনখে দশ চাঁদ ভাসে।

পরের মছুরা ডিঙায় বসে মহাপাত্র, সভাসৎ, বীরবর সেনাপতি ও কোটাল কালু দণ্ড। ডিঙাটির নাম হংসরাজ। তার শ্বেতশুভ্র বর্ণে পৌষের পঞ্চমী নিশীথে নীলাশ্বতে কোজাগরী পূর্ণিমা। সে রূপে সিদ্ধুতলের শত-সহস্র শুক্তি ভেসে ওঠে তরঙ্গশীর্ষে। যেন শত শত শ্বেতকমল ফোটে সাগরজলে। পঞ্চপাত্র মহাতঙ্কে। বুঝি সত্য হয় সাধু বাক্য। তাহলে এই পৌষ মাসেই ঘনাবে সর্বনাশ। খণ্ড রাজ্যে তখন আধা পরিতোষ। কিন্তু যদি গজ চলে সিদ্ধুতলে, কমলদল ঝরে ঘন হিমে, কামিনী ফেরে নিজ বাসে! তখন কী প্রাপ্য কার? মহাপাত্র বলে, কাশীরাজ, আপনার জন্য শ্বেত তুরঙ্গদল নির্দিষ্ট করব আমি। যে চতুষ্পদের পদ স্পর্শ করে না ভূমি, তার মুখরঞ্জু ধারণ করে কার সাধ্য কাশীরাজ ছাড়া? আমার পাঁচখানি মাতঙ্গ প্রয়োজন। এই বৃদ্ধ বয়সে গজগমনই ভালো। আমার জ্ঞাতি, মাতুলালয়

ও স্বশূরালয়েরও বহুকালের শখ গৌড়দেশের গজের। তাদের জন্য সামান্য দশখানি নির্দিষ্ট থাক। রত্নমালার সেতুবন্ধে দেখলুম তুরঙ্গগুলিও বড়ো নধর। শত তুরঙ্গ প্রাপ্য হল সব সভাসদগণের। সেনাপতি ও কোটালের কী পছন্দ? কুরঙ্গ আছে, প্লবঙ্গ আছে, মেঘ আছে, তেজি অশ্বও। যা অভিরুচি তাই নিয়ে। অগ্নিশর্মা দ্বিজ, তার প্রয়োজন দুন্ধের। তাহলে তার জন্য নির্দিষ্ট হল পঞ্চাশ গাভী আর পাঁচ বৃষ। বাকি যে বৃষ, গাভী, নারিকল, বয়ড়া, কাচ, গুঞ্চা, হরিতাল, ঘি, বরবটী, বাটুলা—সব পাক প্রজাকুল।

রাজমাতা চলে স্বর্ণমুখী সিন্ধুডিঙায়। নাম কেকাবলী। সহস্র পুরট নূপুর বাঁধা কেরয়ালে। ডিঙা যখন চলে মনে হয় শত কলাপী ডাক দেয় আষাঢ়িয়া নববর্ষণে। শ্বেতবাদামে উৎকীর্ণ একটি দেববাণী—‘চিগুই চিত্তামণি।’ শত নীলকমলে কমলবনের কামিনীকে অর্চনা করবে রাজমাতা। কিন্তু পঞ্চাশ কিংকরীতেও ‘শত’ থেকে যায় অধরা। কখনো নবনবতি, কখনো শতাধিক এক। চিত্তাকুল মাতা। সুরলোকের দেবী নিয়ে নরলোকের প্রতিজ্ঞা ও মসিপত্রের ফল। রাজার রাজদণ্ড আর সাধুর ডিঙাকর্ণ, দু-টিরই বড়ো দস্ত। তাই মহাশক্তির নীরব নিঃসঙ্গ বাস সিন্ধুজলে, কমলকাননে। সে ক্রীড়া করে করী সঙ্গে। তার দুই করে বুঝি গজরূপী জগৎ। গড় হয় শালবান জননী।

গর্ভিণী মকরযান ডিঙায় লীলাবতী আদি শত রানি চলে দহ পথে। অগ্নিকুণ্ড জুলে। মহারানি যুক্তি করে সতাদল সাথে কে ওই কামিনী। স্বাহা, স্বধা, শচী, রমা নাকি রম্ভা, অরুন্ধতী, তিলোত্তমা। যেই হোক মদনসুন্দরী, এই হিমঘন শীতল ঋতুতে এল কোথা হতে? কোন পথে? মহারানি বলে, ‘আসেনি তো গৌড়বাসী সাধু সঙ্গে, ডিঙা চড়ে, নীলকূট হতে?’ আতঙ্কিত রমণীদল। তাহলে তো বামাচারী! লঙ্কাপতি যদি একে স্থান দেয় রাজপ্রাসাদে, নির্বাসী শত রানির ব্যবস্থা হবে কামরূপের বরাহরূপী চিত্রশৈলে, কূর্মরূপী মণিকর্ণে, মহামায়ারূপী গন্ধমাদন পর্বতে! শত রানি সমবেতে বলে, যদি লঙ্কারাজ ডিঙায় তোলে ওই কমলে কামিনী, তাহলে আমরা নিমজ্জিত হব কালিয়দহে। নৃপ শালবান মদ্যোনি সলিলে স্নান-পান করুক, আমরা নেই কাকগিরিতে।

দুর্গাবর চলে শত কেরয়ালে। গাষ্ঠীর ও ডহ দারুর জলযানটি উজ্জ্বল দীপালোকে যেন বরুণের প্রাসাদ, কিঙ্কিন্যা নগরী, রাবণের প্রমোদভবন, দিব্যবিমান। সপ্তবর্ষে শতধ্বজ ওড়ে উত্তরা বায়ুতে। গগন স্পর্শ করে দিঘল বায়ু-প্রাকার বাদাম। বাহুতে বীরবিক্রম নাইয়াদলের, অন্তরে কেশরী গাবরদল। সাধু ধনপতি কালিয়দহে কামিনী দেখালে লঙ্কারাজ্য তার। সদাগর হবে নৃপবর। তখন তার রাজসিংহাসন, রাজমহিষী, রাজপুরোহিত, রাজচক্র, রাজভাট। সাধুর দেহে

রাজবস্ত্র, করে রাজদণ্ড, শিরে রাজমুকুট। তখন সিদ্ধুজলে ভাসবে রাজনের প্রমোদতরঙ্গী। কর্ণে তার হেমচূড়া, কেরয়ালে হেমনূপুর। নাইয়া শিরে মণিখচিত উষ্ণীষ। দুর্গাবরে ঘন হয় হ্লাদিত গাবরগীত। নীরব শুধু কাণ্ডার বুঢ়ন। প্রহর গতে ক্রমশ' নিকটে আসে কালিয়দহ। কামিনীটি সাধুমতি হলে অর্ধরাজ্য কিস্তি যদি বাম হয় বামা তাহলে নিশিশেষে লুপ্তিত হবে বৃহিতের ধন। গৌড়বাসী হবে লঙ্কাদ্বীপে কারাবাসী। কু বলে কাণ্ডার মন। আকস্মিক হাঁক দেয়, 'ধীর টান হে নাও, আয়াসে চল।' যেন এ-ভাবেই অন্তহীন হবে সিদ্ধুপথ, অধরা থাকবে কালিয়দহ।

সিদ্ধু-জালিকের দল চলে নানা ডিঙায় কামিনী দর্শনে। কালিয়দহ গমনের বার্তা মিলেছে পরে তাই রন্ধনের ব্যবস্থা ডিঙার ভেতরে। সপরিবার সে-যাত্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ শোনায সিদ্ধুজলে মধ্য যামে মৎস্যকন্যা দেখার বৃত্তান্ত, বৃদ্ধা গায় ঘুমপাড়ানি গীত, ডিঙাপালিত কূর্ম-যুগল বাহির দরগার ওপর হতে উকি মেরে দেখে নাও তলে কত বাঁও জল, পতিদেবতার জন্য কলিকায় গঞ্জিকা সেজে পল্লীদেবী তিন সুখটানে ধাত মাপে ধূমের, শ্রৌঢ় খুড়া গৃহদেবতাকে বক্ষে তুলে দেখায়—ওই হল কালিয়দহ।

বাদাম নামে ডিঙাসারির। আদিগন্ত পাথার জুড়ে জলতরঙ্গে পঞ্চমী শশী দোলে। যেন শত-সহস্র শ্বেত গোখুরা নৃত্য করে বসন্ত বায়ুতে। নাগমণি গাঁথা উর্ধ্ব গগনে। মণিধর ফণী দেখি সিদ্ধুজলে, কোথায় কমলবন? নৃপ বলেন, 'ওহে সাধু, দেখাও কোথায় তোমার কুঞ্জর কোথা কমলে কামিনী?' চতুঃপার্শ্ব দেখে সাধু। বলে, 'ওই ওই।' আগে চলে দুর্গাবর, পশ্চাতে ডিঙাসারি। কোথায় কামিনী কোথা-বা কুঞ্জর! তরঙ্গশীর্ষ যেন হিমাবৃত গিরিশৃঙ্গ। তরঙ্গমালা করীকর সদৃশ হলেও করীবরের বাস নেই কোথাও। সাধু ডিঙা অনুসরণ করে সহস্র কেরয়াল। গত হয় সময়। ত্রিপ্রহর নিশিতে নিদ্রাবেশে সিদ্ধুবারি। ঘন হয় ডিঙার চলনধ্বনি। তরল সাগরস্বর, গিরিশৃঙ্গ ধীরে ধীরে নতশির বন্মীকন্তুপ। গত হয় নিশির তৃতীয় প্রহরও। ক্ষুধার্ত শিশু মাতৃস্তনে পান সেরে ক্রন্দন জোড়ে গৃহের জন্য, ক্ষিপ্ত রাজপাত্রেরা দাবি করে অবিলম্বে কমল দর্শন, অধৈর্য রাজমাতুল প্রশ্ন করে কোথায় শরদ-ইন্দু বদনা বামা। চক্রাকারে ঘোরে ডিঙা সারি। স্নান হয় গগনের দীপমালা। প্রতুষ হয় সিদ্ধু বুকে। সিদ্ধুজালিকের গৃহদেবতা শয়ানে যায় নিশি শেষে। অনল কেউটের ছত্রিশ-দাঁড়ি ডিঙার গাইন-দোহারদল গীতবাদ্যে ক্ষীণ কণ্ঠ। সমাপ্তির আগে গায় শেষ পদ—'রাজহংস মন্দগতি, হেম জিনি দেহজুতি/গজকুন্ত চারু পয়োধরে'। কোথায় গজ কোথা-বা পদ্মিনী। অনল কেওট ঘাই মারে সিদ্ধুজলে। মুহূর্তে বার্তা রটে ডিঙায় ডিঙায়, জলতলের কামিনী বন্দিনি কেওট জালে। রাজমাতা করে তোলে শতদল, কেশসংস্কার করে রাজমাতুল, শত রাজমহিষী

সরোষে তাকায়, পুনর্জাগরণে চলে গৃহদেবতা, বাহির দরগায় শির তোলে কূর্ম-দম্পতি। নবোদ্যমে শুরু হয় গীত-বাদ্য। নৃপ শালবান স্থিরনয়নে প্রতীক্ষা করেন কমলিনীর উত্থানের। সাধু ধনপতি সহাস্য বদনে দেখে কেওটের কামিনী উদ্ধার। সুদূরবিস্তারী জালখানি কালিয়দহ মম্বন শেষে উঠে আসে ডিঙা ডালিতে। উথিত হয় শত শত টমক, শিঙা, কৎসব, কুলির, মীন। কোথাও নেই মৎসকন্যা।

নৃপবর কেশরী নাদে বলেন, ওহে সদাগর, নিশি গত হল বৃথা দহ অশ্বেষণে। বল কোথা তোমার কামিনী-কমল-কুঞ্জর।

ধনপতি সহাস্যে বলে, এতগুলি ডিঙার তলে কমলবন ঢেকে গেছে ধর্মান্বিতার। আপনি মহামতি, জানেন কমলের কোমল স্থিতি।

নৃপবর বলেন, আর কামিনী-কুঞ্জর?

ধনপতি বিনয়ে উত্তর দেয়, কমল না থাকলে কোথায় কামিনী অধিষ্ঠিত হবে রায়? আর এ তো নয় নদ-নদী দহ যে কূলে বসবে বালা, সিদ্ধুদহ যে অকূল রায়।

নৃপবর নির্দেশ দেন ডিঙাসারি রত্নমালার ঘাটে ফেরার। বিষণ্ণ যাত্রীদল। প্রফুল্ল শুধু শালবানের শত পত্নী। যার দর্শন-ভেট আধা লঙ্কা দ্বীপ ও অর্ধ সিংহাসন, না জানি সে কোন স্বাহা, শচী, মদনসুন্দরী। রাজমাতুল বিশুদ্ধ বদনে গগনে দেখে সিদ্ধুসারসের বায়ু-সস্তরণ। দিনমণি উদিত হয় পূর্ব দিগন্তে। ‘বাহ’ ‘বাহ’ ধ্বনিতে ডিঙাসারি দ্রুত ভাঙে লবণজলধি। ক্ষেপ্তকরী সরব হয় দেবী নামে। করজোড়ে নত হয় রাজমাতা। চিত্তর পাণ্ডে কর্ণধারের পাশে বসে গুনগুন গীত গায়— ‘হেমময় হারছলে, কিবা উহার গলে/স্থির হয়্যা সৌদামিনী বৈসে।’ চিত্তর জানে প্রেম দিয়ে না ডাকলে গেহে ফেরে না জলচর হংস, নামজপ না করলে দর্শন দেয় না দেবদেবী, বন্দনাগীতি না গাইলে বদন তোলে না শশীমুখী।

দূরে জাগে হরিৎ সিদ্ধুকূল।

## ৪৭ ডিঙা লুণ্ঠন

তীর জুড়ে অগনন গজ, তুরঙ্গ, গোশকট, লক্ষ লঙ্কাবাসী। প্রতীক্ষা কামিনী, কঞ্জ, কুঞ্জরের। সেতুবন্ধে নিশিজুড়ে প্রস্তুত এক নয়নশোভন তোরণ। দু-পাশে শত কদলী বৃক্ষ, ওপরে পঞ্চপল্লব। সাগরম্নান সেরে নববস্ত্রে চৌদিকে মঙ্গল গায় এয়োবতী নারীদল। সেইবানা তলে কায়বার পড়ে ভাট। গীত গায় নাটদল—‘খদির তাম্বুল রঙ্গ ওষ্ঠ নাহি ছাড়ে, গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নাড়ে।

দূর সিদ্ধুজলে দেহ তোলে বাদাম। দুলে ওঠে বালুতট। সহস্র কলাবতী ধ্বনি

তোলে শঙ্খে। শিশুগণ চড়ে পিতৃস্কন্ধে, যুবাদল বৃক্ষশাখে। নিশিজাগর উলূকের দিবানিদ্রা ভাঙে। সে শোনে নাচারি পদে কালিয়দহে রতিরঙ্গ—‘ডাঙ্কা ডাঙ্কি ডাকে, চক্রবাকী চক্রবাকে/বদনে বদনে আলিঙ্গন।’ নারিকল বৃক্ষশিরে বসে কপিন্দল\*দেখে লঙ্কাতীরে রাজহংস কেলি করে হংসী সাথে, নিকুঞ্জে প্রবেশ করে নবকিশোর কিশোরী সঙ্গে। বিশ্বতলে বসে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বন্দনা গায় বরুণের তিন ভার্যা গৌরী, বরুণানী ও চাঞ্চীর। অনন্ত সলিলে যখন কমলাসনা কামিনী গজ গেলে ও ওগরায়, তখন সিদ্ধুপতিরই কোনো পত্নী ওটি। অন্য কোনো রামা হলে সমাধি ঘটত সলিলে।

ডিঙাযাত্রী শুদ্ধ বদনগুলি যখন চক্ষু পড়ে তখন কুলজন বোঝে না মিলেছে কামিনী, না কমল-কুঞ্জর। মুহূর্তে ধ্বনিহীন সহস্র শঙ্খ, গীতহীন নাট, মূক মুখর ভাট, শুদ্ধ মঙ্গলধ্বনি। সরব কেবল ঝাবু বন, নারিকলগুচ্ছ, ডাবুপত্র আর চিরবিষাদী ঘুঘু। ডিঙা হতে প্রথমে নামেন নৃপবর। তারপর একে একে রাজমাতা, রাজমাতুল, রাজন্যবর্গ, মহাপাত্র, সাধু ধনপতি। নয়নগুলিতে গাঢ় কাজল, ললাটে গভীর বলিরেখা, ভুলতায় ঘন ভাঙন। ডিঙাসারির নিষগ্ন দণ্ডগুলি শূন্য। পক্ষীদল বসে বলদের পৃষ্ঠে, ভাঙা বৃক্ষশাখে, তোরণের টঙে কিন্তু পরিহার করে নিষ্ফলা সিদ্ধুযাত্রার পাক্যষ্টি। নৃপ যেন পরাহত রথী, মহাপাত্র অবোধ শিশু, সেনাপতি দারু সেপাই, কালু দণ্ড পাটনদণ্ডী, গৌড়বাসী সদাগর নিশান্ন।

দুর্গাবরের কাণ্ডার ও নাইয়া-গাবরদের সাক্ষ্যের কথাটি উত্থাপন করে সারথি নৃপ শালবানের রথারোহণ সময়ে। ক্ষণিক দাঁড়ান শালবান। পাত্রমিত্র তাকায় উৎকণ্ঠিত নয়নে। রথে দণ্ডায়মান নৃপ। ইঙ্গিতে ডাকেন কালু দণ্ডে। বলেন, সদাগরে ডাকো।

আসে ধনপতি। প্রতীক্ষা করে রাজ আঞ্জার—কবে এবং কখন পুনর্বীর কালিয়দহ যাত্রা। শালবানের ভিন্ন কথা, তুমি ব্যতীত আর কে দেখেছে কামিনী-কমল-কুঞ্জর?

ধনপতি সোচ্চারে বলে, আমি একা নই রায়, দেখেছে কাণ্ডারও। সেই দৈব দৃশ্যের সেও ভাগ্যবস্তুর দর্শক।

প্রত্যক্ষদর্শীর ডাক পড়ে রাজ নির্দেশে। বুঢ়ন এসে দাঁড়ায় করজোড়ে। রাজা বলেন, ওহে কাণ্ডার, সত্য বল কালিয়দহে স্বচক্ষু দেখেছ তুমি পন্ন, কামিনী, কুঞ্জরে?

শঙ্কিত কাণ্ডার। সে আপন নয়নে দেখেনি কমলে কামিনী দহজলে। সেকথা প্রকাশ পেলে সাধুর কারাবাস, ডিঙা লুণ্ঠন, শত নাইয়া-গাবরের ভিক্ষাবৃত্তি। মিথ্যা বাচন, তাও অন্যায্য। বিভ্রান্ত বুঢ়ন সবিনয়ে বলে, ‘রাজন, সাধু ধনপতির পিতা

জয়পতির সঙ্গে যখন প্রথম আসি সিংহলদেশে সে ছিল যৌবনকাল। নয়ন দু-টি তখন দিনে রবি রাতে শশী। কত যে মনোহর দৃশ্য দেখেছি লঙ্কাপথে কী বলব রায়। লোকন করেছি রাজ্যেশ্বর আপনার পিতৃদেবকেও। বড়ো সাধ ছিল এ-পাটনেও দর্শন পাব তাঁর। হা ললাট, তিনি স্বর্গবাসী। কামনা করলেই কি সব কিছুর দর্শন মেলে রায়!

নৃপ প্রবোধ দিয়ে বলে, বিলাপ কোরো না কাণ্ডার, দর্শন পাবে। সৎ কর্ম ও সত্য বাক্যে ভবনদী পার হয়ে স্বর্গযাত্রা। সেথা সাক্ষাৎ পাবে যত শুভমতি প্রিয়জন, শিবকর আত্মজন। এবার বলো তো কাণ্ডার, কী রূপ কমলে কামিনীর,— কটি ভুজ, কমলেরই—বা কী বর্ণ?

প্রশ্নবাণে বিভ্রান্ত কাণ্ডার বলে, আমার চক্ষু প্রদীপে বড়োই তৈলাভাব, সলিতা মুখে অঙ্গার! আমি কেমন করে দূর দহজলে কমল ও কামিনী দেখব রায়! তবে...

লঙ্কাকেশরী উচ্চারণ করেন সতর্ক বাণী, পুত্রের মিথ্যাবাক্যে, কাণ্ডার, পূর্বপুরুষ-সকলের অনন্ত নরকবাস। বেদব্যাস আর তার সুপুত্র শুকদেব বলে গেছে সত্য বাক্যের সম ধর্ম এবং মিথ্যা বাক্যের সম পাপ নেই ত্রিভুবনে। অবনী বলে মিথ্যাজন ব্যতীত সে বহন করতে পারে সব ভার।

বিবর্ণ বুঢ়ন নতশির। মনে হয় পদতলের মুক্তিকা দ্রুত সরে।

নৃপতি বলেন, শির তোলো কাণ্ডার। দেখ আমার দেহ। এখানে বাস করে ইন্দ্র, অগ্নি, নৈঋত আদি দেবগণ। সর্বজীবময় নৃপে যে ভণ্ড ভাণ্ডায়, জেনো বিধাতার কাছে তার দণ্ড নিশ্চিত।

শেষ প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় নত মস্তকে বুঢ়ন বলে, রাজ্যাভিপতি হলেন নৃপ আর ডিঙাধিপতি হলেন সদাগর। আপনার রথ-সারথির মতো আমি ডিঙাচালক মাত্র। কী মূল্য আমার দর্শন-অদর্শনের, কিবা মান আমার বাক্যের—আমায় যেতে আজ্ঞা দিন অধীশ্বর। নৃপদর্শনে যে পুণ্য সঞ্চয় হল, সেটিই আমার ভবনদীর পারানি।

নৃপ বজ্র স্বরে বলেন, চলো সিদ্ধুজলে। পূর্ব মুখ হয়ে বলো নিজ চক্ষে দেখেছ কামিনী-কমল-কুঞ্জর। স্মরণে রেখো একানই পুরুষ দণ্ডায়মান তোমার সমুখে। যদি মিথ্যা বল, যাবৎ চন্দ্র ও দিবাকর উদিত হবে গগনে তাবৎ নরকবাস পূর্ব ও উত্তরপুরুষের।

লক্ষ লঙ্কাবাসীর উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা সিদ্ধুকূলে। নীরব পাকপক্ষী বৃক্ষলতা। ধীরে ধীরে নত শির ওপরে তুলে ভগ্নস্বরে বৃদ্ধ বুঢ়ন বলে, আমি নাহি দেখি কঞ্জে কামিনী-কুঞ্জর।

রাজা শালবান ঘোষণা দেন, সাধু ভণ্ড, মিথ্যা কামিনী-কমল-কুঞ্জর। বন্দি করো কোটাল।

নায়ের রজ্জুতে আবদ্ধ ধনপতি সোচ্চারে বলে, সত্য কৃশোদরী বালা, সত্য শতদল কমল, সত্য ওই কুঞ্জর।

কে শোনে তার বাক্য! বেজে ওঠে রণশিঙ্গা। রণভেরি, দুন্দুভি, নিশান। দুর্গাবত্নের আতঙ্কিত নাইয়া-গাবরদল ‘বাহোই’ ‘বাহোই’ ধ্বনিতে উর্ধ্বশ্বাসে ছোট বনপথে। যাত্রা করে নৃপরথ, গমন করে রাজমাতা, রাজমাতুল, ভুইয়ারাজা, পাত্রগণ। গৃহে ফেরে ভগ্নমনোরথ লক্ষাবাসী। আশাবাদী শুধু মীনব্যাপারী চিত্তর পাণ্ডে। জালে কি জলে যেখানেই থাকুক সিঙ্কুজীব, একদিন-না-একদিন আসবে মহাজন দ্বারে। সে পথ চলে গুনগুন গীতে—কোকনদ দর্পহর, বেড়িত তাহার কর/অঙ্গলি চম্পক পরকাশে।

কালু দণ্ড কেড়ে নেয় সাধুর অঙ্গুরি, অঙ্গদ, বালা, কর্ণপুর। কঠের হেম ও কলধৌত কণ্ঠমালাগুলিও নিজ দেহবস্ত্রের মধ্যে ঢোকায়। তারপর রক্ষী সঙ্গে সাধুকে পাঠায় বন্দিশালে। শেষে বন্টনে বসে গজদলের। বিশখানি যায় নৃপের গজশালে। রাজ-মাতুলের দু-টি। রাজপাত্রদের একটি করে। নিজ শালে পাঠায় পাঁচখানি এবং নিজ পরিজনদের একটি করে। তুরঙ্গগুলি নৃপ, মাতুল, ভুইয়া-রাজন, সেনাপতি এবং নিজের মধ্যে বন্টন করে। মহাপাত্র বৃদ্ধ তাই তুরঙ্গে তার কিবা লাভ! বরং এক কুড়ি কুরঙ্গ দিলে তৃণভোজনে পরিষ্কার রাখবে গৃহাঙ্গন। রাজকাননে যায় সহস্র কুরঙ্গ, সেনাপতি ও নিশীশ্বর নিবাসে এক এক দু-কুড়ি। গাভীগুলি চলে দণ্ডনিবাসে, দুটি যায় দ্বিজগৃহে, মাতুলালয়ে এবং রাজশালে। কপিদলের অর্ধেক প্রেরিত হয় মহাপাত্রের গৃহে, বাকি অর্ধ দ্বিজধামে। রামনামে পুণ্যসঞ্চয় এবং সজ্জানে সুরলোক যাত্রা। সৰুম্মাথ আর পামরী কঞ্চলগুলি পাঠায় রাজমাতা ও শত রাজমহিষীদের কাছে। নিজ পত্নীর জন্য একটি সৰুম্মাথ এবং উপপত্নীর জন্য একটি পামরী কঞ্চল পৃথক করে রাখে। রত্ন, গন্ধদ্রব্য, ঘৃত, তৈল, মাষ, মুসরি, তণ্ডুল, মধুরি, বরবটী, বাটুলা, চিনা আদি দ্রব্য যথাস্থানে যথায়থ প্রেরণ।

রত্নমালার সেতুবন্ধে বসে হৃদয়-বিদারক সে দৃশ্য দেখে লুণ্ঠিত ডিঙার কাণ্ডার বুটন। প্রতিটি পণ ও প্রাণীকে সে স্বচক্ষে দেখেছে দুর্গাবরে প্রবেশ করতে। কত-না যত্ন ও ভাবনায় সে-সব যথাস্থানে রাখা, নদীজল ও সিঙ্কুতরঙ্গ ভেঙে লক্ষাদেশে আনা! সবই বে-হস্ত হল কী এক মায়াদৃশ্যে! সদাগর বন্দি কারাগারে, নাইয়া-গাবরদল পলাতক। গাভীর ও ডহ দারুনির্মিত যে ডিঙার বাহির খোলে জ্বলজ্বল করত দুর্গতিনাশিনীর মুখ তা এখন নিজেই দুর্গত। যে সুবিশাল বাদামে ভাসত দেবাদিদেব মহাদেবের ত্রিশূল ও বিষম ঢাক, সেটি ন্যুজ, অবনত। দুর্গাবর যেন সতীর আত্মাখতি ও শিবানুচরদের তাণ্ডব শেষে দক্ষের যজ্ঞস্থল। কালু দণ্ডের

নিষ্ক্রমণের পর তার অনুচরেরা একে একে খুলে নেয় সাধুশয্যা, সপিদীপ, নাওধ্বজা। স্বন্ধে তোলে বৃদ্ধ মেঘ, শত কেরয়াল, জলদ্রোণি। নিয়ে চলে দুর্গাবরের সুদীর্ঘ কণ্ঠিও। সজল নয়নে দেখে বুঢ়ন। কাণ্ডারহীন হল কাণ্ডারি। অবসান হল ফেরতযাত্রার সব আশা, সব স্বপ্ন। কাণ্ডারহীন দুর্গাবর কেমন করে সর্পদহ, শঙ্খদহ, নীলাচল, মগরা, ত্রিবেণী অতিক্রম করে পৌঁছোবে ভ্রমরাকুলের ইছানি নগরে? আমৃত্যু সিংহলবাস দেবতার ললাটলিখন।

সব লঙ্কাবাসী গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেও রত্নমালার বৃক্ষতলে তখনও অশীতিপর দম্পতি। তাদের বাস সিঙ্কুতট থেকে দূরে এক নদীবর্তী গ্রামে। তাই সাধ ছিল কমলে কামিনী দর্শন শেষে অবগাহন করবে সাগরজলে। দেহ হবে জরামুক্ত, মন হবে শশীকিরণে ক্রিয়। কিন্তু কামিনীর নিরাগমনে মনটি নিরানন্দ, সাধু-ডিঙার লুণ্ঠনে অন্তরখানি বিষণ্ণ। তাই না স্নান না পান এই দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। এমনকী শকটবাহী দুই দুষ্ক ধবল বলদও উপবাসী। সমুখে স্তূপীকৃত বালাম ধান্যের খড় কিন্তু তাদের উদাসী চক্ষু লুণ্ঠিত দুর্গাবরে। বারো বৎসর পর যখন শেষ হবে সাধুর কারাবাস তখনও ভাসবে তো এই নিষ্পদ? নাকি পরিত্যক্ত দেবালয়ের মতো নিত্য ক্ষয়ে কালগ্রাসে লীন! যুবক চালকের ভিন মতি ভিন্ন গতি। সে শ্মশানদেউলে প্রণাম সেরে প্রসাদ নিয়ে আসে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জন্য। সিঙ্কুকুলের সবুজ তৃণও আনে শকটবাহীদের ক্ষুধা মেটাতে। সে জানে অমাবস্যার পর পূর্ণিমা আসে, ভাদ্র পেরিয়ে পৌষ, গ্রীষ্মের শুষ্ক পুষ্করিণীতে শরতে ফোটে শতদল কমল। কমল থাকলে অলি, পিকু আর কামিনী আসতে কতক্ষণ! নারিকল-গুয়া বনের মধ্য দিয়ে শকট চালাতে চালাতে সে গুনগুন গীত গায়—বামা ঈষৎ হাসে, গগনমণ্ডল ভাসে/দন্তপঙ্ক্তি বিদিত বিজুলি।

রত্নমালার সেতুবন্ধে একা নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ বুঢ়ন। সপ্তডিঙায় সহস্র নাইয়া-গাবরে শুরু হয়েছিল যে যাত্রা তার সমাপ্তি ঘটল নিষ্প্রাণ শূন্যতায়। সিঙ্কুজলে কেরয়ালহীন এক ডিঙা আর সেতুবন্ধে কণ্ঠহীন এক কাণ্ডারি। প্রবাহিত স্রোতে ডিঙা দোলে কিন্তু চলে না। সচল অপরাহু বায়ুও কিন্তু ওড়ে না ধ্বজা। দূরে চলে চব্বিশ হস্ত মধ্যমা সমবেত কেরয়ালে, ষোল হস্ত ক্ষুদ্রা যায় বাদাম উড়িয়ে, মহাযান দুর্গাবার অচল, স্থানু, জড়। এ-যেন চর্মচটিকা ওড়ে, বর্বরী পক্ষ মেলে আর অসহায় শ্যেন বদ্ধ থাকে পিঞ্জরায়। দিনমণি চলে সাগরতলে। নীড়ে ফেরে পক্ষীদল। গোক্ষুরা পৃথিবী ধূলি বর্ষে ধূসর। রাত্রির আশ্রয় সন্ধানে ধীরপদে ডিঙায় চলে বুঢ়ন। আর্দ্র হয়ে ওঠে দুই চোখ। এ-দৃশ্য দেখার জন্য কেন বাঁচা! মৃত্যু ছিল শ্রেয় মগরায়। ডিঙা চড়ে কাণ্ডার। হঠাৎ চোখে পড়ে একটি জলদ্রোণি, মৃদু নড়ে। উৎসুক বুঢ়ন তুলে দেখে শুক-শারি দম্পত্তি। বুঢ়নকে দেখে সে কী আহ্লাদ

পক্ষীযুগলের! কলকণ্ঠে সরব হয় দুর্গাবর। কাণ্ডার বসে ডিঙা সমুখে। কাণ্ডারকে কণ্ঠহীন দেখে দুই পক্ষী কর্ণ স্থানে এসে বসে। তারা বলবে কোন পথে কর্ণধার বাইবে নাও। আঁধার নামে সিঙ্কুকূলে। দূর বৃক্ষশাখে ভেসে ওঠে সস্তম্ভ দু-একটি মুখ। কে বসে দুর্গাবরে? কাণ্ডার বুটনকে দেখে দুর্গাবরের নাইয়া-গাবর নামে বৃক্ষ হতে। ধীর পায়ে চলে তট বেয়ে ডিঙা মুখে। নিষঙ্গ দণ্ডে এসে বসে একটি দুঃখবল উলুক। অন্ধকার ডিঙাখানি পক্ষীর চক্ষুদীপে মুহূর্তে দীপ্তময়।

## ৪৮ বন্দিশালে ধনপতি

সিঙ্কুকূলের অদূরে প্রাকারবেষ্টিত বন্দিশাল। প্রাকারটি যেমন সুদীর্ঘ তেমনই উচ্চতায় অভ্রভেদী। শৈলশিলায় নির্মিত বেষ্টিতবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। মূল প্রবেশ দ্বারটি লৌহদণ্ডের। দ্বারের সম্মুখে বাঁধা দশটি কেঁদুয়া। তাদের গর্জনে নাদিত চারপাশ। পার্শ্বে প্রবেশ-নিষ্ক্রমণের একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো দ্বার। সেখানে বামে রাঙা ধড়ায় দশ বীরবর তোমর, টাঙ্গি, শেল হাতে। দক্ষিণেও দশ দ্বারী। তাদের হাতে জমধর, খাণ্ডা, সন্ধান। দ্বারের দুই প্রান্তে দু-টি গগনস্পর্শী কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষ। সংবৎসর সেথায় ফুটে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ শোণিতবর্ণ পুষ্প।

বন্দিশালের ভেতরে বামে সহস্র কুটুরি দণ্ডিতদের বসবাসের জন্য। শিলানির্মিত কুটুরির দ্বার লৌহের। দ্বারীদের দেহবস্ত্র কৃষ্ণকায়। হাতে বীর-বালা, কানে কর্ণপুর। বন্দিশাল প্রাঙ্গণে সারি সারি নিম্ববৃক্ষ। সেখানে শত-সহস্র দাঁড় কাউয়ার বাস। তারা নিত্যদিন ভক্ষণ করে বন্দিশালের তপ্পল আর দণ্ডিতদের শোনায়ে ভূশুণ্ডি রামায়ণ। রন্ধনশালাটি দক্ষিণে। সারি সারি অগ্নিকুণ্ডের ওপর অজস্র অতিকায় কটাহ। অদূরে স্থপীকৃত ইন্ধন। দারু-স্ত্রুপের ওপরে নিদ্রিত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শত মার্জার। রন্ধনশাল অতিক্রম করে পূর্বে একটি বিশাল সরোবর। জলাশয়ের চারদিকে চারখানি শত-সোপান জলাবতার। পূর্বদিকের ঘাটটির নাম মীনঘাট, পশ্চিমের কূর্মঘাট, উত্তরের কুলিরঘাট আর দক্ষিণের কুস্তীরঘাট। মদগুর মীন-যুগল স্বর্ণনোলকধারী, কূর্মযুগল পদাসুরীয়, কুলিরদম্পতি কোমরবন্ধ, কুস্তীরদম্পতি কণ্ঠহার। যে পাপাচারীর পূর্ণ হয় ষোলো কলা, সে আপনি তলায় সরোবরে। তারপর জলতলে রঙ্গ মদগুর, কূর্ম, কুলির ও কুস্তীর সঙ্গে। সহস্র প্রস্ফুটিত কোকনদ সরোবর জলে। সুবাসিত পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করে সহস্র অযুত মধুকর। মধুচক্র গড়ে জলাবতার গাত্রের চেষ্টাবৃক্ষে। যে দণ্ডিতের গরলমতি না বদলায় বারো বর্ষে, তার দেহে মধু

অন্তঃক্ষেপণ করে মক্ষীদল। অসংখ্য চর্মচটকার বাস বন্দিশালের আতৃপ্য বৃক্ষে বৃক্ষে। তারা ক্রুরমতির কুটুরিতে দলে দলে প্রবেশ করে ব্যজনীর বায়ু দেয় মাঘ নিশীথে।

বন্দিশাল পেরিয়ে বকুল বৃক্ষসারি। প্রাণঘাতী লঙ্কার মশান। সমুখে রক্তকমল শোভিত একটি শোণিত সায়র। চারপাশে রক্তকাঞ্চন, রৌহিতক, পুনর্নবা, পাটলী, নাগদমনী ইত্যাদি নানা রক্তপুষ্পের গাছ। সায়রের পরে বেশ ক-টি রক্তচন্দনের কানন। তারপর সারি সারি হাড়িকাঠ। গ্রীবা ধারকে ঘন প্রলেপ সিন্দূরের। ভূতলে শিলাভূত শোণিত। বেশ কয়েকটি কেতকীবৃক্ষ ইতস্তত। সেথা বাস শত শত গৃধিনীর। শাবকগুলি ফ্রন্দনপ্রিয়। দিবারাত্র সমবেতে সোচ্চার। তারপর একটি কর্মকারশালা। সেথা অগ্নিকুণ্ড জ্বলে অহর্নিশ। বিশ্বকর্মা ও শূদ্রার বংশধারকেরা গড়ে চলে ক্ষুরধার খড়্গ। শত-সহস্র নর-করোটি চতুর্দিকে। তারা সিঙ্খুবাযুতে বন্দনা গায় রক্তবাসাঃ, বন্ধমৌলি, বপুস্মান্ যমরাজের।

এক প্রহর নিশি গতে বন্দিশালের পাইকদল দূরে দেখে বকুল বৃক্ষের তল দিয়ে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আসে। কাঁখে রঙ্গন-বুড়ি আর দক্ষিণ হাতে বেত-নড়ি তার। হতবাক সর্বজন, কারাদ্বার অতিক্রম করে কী করে ভিতরে এল অস্থিচর্ম বিলোলনা এই জরতী ব্রাহ্মণী? কেনই-বা তার বন্দিশালে আগমন? ভাবে সমুখে এলে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু বড়েই ধীর তার গতি। বাতশূলে কাঁকালি বন্ধ আর তাই চলন মুদ্রাটি ত্রিভঙ্গ। উছটের ঘায়ে গড়াগড়িও যায় পথে। হঠাৎই বৃক্ষতলের আঁধারে অদৃশ্য হয় বুড়ি। পাইকদল ভাবে বুঝি ভূতলে চিরশয়ান হল তার। এগিয়ে যায় দু-চারিজন। দেখে কোথাও নেই পলিতকেশ ব্রাহ্মণী। ‘সাজ’ ‘সাজ’ রব কারাশালে। শত পাইক ছোটো চারিপাশ। কোথাও নেই বৃদ্ধা। একসময় পাইকদল ক্লাস্ত হয়ে বসে তরুতলে। মশানের কর্মকারেরা সহাস্যে বলে, ‘গঞ্জিকার পরিমাপে গণ্ডগোল হলে বন্দিশালে ঢোকে ব্রাহ্মণী আর গোশালে ঢোকে গজ।’ ঘন হয় রাত্রি। কেশরী ডাক দেয় নিশিখাদ্যের জন্য। পাকশালের ঘন্টিও বাজে। বন্দিরা আসে পাত্র হাতে। বসে সারিবদ্ধ। অনুপস্থিত শুধু একজন। নব দণ্ডিত সাধু ধনপতি। সর্বজনের মুখে সেই এক নাম। গৌড়বাসী সাধুর বর্ণ কনকগৌর, দেহ দৈবসার দীর্ঘ, সিংহের মতো মধ্যদেশ। বিহঙ্গমের চেয়েও উন্নত নাসিকা, ঋতিপাত পবনে চঞ্চল, আঁখি বিকচকমল। কুটিল কুন্তলের বর্ণ নীলাভ। দণ্ডিতজন বলে, ‘এমন রূপবান পুরুষ দেখে জলপরির কামার্ত হওয়ারই কথা। পাইকগুলি দণ্ডধারী পাষণ্ড তাই তারা দেখে বন্দিশালে টেড়ি বুড়ি।’ দু-জন পাইক চলে সাধুকে ভোজনশালে ডাকতে। শাল্মলি ও চেষ্টাবৃক্ষ পেরিয়ে আলো-আঁধারিতে বিস্ময়ে দেখে বুড়ি সাধুর কুঠুরির দিকে ধীর পদে হাঁটে উচ্চৈঃস্বরে বেদ

পড়তে পড়তে। দ্রুত ছোট দুই পাইক ব্রাহ্মণীর পথ রোধ করতে। বেণু বন পেরিয়ে সদাগরের কুঠুরির সমুখে এসে অদৃশ্য হয় মায়া ব্রাহ্মণী। দুই পাইক গলদঘর্ম। শ্বাস টানে ঘন। কিছু সময় গতে দুই পাইক ফেরে আপন বোধে। সাধুকে বলে ভোজনে যেতে। সাধু জানায় এ-নিশায় সে থাকবে উপবাসী। তখনই নব আতঙ্কে দুই পাইক। কেমন করে ফিরবে ভোজনশালে? অবশেষে ‘কু’ ডাকে দৌড় দেয় দ্রুত।

গত হয় প্রহর। ঘন হয় নিশি। নিশ্চুপ বন্দিশাল। দূর হতে ভেসে আসে কেঁদুয়ার ডাক আর সিন্ধু স্বর। মধ্যে মধ্যে পাইকদল হাঁক দেয় সমবেতে। তাতে যত-না বরাভয় তার চেয়ে বেশি শঙ্কা। এই বুঝি হেঁটে যায় মায়া-ব্রাহ্মণী। নিদ্রা যায় বন্দিজন। হঠাৎই নিদ্রিত সাধু-শিয়রে এসে বসে ভগবতী। বলে, ‘ওহে ধনপতি, ধনে তোমার ধাম পূর্ণ আর তুমি শায়িত শিলাশয্যায়? যার অগ্নে-লালিত হয় সহস্রজন সে অনাহারী? সাধু, ত্যাগ করো মিথ্যা অভিমান। তুমি ভজনা করো মহামায়া, ফিরে পাবে সব ধন। নিমজ্জিত সপ্তডিঙা আমি আবার ভাসাব মগরার জলে। করী, কমল, কামিনী দেখাব রাজা শালবানে যদি জপ ‘ভবানী’ নাম। একবার ধ্যান করো চণ্ডী নাম। তোমাকে করব অর্ধ সিংহলেশ্বর, শিরে দেব ধবল ছাতি।’ ধনপতি বলে, ‘যদি এই কারাগারে শেষ হয় এ-জীবন, হোক। না ভজি চণ্ডী নাম’। ভগবতী বলে, ‘ওহে মৃঢ় মতি, বন্দিশালের ভোজন হবে নিত্য বিড়ম্বনা। ওই ধড়ি একদিন হবে শতচ্ছিন্ন আর দেহ আচ্ছাদন হবে ধুকড়ি। যত গত হবে বৎসর তত দীর্ঘ হবে শ্মশ্রু, পুনর্নব, কেশ। একদিন দিঘল শ্মশ্রু স্পর্শ করবে নাভিদেশ, পুনর্নব হবে বিঘত-প্রমাণ আর কেশ হবে জটাভার। তৈল বিনা গায়ে উড়বে খড়ি আর অন্নকণ্ঠে দেহ হবে দড়ি।’ অচঞ্চল সাধু। বলে, ‘কপালে আবার শিব-প্রণতি চিহ্ন আর গলে রুদ্রাক্ষ। মহেশঠাকুর ভিন্ন অন্য কেহ নাহি জানি।’ রোষিত দেবী বলে, চার চক্ষু থাকতে তুই অন্ধ, কান থাকতে বধির, মুণ্ড থাকতে মুর্থ। তুরঙ্গ, কুরঙ্গ আদি পণ নিয়ে নিয়ে জীবন কাটাস, পুরাণ পড়িস না। শোন আমি কালী, কপালিনী, কাস্তি, কপালকুণ্ডলা, কালরাত্রি, কুরঙ্গাক্ষী। আমি গিরিজা, গণেশমাতা, গৌরী। আমি জন্ম-জরা-মৃত্যুহরা জয়ন্তী জননী। আমি ত্রিগুণাঙ্ঘিকা, তারা, ত্রৈলোক্যজননী। আমি দুর্গা, দনুজদলনী, দয়াবতী। আমি দক্ষিণা কালী, দুরিতনাশিনী, দুঃখ-বিনাসিনী। আমি ধরণী-ধারিণী, ধেয়ান-ধারিণী, ধরাধর সুতা। আমি নগেন্দ্রনন্দিনী, নিশুন্তনাশিনী, নীলপতাকিনী। আমি ভয়ংকরা, ভয়হরা, ভৈরবী। আমি ভারতী, ভদ্রকালী, ভবেশ্বরিনি। আমি মহিষমর্দিনী, মধুকৈটভ-ঘাতিনী, মস্তকমালিনী। আমি রণপ্রিয়া, রণজয়া, রুক্মিণী। আমি শঙ্খিনী, শূলিনী, শংকরী। আমি শশিশিরোমণি, শক্তিরূপা, শাকম্বরী। আমি শর্বাণী, শক্তি,

শিবের ঘরনি। আমি ষড়ঙ্কধারিণী, ষটপদগায়িনী, ষড়ঙ্গপূজিনী। আমি সতী, সনাতনী, সংসারসারিণী। আমি হরজায়া, হৈমবতী, হেমন্তনন্দিনী। তুই বলিস সাধু, আমায় চিনিস না? যার পূজাস্তে রাবণে বধ করল শ্রীরামচন্দ্র, যার জন্য রক্ষা পেল গোকুল, যে রাজা করল ব্যাধ কালকেতুকে সে অপূজ্য সাধু ধনপতির কাছে? আমি এ কী শ্রবণ করি নিজ কর্ণে? হয় বধির হব আমি, নয় নির্বাক হবি তুই সাধু।

ধনপতি বলে, বাক্ষ্যক্তি হরণের পূর্বে বলব একটিই কথা, শতরূপা চণ্ডীর শ্রেষ্ঠ রূপটি হল কমলে কামিনী। অধর যেন পক্ক বিশ্বিকাকফল, বদন শরদ-ইন্দু, আঁখি কুরঙ্গলোচন। কী নয়নাভিরাম দুই কুচগিরি, নিবিড় নিতম্ব। এ-রূপ পূজ্য হবে কেমনে?

ক্ষোভিত চণ্ডী অভিযোগে বলে, ওরে সাধু, কামিনী-কাঞ্চন ছাড়া নেই তোর অন্য কোনো মতি। তোর চক্ষু দুটি নিত্য কামার্ত। শুধু বাক্রোধ নয়, তোর যোগ্য শাস্তি দৃষ্টিহরণও। ওরে দেখ আমার প্রকৃত রূপ।

মুহূর্তে অদৃশ্য হল মায়া-ব্রাহ্মণী। মহামায়া দেবীরূপে আবির্ভূত হল বন্দিশালে। রোষায়ুত নারায়ণীর নয়ন দু-টি প্রভাত-রবি। প্রলয়বদনা দেবীর মুখে বয় কালঘাম, মেঘদলে ঠেকে মুকুট, কোপে কাঁপে তনু। দুই ভুরুযুগ বিস্তার পায় ইন্দ্রধনুর মতো। ঘোরধ্বনিতে গগন হয় নাদিত। শবারুঢ়া মহাতেজা হয় দশভুজা। তার অধিষ্ঠানের জন্য ভেসে আসে শিখর সফর শরাসন। দশভুজার দশ করে শূল, ধনু, পাশ, পরিঘ, তোমর, পাশ। রাঙ্গিবস্ত্রা দেবীর ভুজে ভুগুণ্ডি, ডাবুস, টাঙ্গি, তবক, বেলক, চক্রবাণ, ভিন্দিপাল, খড়্গা, ফাঙ্গি-ফট্ট, কামান, কৃপাণ, যমদণ্ড। দেবীর অট্টহাসে ধরায় ত্রাস জাগে, নিনাদে ভরে ত্রিভুবন। দেবী করে বিরাজ করে শূলপাণির আয়ুধ, নারায়ণের চক্র, জলেশ্বরের শঙ্খ, নিশাচরের শক্তি, অম্বুপতির নাগপাশ, সদাগতির কার্মুক-বাণ, সুরপতির বজ্র, ইরাবতের ঘণ্টা, সঞ্জীবনীপূর-পতির কালদণ্ড, দক্ষের অক্ষমালা, ধাতার কমণ্ডলু, কালের করবাল, বিশ্বকর্মার অভেদ্য অঙ্গবর্ম। মাতা কণ্ঠে ক্ষীরসিন্দুর হার, কর্ণে চূড়ামণির কনক-কুণ্ডল, মুকুটে অর্ধেন্দু, বাহুযুগে অঙ্গদমণ্ডল। ভগবতীর দুই চরণে মুখর পুরট তুলাকোট, কণ্ঠে দিব্য ভূষা, অঙ্গুলিতে রত্নময় অঙ্গুরি, পদাঙ্গুলে রতন পাসুলি। চণ্ডী শিরে উর্বশীর করি বিভূষণ ও কণ্ঠে জলনিধির অমল পঙ্কজমালা, হস্তে যথরাজার সুধাপূর্ণ চমক, বক্ষে লম্বিত নাগরাজ শেষের মহামণি ভূষিত নাগহার। মাতা চণ্ডিকা আরাঢ়া হিমবানের কেশরীতে।

মহামাতা বলে, ওহে সাধু, এই দেখ আমার রণরূপ। যদি সাধু জাগে আমার চৌষটি যোগিনী দেখার, দেখাব তোকে। ধৈর্যে আসবে অসি ও খাঁড়াজুজা উগ্রচণ্ডা, লোহিত বসনা শিবদূতী, রণপ্রিয়া, কঙ্কালমালিনী, বৃষারুঢ়া মাহেশ্বরী, খট্টাঙ্গধারিণী

ঘোরস্বনা আদি যোগিনী। আমি আহ্বান করলে ত্রিকোটী বিকটদশনা দানা হানা দেবে  
লঙ্কাদেশে। বল সদাগর, তুই স্থাপন করবি চণ্ডীবারি। ভজনা করবি মহামায়া।

নেই কোনো উত্তর। দেবী দেখে শিলাশয্যা নিদ্রা যায় সদাগর। লজ্জায় নতমুখ  
ভবানী চলে সুরলোকে। পশ্চাতে ফিরে কুপিত মহামায়া বলে, বন্দিশালে বদ্ধ থাক  
মূঢ়মতি সদাগর দ্বাদশ বৎসর।

সম্ভ্রান্ত পাইকদল কম্পিত স্বরে হাঁক দেয়— নির্ভয়ে রহো।

## ৪৯ গীতময় লঙ্কা দ্বীপ

ঋতুচক্র ঘোরে। শীতল কাল শেষে বসন্তী ডাকে বসন্ত আসে। লঙ্কা দেশ বর্ণময়  
বাসন্তি, কাঞ্চন পুষ্পে। দ্বীপের গেহ-গারি, চারণ-প্রান্তির সুবাসিত কেতুকি, ধাতুকি,  
চন্দ্রকের গন্ধে। কুসুম-রাগে শ্বেতশুভ্র অলিদল। ভ্রমর দম্পতি পান করে মধু আর  
গীত গায় সুমধুর। বৃক্ষে বৃক্ষে নব লোহিত পল্লব। মন্দ মন্দ বয় দক্ষিণ বায়ু।  
অশোক বৃক্ষতলে বসে কিশোর রাখাল বেণুতে বাজায় গীত—

অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন  
পঞ্চম গায় অলি নাচে পিকুগণ।  
ক্ষণে উড়ে ক্ষণে বৈসে মত্ত মধুকর  
পরাগে ধূসর লতা তরু কলেবর।

বসন্ত বিদায়ে নিদাঘ আসে। মাকন্দবৃক্ষ ন্যুজ্জ হয় ফলভারে। তাদের হরিদ্রা বর্ণ  
যেমন নয়নাভিরাম, সুবাসও তেমন ঘ্রাণপ্রিয়। দিনমণি তেজপ্রখর তাই জলদানে  
দ্বীপবাসীরা জলধারা বাঁধে শালগ্রাম শিলায়, শিবলিঙ্গে এবং অশ্বখ, বট ও  
তুলসীবৃক্ষে। ভোজন করে শালি তণ্ডুল, ঘৃত, দুগ্ধ আর পান করে সুশীতল  
শর্করোদক। মধ্যাহ্নভোজনের পর কেউ বিশ্রাম নেয় বায়ু-প্রবাহিত সুশীতল  
শয়নমন্দিরে কেউ বা আশ্রয় নেয় নিবিড় ছায়ামণ্ডপে। গাত্রে লেপন করে চন্দ্রনাদি  
সুগন্ধি, স্নিগ্ধদ্রব্য এবং কণ্ঠে পরে জুই-মল্লিকার মালা। নিশীথে শয়ন করে বায়ু ও  
হিমযুক্ত স্থানে। চন্দ্রকিরণ উপভোগ করতে করতে গুনগুন গীত গায়—

বিকশিত কুঞ্জবনে কুসুম মালতি  
দামিনি মরুয়া ফুল ফোটে জাতি জুতি।  
ফুটিছে মাধবীলতা পলাশ কাঞ্চন  
কুন্দকুসুম ফোটে বজ্র রঙ্গন।

নিদাঘ অস্ত্রে আসে বরিষাকাল। রবির আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রবেশ এবং মঙ্গল, বুধ ও শুক্রের রাশ্যান্তর আদি কারণ হেতু ঘটে প্রবল বৃষ্টিযোগ। শুরু হয় হৈমন্তিক ধান্য রোপণ এবং কৃষ্ণমুগ, মাষকলাই, লতাকস্তুরী প্রভৃতির বীজবপন। গ্রীষ্মের দাবদাহ নির্বাপিত হয় সুশীতল মেঘবারি বর্ষণে এবং বৃক্ষসকল হরিৎ হয় নবনব পত্রে। পিকুগণ নৃত্য করে বন, পর্বত ও সিঙ্খুতটে। জলকেলি করে রাজহংস হংসী সঙ্গে। হ্লাদিত ভেকদল সরব হয় খাল, বিল, সরোবরে। শত-সহস্র কইমীন সমবেতে চলে খাজুরি বৃক্ষ আরোহণে। বর্ষণ হয় অবিশ্রাম। নদী ঘাটের পাটনি উদাত্ত কণ্ঠে গায়—

ক্ষণে ক্ষণে হাসে রামা নাচে ভুজ তুলি  
পঞ্চম গায় রাগ-রাগিণী মেলি।  
রবার মরুজ ডম্ফ করয়ে বাজন  
অঙ্গভঙ্গে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ।

সিঙ্খু, নদী, সরোবর, সরসী, গোম্পদগুলিকে পূর্ণ করে বজ্রবাহী জলধর অদৃশ্য হয় দিগন্তে। গগন তটখানি নির্মল, নির্ভর। শুভ্র কাশ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় পথে-প্রান্তরে। পুঞ্জ পুঞ্জ শরৎ দেয়া উড়ে চলে বিহঙ্গম সাথে। কহ্লার পুষ্প আন্দোলিত হয় জলাশয়ে। রামাদল মৃৎকুটিরের গাত্রে লেপন করে শ্বেত মৃস্তিকা এবং নিজ নিজ দেহে প্রলেপ দেয় চন্দন ও কর্পূর। অকালবোধনে মৃৎশিল্পী নির্মাণ করে দেবী প্রতিমা। মশানের প্রধান কর্মকার দেবী-করের জন্য স্বাতীনক্ষত্রতলে চতুর্থী নিশীথে গড়ে ক্ষুরধার খড়্গ। গুনগুন সুর তোলে ঝাবু বন, প্রহর গতের ডাক দেয় বকুলবৃক্ষের পক্ষীদল, সিঙ্খুকূলে শঙ্খ বাজায় শারদ বায়ু, সুবাস ছড়ায় মালতীপুষ্প। খড়্গ হস্তে গীত গায় লৌহকার—

বালা অতি কৃশোদরী ভার দুই কুচগিরি  
নিবিড় নিতম্বে অবতার  
বদন ঈষৎ মেলে কুঞ্জর উগারে গিলে  
জাগরণে স্বপন প্রকার।

সুরময় সিংহল দেশ, গীতময় লঙ্কা দ্বীপ।

## শব্দার্থ

অক্লেদ্য — যা কোনো কিছুতে আর্দ্র হয় না। অক্ষুশ — হস্তিচালন অস্ব। অপাঙ্গ — অপাং গম্বু। অমরুং — পেয়ারা। অমলখি — আমলকী। অযোনিসম্ভবা — যে স্ত্রীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেনি। অঁড়ুয়া — এঁড়ে। অলাবু — লাউ। অলিঞ্জর — বড়ো মৃৎপাত্র। অসৌরত — রতিহীন। অস্থি — আঁটি।

আকন্দ — ফুল-বিশেষ। আঘন — অগ্রহায়ণ। আঙলা — আমলকী। আতপত্র — রাজচ্ছত্র। আতৃপ্য — আতা। আশ্রসার — আমশাখা। আশ্রাতক — আমড়া। আরতি — আর্তি। আলান — ডিঙা বাঁধার খুঁটি। আনুক — আলু-বিশেষ। আঁশিহাটা — মাছের হাট।

ইক্কন — রন্ধন কাঠ। ইরাবৎ — ঐরাবত।

ইকড়া — গুচ্ছ গুল্ম-বিশেষ। উকল্যা — গন্ধতৃণ-বিশেষ। উচোটো — যাতে হোঁচট লাগে। উছটা — স্ত্রীলোকের পদভূষণ। উজবক — তাতারের সৈন্যদল।

উবলম্ব — ভর্ৎসনা। উডম্বর — ডুমুর। উলুক — পেঁচা। উৎকুণ — উকুন। উনকোট — বহু সংখ্যক। উদ্ধ্বরেতাঃ — যাদের গুত্র অধোগামী হয় না।

একজানি — একজন মাত্র লোকের জানা। একটুকি — একটু। একানই — একানবই। একানংশা — আইবড় (নংশার অর্থ দেহসংযোগ)।

ওড়্রদেশ — উৎকল দেশ। ওদন — অন্ন। ওড়পুত্প — জবাফুল।

ককট (ক) — কাঁকড়া। কখারুফুলো — কুমড়োফুল। কঙ্ক — সারস পক্ষী-বিশেষ।

কঞ্জ — পদ্মফুল। কচাট — ঘন জাল। কচ্ছ — নৌকার পশ্চাদভাগ।

কটুতৈল — সর্ষের তেল। কঠয়ালি — কাঁঠাল। ক-দল — বায়ুদল। কপিঞ্জল —

তিতির-শ্রেণীর পাখি। কপিথ — কয়েতবেল গাছ। কপিল — পিঙ্গল। কমট —

কচ্ছপ। করকাঞ্চি — কর-গ্রস্থিত কটিভূষণ। করতব — সুরসাধনা। করবাল —

অসি। করভ — উটশাবক। করুণা — লেবু-বিশেষ। কলধৌত — স্বর্ণ বা

রৌপ্য, এখানে রৌপ্য। কর্ণ — নৌকার হাল। কলাপী — ময়ূর। কলি — কুল।

কব্য — পিতৃদেবের তৃপ্তার্থ দেয় অন্নাদি। কহ্লার — পদ্ম বা শালুক, এখানে

শালুক। কঙ্ক (পাখি) — হারগিলা। কৎসব — কচ্ছপ। কাউ(য়া) — কাক।

কাকমাচিকা (গাছ) — গুড়কামাই। কাছাড় — নদীর কুল। কাণ্ডাফলা —

খড়্গফলক। কাপড়ি সন্ন্যাসী — যোগী ভিখারি। কার্মুক — ধনুক। কালসার —

কৃষ্ণসার মৃগ। কালাপাতি — নৌযানের দুই তক্তার মধ্যবর্তী ফাঁক ভরাটের শন,

পাট ইত্যাদি সামগ্রী। কালিয়া — কৃষ্ণবর্ণ। কাষ্ঠকুট — কাঠবেড়ালি।

কাঁকালি — কোমর। কাঁঙ্গুরা — চূড়া। কাঁত — দেয়াল। কায়বার —

গুণবর্ণনাপূর্বক স্তব। কুচগিরি — সুউচ্চ স্তন। কুটীক — যে সন্ন্যাসী নিজ আশ্রমে

থাকে। কুণপ — শব। কুস্তল — চুল। কুন্দরু — কুঁদরি। কাঁড়া-কাল — মহিষ-

কালো। কুরঙ্গ — হরিণ। কুলির — ছোটো কাঁকড়া। কেঁদুয়া — কেঁদো বাঘ।

কেরয়াল — দাঁড়। কেশরী — সিংহ। কেয়ূর — কঙ্কণ। কোক — নেকড়ে বাঘ।

কোদণ্ড — ধনুক। কোদালে — যেখানের অধিবাসী মাটিকাটা মজুর। কোদো —

অপকৃষ্ট ধান্য বিশেষ। কৈরব — পদ্মফুল। কৌমোদকী — বিষুণের গদা। ক্ষণ —

ত্রিশ কলায় এক ক্ষণ। ক্ষুদ্রজীরক — ছোটো জিরে। ক্ষেপংকরী — শঙ্খচিল।  
 খটাস — খাটের পায়। খদির — খয়ের। খণ্ড — চাপ গুড় ও ক্ষীর। খণ্ড —  
 বাটপার। খাপরা — পাতলা মৃৎপাত্র। খাসা জোড়া — উৎকৃষ্ট পরিধেয়  
 যুগ্মবসন। খিরী — রাবড়ি। খুড়িয়া — শাক-বিশেষ। খেটক — ঢাল।  
 গঙ্গারাম — শুক ও শারীকে আদরে ডাকা। গড়া — থান কাপড়। গণ্ডা — গণ্ডার।  
 গৰ্ভদণ্ড — বাদাম তোলা দণ্ড। গলুই — নৌকার অগ্রভাগ। গাউল-বম্বল —  
 নিশানধারী পদাতিক। গাছফল — হরীতকী। গাঙ্গে — নদীতে। গাবর —  
 জোয়ান নাবিক। গাড়ে — গর্তে। গিথ্যানির — গৃহিণীর। গিধিনি — শকুন।  
 গুপ্তি — নৌকার গৰ্ভ। গুয়া — সুপারি। গেঁঠা — নৌকা। গেহ-গারি —  
 ঘরসংসার। গোধিয়া — গোসাপ। গোধুম — ময়দা। গোরোচনা — গোমস্তকস্থ  
 পীতবর্ণ শুষ্কপিত্ত। গ্রস্থি — গ্রস্থিপণ বৃক্ষ। গ্রাহবতী — হিংস্র জলজন্তুপূর্ণ।  
 ঘুসি-টোকে — নৌকায় চৌর্যবৃত্তি। ঘোড়ন খাটুলি — আবৃত ডুলি।  
 চঞ্চ — তরল গন্ধদ্রব্য-বিশেষ। চন্দ্রবল্লরি — সোমলতা। চর্মচটকা — চামচিকে।  
 চণক — ছোলা। চণ্ডীগাছা — তেঁতুলগাছ। চড়া — ধনুকের ছিলা। চলদল —  
 অশ্বখ গাছ। চষক — পানপাত্র। চাক — চাকা। চাপে — ধনুকে। চিকুর —  
 চুল। চিত্রফল — চিতলমাছ। চিনা — ছোটো দানার চাল-বিশেষ। চিরনি —  
 চিরুনি। চিল্লক — চিল। চূতপুষ্প — আশ্রপুষ্প। চেষ্টা — তেঁতুল।  
 ছই — জলযানের আচ্ছাদন। ছেলি — ছাগল। ছুটি — ঘুন্টি দেওয়া পদাঙ্গুরি।  
 জঘনা — নীতম্ব। জলধর — দু-ফলা কাটারি। জলযুক — জৌক। জললতা —  
 জলতরঙ্গ। জলৌকা — জৌক। জাবক — আলতা। জালিক — জেলে।  
 জাঙ্গাল — বাঁধ। জায়পত্র — জন্মপত্র। জিবন্তী — সাত রকমের হরিতকির  
 মধ্যে অন্যতম এবং সোনার মতো উজ্জ্বল। জৌঘর — গালাঘর।  
 ঝাবুবীথি — ঝাউ বন। ঝাং ঝাং — ঘেউ ঘেউ। ঝিঙ্গাক — ঝিঙে।  
 টঙে — ওপরে। টঙ্ক — শুকনো ফল। টেসকানা — পক্ষী-বিশেষ।  
 ঠমক — বাদ্য-বিশেষ। ঠাকুরানি — প্রভুত্ব। ঠাট — সজ্জিতবাহিনী।  
 ডঙ্ক — সর্পাঘাত। ডম্ফ — খঞ্জনি। ডাবুস — ডাঙস। ডাণ্ডিয়া — মাঝি।  
 ডিভি — বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।  
 ঢেঙা মাণ্ড — লম্বা বউ। ঢোলকান — মৃগ-জাতীয় বন্য পশু।  
 তবক — বন্দুক। তবকী — গোলন্দাজ। তরক্ষু — নেকড়েবাঘ। তরপণ্য —  
 পারানির কড়ি বা মাশুল। তাজ — তর্জন গর্জন। তাড়বালা — আঁটবালা।  
 তিমিসিল — তিমি গিলে খায় এমন জীব। তিস্তিড়ী — তেঁতুল। তীর্থ —  
 নদীঘাট। তুরঙ্গ — ঘোড়া। তুল — তুলো। তুলা (পরীক্ষা) — ওজন।  
 তুলাকোট — নূপুর-জাতীয় পদভূষণ। তেলিয়া — তৈলব্যাপারী। তোমর —  
 বর্শা-বিশেষ। ত্রিপুত্র — ত্রিরেখার তিলক-বিশেষ। ত্রাশ্বকা — ত্রিনয়না।  
 দংষ্ট্রা — স্থূলদন্ত-বিশেষ। দক্ষিণ পাটন — নৌবাণিজ্য কারণে সিংহলদেশ যাত্রা।  
 দধিকালি — ভাণ্ডস্থিত দধির পরিমাণ নির্ণয়ে শুভংকরী হিসাব। দধিথ (বৃক্ষ) —  
 কয়েত। দশন — দাঁত। দাপ — দর্প। দাপনি — দর্পণ। দিগারি — প্রাপ্য কর।  
 দিব্যফল — বেল। দিয়ারা — চর। দীপবর্তি — সলতে। দুয়ারি — দারোয়ান।

দুইখণ্ড — দুর্বৃত্ত-দুরাছা। দুহার — দু-জনে! দেহারা — দেবমন্দির। দোখণ্ড —  
 বীণা-জাতীয় বাদ্য-বিশেষ। দৈবসার — শালগাছ।  
 ধড়ি — পরিধান বস্ত্র। ধানকি — ধনুর্ধারী যোদ্ধা। ধান্যেশ্বরী — ভেতো মদ।  
 ধাবক — ধোবা। ধাবনি — দ্রুতগমন। ধুকড়ি — ছেঁড়া কাঁথা। ধুকুড়িয়া —  
 সারস পক্ষী-বিশেষ।  
 নক্ররাজ — হাঙর। নদীবন্ধ — নদীঘাট। নফর — চাকর। নড়ি — পথিকের লাঠি।  
 নাগরমুস্তা — জলতৃণ-বিশেষ। নাচারি — বাংলা গীতপদ-বিশেষ। নাড়ু  
 গঙ্গাজল — গঙ্গাজল রঙের নাড়ু। নাল ফুল — জলশিউলি আদি দণ্ডযুক্ত  
 পুষ্প। নালভূমি — কৃষিখেত। নালিক — চাষি। নাং — উপপতি। নিত্যা —  
 ঋণবস্থিতা (মনসা)। নিষ গাছ — নিম গাছ। নিশান — বাদ্যধ্বনি। নিষগ্ন দণ্ড —  
 নৌকার যে-দণ্ডে পাখি বসে। নিষ্পদ যান — জলযান। নীলক — নীল অশ্ব।  
 নেঞ্জহীন — লেজহীন। নেজা — বর্ষা। নেত — উৎকৃষ্ট সূতিবস্ত্র। নোনা  
 বায় — লবণার্দ্র বায়ুতে। নৈঋত — রাফস।  
 পউটি — খাদ্যশস্যের পরিমাণ-বিশেষ। পর্কটি — পাকুড় গাছ। পর্জন্য — বিষ্ণু।  
 পত্রবাল — নৌকার হাল। পত্রাবলি — পত্ররূপ দেহাঙ্কন। পনস — কাঁঠাল।  
 পরশু — কুঠার। পরিঘ — লৌহ দণ্ড। পণ — পণ্য। পড়া — নাগরা। পল —  
 দণ্ডের যষ্টিতম অংশ। পলা — প্রবাল। পলাকড়ি — পটোল। পাকল — রাঙা।  
 পাগ — পাগড়ির সূক্ষ্ম কাপড়। পাটলিবৃক্ষ — পারুলগাছ। পাটন — বাণিজ্য।  
 পাটি — মাদুরবিশেষ। পাত্যারা — বিশ্বাস। পামরি — অলংকৃত। পারথি —  
 ধাত্রী। পাড়ি — তোষক। পিক — কোকিল। পুনর্নব — নখ। পুরট — সোনা।  
 পোড়গ — কবিরাজি (তৈল)। পুঙ্কা — পিড়িং শাক। প্রতুলুক — পাখি।  
 পৌর্ণমাসী — যে তিথিতে চন্দ্রের ষোলোকলা পূর্ণ হয়। প্রদর — স্ত্রীলোকের  
 যোনিরোগ ভেদ। প্রমেহ — মূত্ররোগ ভেদ। প্রাণ-পিড়াসিল — প্রাণি-বধকারী।  
 প্রিয়ঙ্গ — সুগন্ধি লতা-বিশেষ। প্লবঙ্গ (ম) — যা ঝাঁপিয়ে চলে (এখানে ব্যাং)।  
 ফণী — সাপ। ফড়িঙা — ঝিঝি। ফাঞ্চি-ফট — তুবড়ি বোমা। ফেনি — বাতাস।  
 বগা — বকপাখি। বর্ণন — বানান। বদরী — কুল (গাছ)। বপ্র — তট। ববরী —  
 বাবুই পাখি। বসন্তী — কোকিল। বহিত্র — নৌকা। বক্কাল পানীয় — মদ।  
 বন্ধুক — বান্ধুলি ফুল। বস্ত্রী — উইপোকা। বঙ্ককি — বীণা-বিশেষ। বল্পকি —  
 বীণা-বিশেষ। বাঁও — আনুভূমিক সম্প্রসারিত দুই হাত পরিমাণ। বাকসনা —  
 বকফুল। বাঙালি (খেলা) — লাঠি বা তরবারির ঘূর্ণন। বাটুলা — মটরকলাই।  
 বাথুয়া — বেতো শাক। বান্যানী — বেনে-বউ। বার্তাকু — বেগুন। বারশুঙ্গ —  
 যে হরিণের শৃঙ্গে বারোটি শাখা। বারি — পূজার ঘট। বাহির দরগা — নৌকার  
 বাইরের খোল। বিক্রম — প্রবাল। বিভীতক বৃক্ষ — বহেড়া গাছ। বিভূতিভূষণ  
 — ভস্মরূপ অলংকার। বিশ্ববর — তেলাকুচা ফল। বিশ্বিকা — সূর্য ও চন্দ্রের  
 মণ্ডল। বিশ্বুক — পাকা তেলেকুচা ফল। বিরকালি — যুদ্ধকালোচিত। বিড়ঙ্গ —  
 ভেষজ উদ্ভিদ। বিড়া — পানের থিলি। বীর্যশুদ্ধা — বীর্যপণ। বীরঢাক — জয়  
 ঢাক। বুড়ি — পাঁচ গণ্ডা। বৃহিত — নৌকা। বৃহিতাল — যার নৌকা আছে  
 (সওদাগর)। বেউশ্যা — যৌনকর্মী। বেত-নড়ি — বেতের দণ্ড। বেণী —

দু-তারের বাজনা। বেলক — খলতা বাণ। বেসর — ঘণ্ট। বেসারি — বাটা  
 মশলা। বোদালমাছ — বোয়ালমাছ। বেভার — কুটুস্থিতা-ব্যবহারে উপহার।  
 ব্যজনী — পাখা।  
 ভরা — নৌবাগিচা পণ্য। ভরাতারা — পণ্যপূর্ণ নৌসার। ভাণ্ডায় — ঠকায়।  
 ভাট্যারি — ভাটিয়ালি। ভারদ্বাজি — বুনো কার্পাস। ভালুকা — একজাতীয়  
 বাঁশ। ভিণ্ডি — বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। ভিন্দিপাল — পাথর ছোঁড়ার গুলতি।  
 ভুসন্তি — অস্ত্র বিশেষ। ভুঁইয়া — ভুমিজ আদিবাসিন্দা। ভুজঙ্গম — সাপ।  
 ভূষা — ভূষণ। ভোট — পাহাড়ি দেশের কঞ্চল।  
 মকরন্দ — মধু। মদগুর — মাগুর। মধুমােস — চৈত্রমােস। মধুরি — মৌরি।  
 ময়াল — সমীপবর্তী দেশ। মসার — পান্না। মসিপত্র — কালিতে লেখা  
 প্রতিজ্ঞাপত্র। মহলাদি — বাঁকা স্রোত। মহাকচ্ছ — সমুদ্র। মহীলতা — কেঁচো।  
 মাংসসার — স্থলকায়। মাকড় — মর্কট। মাকড়া (চণ্ডী) — মাকড় বা বানরের  
 মতো ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ। মাকন্দ — আম। মাকুন্দ — যে পুরুষের গৌফ-দাড়ি  
 ওঠে না। মাতঙ্গ — হাতি। মান্দাস — ডেলা। মাডুয়া — ছোটো দানা কলাই-  
 বিশেষ। মীনরঙ্গ — মাছরাঙা। মুড়েল — নৌকার অগ্রভাগ। মুড়েলা — চূড়া।  
 মুরজ — পাখোয়াজের মতো বাদ্য-বিশেষ। মুষলী — টিকটিকি। মেঙুদি (বৃক্ষ)  
 — মেহদি। মোকা (নারিকেল) — শূন্যগর্ভ।  
 যাবক — আলতা। যাম — যম। যোগপাটা — যোগাসনের বন্ধনী।  
 রণ — বাদনদণ্ড। রন্ধ — ক্ষুধার্ত। রাস্তি — রাঙা জামা। রবাব — বেহালার মতো  
 বাদ্য-বিশেষ। রাউত — অস্থারোহী সেনা। রান্না — পরবৃক্ষজীবী লতাবিশেষ।  
 লক্তক — আলতা। লবণিয়া — নুন ব্যবসায়ী। লীলুয়ারী (বায়ু) — লীলাচঞ্চল।  
 লোন — নুন। লোল — সতৃষ্ণ। লোহ — চোখের জল।  
 শকুল — শোলমাছ। শটী — বন-আদা। শফরী — পুঁটিমাছ। শর্ব — তীরধারী।  
 শরভ — কাল্পনিক অষ্টপদ জন্তু। শল্পকী — শোণবৃক্ষ। শশারু — খরগোশ।  
 শাম্মলি (বৃক্ষ) — শিমুল। শিঞ্জুন — ভূষণধ্বনি। শিবা — শৃগাল। শিবিকা —  
 পালকি। শুভ্রা — শুক্তি। শুষ্ঠ — আদা-জাতীয় শুকনো শিকড়। শৃঙ্গটক —  
 পানিফল। শেষ — অনন্তনাগ। শ্রীকলা — ছবি। শ্রীকালি — শৃগাল।  
 শ্রীফল — বেল। শ্রীপদ — গোদ।  
 সইবানা — সামিয়ানা। সকল্মাথ — পশমি বস্ত্র। সঞ্জীবনীপুর — যমালয়। সতা —  
 সতিন। সর্পি — গাওয়া ঘি। সয়চান — বাজপাখি। সসাজ বারণ — সাজসহ  
 হাতি। সন্ধান — সংযোগ। সহকার — আমের মুকুল। সহখটাসন — এক খাটে  
 অনেকে বসা। সাগুন — সেগুন। সাতনল — পাখি-ধরা আঠাকাঠি। সাধু —  
 সদাগর। সিউলি — খেজুর রসকারক। সিখর — শৈলাগ্র। সিখিবাণ —  
 অগ্নিবাণ। সিঙ্গবৃক্ষ — মনসা গাছ। সীতাখাল — লাস্কলের রেখার মতো সরল  
 জলপথ। সুছন্দরী — হাউই। সুদি — গুরুপক্ষ। সুডউ — বড়ো যোদ্ধা।  
 সুপ — ডাল। সৃণি — অক্ষুশ। সেতুবন্ধ — নদীঘাট। সোলপা — সুলপো শাক।  
 হবি — গাওয়া ঘি। হরিতাল — পীত ধাতু-বিশেষ। হাণ্ডিয়া — প্রকাণ্ড। হাদি —  
 জলজ তৃণশৃঙ্গ। হিসুল — রঞ্জক। হল্লাখলি — উলু-উলু ধ্বনি।

কৃতজ্ঞতা

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মনীশ চক্রবর্তী

নূপেন চক্রবর্তী

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

অনির্বাক রায়

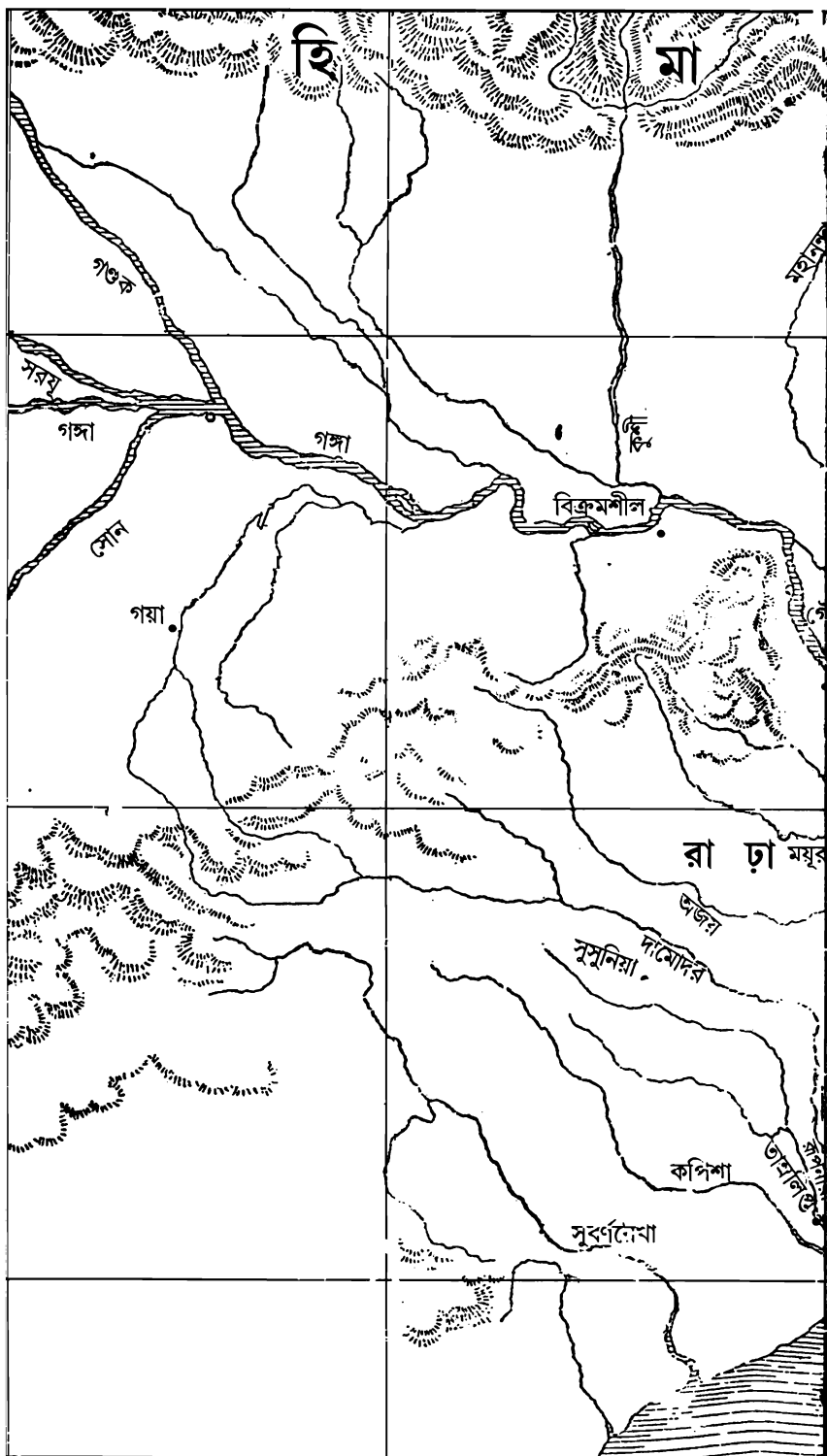
গৌতম সেনগুপ্ত

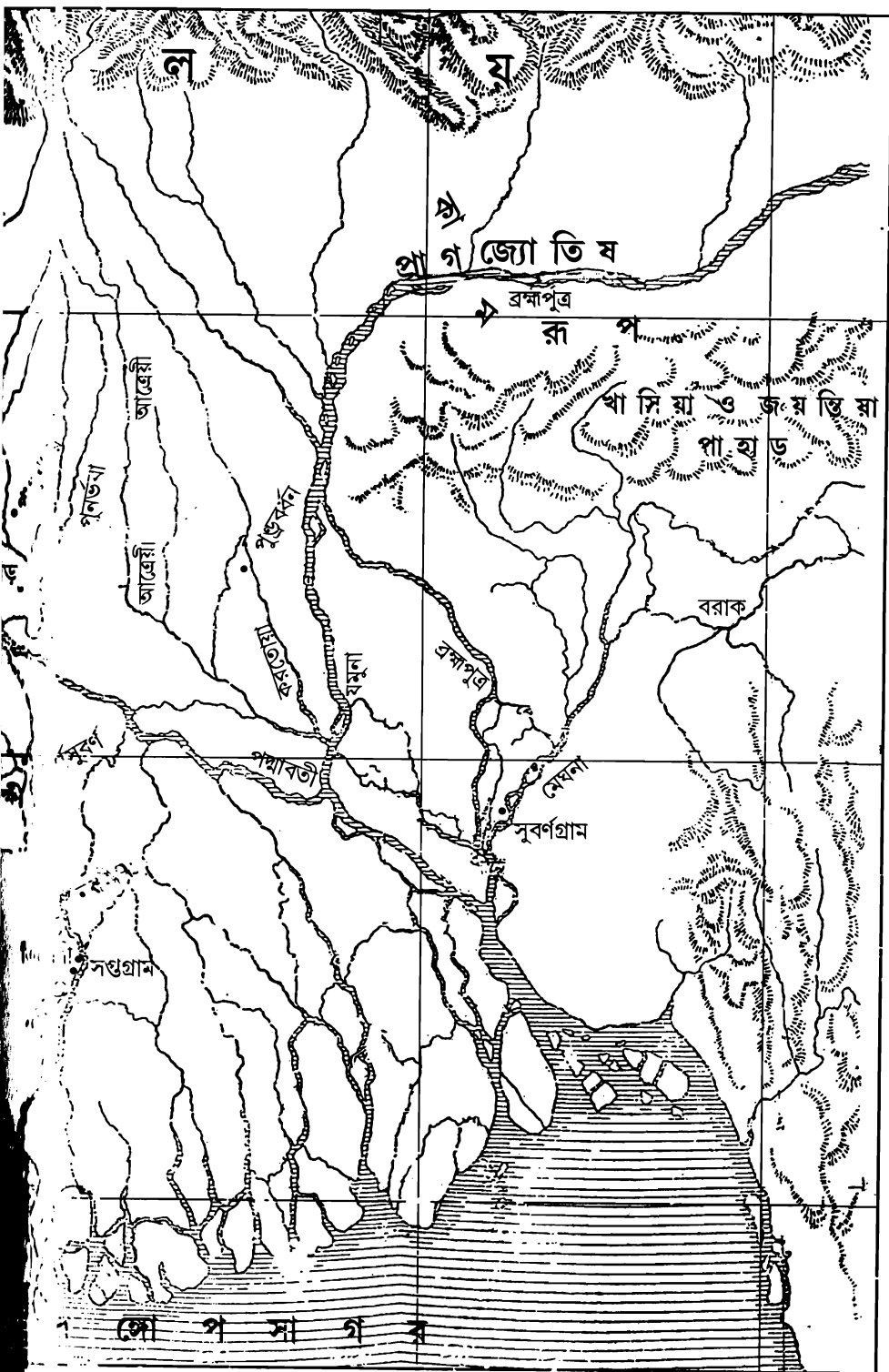
হরেকৃষ্ণ আচার্য

অশোককুমার বসু

মানচিত্র

প্রাচীন জনপদ ও জলপথ





রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৩৬৩ সনের  
৫ই আশ্বিন কলকাতায়। শৈশব ও কৈশোরের  
প্রায় পুরোটাই কেটেছে বাঁকুড়া জেলায়।  
১৩৯৬-এ কবিকঙ্কণ মুকুন্দের ওপর সুকুমার  
সেনের একটি ইংরেজি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার  
কাজে পণ্ডিত ও রসবেত্তার সঙ্গে পরিচয়।  
সম্পর্ক নিবিড় হয়েছিল দিনে দিনে, আচার্য  
ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে। চণ্ডীমঙ্গল-এর  
আখ্যটিক খণ্ডের নির্বাচিত অংশের ইংরেজি  
অনুবাদক ই. বি. কাওয়েলকে নিয়ে ‘পশ্চিম-  
পূর্ব’ নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয় ১৪০৪-  
এ বারোমাস পত্রিকার শারদ সংখ্যায়। সে  
গল্পে আসে গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং ক্ষেত্রমণির  
কথাও। ১৪০৪-০৫ সময়পর্বে ধারাবাহিক  
প্রকাশিত হয় লহনা-খুল্লনা উপন্যাস কিন্তু তা  
যেন প্রস্তুতিই তাই শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করেননি  
বই হিসেবে। ১৪০৯-এ দেশ পত্রিকার গল্প-  
সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ‘কালিদহ’ গল্প শ্রীমন্তের  
কঙ্ক-কামিনী-কুঞ্জর দর্শন বিষয়ে। বর্তমান  
উপন্যাসটির সূত্রপাত বছর ছয় আগে।

প্রিয় পাঠ্যবস্তু পরিচিত ও অল্পপরিচিত নানা  
মঙ্গলকাব্য এবং প্রিয় খাদ্যপদ বদরী-শকুল  
(কুল দিয়ে শোলমাছের টক)।